বাংলা আখ্যায়িকা-কাব্য

(১৮৫০-১৯০০)

শ্রীপ্রভাময়ী দেবী, এম.এ., ডি. ফিল্.

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
১৯৫৮

মূল্য—৬·৫০

সূচীপত্র

মাতৃদেবীর শ্রীচরণে

মুখবন্ধ

উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা আখ্যায়িকা-কাব্য অজস্র লেখা ও ছাপা হয়েছিল। শতাব্দীর প্রথমভাগের রচনাগুলিতে ভারতচন্দ্রের ও ইসলামি রোমান্টিক গল্পের প্রভাব ছিল মুখ্য। দ্বিতীয়ভাগের রচনাগুলিতে রঙ্গলালের ও মধুসূদনের এবং সংস্কৃত কাব্যের প্রভাব বেশি প্রতিফলিত। কোন কোন লেখক ইংরেজী আখ্যায়িকা অনুসরণ করেছিলেন। নানা কারণে বিগত শতাব্দীর আখ্যায়িকা-কাব্যগুলি জনপ্রিয় হতে পারেনি। (অবশ্য কামিনী-কুমারের মত আদিরসমুখ্য বইগুলির কথা আলাদা। কিন্তু এসব বইও রুচি পরিবর্তনের ফলে এখন বিলুপ্ত।) আধুনিক পাঠকের কাছে এসব বইয়ের নাম পর্যন্ত জানা নেই। বইগুলিও এখন দুর্লভ ও লুপ্তপ্রায়।

শ্রীযুক্তা প্রভাদেবী যখন আমার কাছে এলেন বাংলাসাহিত্যে গবেষণা করবার ইচ্ছা নিয়ে তখন আমি তাঁকে এই লুপ্ত আখ্যায়িকা-কাব্যগুলির পরিচয় উদ্ধারকার্যে নিযুক্ত করেছিলুম। তিনি প্রায় বছর তিনেক ধরে খেটে তাঁর থিসিস্ সম্পূর্ণ করেন এবং যথাকালে ডি-ফিল ডিগ্রী প্রাপ্ত হন। সুখের বিষয় এই যে অনতিবিলম্বে এই সে থিসিস্ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত হ'ল। শ্রীযুক্তা প্রভাদেবী আর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় উভয়ের পক্ষেই এটা সৌভাগ্য।

আলোচিত কাব্যগুলি—অর্থাৎ পদ্যে লেখা আখ্যায়িকাগুলি—অধিকাংশই সাহিত্যসৃষ্টি হিসাবে অকিঞ্চিৎকর। কিন্তু একদা সাধারণ পাঠকের ও সাধারণ লেখকের রুচি ও প্রবণতা কোন্ পথে ধাবিত হয়েছিল তার একটা অব্যর্থ ইঙ্গিত এগুলিতে পাই। সুতরাং বিগত শতাব্দীর সাহিত্যের ইতিহাসে এ বইগুলির আলোচনা অনাবশ্যক নয়। কোন কোন আখ্যায়িকা-কাব্যের আলোচনা আমিও করেছিলুম। কিন্তু সমস্তগুলির আলোচনা আমার বিষয়ের পক্ষে অপ্রাসঙ্গিক মনে করে করিনি। শ্রীযুক্তা প্রভাদেবীর এই বইয়ে আমার বইয়ের অসম্পূর্ণতা ঘুচল এবং উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের একটা ফাঁক পূর্ণ হ'ল।

'বাংলা আখ্যায়িকা-কাব্য' অনেক অজানা লেখকের ও অজানা বইয়ের সন্ধান দিয়েছে। বাংলাসাহিত্যের যাঁরা "উচকপালে" পাঠক-সমজদার তাঁদের কথা ধরি না, তবে যাঁরা নিতান্তই "সাধারণ" পাঠক তাঁরা নিশ্চয়ই প্রীত হবেন বইটি পড়ে। যাঁরা নিছক গল্পখোর তাঁরাও হয়ত বঞ্চিত হবেন না।

আগেকার দিনে রোজারা ক্রিয়াকর্ম শুরু করবার আগে অপদেবতার দৃষ্টি নিরাকরণের উদ্দেশ্যে "মুখবন্ধ" মন্ত্র পড়ত। আমি রোজা নই এবং এই মুখবন্ধ দিয়ে সমালোচকের মুখ বন্ধ করতে অবশ্যই চাই না। আমি শুধু শিক্ষিত সাধারণের কাছে সাহিত্যের এই ভোজ্য পাত্রটি এগিয়ে দিলুম।

দোলপূর্ণিমা
৫ই মার্চ্চ ১৯৫৮

শ্রীসুকুমার সেন

নিবেদন

সর্ব্বপ্রথমে আমার পরম পূজনীয় জ্ঞানগুরুদিগের শ্রীচরণে অন্তরের সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করি। তাঁহাদের উৎসাহ-উদ্দীপনা-উপদেশ না পাইলে গবেষণাত্মক-গ্রন্থরচনা-রূপ দুরূহ কার্য্যে অগ্রসর হইবার সাহস পাইতাম না। সাধক সাধনা করে—কিন্তু তাহার নিষ্ঠা ও একাগ্রতা অবিচলিত রাখিবার জন্য, উৎসাহ ও বিশ্বাস উদ্দীপ্ত রাখিবার জন্য এবং সমস্ত ভ্রান্তি ও সংশয় বিদূরিত করিবার জন্য গুরুর প্রয়োজন। আমার গবেষণা-কার্য্যে শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন মহাশয়কে গুরুরূপে পাইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলাম। তিনি তাঁহার গভীর জ্ঞানপূর্ণ উপদেশ ও নির্দ্দেশে গবেষণা কার্য্য যেমন পরিচালিত করিয়াছেন তেমনি আশা ও উৎসাহের বাণী দ্বারা আমার ক্ষণিকের নিরুৎসাহ ও নিরুদ্যমের নিরসন করিয়াছেন। তাঁহার মধ্যে প্রকৃত শিক্ষাগুরুর সন্ধান পাইয়াছি—জীবনে ইহা একটি পরম লাভ। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত লালতাপ্রসাদ সুকুল মহাশয় প্রেরণা এবং উৎসাহ দ্বারা আমাকে গবেষণা-কার্য্যে ব্রতী করিয়াছিলেন। সাক্ষাৎ হইলেই তিনি প্রশ্ন করিতেন—গবেষণা করিতেছি কিনা। অনেক সময় তাহাতে বিরক্তি-বোধও করিতাম, কিন্তু আজ মনে হয় ঐ প্রশ্নই হয়তো আমার মধ্যে কর্ম্মের প্রয়াস আনিয়াছিল। তাঁহার ঋণ অপরিশোধ্য। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত শশিভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয়ের সাহায্য-লাভও আমার পক্ষে কম সৌভাগ্যের বিষয় নহে। তিনি শুধু এই গবেষণার বিষয়বস্তুকে সর্ব্বসমক্ষে উপস্থিত করিবার সুযোগ ও সুবিধা দান করিয়াই ক্ষান্ত থাকেন নাই, মুদ্রণের ব্যাপারে আমার অজ্ঞতাজনিত সমস্ত দোষ-ত্রুটি অপসারিত করিতে নিজে অকুণ্ঠভাবে পরিশ্রম করিয়াছেন এবং যথোপযুক্ত নির্দ্দেশদানে পুস্তকপ্রকাশ সম্ভবপর করিয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার মহানুভবতা ও জ্ঞাননিষ্ঠার পরিচয় পাইয়া ধন্য হইয়াছি। অপর যাঁহারা নানাভাবে সাহায্য করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষাল মহাশয় অন্যতম। তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের গ্রন্থাগার হইতে বহু দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ ব্যবহার

করিবার সুযোগ দান না করিলে আমার কাজ সিদ্ধ হইত না। ন্যাশনাল লাইব্রেরীর শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অরবিন্দ সেনগুপ্ত এবং শ্রীযুক্ত কান্তি রায়চৌধুরী মহাশয়গণ পুস্তক-সংগ্রহের কার্য্যে নানাভাবে সাহায্য করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত সনৎকুমার গুপ্ত মহাশয়ের নামও উল্লেখযোগ্য। ইঁহাদের সকলকেই অন্তরের সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জানাইলাম। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষকেও আমি আমার সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

প্রস্তুত নিবন্ধে ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে রচিত ও প্রকাশিত কাহিনী কাব্যগুলি আলোচিত হইয়াছে। ইহার আরম্ভে মাইকেল মধুসূদন, সমাপ্তিতে কিশোর রবীন্দ্রনাথ। এই দুই মহাকবির নাম হইতেই আলোচিত কাব্যধারার আদ্যন্ত সীমা ও বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট—বাংলা কাব্য-সাহিত্যে ইহা পরিবর্ত্তনের যুগ।

এই সময়ে রচিত কাব্যগুলির মধ্যে অনেক আগাছা ও পরগাছা নজরে পড়ে। কিন্তু শ্যামল বনানীর শোভা উপলব্ধি করিতে চাহিলে কেবল গোলাপ-যূথী-বেলী-শোভিত উদ্যান দেখিলে চলে না, প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয়, ভাল এবং মন্দ, উভয়ের মিশ্রিত রূপটি দেখিয়া নয়ন সার্থক করিতে হয়। ব্যষ্টিগতভাবে যাহাদের কোনই মূল্য নাই, সমষ্টিগতভাবে তাহারাই একটি বিশেষ রূপকে ফুটাইয়া তুলিতে সাহায্য করে। তুচ্ছকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখিলে তাহার তুচ্ছতাই নজরে পড়ে—কিন্তু বৃহতের ক্ষেত্রে দেখিলে তাহারও একটি বিশেষ স্থান ও প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। তাই উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে রচিত কাহিনী-কাব্যের ধারা আলোচনা করিতে গিয়া আমি সব কাব্যকেই অল্পবিস্তর মর্য্যাদা দান করিয়াছি—অকিঞ্চিৎকর বলিয়া কাহাকেও অগ্রাহ্য করি নাই।

এ সময়ে রচিত কাহিনী-কাব্যগুলির মধ্যে দুইটি ধারা দৃষ্টিগোচর হয়—একটি পুরাতন, অপরটি নবীন। পুরাতন কাব্যধারায় গতানুগতিকতার ক্লান্তিকর সুরটি সমাপ্তির ইঙ্গিতে পূর্ণ আর নব্য ধারা নবজাগরণের কল-কল্লোলে মুখরিত। উভয়বিধ ধারার বিশেষ সুরটিকে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়া আমি নিবন্ধটিকে ছয়টি পরিচ্ছেদে ভাগ করিয়াছি।

প্রথম পরিচ্ছেদে—ভূমিকা। ইহাতে কাব্যের স্বরূপ, কাহিনীর সহিত কাব্যের সম্বন্ধ, প্রাচীন কাব্যধারার মূল সুর, আধুনিকতার বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি

আলোচিত হইয়াছে। ইহাদের পটভূমিকায় সে যুগে রচিত আখ্যায়িকা-কাব্যগুলির বিচার করিতে গিয়া তাহাদের পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিয়াছি—(১) পৌরাণিক বা দেবদেবীমাহাত্ম্যজ্ঞাপক কাব্য (২) জীবনী-কাব্য (৩) ইতিহাসাশ্রিত বা দেশপ্রেমমুখ্য কাব্য (৪) প্রণয়মূলক বা আদিরসাত্মক কাব্য (৫) গাথা বা নবীন রোমাণ্টিক কাব্য।

পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদগুলিতে ইহাদেরই এক-একটি ধারাকে অবলম্বন করিয়া যে-সকল কাব্য পাওয়া গিয়াছে তাহাদের আলোচনা করিয়াছি। সর্ব্বসমেত ৬৮ জন লেখকের ৯৬ খানি গ্রন্থ প্রস্তুত নিবন্ধে আলোচিত হইয়াছে।

এই আলোচনায় আমি কোন প্রকার দার্শনিক বা সাহিত্যিক তত্ত্বকথা বলিবার প্রয়াস পাই নাই এবং সেরূপ আলোচনার কোন স্থানও আছে বলিয়া মনে করি নাই। আমার কাজ প্রধানতঃ, যে বিলুপ্ত ও বিলুপ্তপ্রায় গ্রন্থগুলি একদা বাঙালী পাঠকের অল্পবিস্তর মনোরঞ্জন করিয়াছিল, সেগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান—তাহাদের মধ্যে পরস্পর সম্পর্ক নির্ণয় এবং বাংলা সাহিত্যের পূর্ব্বাপর ইতিহাসের সহিত তাহাদের সংযোগসূত্র আবিষ্কার। এই নিবন্ধে আলোচিত আখ্যায়িকা-কাব্যগুলির মধ্যে অধিকাংশেরই কোন রকম স্থায়ী মূল্য নাই এবং সেগুলি যে বর্ত্তমানকালে পাঠকসমাজের উপেক্ষিত তাহাও অন্যায় বলিতে পারি না। কিন্তু একদা যে প্রচেষ্টার ফলে এই আখ্যায়িকা কাব্যগুলি উদ্ভূত হইয়াছিল সেই প্রচেষ্টার ঐতিহাসিক মূল্য আছে। আমার এই আলোচনা সেই ঐতিহাসিক মূল্য যাচাই করিবার উপাদান যোগাইবে,—এই উদ্দেশ্য লইয়াই নিবন্ধটি রচিত হইয়াছে।

আলোচিত গ্রন্থগুলির অধিকাংশই দুষ্প্রাপ্য। সেগুলি সংগ্রহ করিতে বিশেষ আয়াস করিতে হইয়াছে। তবুও যে সবগুলি দেখিতে পারিয়াছি এমন দাবী করিব না। তবে যে-সব বই দেখি নাই তাহা ভারতবর্ষের কোন সাধারণ বা প্রাতিষ্ঠানিক গ্রন্থাগারে অথবা ব্যক্তিগত সংগ্রহে আছে বলিয়া সন্ধান পাই নাই। আলোচনা আমার সাধ্যমত সম্পূর্ণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি।

কলিকাতা — প্রভাময়ী দেবী

২৮শে ফাল্গুন, ১৩৬৪

প্রথম পরিচ্ছেদ

ভূমিকা

কাব্য ও কাহিনী লইয়াই সর্ব্বত্র সাহিত্যের প্রথম উন্মেষ। মানুষের জীবনকে ঘিরিয়া রহিয়াছে রূপ-জগতের বর্ণসুষমা ও সৌন্দর্য্য এবং অরূপলোকের সুর-ঝঙ্কার ও অনির্ব্বচনীয়তা। তাই বিচিত্র অনুভূতি এবং উপলব্ধির ভিতর দিয়া মানব-মনে নানাবিধ ভাবের উদয় হয়। তাহারই আবেগে সে গান করে, ছবি আঁকে, মাটি লইয়া মূর্ত্তি তৈয়ারী করে এবং পাথর কাটিয়া নিজ মনো-ভাবকে ব্যক্ত করে। কখনও সে ছন্দের ভিতর দিয়া অরূপকে রূপায়িত করিতে চায়, আবার কখনও কাহিনীর ভিতর দিয়া রূপের বিকাশ দেখাইতে চেষ্টা করে। এইভাবেই বিশ্বসাহিত্যে কাব্য ও কাহিনীর সৃষ্টি হয়। আত্ম-প্রকাশের ব্যাকুলতা হইতেই উভয়ের উৎপত্তি এবং আত্ম-প্রকাশের ক্রমবিকাশের পথেই উভয়ের শ্রীবৃদ্ধি।

কাব্য-সম্বন্ধে প্রাচ্য দেশের প্রাচীন আলঙ্কারিকগণের নানাবিধ মত দৃষ্ট হয়। কাব্যপ্রকাশকার মম্মটভট্ট কাব্য-সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

কাব্যং যশসেঽর্থকৃতে ব্যবহারবিদে শিবেতরক্ষতয়ে।
সদ্যঃ পরনির্বৃতয়ে কান্তাসম্মিততয়োপদেশযুজে ॥ (১।২)

দণ্ডী কাব্যাদর্শে লিখিয়াছেন—

অতঃ প্রাজ্ঞানাং ব্যুৎপত্তিমভিসন্ধায় সূরয়ঃ।
বাচাং বিচিত্রমার্গাণাং নিববন্ধুঃ ক্রিয়াবিধিম্।
তৈঃ শরীরঞ্চ কাব্যানামলঙ্কারাশ্চ দর্শিতাঃ।
শরীরং তাবদিষ্টার্থব্যবচ্ছিন্না পদাবলী ॥ (১।৯।১০)

কাব্যালঙ্কারে বামন বলিয়াছেন—

কাব্যং গ্রাহ্যমলংকারাৎ। (১।১।১)

এবং

রীতিরাত্মা কাব্যস্য। (১।২।৬)

এই-সকল আলঙ্কারিক কাব্য-অঙ্গের ব্যাখ্যা দ্বারা কাব্যের স্বরূপ বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। সেইজন্য পরবর্ত্তী আলঙ্কারিকগণ-কর্তৃক এই সূত্রগুলি পরিত্যক্ত হইয়াছে। তবে সাহিত্য-দর্পণে বিশ্বনাথ যে সূত্র দিয়াছেন—

বাক্যং রসাত্মকং কাব্যং। (১।২)

এবং আনন্দবর্দ্ধন ধ্বন্যালোকে যাহা লিখিয়াছেন—

কাব্যস্যাত্মা ধ্বনিঃ। (১।১)

পরবর্ত্তী আলঙ্কারিকগণ কাব্য-স্বরূপ-নির্ণয়ের উপযোগী বলিয়া ইহাই গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু ইউরোপীয় আলঙ্কারিকগণের সূত্রগুলি এ বিষয়ে অনেক বেশী সহজ বলিয়া মনে হয়। প্রাচ্যদেশ যেখানে 'রস' এবং 'ধ্বনি' বলিয়া ব্যাপার ঘোরালো করিয়া তুলিয়াছেন, ইংরাজী সাহিত্য-তাত্ত্বিক সেখানে 'Emotion', 'Nature', 'Eternal Truth' প্রভৃতি সাধারণ শব্দ ব্যবহার করিয়া বিষয়টিকে সরল করিয়াছেন সন্দেহ নাই। এরিস্টট্‌ল-এর মতে "The art imitates Nature"। ব্র্যাড্‌লি তাঁহার 'Lectures on Poetry' গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

"It springs from the creative impulse of a vague imaginative mass pressing for development and definition." (P-23)

'Aspects of Poetry' গ্রন্থে জে, সি, সেয়ার্প লিখিয়াছেন—

"It is rooted rather in the heart than in the head." (P-3)

এফ, সি, প্রেসকট "Poetry & Myth" গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

"Poetry is essentially the language of the imagination." (P-1)

'What is Poetry' প্রবন্ধে জে, এইচ্, এল, হাণ্ট লিখিয়াছেন—

"Poetry is imaginative passion."

সেক্সপীয়ার কহিয়াছেন—

…"Imagination bodies forth
The forms of things unknown."
(Midsummer Night's Dream, Act. V· ScI· 16-17)

ওয়ার্ডসওয়ার্থ কহিয়াছেন—

"Poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings ; it takes its origin from emotion recollected in tranquillity."

(Poetry and Poetic Diction)

শেলী 'Defence of Poetry'-তে কহিয়াছেন—

"A poem is the very image of life expressed in its eternal truth."—(P-203)

রবীন্দ্রনাথ 'সাহিত্যের তাৎপর্য্য'-এ কহিয়াছেন—

"ভগবানের সৃষ্টির প্রতিঘাতে আমাদের অন্তরের মধ্যে সেই যে সৃষ্টির আবেগ সাহিত্য তাহারই বিকাশ।"—(সাহিত্য-পৃঃ ৬)

উপরি-উক্ত সূত্রগুলি হইতে দেখা যায়, প্রাচ্য সাহিত্যতাত্ত্বিক কাব্যে 'রস'কে শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়াছেন এবং পাশ্চাত্য সাহিত্যতাত্ত্বিক 'আবেগ'কে (emotion) প্রাধান্য দিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথও 'সৃষ্টির আবেগ'-কেই সাহিত্য-সৃষ্টির মূল উপাদানরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। অবশ্য সব সূত্রের ব্যাখ্যাই বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন কালে যে উপসংহারে আসিয়া সমাপ্তি লাভ করিয়াছে তাহার ভিতর দিয়া একই সত্য আত্মপ্রকাশ করে—বিশ্বের ভাবময় সত্তার রসঘন আনন্দময় প্রকাশকেই কাব্য বলা চলে।

এখন বিচার্য্য হইতেছে যে কাহিনীর সহিত কাব্যের মিলন সম্ভব কি না এবং উভয়ের মিলনস্থানই বা কোথায়? কারণ উভয়ের উপাদান ভিন্ন, দৃষ্টিভঙ্গি ভিন্ন, প্রকাশভঙ্গিও পৃথক্। কাব্যে থাকে অদৃশ্যলোকের অনির্ব্বচনীয়তা এবং ভাবলোকের রহস্যময় ব্যঞ্জনা আর কাহিনীর মধ্যে থাকে দৃশ্যলোকের অনুভূতিময় প্রকাশ, বাস্তব জগতের রূপবৈচিত্র্যের বর্ণসম্ভার। সেইজন্য আপাত-দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে মনে হয় 'কাহিনী-কাব্য' শব্দটি ত্রুটিপূর্ণ ও অর্থহীন। কিন্তু নাটক বা উপন্যাসের মধ্যে যে কাহিনী থাকে কাব্যে রচিত কাহিনী তাহা হইতে স্বতন্ত্র বস্তু। এই উভয়বিধ কাহিনীর ভিতর পার্থক্যটুকু হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে দেখা যায় কাহিনীর সহিত কাব্যের বিরোধ কোথাও নাই বরং উভয়ে উভয়ের সাহায্যে সমৃদ্ধ ও সুন্দর হইয়া উঠিতে পারে।

নাটক বা উপন্যাসের কাহিনী দৃশ্যলোকের বৈচিত্র্যের বর্ণনায় পূর্ণ। ইহা জীবনকে চিত্রিত করে—মানুষের জীবনের সুখ-দুঃখ, ভাল-মন্দ, বেদনা-অনুভূতিভূ

ইহার বিষয়বস্তু। বাস্তবকে মধুর ও সুন্দর করিয়া প্রতিফলিত করিতে পারিলেই ইহার সার্থকতা। কিন্তু কাব্যের ক্ষেত্রে এই দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণই অর্থহীন। মানব-জীবনের বাস্তব প্রকাশের পশ্চাতে যে নিগূঢ় সত্য অদৃশ্য থাকিয়াও নানা রূপে ও ভাবে জীবনকে মাধুর্য্যে ও সঙ্গীতে, বেদনায় ও আবেগে অনুরঞ্জিত করিতেছে কাব্যে রচিত কাহিনী তাহারই প্রতি ইঙ্গিতময়তায় পূর্ণ। ইহা বাস্তবকে চিত্রিত করে কিন্তু তাহার পশ্চাৎ-পটভূমিকায় থাকে বিশ্ব-সত্য ও সৌন্দর্য্যের অনির্ব্বচনীয়তা। ইহার ভিতর যে কাহিনী থাকে তাহা কবির ভাবলোকে দৃষ্ট সত্যের ছায়াময় প্রকাশ। কাহিনী-কাব্যের সত্য, মানব-আদর্শের সত্য আর নাটক বা উপন্যাসের কাহিনীর সত্য, মানব-জীবনের সত্য। উভয়ের উদ্দেশ্য ভিন্ন, দৃষ্টি ভিন্ন এবং উপায়ও ভিন্ন। শ্রেষ্ঠ কবিরা ভাবরাজ্যে বিচরণ করেন এবং তাঁহাদের ধ্যানদৃষ্টির সম্মুখে মানুষের যে অনুভূতিময় সত্তা আত্মপ্রকাশ করে তাহাকেই রূপ দেন তাঁহাদের কাব্যে। কিন্তু উপন্যাস-লেখক বা নাটক-রচয়িতার নিকটে বাহিরের জগতের মূল্যই বেশী। জীবন-সম্বন্ধে তাঁহাদের অভিজ্ঞতা যত ব্যাপক ও গভীর হয় তাঁহাদের রচিত কাহিনীও তত বেশী সুন্দর ও সার্থক হইয়া উঠে। তাই উপন্যাস-সাহিত্যের বা নাট্য-সাহিত্যের কাহিনীর সহিত কাব্য-সাহিত্যের কাহিনীর পার্থক্য অনেক। সব কাহিনীর ভিতর দিয়াই সত্য আত্মপ্রকাশ করে—কিন্তু সে-সব সত্য ভিন্নধর্ম্মী। সেইজন্যই দেখা যায়, কাব্য যেখানে ভাবলোককে প্রকাশ করে এবং কাহিনী যেখানে ভাবময় রূপ দান করে সেখানে উভয়ের ভিতর কোন বিরোধই থাকে না—সেখানেই কাহিনী-কাব্যের সার্থকতা। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—"অতএব চিত্র এবং সঙ্গীতই সাহিত্যের প্রধান উপকরণ। চিত্র ভাবকে আকার দেয় এবং সঙ্গীত ভাবকে গতি দান করে। চিত্র দেহ এবং সঙ্গীত প্রাণ।" —(সাহিত্য—পৃঃ ৫)। এই তাৎপর্য্য আখ্যায়িকা-কাব্যের ক্ষেত্রেই সর্ব্বাধিক স্পষ্ট। ইহা চিত্র আঁকে—সঙ্গীতকেও কথঞ্চিৎ ব্যক্ত করে, রূপকে প্রকাশ করে—অরূপের প্রতিও ইঙ্গিত করে। সেইজন্যই দেখা যায়, আখ্যায়িকা-কাব্যের ছন্দের মধ্যে যেমন আবেগের স্ফুরণ হইয়াছে কাহিনীর ভিতর সেইরূপ অনুভূতি বিকাশ লাভ করিয়াছে। প্রাচীন সাহিত্যে তাই দেখা যায় কাহিনী ও কাব্য অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত এবং উভয়ে উভয়ের সাহায্যে পরিপুষ্ট। ঋগ্বেদ-সংহিতার মত প্রাচীন গ্রন্থেও আমরা ইহার নিদর্শন

পাই। তারপর বিভিন্ন শাস্ত্রগ্রন্থ, ইতিহাস, পুরাণ, শ্রব্য ও দৃশ্য কাব্যের ভিতর দেব-দেবীর ও নর-নারীর মাহাত্ম্যজ্ঞাপক বিভিন্ন কাহিনীর প্রকাশ দেখা যায়। অবশ্য এই কাহিনীগুলি সবই কিছু-না-কিছু পরিমাণে উদ্দেশ্যমূলক ও উপদেশাত্মক ছিল।

প্রাচীন কাব্যে দেবদেবীকে লইয়া রচিত কাহিনীর প্রাধান্যই দৃষ্ট হয়। সকল দেশের সাহিত্যের পক্ষেই ইহা প্রযোজ্য। মানুষের চেতনাবোধের উন্মেষকালে বিশ্বপ্রকৃতির বিচিত্র প্রকাশ তাহার মনে যে আতঙ্ক ও বিস্ময়ের সৃষ্টি করে তাহাই পূজা বা আরাধনা, ভয় ও ভক্তি দ্বারা মানুষের আধিদৈবিক শক্তিবোধের সূচনা করে। অসহায় মানুষ তখন বৃহত্তর শক্তির নিকট আশ্রয় ও সাহস পাইবার বাসনায় বিভিন্ন দেব-দেবীর কল্পনা করিয়া বিপদে-আপদে ও সুখে-দুঃখে শরণ লইতে চায়। ইহারই ক্রমপরিণতিতে তাঁহাদের মাহাত্ম্য-প্রচার করিবার জন্য বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন যুগে মানুষ নানারূপ অলৌকিক ঘটনার অবতারণা করিয়া নানাবিধ কাহিনীর সৃষ্টি করিয়াছে এবং কাব্যে তাহাদের রূপ দিয়াছে।

ধর্ম্মের সহিত কাব্যের যোগসূত্র অন্বেষণে দেখা যায় যে ধর্ম্মের লক্ষ্য এবং কাব্যের লক্ষ্য—মূলে এক। উভয়েই জগৎ এবং জীবনের ভিতর চিরন্তন সত্যের অনুসন্ধানে ধ্যানমগ্ন। ধর্ম্ম মানুষকে বৃহত্তম সত্তার সন্ধান দেয়—কাব্য বিশ্ব-সত্যকে রূপ দিতে চেষ্টা করে। তাই কাব্যের ভাষা ও ছন্দ ধর্ম্মানুভূতি প্রকাশের পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী। ধর্ম্মসাধককে এবং কাব্যসাধককে তুল্যভাবেই দ্রষ্টা বলা চলে। কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ লিখিয়াছেন—

> ......"the animating faith,
> That poets, even as prophets,......
> Have each his own peculiar faculty,
> Heaven's gift, a sense that fits them to perceive
> objects unseen before."
> (The Prelude, Bk. XIII, Ll. 300-305)

জীবনের চিরন্তন সত্য সম্বন্ধে শেলী কহিয়াছেন—

> The One remains, the many change and pass;
> Heaven's light forever shines, Earth's shadows fly;

Life, like a dome of many-coloured glass
Stains the white radiance of eternity.

(Adonais—stanza vii)

আমাদের বেদজ্ঞ ঋষি যাঁহাকে "একমেবাদ্বিতীয়ম্" বলিয়াছেন, কবি শেলী তাঁহার ভাবানুভূতির দ্বারা সেই "One"-কেই উপলব্ধি করিয়াছেন। সেইজন্যই প্রাচীনকালের কাব্য-সাহিত্যে ধর্ম্মের প্রকাশ এবং দেব-দেবীর মাহাত্ম্য-বর্ণনাই স্থান লাভ করিয়াছে।

বাংলা-সাহিত্যেরও শৈশব দেব-দেবীর বন্দনায় ও মাহাত্ম্য-কীর্ত্তনে কাটিয়াছে। তারপর তাহার ধারা বিভিন্ন মতাবলম্বী ও বিভিন্ন পথাবলম্বী লেখক ও পাঠকবর্গের পরিচালনায় বিভিন্ন কাহিনীর ভিতর দিয়া বাংলা কাব্য-সাহিত্যের রসপুষ্টি ও শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছে।

সাহিত্য-সৃষ্টির আদি যুগ হইতে মানুষের রসপিপাসু মনকে পরিতৃপ্ত করিয়া কাব্যের এক অখণ্ড ধারা প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে অনাগতের দিকে। ভিন্ন ভিন্ন যুগের ভাবরসের রঙ্গে-ভঙ্গে-তরঙ্গে ফুটিয়া উঠে তাহার নব রূপ নব বেশ। তাই এক যুগের কাব্য-ধারার সহিত অপর যুগের কাব্যধারার আকাশ-পাতাল প্রভেদ। সাহিত্যের ইতিহাসে এই ক্রমবিবর্ত্তনের মূল কারণ অনুসন্ধান করিতে গেলে প্রধানতঃ দুইটি বিষয়ে দৃষ্টি পড়ে—একটি ধর্ম্ম, অপরটি রাষ্ট্র। মানুষের অন্তর-জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে ধর্ম্ম আর বাহিরের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে রাষ্ট্র, আবার উহারা পরস্পর পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। তাই, কি ব্যক্তিগত জীবনে, কি জাতিগত জীবনে, এই দুইটি শক্তির প্রভাব অনস্বীকার্য্য। নূতন ধর্ম্মের প্রবর্ত্তনে মানসিক দৃষ্টির পরিবর্ত্তন সহজেই লক্ষ্য করা যায় সাহিত্যের পৃষ্ঠায়। বাংলার প্রাচীন সাহিত্যে ইহার দৃষ্টান্ত অপ্রতুল নয়। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পর বাংলা-সাহিত্যে যে এক বিরাট পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইয়াছিল এবং নূতন ভাবের জোয়ার আসিয়াছিল তাহা অবিসম্বাদী সত্য। রাষ্ট্রীয় পরিবর্ত্তনের ক্ষেত্রেও ইহা লক্ষণীয়।

ইতিহাসের রথচক্রতলে পিষ্ট হইয়া যায় পুরাতন জীর্ণ নির্জীবতা। জাগিয়া উঠে নূতন প্রাণের সাড়া—সুষুপ্তির পরে জাগরণ, অবসাদের পরে উদ্দামতা। এই পরিবর্ত্তনের তরঙ্গাঘাত সমাজের নিম্নস্তরে সব সময় পৌঁছায় না। কিন্তু সমাজের বিজ্ঞান-মানসে ও অনুভূতিশীল অন্তরে তাহারই প্রতিক্রিয়া অনেক

পরিবর্ত্তন সাধন করে। কারণ শাসক-সম্প্রদায়ের সভ্যতা-কৃষ্টি, আচার-ব্যবহার, রাজনীতি-ধর্ম্মনীতি দেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতির উপর অনেকখানি প্রভাব বিস্তার করে। তাই দেখা যায়, মুসলমান রাজত্বকালে বাংলাদেশে নবাবগণের পৃষ্ঠপোষকতায় যেমন সাহিত্যের চর্চ্চা বর্দ্ধিত হইয়াছিল এবং অনুবাদ-সাহিত্য দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতেছিল—ইংরাজ-শাসনের প্রবর্ত্তনেও সেইরূপ বাংলা-সাহিত্যের ক্ষেত্রে এক বিরাট পরিবর্ত্তনের সূচনা স্পষ্ট হইয়া উঠিল। নবাবী আমলের পরিবর্তন বহিরঙ্গমূলক ছিল, ইংরাজী আমলের পরিবর্ত্তন অন্তরঙ্গ।

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা-সাহিত্যের বিবর্ত্তনপথটি জানিতে হইলে তাই অষ্টাদশ শতাব্দীর ইতিহাসকে উপেক্ষা করা যায় না। যে আলস্য ও নিশ্চেষ্টতায়, যে সঙ্কীর্ণতা ও স্বার্থপরতায় বাঙালীর জাতীয় জীবন গ্লানিপূর্ণ ও অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল পলাশীর রক্তস্নানে তাহা বিধৌত হইল। জাতীয়-জীবনের পরবর্ত্তী ইতিহাস জাগরণের ইতিহাস, সংঘর্ষের ইতিহাস, সংস্কারের ও সংগঠনের ইতিহাস। অবশ্য পলাশীর ক্ষেত্রে দেশের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই এই জাগরণের সূচনা দেখা যায় নাই। অতি ধীরে মন্থর-গতিতে জাতীয় জীবনের মধ্যে এই সংস্কারের কাজ চলিয়াছিল—তাহার একদিকে ভাঙ্গা অপরদিকে গড়া। প্রথমে সংঘাত পরে সমন্বয়, প্রথমে বিপর্য্যয় ও বিশৃঙ্খলা, পরে সংহৃতি ও সংগঠন। ইহারই ক্রমবিবর্ত্তনের ইতিহাস পাওয়া যায় উনবিংশ শতাব্দীর সমাজ-মানসে ও সাহিত্য-মানসে। প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের সাংস্কৃতিক সংঘর্ষের ফলে আসিল নূতন জীবনবেদ। জড়তা ও নির্লিপ্ততা ঘুচিয়া গেল, বাস্তব-জীবনের দিকে লক্ষ্য পড়িল, পার্থিব ভোগ-তৃষ্ণা মাথা চাড়া দিয়া উঠিল, আদর্শের নিশ্চল ভিত কম্পিত হইল। আসিল নবীন জিজ্ঞাসা। ভক্তির স্থানে আসিল বুদ্ধি, বিশ্বাসের স্থানে বিচার, ব্যাপ্তির স্থানে গভীরতা। জগৎ ও জীবনকে নূতন চোখে দেখিবার, নূতনভাবে পাইবার স্পৃহা জাগিল—আনিল বিস্ময় ও প্রেরণা, ভ্রান্তি ও মুক্তি, ধ্বংস ও গঠন। তাহারই ফলস্বরূপ আমরা পাইলাম রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, রঙ্গলাল, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র প্রভৃতি সাহিত্যসেবিগণকে। এই নবীন সম্প্রদায়ের জয়যাত্রা সকল দিকেই যে সাফল্যমণ্ডিত হইল তাহা নহে, তবে এক নূতন প্রাণবন্যা যেন সকল দিকেই

নবীন জীবনের সূচনা করিয়া দিল। আত্মভোলা ভাববিমুগ্ধ বাঙালীর জীবনে আত্ম-সচেতনতা ব্যক্তিত্ববোধ, স্বাজাত্যপ্রীতি এবং যুক্তিবাদ আত্মপ্রকাশ করিল। তাহারই ফলস্বরূপ গদ্য-সাহিত্যের সৃষ্টি হইল। একদিকে গদ্য পাঠ্যপুস্তক, সংবাদপত্র ও তাহার মাধ্যমে বিজ্ঞানসম্মত প্রবন্ধাদি এবং ধর্ম্ম ও সমাজ-সম্বন্ধীয় তত্ত্ব-ব্যাখ্যাদি পাওয়া গেল—অপরদিকে উপন্যাস, নাটক, প্রহসন ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপাত্মক চিত্র প্রকাশিত হইতে লাগিল। কাব্য-জগতে—গীতিকাব্য, চতুর্দ্দশপদী-কবিতা, রোমান্টিক কাব্য, ইতিহাসাশ্রিত কাব্য, স্বদেশপ্রেমমূলক কাব্য, গাথা-কাব্য প্রভৃতি নূতন রূপের সৃষ্টি হইল এবং ভাবের ক্ষেত্রেও অভাবনীয় পরিবর্ত্তন সূচিত হইল। দেবমহিমাজ্ঞাপক পুরাণ-কাহিনী, রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবত কাহিনী, মঙ্গল-কাব্যের কাহিনীর পরিবর্ত্তে মানুষের শৌর্য্য-বীর্য্যের কাহিনী, সুখ-দুঃখের কাহিনী দেখা গেল। তাই উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে (১৮৫০ হইতে ১৯০০ খ্রীঃ মধ্যে) যে-সকল আখ্যায়িকা কাব্য পাওয়া যায় তাহাদের মোটামুটি পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা চলে—(১) পৌরাণিক বা দেব-দেবীর মাহাত্ম্য-জ্ঞাপক কাব্য, (২) জীবনী-কাব্য, (৩) ইতিহাসাশ্রিত বা দেশপ্রেমমুখ্য কাব্য, (৪) প্রণয়মূলক বা আদিরসাত্মক কাব্য, (৫) গাথা বা নবীন রোমান্টিক কাব্য।

কাব্যের ক্ষেত্রে এই যুগের ভাবমুক্তি ও নব রূপায়ণকে এক কথায় বলা যায় ইহা ক্লাসিসিজমের কৃত্রিম বন্ধন হইতে রোমান্টিসিজমের আবেগানুভূতির ক্ষেত্রে হৃদয়-মুক্তির ইতিহাস, মহাকাব্য ও আখ্যায়িকা-কাব্যের কাহিনী-বন্ধন হইতে লিরিক অনুভূতি ও হৃদয়োচ্ছ্বাসের স্বতঃস্ফূর্ত্তির ইতিহাস। তাই এই যুগের কাহিনীকাব্যের ক্লাসিক সুরের মধ্যে রোমান্টিক সুরের ধীর মন্থর আগমন লক্ষ্য করা যায় এবং তাহারই পূর্ণ প্রকাশ আমরা এই যুগের রোমান্টিক গাথা কাব্যগুলিতে পাই, যাহাকে লিরিক কবিতারই পূর্ব্বাবস্থা বলিয়া ধরা চলে।

ক্লাসিক সাহিত্যে সহজ সরল বলিষ্ঠতা আত্মপ্রকাশ করে। তাহার মধ্যে ইঙ্গিত বা রহস্যময়তার স্থান নাই। স্থূল দৃষ্টিতে সহজ বুদ্ধিতে যাহার মহত্ত্ব, বীরত্ব, বিরাটত্ব ও ব্যাপ্তি মনে বিস্ময় ও প্রশংসার উদ্রেক করে তাহারই প্রকাশ আমরা দেখি ক্লাসিক সাহিত্যে। সেখানে বুদ্ধিবল অপেক্ষা বাহুবলের প্রাধান্য, সূক্ষ্ম অন্তর্দ্বন্দ্ব অপেক্ষা স্থূল প্রবৃত্তির সংঘাত, মানসিক অবস্থার পরিণতি অপেক্ষা বাহ্যিক জয়-পরাজয় দ্বারা জীবন-জিজ্ঞাসার পরিসমাপ্তি দেখা

যায়। স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতাল পরিব্যাপ্ত করিয়া ঘটনার সমাবেশ, সংহত কাঠিন্যের মধ্যে গাম্ভীর্য্যপূর্ণ পরিবেশ-সৃষ্টি, ভাষা ও ভাবের আড়ম্বরপূর্ণ জমকালো প্রকাশ, সমস্ত সাহিত্যের মধ্যে একটা মহান্ অসাধারণত্বের সুর ঝঙ্কৃত করে। তাই ক্লাসিক কাব্যের চরিত্রগুলিও হয় বলিষ্ঠ, আত্মনির্ভরশীল, আদর্শনিষ্ঠ এবং একমুখী। সোজা পথে আত্মবিশ্বাসের দৃঢ় পদক্ষেপে কাহিনীর মধ্যে তাহাদের অগ্রগতি লক্ষণীয়। প্রাকৃতিক দৃশ্য বর্ণনায়ও একটা বিরাট পরিবেশ সৃষ্টির প্রয়াস দেখা যায়, সূক্ষ্ম সহমর্ম্মিতা দ্বারা প্রকৃতির রহস্যের প্রতি আকর্ষণ দৃষ্ট হয় না। অপরদিকে রোমান্টিক সাহিত্যের মধ্যে ইহার বিপরীত অবস্থাগুলিই দেখা যায়। মোহিতলাল মজুমদার "আধুনিক বাংলা সাহিত্য"-এ লিখিয়াছেন —"মোটের উপর অর্থে নহে—ভাবে যাহা গভীর, শব্দ হইতে শব্দাতিরিক্ত ভাবসৃষ্টি যাহার উদ্দেশ্য, প্রকাশ অপেক্ষা ইঙ্গিত ব্যঞ্জনা যাহাতে অধিক,— তাহাকেই আমরা রোমান্টিক রচনা বলিতে পারি।" (৩য় সংস্করণ, ২৭৭ পৃঃ)। মানব-জীবনকে ঘিরিয়া এবং প্রকৃতিকে আচ্ছন্ন করিয়া যে নিগূঢ় সত্তা বিদ্যমান এবং যাহা মানবচিত্তকে আনন্দ-কল্পনায় নিয়ত উদ্বুদ্ধ করিতেছে রোমান্‌স্ কাহিনী তাহাই প্রকাশ করিতে চেষ্টা করে। পৃথিবীতে কত অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিতেছে, জীবনে কত অসম্ভব ও অবিশ্বাস্য ঘটনা সম্ভব হইতেছে—ইহার কার্য্যকারণ মানুষের নিকট দুর্জ্ঞেয়। কবি-কল্পনার আলোক-সম্পাতে, ভাবের তন্ময়তায় এবং সুতীব্র অনুভূতির আবেগময়তার নিকট এই রহস্য আপন অবগুণ্ঠন অর্দ্ধোন্মোচিত করে। কবি সেই অপূর্ব্ব রূপ-শ্রী দর্শনে অভিভূত হইয়া পড়েন এবং তাঁহার সেই আত্মবিহ্বল সৌন্দর্য্যানুভূতি ও বিস্ময়-বিমুগ্ধ-আবেগ রূপ পায় তাঁহার রোমান্টিক কাব্য-কল্পনায়। বাস্তবতার রন্ধ্রে রন্ধ্রে অবাস্তবতা যে বাঁশি বাজাইতেছে, ইন্দ্রিয়ের কানায় কানায় যে অতীন্দ্রিয়ের সুধারস টলটল করিতেছে, লৌকিক জগতের ঘরে ঘরে যে অলৌকিকের আনাগোনা—রোমান্‌স্ তাহাই প্রকাশ করিতে চায়। জীবন যাহাকে চায় কিন্তু পায় না—সেই সুন্দরতর, বৃহত্তর ও মহত্তর পরিবেশকে রোমান্‌স্ প্রকাশ করে। তাই ইহার ভিতর স্থূল প্রবৃত্তি অপেক্ষা সূক্ষ্ম অনুভূতি এবং তাহার বিচিত্র আনন্দ ও বেদনাবোধ রূপায়িত হয় সূক্ষ্ম স্বচ্ছ কারুকার্য্য ও ইঙ্গিত-ময়তার দ্বারা। ভাব ও ভাষা আড়ম্বরহীন ব্যঞ্জনায় পূর্ণ। চরিত্রগুলির মধ্যে শৌর্য্য-বীর্য্য অপেক্ষা হৃদয়মত্তা, অন্তরের নিষ্ঠা অপেক্ষা দ্বন্দ্ব, বাহ্যিক জয়-

পরাজয় অপেক্ষা মানসিক অনুভূতি, প্রধান স্থান অধিকার করে। ব্যাপ্তি অপেক্ষা গভীরতা, সহজ সরল পথরেখা অপেক্ষা জটিল, দুর্জ্ঞেয়, রহস্যপূর্ণ পথের সন্ধান বেশী কার্য্যকরী হয়। প্রকৃতির বিরাট মহনীয়তা ইহাতে চিত্রিত হয় না—অতি ক্ষুদ্র তুচ্ছ কর্ম্মের মধ্যে মানুষের সহিত প্রকৃতির নিবিড় সম্বন্ধের প্রকাশ, প্রকৃতির রহস্যময়ী ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রকাশের প্রতি মানুষের মনের বিপুল আকর্ষণ স্থান পায় রোমান্টিক সাহিত্যে।

বাংলা সাহিত্যে সম্পূর্ণ ক্লাসিক রচনা একটিও নাই বলা চলে। বাংলার আকাশে-বাতাসে যে বিচিত্র সৌন্দর্য্যসম্ভার তাহা ভাবুক বাঙালী চিত্তকে চিরকালই দোলা দিয়াছে। ফলে, কাহিনীর বা কাব্যের অগ্রগতির মধ্যে কবি-মানস নিরপেক্ষ থাকিতে পারে নাই। তাঁহার নিজস্ব অনুভূতি ও আবেগের স্পর্শ স্থানে স্থানে ক্লাসিক কাব্যের দৃঢ়পিনদ্ধ সংহতিকে ক্ষুণ্ণ করিয়াছে। এই-সকল কাব্যের স্থানে স্থানে রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশও যে একেবারে নাই ইহাও জোর করিয়া বলা যায় না। কিন্তু তাহা অকস্মাৎ এবং অতি সামান্য। সেইজন্য সাহিত্যের শ্রেণীবিভাগের ক্ষেত্রে তাহার মূল্য অকিঞ্চিৎকর।

উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা আখ্যায়িকা-কাব্যের ধারা অনুসরণ করিলে দেখা যায় ইহা ক্লাসিসিজম্ হইতে রোমান্টিসিজমে অগ্রগমনের ইতিহাস—কি ভাষা, কি ভাব, কি প্রকাশভঙ্গি কি রূপগত বৈশিষ্ট্য সব দিক দিয়া বিচার করিলে এই সত্যই নিরূপিত হয়।

১

দেব-দেবীর মাহাত্ম্য-জ্ঞাপক আখ্যায়িকা-কাব্য এদেশে বহু প্রাচীন কাল হইতেই প্রচলিত ছিল। সাধারণতঃ সংস্কৃত সাহিত্যের অনুবাদের মধ্য দিয়াই এই কাব্যগুলি বাংলা-সাহিত্যে প্রবেশ লাভ করে। এই-সকল কাব্যের দেবদেবীগণ আর্য্য সাধকগণের আদর্শের প্রতিমূর্ত্তি—অতীন্দ্রিয় সত্তার উজ্জ্বলতম প্রকাশ। সুখ-দুঃখের ঊর্দ্ধে যে আনন্দলোক সেখানেই তাঁহাদের অবস্থিতি এবং জীবকুলের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণের মধ্য দিয়া তাঁহারা বিশ্বের মঙ্গল সাধন করিতেছেন। কিন্তু বাংলার শিক্ষিত সমাজের ভিতরেই এই কাব্যগুলি

সীমাবদ্ধ থাকিত। কারণ অশিক্ষিত জনসাধারণ না বুঝিত ইহার ভাষা, না পারিত ইহার উচ্চস্তরের আধ্যাত্মিক তত্ত্বের মর্ম্মগ্রহণ করিতে। তাই তাহারা নিজেদের দেব-দেবীকে বৃক্ষ-রূপে, প্রস্তরখণ্ড-রূপে বিভিন্ন আচার-নিয়মের দ্বারা পূজা করিয়াছে—হোম-যজ্ঞ, ধ্যান-ধারণার খবর রাখে নাই। ইহার ফলস্বরূপ ওলাবিবি, ধর্ম্মঠাকুর, মঙ্গলচণ্ডী প্রভৃতি দেব-দেবীগণকে পাই। পরবর্ত্তী কালে শিক্ষিত ও অশিক্ষিত জনসাধারণের ভাবধারার সংমিশ্রণে মঙ্গলকাব্যগুলির উৎপত্তি হয়। এই কাব্যগুলির ভিতর যে-সকল দেবদেবীর চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, তাঁহারা কোথাও সর্ব্বশ্রেষ্ঠগুণে বিভূষিত হইয়া মানবকে আদর্শের পথে প্রেরণা জোগাইয়াছেন আবার কোথাও হীন ছলনা ও নিষ্ঠুরতা দ্বারা মানুষের মনে ভয় এবং জুগুপ্সার উদ্রেক করিয়াছেন।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে যে সকল দেব-দেবী-মাহাত্ম্য-জ্ঞাপক আখ্যায়িকা-কাব্য পাওয়া যায় সেগুলি অধিকাংশই সংস্কৃত পুরাণের ছায়া অবলম্বনে রচিত। এই কাব্যগুলির দেব-দেবীগণ দয়া-অনুকম্পা ইত্যাদি উচ্চ গুণাবলীতে বিভূষিত। তবে কোন কোন কাব্যে লৌকিক দেব-দেবীর আবির্ভাব এবং তাঁহাদের সহিত পুরাণ-বর্ণিত দেব-দেবীর সংমিশ্রণও দেখা যায়। কাব্যের সর্ব্বত্রই প্রায় ধর্ম্মের ও নীতির আদর্শের প্রতি ইঙ্গিত আছে। তথাপি কোন কোন কাব্যের ভাবধারায় সে-যুগের প্রভাব পরিস্ফুট। ইংরাজী সাহিত্যের প্রভাবে কবি-মনে যে ব্যক্তিসচেতনতা, স্বদেশপ্রীতি ও যুক্তি-পরায়ণতা আসিয়াছিল কোন কোন রচনায় তাহা প্রকাশলাভ করিয়াছে। অনেক ক্ষেত্রেই ভাষা গতানুগতিকতার পথে চলিয়াছে—ঘটনাস্রোতও পুরাণে বর্ণিত পরিণতির অভিমুখে চলিয়াছে কিন্তু তত্ত্ব-ব্যাখ্যা ও সুখ-দুঃখের কারণ ব্যাখ্যা করিতে গিয়া কবি যে-সকল যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণই এই যুগের বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত। চরিত্র অঙ্কনের ব্যাপারেও এই পার্থক্য লক্ষণীয়। কোন কোন চরিত্রের মধ্যে ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ ও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য-বোধ সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই সময়ে ইংরাজী কাব্যের ভাব-অবলম্বনে রচিত বাংলা কাব্যও কিছু পাওয়া যায়। এক কথায় বলা চলে যে এ-যুগের কিছু সংখ্যক পৌরাণিক কাহিনী-কাব্যে পুরাতন কাঠামোর ভিতর নূতনের প্রাণস্পন্দন অনুভূত হইয়াছিল।

এই সময়ে মঙ্গলকাব্যও যে কিছু রচিত হয় নাই, তাহা নহে। কিন্তু

সেগুলি মঙ্গলকাব্যের বিষয়ীভূত বলিয়া আখ্যায়িকা-কাব্যের আলোচনায় পরিত্যক্ত হইয়াছে।

২

দ্বিতীয় ধারা হইতেছে, জীবনী-কাব্য। সুন্দরকে পূজা করা, মহৎকে শ্রদ্ধা করা, মানুষের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম। তাই মানুষের সমস্ত সাহিত্যের ভিতরেই নায়ককে অতিমানবরূপে কল্পনা করার রীতি দেখা যায়। প্রাচীন সাহিত্যে তাঁহারা দেব-দেবীর রূপে মানুষের হৃদয়ের শ্রদ্ধা-ভক্তির অর্ঘ্য গ্রহণ করিয়াছেন ও মানুষের আদর্শের শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তিরূপে পূজা পাইয়াছেন। মানুষ নিজে যাহা হইতে পারিতেছে না, অথচ যাহা হইতে পারিলে সে জীবনকে সার্থক মনে করে তাহারই প্রতিচ্ছবি দেবতা-কল্পনায় নানারূপে ও নানাভাবে কবিগণ অঙ্কিত করিয়াছেন। দেবতাগণকে নানা অলৌকিক শক্তির অধিকারী করিয়া নানাবিধ অসম্ভব কার্য্য তাঁহাদের দ্বারা সম্পাদিত করিয়া কবি আনন্দলাভ করিয়াছেন। তারপর মানব-সভ্যতার বিবর্ত্তনের সহিত এই চিন্তাধারার ভিতরেও পরিবর্ত্তন সূচিত হয়। তখন সাহিত্যে দেবতার পরিবর্ত্তে অতি-মানবকে দেখা যায়। শারীরিক ও মানসিক শক্তিতে-নিষ্ঠায়-ত্যাগে-দৃঢ়তায় সমস্ত প্রতিকূল ঘটনার বিপক্ষে দাঁড়াইয়া যাঁহারা সংগ্রাম করিয়াছেন এবং অন্যান্য মানুষের মনে শক্তি-সাহস ও আশার সঞ্চার করিয়াছেন—তাঁহারা কাব্যের নায়করূপে অবতীর্ণ হইতে লাগিলেন। এই প্রসঙ্গে চাঁদ-সদাগর, ধনপতি সদাগর প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। ক্রমে এই ধারারও পরিবর্ত্তন হইল। তখন আর কাল্পনিক চরিত্র মানুষকে তৃপ্তি দিতে পারিল না। বাস্তব ক্ষেত্রে আদর্শ চরিত্রের নায়কের সন্ধান চলিল। তখনই সাহিত্যে অবতারবাদের সূচনা দেখা গেল। ষোড়শ শতাব্দীতে শ্রীচৈতন্যদেবকে লইয়া প্রথমে সংস্কৃতে এবং পরে বাংলায় অনেক কাব্য রচিত হইয়াছিল। মানুষের চিন্তাধারা তখন স্বর্গ হইতে মর্ত্ত্যে ফিরিয়া আসিয়া মানবতার ক্ষেত্রে মুক্তিলাভ করিল। যদিও চৈতন্যদেবকে অবতাররূপে কল্পনা করিয়া কাব্যে অনেক অলৌকিক ঘটনার সমাবেশ করা হইয়াছিল, তথাপি একথা ভুলিলে চলিবে না যে, মানুষ তখন মানুষের মধ্যেই দেবতাকে অনুসন্ধান করিয়াছিল—মানুষকে পূজা

করিয়াছিল এবং মর্য্যাদা দিয়াছিল। স্বর্গের সুষমা ও মর্ত্ত্যের মাধুর্য্য এক সঙ্গে মিশিয়া এই কাব্যগুলিকে সুন্দর ও মধুর করিয়াছিল। বাংলায় শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনী লইয়া প্রথম বৃন্দাবন দাস চৈতন্যভাগবত নামক কাব্য রচনা করেন। চৈতন্যদেব ও তাঁহার ভক্তমণ্ডলীকে লইয়া রচিত জীবনী-কাব্যগুলি ষোড়শ, সপ্তদশ, অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে রচিত হয়। এই কাব্যগুলি-সম্বন্ধে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কথা হইতেছে, কবিগণ চৈতন্যদেব বা তাঁহার ভক্তমণ্ডলী সম্বন্ধে যাহা কিছু লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন তাহা তাঁহাদের হৃদয়ের ভক্তিরসে ও বিশ্বাসে আপ্লুত ছিল—তাই কাব্যের মধ্যে সমস্ত অলৌকিকত্ব এবং দার্শনিক তত্ত্ব ও ব্যাখ্যাদি সজীব ও শ্রীমণ্ডিত হইয়াছিল।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে জীবনী-কাব্য খুব বেশী লেখা হয় নাই। মানুষের দৃষ্টি তখন নব নব রসের অনুসন্ধানে ও উন্মাদনায় ব্যস্ত। একদিকে রোমাণ্টিকতার প্রতি প্রবল আকর্ষণ, অপর দিকে ঐতিহাসিক কাহিনীর প্রতি অনুরাগ, তাহার উপর যুক্তিবাদ ও ব্যক্তিত্ববাদ আসিয়া জীবনী-কাব্যের ধারাকে অনেকখানি ক্ষীণ করিয়াছে। তথাপি যে দুই চারিখানি কাব্য এযুগে পাওয়া যায় তাহারাও খুব সার্থক হইয়া উঠিতে পারে নাই। কারণ সেগুলি না পারিয়াছে যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠালাভ করিতে, না পারিয়াছে ভক্তি-বিশ্বাসের ঔজ্জ্বল্যে দীপ্ত হইতে। ইহাদের ভিতর পূর্ব্ব ধারার অনুকরণে অলৌকিকত্ব স্থান লাভ করিয়াছে—কিন্তু কোনটিই জীবন্ত হইয়া উঠিতে পারে নাই। তবে তত্ত্ব-ব্যাখ্যার পশ্চাতে যে-সকল যুক্তি-তর্কের অবতারণা করা হইয়াছে তাহার ভিতর সে যুগের বিশিষ্ট ছাপ বর্ত্তমান।

৩

এযুগের কাব্য-সাহিত্যের তৃতীয় ধারা—ইতিহাসাশ্রিত বা দেশপ্রেমমুখ্য-কাব্য। কাব্য এবং ইতিহাস, উভয়েই মানব-জীবনকে কেন্দ্র করিয়া রচিত হয়। কিন্তু উভয়ের রচনারীতি ও দৃষ্টিভঙ্গি ভিন্ন প্রকৃতির।

ইতিহাস-সম্বন্ধে প্রাচীন শাস্ত্রকারগণ কহিয়াছেন—

ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণামুপদেশসমন্বিতম্।
পূর্ব্ববৃত্তকথাযুক্তমিতিহাসং প্রচক্ষতে॥ —(মহাভারত)

আধুনিক কালে ইতিহাসের এই ব্যাপক অর্থ নাই। এখন জাতীয় জীবনের উত্থান-পতনের বিবরণ স্থান পায় ইতিহাসে। যে-সকল ব্যক্তি-চরিত্র ও ঘটনাবলী দেশের সুখদুঃখের সহিত জড়িত, তাহাদের চরিত্রগত বা সময়গত বৈশিষ্ট্য এবং উন্নতির বা অবনতির কারণ বিশ্লেষণ দ্বারা জাতির জীবনের ধারাবাহিক গতি নির্দ্ধারণ করা ইতিহাসের কাজ। সত্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া উপাদান সংগ্রহ করা এবং তাহাদের সাহায্যে জাতীয় জীবনকে প্রতিফলিত করার মধ্যেই ইতিহাসের সার্থকতা। ইহা ব্যক্তিনিরপেক্ষভাবে সত্য বিবরণ প্রকাশ করে—তাহার ভিতর ঐতিহাসিকের কোন অনুভূতি বা আবেগের স্থান নাই।

ইতিহাসাশ্রিত কাব্যের মধ্যে খানিকটা থাকে কবির ভাবলোকের অনুভূতিময় প্রকাশ। তাই ইতিহাসের সহিত ইতিহাসাশ্রিত কাব্যের পার্থক্য অনেক বেশী। কাব্য যখন ইতিহাসকে আশ্রয় করে তখন তাহা কোন ঐতিহাসিক চরিত্র বা ঘটনার উপর বিশেষ অনুভূতির আলোক-সম্পাত দ্বারা তাহাকে বিশেষ রঙে অনুরঞ্জিত করে। ইহার দ্বারা কেহ বৃহত্তর ও মহত্তর হইয়া উঠেন, কেহ বা ক্ষুদ্রতর ও অবজ্ঞেয় হইয়া পড়েন। কারণ, ঐতিহাসিক ব্যক্তি বা ঘটনা কবি-মানসের ভাবলোকে রূপায়িত হইয়া বিশেষ রূপে ও রসে উদ্ভাসিত হয় এবং সেই রূপ ও স্বর তাঁহার কাব্যে মূর্ত্তি গ্রহণ করে। কবি-বর্ণিত ইতিহাস তখন সীমাবদ্ধ স্থান ও কালের উর্দ্ধে উঠিয়া চিরন্তন মানব-মনকে রূপ দান করে—বিশেষ ব্যক্তি বা ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া অনুভূতির ঝঙ্কারে ও আবেগের স্পন্দনে জীবন্ত হইয়া উঠে। ঐতিহাসিক সত্য তখন অনুভূতির সত্য হইয়া পাঠকচিত্তকে বেদনায় বিধুর বা আনন্দে বিহ্বল করিয়া তুলে। ইহার ভিতরেও কবি কাব্যের পশ্চাতে থাকেন—কিন্তু তাঁহার ভাবানুভূতিই সমস্ত কাব্যের ভিতর ঝঙ্কৃত হইতে থাকে।

'ঐতিহাসিক উপন্যাস' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন— "...তাহাদিগকে কেবল ব্যক্তিবিশেষ বলিয়া নহে, পরন্তু মহাকালের অঙ্গস্বরূপ দেখিতে হইলে দূরে দাঁড়াইতে হয়, অতীতের মধ্যে তাঁহাদিগকে স্থাপিত করিতে হয়, তাঁহারা যে সুবৃহৎ রঙ্গভূমিতে নায়ক-স্বরূপ ছিলেন, সেটা সুদ্ধ তাঁহাদিগকে এক করিয়া দেখিতে হয়।

এই যে আমাদের প্রতিদিনের সাধারণ সুখ দুঃখ হইতে দূরত্ব, আমরা যখন

চাকরী করিয়া কাঁদিয়া-কাটিয়া খাইয়া-দাইয়া কাল কাটাইতেছি তখন, যে জগতের রাজপথ দিয়া বড়ো বড়ো সারথিরা কালরথ চালনা করিয়া লইয়া চলিতেছেন, ইহাই অকস্মাৎ ক্ষণকালের জন্য উপলব্ধি করিয়া ক্ষুদ্র পরিধি হইতে মুক্তিলাভ, ইহাই ইতিহাসের প্রকৃত রসাস্বাদ।" —(সাহিত্য—১৫৮ পৃঃ)

ইতিহাসাশ্রিত আখ্যায়িকা-কাব্য-সম্বন্ধেও রবীন্দ্রনাথের এই উক্তির যথার্থতা অনুভূত হয়। ঐতিহাসিক ঘটনা মানুষের সাধারণ জীবনের ঘটনা হইতে পৃথক্। আপাতদৃষ্টিতে দেখিলে মনে হয় সাধারণ জীবনের সহিত তাহার কোন যোগাযোগ নাই। কিন্তু চারিদিকের পরিবেশের সহিত সাহিত্যে যখন তাহা মূর্ত্ত হইয়া উঠে তখনই বোঝা যায়—সাধারণ হইতে দূরে থাকিয়াও তাহা সাধারণ মানুষের সম্মুখের রাজপথ দিয়াই চলিয়া গিয়াছে—তাহার চক্রের ধূলিতে কখনও সাধারণ মানুষের গৃহ পূর্ণ হইয়াছে, কখনও তাহার পুষ্প-সৌরভে গৃহের বাতাস আমোদিত হইয়াছে। ইহাদের ভিতর দিয়া যেন নিজেদেরই বৃহত্তর ব্যক্তি-সত্তার উপলব্ধি জাগরিত হয়।

প্রাচীন ভারতে ইতিহাসের মর্য্যাদা ছিল না বলিয়া একটা মতবাদ প্রচলিত আছে। কিন্তু মহাভারতে আছে—

ইতিহাসপুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েৎ।
বিভেত্যল্পশ্রুতাদ্বেদো মাময়ং প্রহরিষ্যতি॥ (১।১।২২৯)

তখন ধারণা ছিল, কেবল বেদ, বেদাঙ্গ ও উপনিষদ্ পাঠ করিলেই লোকে প্রাজ্ঞ হয় না—তাহার সহিত ইতিহাস এবং পুরাণ-সম্বন্ধেও জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে প্রাচীনকালের লোকেরা ইতিহাসকে উপেক্ষা করেন নাই। তবে ইতিহাসের অর্থ তখন অন্যরূপ ছিল। প্রচলিত কাহিনী তখন ইতিহাসের বিষয়বস্তু-রূপে গণ্য হইত। তাই পুরাণগুলির ভিতর ঋষিদের ও রাজাদের বংশ-তালিকা, বীরত্বের কাহিনী এবং ধর্ম্মের কাহিনী স্থান পাইত। কিন্তু সেগুলির ভিতর অলৌকিক ঘটনাবলী এমন ভাবে সম্পৃক্ত যে তাহার কতখানি সত্য এবং কতখানি কল্পনা তাহা নির্ণয় করা দুরূহ। তাহা ছাড়াও, বিভিন্ন কাব্যের ভিতর এবং সাহিত্যের ভিতর আমরা রাজবংশের যে-সকল কাহিনী পাই সেগুলি সময়গত ও দেশগত-ভাবে এমন স্বতন্ত্র যে তাহা দ্বারা ইতিহাসের উদ্দেশ্য সাধিত হয় না। রবীন্দ্রনাথ "বাংলা জাতীয় সাহিত্য" প্রবন্ধে লিখিয়াছেন— "আমাদের দেশে কনোজ

কোশল কাশী কাঞ্চী প্রত্যেকেই স্বতন্ত্রভাবে আপন আপন পথে চলিয়া গেছে, এবং মাঝে মাঝে অশ্বমেধের ঘোড়া ছাড়িয়া দিয়া পরস্পরকে সংক্ষিপ্ত করিতে ছাড়ে নাই। মহাভারতের ইন্দ্রপ্রস্থ, রাজতরঙ্গিণীর কাশ্মীর, নন্দবংশীয়দের মগধ, বিক্রমাদিত্যের উজ্জয়িনী, ইহাদের মধ্যে জাতীয় ইতিহাসের কোন ধারাবাহিক যোগ ছিল না। সেইজন্য সম্মিলিত জাতীয় হৃদয়ের উপর জাতীয় সাহিত্য আপন অটল ভিত্তি স্থাপিত করিতে পারে নাই।"

—(সাহিত্য—১১২ পৃঃ)

তাই আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে ইতিহাসকে বিচ্ছিন্নরূপে পাইলেও ইতিহাসের ধারাবাহিক কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। এইরূপ বিচ্ছিন্ন ইতিহাসের ঘটনা-বিশেষ লইয়া রচিত গাথা-কাব্য ও কবিতা প্রাচীন বাংলা-সাহিত্যে কিছু দেখা যায়। যেমন,—গঙ্গারামের 'মহারাষ্ট্রপুরাণ'—(১১৫৮ সাল)—, দেওয়ান মাম্লা মণ্ডলের 'কান্তনামা'—(বা 'রাজধর্ম্ম'), কোচবিহারের মহারাণী বৃন্দেশ্বরীর 'বেহারোদন্ত' (১২৬৬ সাল) ও বিবিধ ব্যক্তির রচিত 'রাজমালা' প্রভৃতি পাই। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে যে-সকল ইতিহাসাশ্রিত কাহিনী-কাব্য আত্মপ্রকাশ করে তাহারা উপরি-উক্ত কাব্যগুলি হইতে স্বতন্ত্র। কেবল ইতিহাস বা ঐতিহাসিক ঘটনাই তাহাদের লক্ষ্যবস্তু ছিল না। দেশের পুরাতন গৌরব ও ঐতিহ্যকে পুনরুজ্জীবিত করা এবং ইতিহাসের পটভূমিতে রোমান্সের বর্ণ-বিন্যাস দ্বারা অভিনব রসসৃষ্টি করাই এই-সকল কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল।

উনবিংশ শতাব্দীতে ইংরাজি শিক্ষার ফলে দেশের ইতিহাসের প্রতি যখন শিক্ষিত-সমাজের মনোযোগ আকৃষ্ট হইল তখন ইতিহাসকে অবলম্বন করিয়া রোমান্টিক উপন্যাস ও কাহিনী-কাব্য রচনার প্রেরণায় লেখকগণ উদ্বুদ্ধ হইলেন। ইংরাজ-সাহিত্যিক স্কট, বায়রন, বার্ন্‌স, ব্রাউনিং, টমাস মুর, প্রভৃতির রচনা আবেগপ্রবণ বাঙ্গালীর মনে যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহারই ফলরূপে এই কাব্যগুলিকে আমরা পাই। বাংলার ইতিহাসাশ্রিত কাহিনী-কাব্যের ধারার উপর পুরাতন গাথা-কবিতাগুলির কোন প্রভাবই দৃষ্ট হয় না—ইংরাজী-সাহিত্যের নিকটই ইহারা ঋণী। শিক্ষিত বাঙ্গালীর মনে তখন যে আত্মমর্য্যাদাবোধ ও স্বাজাত্য-প্রীতি জাগরিত হইয়াছিল তাহাই রঙ্গলাল প্রভৃতি লেখকগণের মনে পরাধীনতার লজ্জা ও গ্লানি আনিয়া

দিয়াছিল এবং পুরাতন ইতিহাসের ভগ্নস্তূপের ভিতর স্বজাতির মহিমা ও গৌরব অনুসন্ধানের প্রেরণা জোগাইয়াছিল। এদেশে ইতিহাসাশ্রিত কাব্য রচনা করা সহজসাধ্য ছিল না। কারণ জাতির কোন ধারাবাহিক ইতিহাস নাই। তাহা ছাড়া, সাধারণ লোকের মনে ইতিহাসের ধারণাই ছিল না। ঐতিহাসিক বড় বড় পরিবর্ত্তনের ঢেউ সাধারণ গৃহস্থকে স্পর্শ করিত না এবং সেইজন্য রাজসিংহাসনে কে আসিল বা কে গেল তাহার সন্ধানও কেহই রাখিত না। কেবলমাত্র সভাকবির গানের ভিতর তাঁহাদের কীর্ত্তিকলাপ স্থায়ী হইত এবং চারণগণের গীতের ভিতর দিয়া তাঁহাদের মহিমা ও বীরত্ব প্রচারিত হইত। তাই বাংলার কবিগণ যখন ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন তখন টড্-রচিত 'রাজস্থান' গ্রন্থ তাঁহাদের আকৃষ্ট করিল। তাহা ছাড়া চারণগণের গীত এবং প্রচলিত কাহিনীগুলি হইতেও তাঁহারা তথ্য সংগ্রহ করিলেন। ইতিহাসের বিচারে এগুলি কতখানি সত্য তাহা বলা কঠিন, তবে কবিগণের উদ্দেশ্য-সাধনের পক্ষে পর্য্যাপ্ত ছিল। সেই সময়ে কবিগণ স্বদেশনিষ্ঠ ও প্রজাবৎসল নৃপতিবৃন্দের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এই রাজন্যবর্গের মধ্যে অনেক দোষ-ত্রুটি, অনেক দুঃখ-বেদনা, অনেক সফলতা ও বিফলতার ইতিহাস জড়িত থাকা সত্ত্বেও এবং ইঁহারা সাধারণ লোক হইতে অনেক দূরে এবং অনেক ঊর্দ্ধে থাকা সত্ত্বেও, কবিগণের লিপি-কৌশলে, সাধারণ লোকের আশা-আকাঙ্ক্ষা, মান-মর্য্যাদা ও সুখ-দুঃখ ইঁহাদের সহিত আন্দোলিত হইতে লাগিল। এই কাব্যগুলির ভিতর দিয়া জাতীয় ইতিহাসের প্রতি মানুষের মর্য্যাদাবোধ জাগরিত হইল এবং স্বদেশপ্রীতির প্রেরণা স্ফুরিত হইতে লাগিল।

বাংলা কাব্য-সাহিত্যে এই ইতিহাসাশ্রিত কাব্যগুলি যুগান্তর আনয়ন করিয়াছিল। রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্র-রচিত বিদ্যাসুন্দর কাব্যের অনুকরণে বাংলা-কাব্য তখন রস-বৈচিত্র্য হারাইয়া ফেলিয়াছিল। নব-উন্মেষণী প্রতিভা বা বৃহত্তর চেষ্টা কোথাও ছিল না। কেবল অনুকরণ ও অনুপ্রাস, ভাষা ও ছন্দের চাকচিক্য ও বাহ্যসজ্জা বাংলা-কাব্যকে নির্জ্জীবতার পঙ্কে নিমজ্জিত করিতেছিল। টপ্পা গান ও কবির লড়াই তখন লোকপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল এবং ঈশ্বর গুপ্তের ব্যঙ্গকাব্য আসর মাতাইয়া রাখিয়াছিল। কোন দিক্ হইতেই কোন কিছু সৃষ্টির সম্ভাবনা, কোন বলিষ্ঠ প্রচেষ্টা দেখা যায় নাই।

প্রাণগতিকে রুদ্ধ করিয়া রাখিলে জীব যেমন সমস্ত সৌন্দর্য্য হারাইয়া ফেলে এবং তাহার সমস্ত চাঞ্চল্য স্তব্ধ হইয়া নির্জীব ও নিস্তেজ হইয়া পড়ে—বাংলা কাব্য-সাহিত্যও তখন কেবল নিয়ম-নিয়ন্ত্রিত কাঠামোর মধ্যে নিরুদ্ধ ও নিপীড়িত হইয়া প্রাণশক্তি এবং সৌন্দর্য্য হারাইয়া ফেলিয়াছিল। সেই সময় কবি রঙ্গলাল কাব্য-রচনার মধ্যে ঐতিহাসিক রোমান্‌স্‌কে রূপ দান করিয়া অভিনব ধারার প্রবর্ত্তন করেন। তাঁহার কাব্য আদিরসাত্মক কাব্যের ধারা পরিবর্ত্তিত করিয়া তাহার ভিতর নিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও স্বদেশ-প্রীতির উজ্জ্বল আলোক-সম্পাত করিয়াছিল। পুরাতনের সকল জীর্ণতা ও জড়তা ঝাড়িয়া ফেলিয়া বাংলা কাব্য নবীন যৌবনের স্পর্শে সতেজ ও সবল হইয়া উঠিয়াছিল। নূতন প্রবাহপথ উন্মুক্ত হওয়ায় কাব্য-স্রোতস্বতী প্রাণবন্যায় পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল।

ইতিহাসাশ্রিত বা দেশপ্রেমমুখ্য কাব্যগুলির কাহিনী সবই ইতিহাসের ঘটনা অবলম্বনে রচিত হয় নাই। অনেক কবি কল্পিত-কাহিনীর ভিতর দিয়া নায়ক-নায়িকার স্বদেশ-প্রেম ও তৎ-জনিত ত্যাগ ও কষ্ট-স্বীকার চিত্রিত করিয়া আপনার স্বদেশপ্রেমের আদর্শকে মূর্ত্ত করিয়াছেন। যাঁহারা ইতিহাসকে আশ্রয় করিয়াছেন—রাজপুতদিগের বীরত্ব-কাহিনীই তাঁহাদের কাব্যে সমধিক স্থান লাভ করিয়াছে। তারপর শিবাজীর অভ্যুত্থান, প্রতাপাদিত্যের বীরত্ব, সিরাজুদ্দৌলার পতন প্রভৃতিও চিত্রিত হইয়া পাঠক-সমাজকে কখনো গর্ব্বে ও আনন্দে উদ্দীপ্ত করিয়াছে, কখনো লজ্জায় ও দুঃখে অভিভূত করিয়াছে। এই-সকল কাব্যের ভিতর দিয়া যেমন জনসাধারণ জাতীয় জীবনের চেতনা লাভ করিয়াছে তেমনি সাহিত্যের ক্ষেত্রেও এক বলিষ্ঠতর নূতন ধারার প্রবর্ত্তনে কাব্যে নূতন শ্রী ও সুষমা আসিয়াছে। সাহিত্যের মানদণ্ডে ইহারা শ্রেষ্ঠ স্থান দাবী করিতে পারে না সত্য—কিন্তু সাহিত্যের বিবর্ত্তন-ইতিহাসে ইহাদের মূল্য অনেকখানি।

৪

প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে প্রণয়-মূলক বা আদিরসাত্মক কাহিনীর অভাব নাই। কিন্তু সবগুলিই রাধাকৃষ্ণের প্রণয়-লীলা লইয়া রচিত—"কানু ছাড়া গীত নাই।" বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন কবি রূপে-রসে-বর্ণে রাধা-কৃষ্ণের লীলাকে বাঙ্গালীর

প্রাণের বস্তু করিয়া তুলিয়াছিলেন। এই একটি অত্যন্ত সজীব ও সুন্দর প্রণয়-কাহিনী প্রাচীন কাব্য-সাহিত্যে আবেগ ও অনুভূতির স্পর্শে জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু তথাপি তাহাকে রোমান্টিক আখ্যা দেওয়া চলিবে না। আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার আবরণে তাহা অপার্থিব—মাটির পৃথিবী ছাড়িয়া স্বর্গের দ্যুতিতে উজ্জ্বল। তাহার ভিতর দিয়া মানবাত্মার ব্যাকুল ক্রন্দন ধ্বনিত হইয়া দেবতাত্মাকে আকর্ষণ করিতেছে। তাই শাস্ত্রকারগণ বারবার সাবধান করিয়া দিয়াছেন "ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস"।

মানব-মানবীর প্রেম-কাহিনী অবলম্বনে কাব্য-রচনা বাংলা সাহিত্যে অল্প দিনই প্রচলিত হইয়াছে। মানব-মনের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, ভাল-লাগা, মন্দ-লাগাকে ধর্ম্মপিপাসু জাতি কোন দিনই যথেষ্ট মর্য্যাদা দেয় নাই। তাহাদের সকল কর্ম্ম, সকল নীতি, সকল সমর্থন ও শাসন ধর্ম্মের পথ ধরিয়া নৈতিক উন্নতির চেষ্টায় নিয়োজিত হইয়াছিল। কাব্য-রস ছিল আধ্যাত্মিক তত্ত্বকে আশ্রয় করিয়া এবং আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ ছিল উচ্চতম আদর্শ লাভের চেষ্টায়। কিন্তু মানব-মনের গোপন অনুভূতি,—যাহা সমস্ত নৈতিক যুক্তি-তর্ককে তুচ্ছ করাইয়া মানুষকে আবেগের পথে চালিত ও আকাঙ্ক্ষার পথে বাহির করিতেছে—সমস্ত দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও সমস্যার ভিতর যাহার বিচিত্র অনুভূতি করুণ এবং মধুর হইয়া উঠিতেছে—তাহার প্রকাশ আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে স্থান পায় নাই। তাই নিছক মানব-প্রেমকে কেন্দ্র করিয়া কোন কাহিনী প্রাচীন সাহিত্যে স্থান লাভ করে নাই।

আদিরসাত্মক কাহিনী বা প্রণয়মূলক কাহিনী সংস্কৃত সাহিত্যে দেখা যায়, কিন্তু সেগুলির ভিতরেও দেবতার আনাগোনা বিদ্যমান। বাংলা সাহিত্যে মানবীয় প্রেমের স্থান বেশ বিলম্বে হইয়াছিল। ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে আমরা বিদ্যাসুন্দর-কাহিনী পাই। সেই সময়ে মাধবানল-কামকন্দলার কাহিনী, মৃগাবতী, দৌলত কাজীর লোর-চন্দ্রানী, আলাওলের পদ্মাবতী পাঁচালী প্রভৃতি রচিত হইয়াছিল। কিন্তু এগুলির প্রাচীন এবং পূর্ণাঙ্গ রূপ প্রায়ই দুষ্প্রাপ্য ও অপ্রাপ্য। তাই অষ্টাদশ শতকে রচিত ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর-কাহিনীকেই সাধারণভাবে প্রথম আদিরসাত্মক কাহিনী-কাব্য বলিয়া ধরিলে দোষ হয় না। এই কাব্যের প্রভাবও পরবর্ত্তী সাহিত্যের উপর অত্যন্ত বেশী ছিল।

ইংরাজিতে যাহাকে রোমান্টিসিজ্‌ম্‌ বলে এই কাব্যগুলির মধ্যে তাহার অনেক লক্ষণ পাওয়া যায়। কিন্তু এগুলি তখনও পুরাতনের সকল বন্ধন মুক্ত হইতে পারে নাই। ইহারা দেবতার কবলমুক্ত হইয়া মানবীয় প্রেমের অনিবার্য্য আকর্ষণের প্রতি দৃষ্টি দিয়াছে কিন্তু তাহাদের প্রকাশ-ভঙ্গি সর্ব্বত্র সার্থক হইয়া উঠে নাই।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে যে-সকল প্রণয়মূলক আখ্যায়িকা-কাব্য পাওয়া যায় তাহাদেরও ঠিক রোমান্টিক বলা চলে না। কারণ যে অনুভূতি ও আবেগ কবিকে বন্ধন-মুক্তির প্রেরণা যোগায় এই কাব্যগুলিতে তাহার অভাব অত্যন্ত বেশী। ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর কাব্যকে আদর্শ করিয়া এই কাব্যগুলি গতানুতিক-ভাবে মানব-মানবীর প্রেম-কাহিনী বর্ণনা করিয়াছে কিন্তু যে প্রেম মানুষকে অসীম দুঃসাহসিকতার পথে বাহির করে, জীবনের ভিতর নানা বৈচিত্র্য আনিয়া রস-মাধুর্য্য সৃষ্টি করে—এই কাব্যগুলির অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেই প্রেমের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হয় নাই। এইগুলিতে প্রেমের রূপ আছে কিন্তু স্পন্দন নাই। যে সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার অমর লেখনী দ্বারা দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী প্রভৃতি রচনা করিয়া বাংলা উপন্যাস-জগতে রোমান্সের বন্যা প্রবাহিত করিয়াছিলেন, সেই যুগের রোমান্টিক কাহিনী-কাব্যকারগণ পুরাতনের ছক-বাঁধা পথে অগ্রসর হইয়া তাঁহাদের কাব্যকে গতানুগতিকতায় পর্য্যবসিত করিতেছিলেন। ইহার একটি কারণ, আমাদের সামাজিক ব্যবস্থায় রোমান্টিক পরিবেশের স্থান নাই। বিবাহের পূর্ব্বে ও বিবাহের বাহিরে প্রেম এই-খানে অচিন্তনীয়। তাই মানবীয় প্রেমকে মূর্ত্ত করিতে গিয়া কবিগণ দিশাহারা হইয়া আদিরসের উচ্ছ্বাস প্রবাহিত করিয়াছেন এবং কোথাও ভারসাম্য রাখিতে পারেন নাই। অবশ্য প্রেমের অন্তর্বিকাশ আমাদের দেশে চিরকালই ছিল। বাহিরে তাহা ধীর-স্থির-শান্ত। কিন্তু অন্তরে সেই প্রেমেরই দুর্লঙ্ঘ্য শক্তি নর-নারীকে দৃঢ়তায় ও নিষ্ঠায়, দ্বন্দ্বে ও সংঘাতে, গভীরতায় ও তীব্রতায় যে মাধুর্য্য দান করে তাহাকে লইয়া রোমান্টিক কাব্য হয়ত অনায়াসে লেখা চলিত। কিন্তু সে যুগের কবিগণের দৃষ্টি তখনও প্রেমের বহির্মুখী প্রকাশের দিকে নিবদ্ধ ছিল—তখনও কাহিনীকে রূপকথা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক করিয়া দেখিবার দৃষ্টিভঙ্গি আসে নাই। তাই আদিরসাত্মক কাহিনী-কাব্যগুলির নায়ক-নায়িকা রাজপুত্র ও রাজকন্যা কিংবা সদাগরপুত্র ও সদাগরকন্যা—

সাধারণ নর-নারীকে সেখানে দেখা যায় না। রোমান্টিসিজমের যে প্রধান লক্ষণ—অনুভূতি ও আবেগ—তাহার অভাব এই সময়ে রচিত কাব্যগুলিতে অত্যন্ত বেশী প্রকট, তাই এগুলিকে রোমান্টিক আখ্যা দেওয়া চলে না—প্রেম-মূলক কাহিনী-কাব্য বলিলেই বেশী সঙ্গত হয়।

এই আদিরসাত্মক কাব্যের একটি ধারাকে সংস্কৃত ও প্রাচীন সাহিত্যের কাহিনী অবলম্বন করিয়া ভারতচন্দ্রকে অনুকরণ করিতে দেখা যায়। উদাহরণ-স্বরূপ মদনমোহন তর্কালঙ্কারের বাসবদত্তা-নামক গ্রন্থটির উল্লেখ করা যায়। অপর ধারায় দেখা যায়, মঙ্গলকাব্যের সদাগর, সদাগরপুত্র বা রাজপুত্র কাব্যের নায়ক রূপে বাণিজ্য-যাত্রা করিয়া কোন বিদেশিনীর রূপে মুগ্ধ হইয়া আত্মীয়-স্বজন-স্বদেশ ভুলিয়া গোপন-প্রণয়ের ভিতর নিমজ্জিত রহিয়াছেন এবং পরে পত্নীর সাহায্যে উদ্ধারপ্রাপ্ত হইয়া স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন। এমন রচনার মধ্যে কামিনীকুমার, চন্দ্রকান্ত প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তৃতীয় একটি ধারাকে দেখা যায়, তাহা দেবতার মায়াজাল-মুক্ত হইয়া ভূত-প্রেত, পরী-গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস-খোক্কস, দৈত্য-দানব প্রভৃতির আশ্রয় লইয়া আদিরসের সাগরে পাড়ি জমাইয়াছে। এই-সকল রচনার উপর আরব্য-উপন্যাস, পারস্য-ইতিহাস, তুরকীয় ইতিহাস প্রভৃতি মুসলমানী কাহিনীর প্রভাব স্পষ্ট প্রতীয়-মান হয়। এমন কাহিনী-কাব্যের মধ্যে 'হেমলতা-রতিকান্ত', 'কমলদত্তা-হরণ' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। রূপকথার পরিবেশ-প্রধান অপর ধারা সংস্কৃত ও দেশ-প্রচলিত কাহিনী অবলম্বন করিয়া আত্মপ্রকাশ করে—যেমন বত্রিশ সিংহাসন, ভানুমতীর উপাখ্যান ইত্যাদি। এইগুলিকে ঠিক রূপকথা বলা চলে না। যদিও অনেক অলৌকিক ঘটনার সমাবেশে এগুলি পুষ্ট এবং দেবতা-গন্ধর্ব্ব-রাক্ষস-পরীর ক্রোধ ও দয়ার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত তথাপি মানব-মনের সুখ-দুঃখের অনুভূতির চিত্র ইহাদের ভিতর রহিয়াছে এবং আদিরসের আতিশয্যও কোন কোন স্থলে রহিয়াছে। তাই এগুলিকে আদিরসাত্মক বা প্রণয়মূলক কাহিনী-কাব্যে স্থান দেওয়া চলে।

এই সময় মুসলমানী কাহিনী লইয়াও কিছুসংখ্যক কাব্য রচিত হয়। তাহাদের ভিতর প্রাণের আবেগ, সৌন্দর্য্য-বিলাসের রোমান্টিকতা এবং অনুভূতির তীব্রতা যে একেবারেই নাই তাহা নয়, তবে অলৌকিকের আতিশয্য, আরবী-ফারসী শব্দের সমধিক প্রাচুর্য্য এবং রচনারীতির বহু-অনুকৃত

গতানুগতিকতার জন্য এই রচনাগুলি সাধারণ সাহিত্য-রসিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে নাই। মুসলমানী কাহিনী-কাব্যের মধ্যে 'লয়লা মজনু', 'গোলেব-কাওলি' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। বাংলা আদিরসাত্মক কাব্যগুলিতে সে সময়ে যে প্রাণহীনতা পীড়াদায়ক হইয়া উঠিয়াছিল মুসলমানী কাহিনী-কাব্যে তাহা অনেক পরিমাণেই অনুপস্থিত।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে রচিত আদিরসাত্মক বা প্রণয়মূলক কাহিনী-কাব্যগুলিকে সার্থক রচনা বলা চলে না। এই কাব্যগুলির ভিতর রূপ আছে, বর্ণ আছে, ঝঙ্কার আছে—নানাবিধ ঘটনার সংঘাত আছে। যে-সকল বাহিরের উপাদান থাকিলে ছন্দোবদ্ধ রচনা কাব্য হইয়া উঠিতে পারে—যে ঘটনা-সংঘাতে চরিত্রের রূপ সৃষ্টি সম্ভব হয়—সবই এই কাব্যগুলিতে বর্ত্তমান। তথাপি এগুলি এখন বিস্মৃতির অতল তলে নিমজ্জিত হইয়াছে। তাহার প্রধান কারণ, এগুলির রচনার পশ্চাতে কবির অনুভূতি নাই, ভাব-বিহ্বলতা নাই, প্রাণের আবেগ নাই এবং গল্পরসও নূতনত্ববর্জ্জিত সুতরাং আকর্ষণহীন। এগুলির মধ্যে রোমান্টিক আয়োজনসম্ভার আছে কিন্তু রোমান্‌স্ নাই। দ্বিতীয় কারণ, এগুলি একদিকে যেমন নৈতিক নিষ্ঠা হইতে ভ্রষ্ট, অপর দিকে সেইরূপ সুরুচির সুষমা হারাইয়া কাব্যরসকে ক্ষুণ্ণ করিয়াছে। তৃতীয়তঃ, ভাষায় রহিয়াছে জড়তা, অলঙ্কার-বাহুল্য ও অনুপ্রাসের অট্টহাস। সাহিত্য-হিসাবে ইহাদের গুরুত্ব কিছু নাই। শুধু মঙ্গলকাব্যযুগের পরিসমাপ্তি ও রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি কবির রোমান্টিক কাব্যের সূচনার মধ্যবর্ত্তী রচনা বলিয়াই এগুলির যাহা কিছু ঐতিহাসিক মূল্য। দেব-দেবীর সর্ব্বগ্রাসী কবল হইতে এগুলি কাব্য-কাহিনীকে মুক্তি দিয়াছে এবং পরবর্ত্তী কালের মানবানুভূতির রূপ-সম্ভারের প্রতি হয়ত অঙ্গুলি-সঙ্কেত করিয়াছে।

৫

আখ্যায়িকা-কাব্যের পঞ্চম ধারা পাওয়া যাইতেছে নবীন রোমান্টিক বা গাথাকাব্যগুলিতে। কোন একটি বিশেষ ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া মানবানুভূতির আবেগময় অভিব্যক্তি এই-সকল কাব্যে স্থান পায়। বিরাট কোন ঘটনার সন্নিবেশ ইহাদের ভিতর নাই—জটিলতর সমস্যা নাই—কষ্টকল্পিত কাহিনী নাই

—অনেক পৃষ্ঠাব্যাপী নায়ক-নায়িকার রূপ-গুণের বর্ণনা নাই,—বা বৃহৎ তত্ত্বের বিস্তৃততর ব্যাখ্যাও নাই। এগুলির কোনটি আনন্দোচ্ছ্বাসে মুখর, কোনটি দুঃখের ঝঙ্কারে বেদনাবিধুর, কোনটি বীরত্ব-ব্যঞ্জনায় দীপ্ত। সংবেদনশীল মানব-মনকে এগুলি সহজেই অভিভূত করে। এই কাব্যগুলির ভিতর গীতিকাব্যের আবেগ উচ্ছ্বাস কিছু রহিয়াছে, কিন্তু কবির ব্যক্তি-মানসের অনুভূতির স্পষ্ট প্রকাশ নাই। কবি ইহাতে কাব্যের পশ্চাতে থাকিয়া কাহিনীর ভিতর দিয়া নিজ ভাবানুভূতির গতি নির্দ্দেশ করেন। গীতিকাব্যের সহিত এই স্থানেই গাথাকাব্যের পার্থক্য।

অন্যান্য কাহিনী-কাব্যগুলির সহিত গাথা-কাব্যের পার্থক্য গঠনরীতিগত ও ভাবগত। অন্যান্য কাহিনী-কাব্যে ঘটনার বাহুল্য ও জটিলতা, বিভিন্ন চরিত্রের সমাবেশ ও সংঘাত, মানব-ভাগ্যচক্রের উত্থান-পতনের বিচিত্র বর্ণ-সম্ভার প্রভৃতি চিত্রিত হইয়া কাহিনীকে পরিণতির দিকে লইয়া যায়। গাথা-কাব্যে এই জটিলতা ও বাহুল্য, এই বিচিত্র অনুভূতি ও বিভিন্ন চরিত্রের সমাবেশের স্থান কম। সেখানে একটি অনুভূতি, আবেগ বা উচ্ছ্বাসের তীব্রতা সহজ সরল ভাষার মধ্য দিয়া সমস্ত কাহিনীর মধ্যে ঝঙ্কৃত হইতে থাকে এবং কাহিনীর অগ্রগতি বিধান করে।

বাংলা সাহিত্যে উনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব্বেও কিছুসংখ্যক গাথা-কাব্য ও কবিতা রচিত হইয়াছিল। সরূফের 'দামিনী-চরিত্র', 'নীলার বারমাসিগান' এবং শ্রীধর (বা জয়ধর)-রচিত গাথা-কবিতা, খলিলের 'চন্দ্রমুখীর পুঁথি', মৈমনসিংহ-গীতিকা ও পূর্ব্ববঙ্গ-গীতিকা প্রভৃতি পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে মৈমনসিংহ-গীতিকা ও পূর্ব্ববঙ্গ-গীতিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য এবং সকলের দৃষ্টি ইহাদের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে। এই গীতিকাগুলির লিপিকাল লইয়া মত-বিরোধ থাকা সত্ত্বেও এগুলির মূল কাহিনীর উৎপত্তি যে উনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব্বেই ঘটিয়াছিল সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ নাই। এই গাথা-কবিতাগুলি সম্বন্ধে দীনেশচন্দ্র সেন লিখিয়াছেন—

"...তাহাতে চূড়ান্ত প্রেমের কথা আছে—কিন্তু প্রেমের আধ্যাত্মিকতা নাই; দুশ্চর তপস্যা আছে—কিন্তু তুলসী বা বিল্বপত্রের অর্ঘ্য নাই। এক-কথায় সেখানে পার্থিব প্রেম শতদলের মত মনোলোভা হইয়া বিকাশ পাইয়াছে, কিন্তু তাহা স্বর্গের পারিজাত কুসুম হইয়া ফোটে নাই। পল্লীগীতিকার

প্রেম বিরাট আকাশের নীচে, নীলবনান্ত প্রদেশে, রক্তপুষ্পরঞ্জিত বন্যবীথিতে, কংস, ধনু প্রভৃতি প্রবল নদ-সৈকতে স্বাধীনভাবে বিকশিত হইয়াছে—কিন্তু তাহা মন্দির জুড়িয়া বসে নাই। এই প্রেম নর-নারীর প্রেম, ইহা উপাস্য-উপাসকের সাধনা নহে। তথাপি এই প্রেম স্বর্গের অতি সন্নিহিত—ইহাতে যেটুকু বাকী ছিল, বৈষ্ণবেরা তাহা পূরণ করিয়াছেন।"

(বঙ্গভাষা ও সাহিত্য—পৃঃ-৩৮৫)

দীনেশচন্দ্র সেনের এই উক্তিতে আতিশয্য আছে সন্দেহ নাই—কিন্তু বাংলা কাব্য-সাহিত্যে এই গাথা-কবিতাগুলি যে অভিনব সৃষ্টি তাহাতে কাহারও সন্দেহের অবকাশ নাই। সহজ প্রাণের সহজ অভিব্যক্তি, উচ্ছ্বাসে-আবেগে পূর্ণ। গ্রাম্য পরিবেশের ভিতর গ্রাম্য জীবনের সজীব প্রাণবন্যা কবিতাগুলিকে অপূর্ব্ব রসে ও মাধুর্য্যে মণ্ডিত করিয়াছে।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে যে-সকল গাথা-কাব্য বা কবিতা পাওয়া যায় তাহারা ভিন্ন প্রকৃতির। আদিরসাত্মক বা প্রণয়মূলক কাহিনী-কাব্যের যে ধারা নর-নারীর প্রেম-কাহিনী রচনায় উৎসাহিত হইয়াছিল কিন্তু গতানুগতিকতার ছক-বাঁধা পথ অতিক্রম করিতে পারে নাই, তাহারই উন্নততর মার্জ্জিত ও ভাবোচ্ছ্বাসপূর্ণ অভিব্যক্তি এই-সকল কাব্যে আত্মপ্রকাশ করে। রোমান্টিক কাব্যের সহজ প্রকাশ এগুলির ভিতর সম্পূর্ণতা লাভ করে। যে আবেগ ও অনুভূতির অভাবে প্রণয়মূলক কাহিনী-কাব্যগুলি রোমান্টিক হইয়া উঠিতে পারে নাই—ইহাদের ভিতর সেই আবেগ-অনুভূতি ও ভাবোচ্ছ্বাস কাব্যগুলিকে প্রাণবন্ত করিয়া তুলিয়াছে। পূর্ব্বের গাথা-কাব্যগুলিতেও প্রেমের স্ফুরণ ও উচ্ছ্বাস দেখা যায়। কিন্তু সে-সকল কাব্যের নায়ক-নায়িকাগণ অত্যন্ত সহজ সরল, ছলা-কলাহীন এবং প্রাণের আবেগে ভরপুর। তাহাদের প্রাণতন্ত্রীতে সহজেই সুর ঝঙ্কৃত হইয়া উঠে এবং তাহারই ব্যঞ্জনায় কাব্যের সৃষ্টি। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে যে-সকল গাথা-কাব্য রচিত হয়, তাহাদেরও বিষয়বস্তু মানব-মানবীর প্রেম এবং তাহারই বিচিত্র অনুভূতির ব্যঞ্জনা। কিন্তু ইহাদের নায়ক-নায়িকাগণ সর্ব্বক্ষেত্রে অতখানি সহজ-সরল নয়। ইহাদের ভিতর কেহ উচ্চশিক্ষিত, কেহ মনস্তত্ত্ব-সম্বন্ধে জ্ঞানবান্,—কিন্তু অত্যন্ত ভাবপ্রবণ, তাই যাহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে—

যুক্তিতর্ক-দ্বারা তাহার বিচ্ছেদকে সহ্য করিবার চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হয় নাই। কেহ বা প্রাণের আবেগে প্রিয়জনকে ছাড়িয়া বাহিরের বিশ্বে অধিকতর আনন্দের সন্ধানে বাহির হইয়াও প্রেমের আকর্ষণে গৃহে ফিরিয়াছে এবং প্রিয়জনের অভাবে নিরাশায় ও দুঃখে তাহারই স্মৃতি লইয়া কাল কাটাইয়াছে। প্রেমকে কেন্দ্র করিয়া দুইটি নরনারীর হৃদয়ের গভীর অনুভূতির প্রকাশ—তাহাদের মনের অলিতে-গলিতে যে-সকল আশা-আকাঙ্ক্ষার আনা-গোনা চলিতেছে, যে-সকল বাসনা-কামনার উত্থান-পতনে তাহাদের জীবনের সুখ-দুঃখ নিয়ন্ত্রিত হইতেছে, তাহার সুতীব্র আলোড়নের ইতিহাস এই কাব্যগুলিকে সৌন্দর্য্যে ও সুষমায় মণ্ডিত করিয়াছে।

এই সময়ে কয়েকটি অন্তর্ভাবিত রূপক গাথা-জাতীয় কাব্যও পাওয়া যায়। রোমাণ্টিক পরিবেশের ভিতর দিয়া রোমাণ্টিক প্রেম-কাহিনী এগুলিতে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু অন্তর্নিহিত ভাবধারা তাহার অতিরিক্ত কিছু গভীরতর তত্ত্বের সন্ধান দেয়। কাহিনীর অতিরিক্ত কোন সত্যের অথবা তত্ত্বের প্রতি ইঙ্গিত-ময়তা এগুলির বৈশিষ্ট্য। সহজ ভাষায় সহজ ভাবের ভিতর দিয়া অনির্ব্বচনীয়ের সন্ধান এবং সহজ ঘটনার ভিতর দিয়া চিরন্তন সত্যের মর্ম্মোদ্ঘাটন এই কাব্যগুলিকে সরস ও সুন্দর করিয়াছে। গাথা-কাব্য যে কেবল ভাবানুভূতির প্রকাশ নয়—কেবলমাত্র আবেগের উচ্ছ্বাস নয়—আবেগ এবং উচ্ছ্বাসের ভিতর দিয়াও গভীরতর ও মহত্তর বিষয়ের দ্যোতনা সম্ভবপর—এই কাব্যগুলির মধ্যে যেন সেই সত্যই প্রমাণিত হয়।

এই সময় এমন কিছু গাথা-কবিতাও রচিত হয় যেগুলির আয়তন ক্ষুদ্র। ক্ষুদ্র ঘটনার ভিতর দিয়া মানব-মনের অনুভূতির বিকাশ এগুলির মধ্যে পাই। মানুষের জীবনে এমন অনেক ছোট ছোট ঘটনা সংঘটিত হয় যাহা তাহার সমস্ত জীবনকে অভিভূত করিয়া ফেলে—কোন প্রাণের ক্ষুদ্র স্পর্শ তাহার জীবনে জন্মান্তর আনয়ন করে—কোন ঘৃণা বা অবহেলা তাহাকে পশুতে পরিণত করে। এইরূপ ক্ষুদ্র ঘটনার প্রভাবে নায়ক-নায়িকার জীবনের অদম্য আবেগ এই-সকল কবিতার বস্তু। এগুলি এক হিসাবে যেন ছোট-গল্পেরই পূর্ব্বাভাস এবং ছোট গল্পের কাব্যিক রূপ। অবশ্য ছোটগল্পের কাহিনীর সহিত ইহার কাহিনীর পার্থক্য অনেক। নাটক ও উপন্যাসের কাহিনীর সহিত কাব্যের কাহিনীর পার্থক্য যেরূপ, ছোটগল্পের কাহিনীর সহিত গাথা-

কবিতার কাহিনীর পার্থক্যও সেরূপ মূলগত। দুইই অনুভূতির অভিব্যক্তি —কিন্তু একটির ভিতর বাস্তবতার অনুভূতির প্রাধান্য, অপরটির ভিতর ভাব-লোকের অনুভূতির প্রাধান্য।

এই-সকল গাথা-কাব্য বা কবিতাগুলিকে উনবিংশ শতাব্দীতে কাব্য-সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি বলা যায়। সামাজিক ও মানসিক সমস্ত পরিবর্ত্তনের ধারা ও চেষ্টা এই কাব্যগুলির মধ্যে যেন সংহতভাবে ও প্রাণময়-রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীতে কবিচেষ্টার সিদ্ধির রূপ লইয়া এগুলি যেন কাব্য-সাহিত্যকে শ্রীমণ্ডিত করিয়াছে। উপন্যাসের মনস্তত্ত্ব, গীতিকাব্যের ভাবময়তা, ছোট গল্পের সংহত রূপ এবং কবিমনের আবেগ ও অনুভূতিতে কাব্যগুলি একটি নূতন যুগের সৃষ্টিধারাকে মূর্ত্ত করিয়াছে।

৬

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে রচিত বাংলা আখ্যায়িকা-কাব্যের ভাষা ও ছন্দের মধ্যে একটি অগ্রগতিরও সূচনা দেখা যায়। ঐ সময়ে বাংলা-সাহিত্যের ভাবধারা এবং টেকনিকের ভিতর যেমন অনেক পরিবর্ত্তন আসিয়া সাহিত্যকে উন্নততর ও সমৃদ্ধিশালী করিয়াছে ভাষা ও ছন্দও সেইরূপ নানা পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া এবং বাহুল্য-বর্জ্জনের দ্বারা গতি ও সুষমা আনিতে সাহায্য করিয়াছে।

পূর্ব্বে বাংলা কাব্যধারা বেশীর ভাগই সংস্কৃত হইতেই প্রকাশভঙ্গি ও অলঙ্কার-রীতি গ্রহণ করিয়াছিল। সেইজন্য সংস্কৃত বাক্-রীতির ও অলঙ্কারের প্রভাব ইহার উপর পূর্ণমাত্রায় কার্যকরী হইয়াছিল। বাংলা কাব্যের ভাষার ভিতর তাই সে সময়ে বড় বড় সমাসবদ্ধ পদের ব্যবহার, দুরূহ শব্দের প্রয়োগ, অতিশয়োক্তির আতিশয্য, অনুপ্রাস ও যমকের ছড়াছড়ি, অলঙ্কার-বাহুল্য এবং উপমা-রূপকাদির চিরাচরিতরূপে ব্যবহার ভাষাকে জড়তাযুক্ত ও গতিহীন করিয়া তুলিয়াছিল। সহজ ভাষায় ভাবের সহজ প্রকাশ কোথাও ছিল না। বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই ভাব চাপা পড়িয়া যাইত, ভাষা আড়ম্বর-প্রধান হইয়া উঠিত ও কাব্যপ্রাণকে সহজ স্ফূর্ত্তির ক্ষেত্রে বিকাশ লাভ করিতে বাধা দিত। সমস্ত রচনাই অস্বাভাবিক ভারযুক্ত হইয়া শ্লথ ও ক্লান্তিদায়ক হইয়া উঠিত। কিন্তু

ইংরাজী-শিক্ষার প্রভাবে কাব্যের ভাষার ভিতর এই জড়তা হইতে মুক্তির একটা চেষ্টা দেখা যায়। দুরূহ শব্দ ও সমাসবদ্ধ পদগুলি যথাসম্ভব পরিত্যক্ত হইতে লাগিল এবং তাহারই অনুশীলন-দ্বারা কথ্য ভাষাও সাহিত্যে স্থান পাইতে লাগিল। শব্দের হ্রস্বতা ও লঘুতার প্রতিও একটা স্বাভাবিক ঝোঁক আসিল। তাহারই ফলে বিশেষ্যপদ হইতে নামধাতু সৃষ্টি হইতে দেখা গেল। মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রথমে তাঁহার কাব্যে এই নামধাতু হইতে গঠিত ক্রিয়াপদের ব্যবহার করেন এবং পরবর্ত্তী কালে অনেক কবি তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া ভাষার ক্ষেত্রে একটি নূতন ধারার প্রবর্ত্তন করেন। সংস্কৃত ব্যাকরণেও নামধাতুর সাহায্যে বিশেষ্যপদকে ক্রিয়াপদরূপে ব্যবহার করিবার রীতি বর্ত্তমান। কিন্তু বাংলা সাহিত্যে সে রীতিকে অনুসরণ করা হয় নাই। ছন্দের সুবিধার জন্য ভাব-প্রকাশের উপযোগী করিয়া কবিগণ এইরূপ শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন। তাহা ছাড়াও অনেক বিশেষণ ও বিশেষ্য পদ সংস্কৃত ব্যাকরণের রীতি অমান্য করিয়া শ্রুতিসুখকর ও ছন্দোপযোগিরূপে ব্যবহৃত হইতে থাকে। এইভাবে দেখা যায়, কাব্যসুষমা ও ভাষা-মাধুর্য্যের দিকে কবিগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে—ব্যাকরণের বাঁধা-ধরা নীতিকে উল্লঙ্ঘন করিয়া নূতন নূতন শব্দ আহরণে এবং সৃষ্টিতেও একটা চেষ্টা আসিয়াছে।

অলঙ্কারের ক্ষেত্রে ঐ যুগের রচনায় অনুপ্রাস ও যমকের মোহ অনেক কাটিয়া যাইতে থাকে। উপমা রূপক প্রভৃতিও গতানুগতিক শব্দের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া নূতন নূতন শব্দের ভিতর দিয়া নবভাবের সৃষ্টি করে। অলঙ্কার-বাহুল্য প্রশমিত হইয়া ভাষাকে স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল করিয়া তুলিল। এক কথায়, ভাষা তখন প্রাচুর্য্য ত্যাগ করিয়া অন্তর্নিহিত ভাবকে রূপদান করিবার নিমিত্ত সচেষ্ট হইল এবং তাহারই ফলে কাব্য যেমন ভাবমুখর হইয়া উঠিল ভাষাও সেরূপ মিথ্যা আড়ম্বরমুক্ত হইয়া গতিশীল হইল।

সে-যুগে বাংলা ছন্দের ক্ষেত্রেও প্রভূত পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইয়াছিল। পূর্ব্বে বাংলা-কাব্য কেবল পয়ার এবং ত্রিপদীতে রচিত হইত। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতচন্দ্র ছন্দের বিচিত্র ব্যবহারের ভিতর দিয়া কাব্য-সাহিত্যকে সমৃদ্ধতর করিয়া তুলিয়াছিলেন। সে-সকল ছন্দ সংস্কৃত সাহিত্য হইতে সংগৃহীত হইলেও ছন্দ-কৌশলী ভারতচন্দ্রের কাব্যে তাহা সুন্দররূপে আত্মপ্রকাশ করে। ছন্দের ভিতর তখন নানাবিধ নূতন রকমের বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। তারপর

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কবিবর ঈশ্বর গুপ্তকে প্রথম ছন্দে নূতনত্ব প্রবর্ত্তনের চেষ্টায় ব্রতী দেখা যায়। তিনি তখনকার কবিগণকে ইংরাজী কাব্যের ছন্দানুবাদে ও ভাবানুবাদে অত্যন্ত উৎসাহ দিতেন এবং তাহার নিমিত্ত পুরস্কার বিতরণেরও ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাঁহার চেষ্টায় 'গৌণ পয়ার' বাংলা কাব্যে স্থান পাইল। ইহা ইংরাজী সাহিত্যের ছন্দ অনুকরণে সৃষ্ট। তারপর মাইকেল মধুসূদনের প্রতিভার স্পর্শে বাংলা কাব্য পুরাতন সমস্ত বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া নূতন ভাবে, নূতন রূপে, নূতন গতিতে নবজীবন লাভ করিল। অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্ত্তন তাঁহার প্রতিভার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি। যে ছন্দ প্রবর্ত্তন করিবার বাসনা প্রকাশ করায় 'অসম্ভব' বলিয়া সকলেই মাইকেলকে নিরুৎসাহ করিয়াছিলেন, অসীম ধৈর্য্য ও অক্লান্ত চেষ্টায় তিনি তাহা প্রবর্ত্তন করিয়া অপূর্ব্ব কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন এবং বাংলা ছন্দ-ক্ষেত্রে যুগান্তর আনয়ন করেন। ইহা ছাড়াও ৮, ৬, ৫ পঙ্‌ক্তিতে ইংরাজি কাব্যের ছন্দ অনুযায়ী স্তবক রচনা করিয়া তিনি নূতন গতিচ্ছন্দের প্রবর্ত্তন করেন। মাইকেলের পর কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং নবীনচন্দ্র সেন প্রভৃতি মাইকেলকে অনুসরণ করেন এবং ইংরাজী কবিতার ছন্দের অন্তমিলের অনুকরণে—ক খ খ ক—বাংলা ছন্দের প্রবর্ত্তন করিয়া স্থানে স্থানে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে সমর্থ হন। অবশেষে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিভা-স্পর্শে নানাবিধ ছন্দের বৈচিত্র্যে বাংলা কাব্য-সাহিত্য শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের মর্য্যাদায় উন্নীত হয়।

উপসংহারে এই কথাই বলা চলে যে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে বাংলা আখ্যায়িকা-কাব্যে একটি নব-চেতনার ক্রমবিকাশ দেখা যায় এবং তাহা দ্বারা ভাব ভাষা ছন্দ প্রভৃতি সবদিকেই পরিবর্ত্তনের আলোড়ন ও নবসৃষ্টির প্রেরণা অনুভূত হয়। বাংলা সাহিত্য-ক্ষেত্রে ইহাকে একটি সম্ভাবনাময় যুগ বলা চলে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পৌরাণিক বা দেব-দেবীর মাহাত্ম্যজ্ঞাপক আখ্যায়িকা-কাব্য

পৌরাণিক আখ্যায়িকা-কাব্যগুলিকে তিনটি পর্য্যায়ে বিভক্ত করা যায়। প্রথম পর্যায়ে দেখা যায়, এই কাব্যগুলির মধ্যে কল্পনার প্রাচুর্য্য, অসম্ভবের আবির্ভাব এবং ভাবাবেগের আতিশয্য। ইহাদের মধ্যে সর্ব্বত্র সমতা দৃষ্ট হয় না। ভাষাও সর্ব্বত্র মার্জ্জিত নয়। দ্বিতীয় পর্য্যায়ে কাব্যগুলির উন্নততর রূপ দেখা যায়। তখন বুদ্ধির সহিত কল্পনার যোগসাধন হইয়া কাব্যগুলিকে ভাবে ভাষায় ছন্দে সমৃদ্ধতর করিয়াছে। তৃতীয় পর্য্যায়ে, কাব্যের প্রধান প্রধান ঘটনা-গুলিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া কাব্য লিখিবার প্রয়াস দেখা যায়। ইহা যেন পুষ্প-স্তবক রচনার যুগ। এই-সকল রচনার মধ্যে কল্পনার স্ফুরণ বিশেষ নাই—আবেগের স্পন্দন নাই—বুদ্ধি-দ্বারা বিচার করিয়া অংশ-বিশেষের অনুকরণ এবং অবতারণা কাব্যগুলির শ্রীবৃদ্ধি করিতে পারে নাই। এই কাব্যগুলিতে কবির বুদ্ধির প্রাখর্য্য রহিয়াছে, ভাষার কারুকার্য্য রহিয়াছে, কিন্তু ভাব ও কল্পনা কবির নিজস্ব না হওয়াতে ইহারা প্রাণবন্ত হইয়া উঠিতে পারে নাই। কোন কোন কাব্যে কালোচিত ভাব ও সমস্যা অনুপ্রবিষ্ট করিয়া কবি নূতন রূপ-সৃষ্টির চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু পৌরাণিক আখ্যায়িকা-কাব্য হিসাবে তাহারা খুব সার্থক হইয়া উঠিতে পারে নাই। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে রচিত পৌরাণিক আখ্যায়িকা-কাব্যগুলি তৃতীয় পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। এই সময়ে রচিত কাব্যগুলিকে ছয়টি ভাগে বিভক্ত করা চলে,—(১) রামায়ণ-মূলক (২) মহাভারত-মূলক, (৩) দেবীমাহাত্ম্য-জ্ঞাপক, (৪) শ্রীকৃষ্ণ-মাহাত্ম্য-জ্ঞাপক, (৫) বিবিধ, (৬) বিদেশী পৌরাণিক কাহিনীর ভাব অবলম্বনে রচিত।

রামায়ণ-মূলক কাব্যগুলির মধ্যে আমরা পাই—মাইকেল মধুসূদন রচিত 'মেঘনাদবধ কাব্য' (১৮৬১), গিরিশচন্দ্র বসু রচিত 'বালিবধ' (১৮৭৬), গোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী রচিত 'ভার্গব-বিজয়' কাব্য (১৮৭৭), হরিমোহন

মুখোপাধ্যায় রচিত 'মুকুট-উদ্ধার' (১৮৮৬) শশিভূষণ মজুমদার রচিত 'দশাস্য-সংহার-কাব্য' (১৮৮৩) এবং কৃষ্ণেন্দ্র রায় রচিত 'সীতাচরিত' (১৮৮৪)।

মহাভারত-মূলক কাব্যগুলির মধ্যে পাওয়া যায়—মাইকেল মধুসূদন রচিত 'তিলোত্তমাসম্ভব-কাব্য' (১৮৬০), দ্বারিকানাথ চন্দ্র রচিত 'রাজা হরিশচন্দ্র উপাখ্যান' (১৮৬২), ভোলানাথ চক্রবর্ত্তী রচিত 'সাবিত্রী-চরিত' (১৮৬৮), মহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী রচিত 'নিবাতকবচবধ-কাব্য' (১৮৬৯), হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'বৃত্রসংহার' (১৮৭৫), 'যাদবনন্দিনী-কাব্য' (১৮৮০), জীবনকৃষ্ণ ঘোষ রচিত 'দুর্যোধনবধ-কাব্য' (১৮৮৬), দীনেশ চরণ বসু রচিত 'মহাপ্রস্থান-কাব্য' (১৮৮৭), বিপিন বিহারী দে রচিত 'নৈশকামিনী-কাব্য' (১৮৯৩), উমাকান্ত দাস রচিত 'দণ্ডীপর্ব্ব' (?), নবীনচন্দ্র সেন প্রণীত 'রৈবতক' (১৮৮৬), 'কুরুক্ষেত্র' (১৮৯৩) এবং 'প্রভাস' (১৮৯৬)।

দেবীমাহাত্ম্য-জ্ঞাপক কাব্য পাওয়া যায় ভারতচন্দ্র সরকার রচিত 'মদনভস্ম' (১৮৬৬), দ্বিজ কালিদাস রচিত 'কালীবিলাস' (১৮৭৪), রামগতি চট্টোপাধ্যায় প্রণীত 'সুরারিবধ-কাব্য' (১৮৭৫), ললিতমোহন মুখোপাধ্যায় রচিত 'অপূর্ব প্রণয় বা দক্ষবধ-কাব্য' (১৮৭৭), অক্ষয়কুমার সরকার রচিত 'তারকসংহার' কাব্য' (১৮৮৮), 'সতীসংবাদ বা দক্ষযজ্ঞ ও পার্ব্বতী-পরিণয়' (১৮৯০), শশধর রায় প্রণীত 'ত্রিদিব-বিজয়' (১৮৯৬), এবং শরচ্চন্দ্র চৌধুরী প্রণীত 'দেবীযুদ্ধ' (১৯০০)। ইহাদের কাহিনী-অংশ চণ্ডী, মার্কণ্ডেয় পুরাণ এবং দেবী পুরাণ হইতে গৃহীত।

শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্যজ্ঞাপক কাব্য পাওয়া যায়,—জয়রাম রচিত 'উদ্ধব-সংবাদ' (১৮২৫), জয়নারায়ণ বন্দ্যোপাধায় রচিত 'দ্বারকাবিলাস' (১৮৫৫), দীননাথ ধর রচিত 'কংশবিনাশ-কাব্য' (১৮৬১), বনোয়ারীলাল রায় রচিত 'দ্বারকা কেলিকৌমুদী' (১৮৬৩), হরিচরণ চক্রবর্ত্তী রচিত 'ভদ্রোদ্বাহ-কাব্য' (১৮৭১), হরানন্দ রায় গুপ্ত প্রণীত 'উষাহরণ' (?) এবং হরিলাল গোস্বামী রচিত 'নরকসংহার-কাব্য' (১৮৯৬)। ইহাদের মধ্যে ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ, হরিবংশপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থের কাহিনী-অংশ দৃষ্ট হয়।

এই সময়ে পৌরাণিক কাহিনীর আবরণে উদ্দেশ্যমূলক কাব্যও রচিত হইয়াছিল। তাহার মধ্যে বনমালী ঘোষাল রচিত 'পদ্মগন্ধা-উপাখ্যান', (১৮৬৪), জগচ্চন্দ্র দেব সরকার চৌধুরী রচিত 'অজোদ্বাহ-কাব্য' (১৮৬৭),

ব্রজনাথ মিত্র রচিত 'কাদম্বরী-কাব্য' (১৮৬৯), প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'সম্বরণবিজয়-কাব্য' (১৮৬৯), এবং হরিমোহন মুখোপাধ্যায় রচিত 'অদৃষ্ট-বিজয়' (১৮৮১) পাওয়া যায়।

বিদেশী কাহিনীর বিষয় অবলম্বনে এই সময়ে আনন্দচন্দ্র মিত্র 'হেলেনা-কাব্য' (১৮৭৬) রচনা করেন।

রাম-সীতা, অর্জুন-অভিমন্যু, শিব-দুর্গা, কৃষ্ণ-রাধা এবং ব্রহ্মা ও বিষ্ণু বাঙ্গালীর মানসলোকের অনেকখানি স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। কবিগণ এই-সকল দেব-দেবীর নিমিত্ত কখনও বাৎসল্য-রসে পরিপ্লুত হইয়াছেন, কখনও পত্নীরূপে প্রেম নিবেদন করিয়াছেন, আবার কখনও ভক্তরূপে আরাধনা করিয়াছেন। ইহাতে অনেক অলৌকিক ঘটনার অবতারণা করিয়া দেব-মহিমা প্রকাশের প্রয়াস থাকা সত্ত্বেও স্থানে স্থানে কবি-হৃদয়ের ভাবপ্রবণতা ও স্নেহশীলতা ইহাদের বাঙ্গালীর নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত করিয়াছে।

এই কাব্যগুলির দেবদেবী-চরিত্রে দেবোচিত ও মানবোচিত দোষগুণের সমাবেশ দেখা যায়। কখনও অসুর নিধন করিতে দেবগণের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইতেছে আবার কখনও মহাশক্তির আরাধনা করিয়া তাঁহারা শক্তিলাভ করিতেছেন এবং আসুরিক শক্তিকে পরাভূত করিতেছেন। সুযোগমত স্থানে স্থানে তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়া কাব্যকে কাহিনীর উর্দ্ধে তুলিবার চেষ্টাও ইহাদের মধ্যে দেখা যায়। স্থলবিশেষে দেবগণের পরাজয়ের কারণ হিসাবে ঐক্যহীনতা, দেশদ্রোহিতা, স্বার্থপরতা প্রভৃতি দেখাইয়া স্বদেশপ্রীতির মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে। সব কাব্যেই দেবানুগৃহীত ব্যক্তিকে ঐশ্বরিক শক্তি-সাহায্যে উদ্ধার-লাভ ও স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিতে দেখা যায়। দুষ্কৃতকারিগণ প্রথমেই যত শক্তিশালী ও সমুন্নত হউক না কেন—অত্যাচার ও পাপের পরিণাম হিসাবে তাহাদের পতন ও ধ্বংস অবশ্যম্ভাবিরূপেই আসিয়াছে। অনেক কাব্যে দুষ্কৃতকারিগণের প্রতিও কবিহৃদয়ের সমবেদনা ও মমত্ববোধ লক্ষণীয়। কাব্যে তাঁহারা নূতন সুর আনিবার চেষ্টা করিয়াছেন এবং অনেক ক্ষেত্রে কৃত-কার্য্য হইয়াছেন। আবার কোন কোন কাব্যে বিদেশী দেবদেবী-চরিত্রের প্রভাব দৃষ্ট হয়, কিন্তু তথাপি তাহারা সম্পূর্ণরূপে বিদেশী হইয়া যায় নাই। প্রায় সব কাব্যে শিবলোক, বিষ্ণুলোক, ব্রহ্মলোক, মর্ত্ত্যলোক, এবং নরকের বর্ণনা স্থান পাইয়াছে। ইহাদের উপরেও বিদেশী সাহিত্যের প্রভাব দৃষ্ট হয়।

এই কাব্যগুলির মধ্যে সাধারণতঃ করুণরস, বীররস, ভয়ঙ্কররস ও মধুররসের সমাবেশ দেখা যায়। নিষ্ঠা ও ত্যাগ, সাহস ও বীর্য্য, আরাধনা ও একাগ্রতার দ্বারা মানুষ কতখানি শক্তি ও ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইতে পারে তাহাই ছন্দে ও ভাবে ইহাদের মধ্যে রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। অনেক ক্ষেত্রে আবার মানুষকে দেবতার হাতের ক্রীড়নকরূপে ভাগ্যের বিপর্য্যয়-স্রোতে ভাসিতে দেখা যায়। এই-সকল ঘটনার মধ্যে বিভিন্ন রস বিভিন্ন ভাবে পরিবেশিত হইয়া মানবকে এক অলঙ্ঘ্য শক্তির ও অনির্ব্বচনীয়ের ইঙ্গিত দিয়া যায়।

ইহাদের গঠনরীতিতেও ক্লাসিক-রীতিই পরিস্ফুট, যদিও তাহাদের সার্থকতা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ রহিয়াছে। বেশীর ভাগ কাব্যই ত্রিপদী, পয়ার চৌপদী, মালঝাঁপ, তোটক ও অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত। কেহ কেহ বাংলা কাব্যে সংস্কৃত ছন্দ প্রবর্ত্তনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু পাঠক-সমাজের নিকট তাহা সমাদর লাভ করে নাই। অনেকে মাইকেলের অনুকরণে অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করিয়া কিছুটা কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন—কিন্তু আবার এই ছন্দ ব্যবহারের অকৃতকার্য্যতাও অনেকের কাব্যকে ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে।

পৌরাণিক কাব্যগুলির মধ্যে বাঙালী কবি-মানসের একটি ধারা পাওয়া যায়,—তাহা কেবল অলৌকিক শক্তি, আধিভৌতিক ঘটনাবলী, আধ্যাত্মিক তত্ত্বব্যাখ্যা, নিজ নিজ মত ও পথের সমর্থনে দ্বন্দ্ব ও কলহে পূর্ণ নয়। বাঙালী কবিগণ দেবতাকে শ্রদ্ধা-ভক্তি ও ভয় দ্বারা কেবল আরাধ্য দেবতা করিয়া রাখেন নাই,—স্নেহ-প্রেম-ভালবাসা, মান-অভিমান দ্বারা নিজেদের আত্মীয় করিয়া তুলিয়াছেন, এইজন্যই কাব্যগুলি কেবল ধর্ম্মকাহিনী না হইয়া সাহিত্য হইয়া উঠিয়াছে।

১

মেঘনাদবধ কাব্য—মাইকেল মধুসূদন দত্ত রচিত মেঘনাদবধ কাব্যটি ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ইহা রামায়ণের কাহিনীর অংশ লইয়া রচিত হইলেও পুরাতন ভাব-ভাষা-ছন্দের মূলে বিরাট পরিবর্ত্তনের আলোড়ন সৃষ্টি করে এবং এই কাব্যের প্রধান মূল্য-বিচার তাহা দ্বারাই নিরূপিত। বিদেশী সাহিত্যের

প্রভাব এই কাব্যের উপর যতখানি কার্যকরী, এই কাব্যখানির প্রভাব বাংলা কাব্যজগতে তাহা অপেক্ষা শতগুণ অধিক। ইহা কেবল মিত্রাক্ষর ছন্দের শৃঙ্খল ভঙ্গ করে নাই, ছন্দে ওজস্বিতা, ঝঙ্কার ও নূতন গতি দান করিয়াছে; ভাষার ক্ষেত্রেও নামধাতু প্রভৃতির প্রয়োগ দ্বারা অনেক শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়া কাব্যের ভাষাকে নূতন রূপ দান করিয়াছে। ক্লাসিক মহাকাব্যেরও সুর-ধ্বনি, ভাব-ভাষা ইহার মধ্যে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে এবং স্থানে স্থানে লিরিক কবিতার সুর ধ্বনিত হইয়া পরবর্ত্তী কাব্যধারার সূচনা করিয়াছে। এক কথায় বলা যায় এক নূতন বলিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গি এই কাব্যে আত্মপ্রকাশ করিয়া বাঙলা কাব্যক্ষেত্রে নূতন গতিপথ ও প্রবাহ আনিয়া সাহিত্যকে সমৃদ্ধিশালী ও প্রাণবন্ত করিয়াছে।

এই কাব্য সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা বাহুল্যমাত্র।

বালিবধ-কাব্য—'বালিবধ-কাব্য' গিরিশচন্দ্র বসু কর্তৃক রচিত ও ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। রামচন্দ্র-কর্ত্তৃক বালিবধ, এই কাব্যের বিষয়বস্তু। ইহা সাতটি সর্গে সমাপ্ত এবং অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত। কিন্তু ছন্দ কোথাও কাব্যকে গতি বা সৌন্দর্য্য দান করিতে পারে নাই। অমিত্রাক্ষর ছন্দ সম্বন্ধে কবির অজ্ঞতাই কাব্যে প্রকাশিত হইয়াছে। ভাষা অযথা দুরূহ ও আড়ষ্ট হইয়াছে। ছন্দ ও ভাষার দিক দিয়া কাব্যটিকে সার্থক বলা চলে না।

কাহিনী-বিন্যাসের ক্ষেত্রেও কবি নৈপুণ্য প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। কোথাও ভাব বা কল্পনার স্পর্শ নাই—কেবল ঘটনার বর্ণনা ও বিবৃতি, কাব্যটিকে প্রাণহীন করিয়া তুলিয়াছে। তৃতীয় সর্গে বালি পরাজিত ও আহত হইবার পর কাব্যকে বিলাপের দ্বারা অযথা দীর্ঘ করা হইয়াছে। বালি-বধ হইবার পরেও কাব্যকে আরও চারিটি সর্গে টানিয়া বর্দ্ধিত করার জন্য কাব্যের সমতা ব্যাহত হইয়াছে এবং কাব্যরস ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। চরিত্র-চিত্রণে কোথাও প্রাণ সঞ্চারিত হয় নাই। রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ, বালি, সুগ্রীব, অঙ্গদ, তারা প্রভৃতি আপন আপন ভূমিকায় নিজ নিজ কর্ত্তব্য করিয়া গিয়াছেন।

রামচন্দ্র-কর্ত্তৃক তারাকে উপদেশদানচ্ছলে কাব্যে তত্ত্ব-ব্যাখ্যাও স্থান পাইয়াছে।

গ্রন্থকর্ত্তা সম্বন্ধে কিছু জানা নাই। হিন্দু কলেজের এক ছাত্র হোমারের ইলিয়ডের ইংরাজী অনুবাদ বাংলা পদ্যে অনুবাদ করিয়াছিলেন—(১৮৩৭)।

ইনি মিল্টনের 'Paradise Lost' এর ভাব অবলম্বনে ৭ সর্গে 'স্বর্গভ্রষ্ট-কাব্য' রচনা করিয়াছিলেন—(১৮৬৯)। 'বালিবধ' তাঁহারই রচনা হওয়া সম্ভব।

ভার্গববিজয়-কাব্য—১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে গোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্তৃক রচিত "ভার্গব-বিজয়" কাব্যটি প্রকাশিত হয়। রামচন্দ্রের নিকট পরশুরামের পরাজয়—কাব্যের বিষয়বস্তু। প্রত্যেক সর্গের প্রারম্ভে সেই সর্গে বর্ণিত তালিকা দেওয়া আছে। প্রথম সর্গে বর্ণিত বিষয়ের তালিকার পর কাব্যের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে কবি লিখিয়াছেন।

তারপর কবি ভারতীয় ও ইউরোপীয় কবিগণের বন্দনা করিয়াছেন—দেবী সরস্বতীর কৃপাভিক্ষা করিয়াছেন—অবশেষে মাইকেলের নিকট শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছেন।

কাব্যটি ষোলটি সর্গে বিভক্ত। প্রথম তিন সর্গের ভাষা অত্যন্ত দুরূহ—নূতন শব্দ সৃষ্টি করিতে গিয়া কবি ভাষাকে অযথা কষ্টকর ও জটিল করিয়া তুলিয়াছেন। চতুর্থ সর্গ হইতে ভাষা কিছুটা সরল হইয়াছে—তাহাতে কাব্যে গতি আসিয়াছে। ইহা অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত—ছন্দের উপর কবির কিছুটা দখল আছে।

বিষয়-বিন্যাসে কবি কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। মহাকাব্য রচনা করিতে গিয়া কবি কাব্যটিকে অযথা দীর্ঘ করিয়াছেন এবং তাহা দ্বারা কাব্যরস ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। ভার্গবের পরাজয়ের পরেও কাব্যে ৫টি সর্গের অবতারণা ও দৃশ্যাদি-বর্ণনা এবং নিজ-পরিচয় প্রভৃতি উল্লেখে কাব্যের তুলনায় বিষয়বস্তু অকিঞ্চিৎকর হইয়া পড়িয়াছে। বিষয়বস্তুর বিস্তৃতি নাই এবং বিষয়-নির্ব্বাচন কবির সার্থক হয় নাই।

চরিত্র-চিত্রণেও কবি দক্ষতা প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। ভার্গবের চরিত্রে সীতাকে বিবাহ করিবার বাসনা সম্পৃক্ত করিয়া হীনভাবাপন্ন করা হইয়াছে। রামচন্দ্রের চরিত্রটি সুন্দর ও সমুন্নত—লক্ষ্মণ ক্রোধী এবং দশরথ পুত্রের অকল্যাণ আশঙ্কায় হতজ্ঞান। দশরথকে এরূপ দুর্ব্বলচেতা না করিলেই ভাল হইত। এক কথায় বলা চলে কাব্যটি সার্থক হয় নাই।

মুকুট-উদ্ধার—হরিমোহন মুখোপাধ্যায় 'মুকুট-উদ্ধার' কাব্যটি রচনা করেন। ইহা ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। রামায়ণের সীতাহরণ ইহার বিষয়-বস্তু কিন্তু ইহার কাহিনী-অংশ রামায়ণ হইতে পৃথক্। সীতা আর্য্য-রাজলক্ষ্মী

—রামচন্দ্রের পত্নী নহেন। তিনি রাবণ-গৃহে বন্দিনী এবং তাঁহাকে উদ্ধার করিবার জন্যই যুদ্ধ। দশরথ যুদ্ধে পরাজিত ও বন্দী হন। রাবণ অন্যান্য রাজাদিগকে পরাজিত করিয়া ভারতবর্ষে নিজের একাধিপত্য স্থাপন করিয়াছেন। মন্দোদরী কৌশল্যার স্থান অধিকার করিবার জন্য ব্যস্ত। দেবতার রোষ জাগরিত হইল এবং রামচন্দ্রের দ্বারা তাঁহারা রাক্ষস-রাজকে দমন করাইয়া 'সীতার' উদ্ধার সাধন করাইলেন। কাব্যে স্বদেশপ্রীতি মুখ্য স্থান অধিকার করিয়াছে। দেশের স্বাধীনতা ও পরাধীনতা লইয়া কাব্যের সুর ঝঙ্কৃত এবং সমস্ত ঘটনার মূলে স্বদেশের উদ্ধার ও উন্নতি-সাধনের চিন্তা ও উপায় সম্পৃক্ত। ঊনবিংশ শতাব্দীর নবচেতনার পটভূমিকায় পৌরাণিক কাহিনীর সমাবেশ ইহাতে কবি যেমন করিয়া অঙ্কিত করিয়াছেন এমন করিয়া আর কোন কাব্যে দেখা যায় না। ইহাকে ঠিক পৌরাণিক কাহিনীও বলা চলে কি না তাহাও বিবেচ্য। কারণ দশরথ, কৌশল্যা, রামচন্দ্র, সীতা, রাবণ, মন্দোদরী, ইন্দ্রজিৎ, বিভীষণ, সরমা প্রভৃতি নামগুলি থাকা সত্ত্বেও তাঁহাদের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য এবং কার্য্যকলাপ অন্যরূপ। যাহা হউক, কাব্য-হিসাবে গ্রন্থটি সুন্দর ও মর্ম্মস্পর্শী।

ইহা চতুর্দ্দশ উচ্ছ্বাসে বিভক্ত।

প্রথম উচ্ছ্বাস—সরযূর তীরে একাকিনী বসিয়া রাণী কৌশল্যা নিজের দুর্ভাগ্যের জন্য বিলাপ করিতেছেন।

> নীরবে আসীন—চিত্ত চিন্তায় জড়িত ;
> যেন রে হতাশা-মূর্ত্তি পাষাণে ক্ষোদিত। —(১ পৃঃ)

তিনি সব দেব-দেবীকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। ইহাতে সূর্য্যদেব বিচলিত হইলেন। সারথি অরুণের দ্বারা কৌশল্যাকে সান্ত্বনা দান করাইলেন।

দ্বিতীয় উচ্ছ্বাস—লঙ্কায় আনন্দ-উৎসব চলিতেছে। কৌশল্যার সিংহাসনে মন্দোদরীর অভিষেক হইবে। শচীদেবীকে মন্দোদরীর সজ্জাবিধানের নিমিত্ত আনা হইলে তিনি মন্দোদরীকে সজ্জিত করিলেন এবং কৌশল্যার কথা চিন্তা করিয়া দুঃখিত-অন্তরে চলিয়া গেলেন। সিংহাসনে অভিষেকের নিমিত্ত রাবণ ও মন্দোদরীর যাত্রাকালে ব্রহ্মা তাঁহাদের নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিয়া ব্যর্থকাম হন এবং পরে মহাদেবের চরণে সকল সংবাদ জ্ঞাপন করেন। মহাদেব

ক্রুদ্ধ হইয়া বীরভদ্রকে নিজ ত্রিশূল দিয়া সকল সংসার ধ্বংস করিতে আদেশ করিলেন। রাবণ ও মন্দোদরীর রথ একটি তিন্তিড়ী-বৃক্ষে ধাক্কা খাইয়া ভূপতিত হইল। একটি শ্যেনপক্ষী আসিয়া রাবণের মাথার মুকুট লইয়া গেল। আর অপরদিকে ক্রুদ্ধ মহেশ্বরকে শান্ত করিয়া ভবানী তাঁহার কর্ম্মের ভার গ্রহণ করেন এবং মায়া দ্বারা শচীদেবীকে সংবাদ পাঠান। তারপর কৌশল্যাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য ব্রহ্মাকে তিনি মর্ত্ত্যে পাঠাইলেন।

তৃতীয় উচ্ছ্বাস—বৈজয়ন্ত-ধামে শচীদেবী ক্রোধে-ক্ষোভে দাসীর নিকট যুদ্ধে যাইবার বাসনা প্রকাশ করিতেছিলেন। তখন মায়াদেবীর মুখে ভবানীর আদেশ পাইয়া তিনি মর্ত্ত্যে আসিলেন এবং পূর্ব্বের গৌরবময় স্মৃতিসকল স্মরণ করিয়া দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এমন সময় সঙ্গীতের ধ্বনি অনুসরণ করিয়া তাঁহারা দেখিলেন এক সৌম্যমূর্ত্তি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ভারতের পূর্ব্ব গৌরব ও বর্ত্তমানের হীন অবস্থার উল্লেখ করিয়া বীণা বাজাইয়া গান করিতেছেন—

আছে সেই আর্য্যপুত্র অযোধ্যা-ভুবন—
আছে সেই হিমালয় দণ্ডক কানন।
কিন্তু সে গম্ভীর স্বরে কাঁপাইয়া চরাচরে
দামামা দুন্দুভি ভেরী বাজে না ভীষণ।
কোদণ্ড-টঙ্কার ঘন হয় হস্তী গরজন
করে না বিদার আর অবনী গগন।
নীরব সমর-শংখ নিদ্রায় মগন। —(৩৬ পৃঃ)

ইহা হেমচন্দ্রের "ভারত-সঙ্গীত" কবিতাটির পঙ্‌ক্তিগুলি স্মরণ করাইয়া দেয়। গীতধ্বনি বন্ধ হইলে ভবানীদেবীর সহিত শচীদেবীর পরামর্শ হইল। রামচন্দ্রকে সৌদামিনীর এবং চামুণ্ডার তেজ দ্বারা উদ্দীপিত করিয়া স্বদেশ-উদ্ধার-কার্য্যে নিযুক্ত করা স্থির হইল।

চতুর্থ উচ্ছ্বাস—রাজা দশরথ রক্ষ-কারাগারে আবদ্ধ। পুত্র, পুত্রবধূ, জায়া ও পরিজনবর্গ বনে বাস করিতেছেন। একদিন রাত্রে রামচন্দ্র সরোবরকূলে বসিয়া চিন্তায় মগ্ন ছিলেন। এমন সময় তিনি দেখিলেন—কখনও অন্ধকারে চারিদিক্ আবৃত হইতেছে—কখনও আগুনের ঝলকে উদ্‌ভাসিত হইয়া

উঠিতেছে—কখনও ভূকম্পন—কখনও সব স্থির এবং শান্ত। এক নিরাভরণা রমণী-মূর্ত্তি নৃত্য করিতে করিতে নিকটে আসিয়া তৃষ্ণা দূর করিবার জন্য রক্ত চাহিলে তিনি বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া রক্ত দিলেন। চারিদিকে জয়ধ্বনি উঠিল এবং রক্তবিন্দু হইতে শত শত মহাবীরের উৎপত্তি হইল। রামচন্দ্রের প্রশ্নের উত্তরে রমণী নিজ পরিচয় দিলেন—

ভারত-নন্দিনী আমি হে দামিনী
বেড়াই নাচিয়া সকল দেশে।
যৌবনের ঘটা সৌন্দর্য্যের ছটা
খেলায় তরঙ্গ শরীরে হেসে॥
... ...
লহরে লহরে শিহরে শিহরে
কখন নাচি লো মেঘের কোলে।
পবন-হিল্লোলে জলধি-কল্লোলে
কখন খেলি লো ভীষণ রোলে॥ —(৫২-৫৩ পৃঃ)

সৌদামিনীর বর্ণনাটি সুন্দর ও ভাবময়। সৌদামিনী চলিয়া গেলে আবার এক ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি আসিলেন। মায়াবিনী ভাবিয়া রামচন্দ্র অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া ব্যর্থ হইলেন।

তারপর চামুণ্ডার পরিচয় পাইয়া দুঃখিত-অন্তরে রামচন্দ্র কহিলেন—

নির্ব্বাণ বহ্নিরে আর বৃথা বারবার
দিও না আহুতি দান, মিনতি চরণে।
সুখের ভারতে উমা! কি রেখেছ আর?
স্বর্ণভূমি আর্য্যভূমি আজি মরুস্থান
নিবিয়াছে দীপাবলী; ঘোর অন্ধকার
ঘেরিয়াছে সমুদায়; মেদিনী বিমান
ফাটিতেছে আর্ত্তস্বরে—ভারত-সন্তান
ফিরিতেছে অন্নের আশে দুয়ারে দুয়ার
উন্নত হিমাদ্রিশৃঙ্গ করিছে চুম্বন
অধম শৃগাল-পদ—স্বচক্ষে এবার

ধূলায় লুণ্ঠিত হয়ে করিব রোদন
না দেখিলে নহে, দেবি! মনের মতন?
—(৬০-৬১ পৃঃ)

রামচন্দ্র দেবীর নিকট রাক্ষসগণকে বধ করিবার শপথ গ্রহণ করিলেন এবং গৃহে ফিরিয়া পত্নীর নিকট বিদায় চাহিলে তিনি রামচন্দ্রকে কহিলেন—

যাবে নাথ, যাও রণে নিষেধ না করি
বীর হয়ে রবে কেন কাপুরুষ ভাবে?
লভিবে অক্ষয় কীর্ত্তি ধনুর্ব্বাণ ধরি
সুযশ কুসুমে মণি-মুকুট সাজাবে। —(৬৫-৬৬ পৃঃ)

রামচন্দ্র উষাকালে হিমাদ্রিশিখরে আরোহণ করিয়া সকলকে আহ্বান করিতে লাগিলেন—

বাজ্‌রে দামামা বাজ্‌রে আবার,
অবনী গগন হোক্‌রে বিদার।
বাজ্‌রে দুন্দুভি বাজ ভয়ঙ্কর
দানব মানবে করিয়া কাতর। —(৬৮ পৃঃ)

এস্থলেও 'ভারত-সঙ্গীত' কবিতার সুরটি ধ্বনিত হইয়াছে। সৈন্যগণ যুদ্ধের জন্য মিলিত হইল।

পঞ্চম উচ্ছ্বাস—কৌশল্যা যখন বিলাপ করিতেছিলেন তখন ব্রহ্মা তাঁহাকে ভবানীর আদেশ জানাইলেন এবং শচীদেবী চামুণ্ডার তেজে শক্তিশালী রামচন্দ্র কর্ত্তৃক দশরথের মুক্তির ভবিষ্যদ্বাণী জানাইলেন।

ষষ্ঠ উচ্ছ্বাস—লঙ্কায় আনন্দ-উৎসবের মধ্যে রণ-দামামার ধ্বনি শুনিয়া সকলে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিল। প্রচণ্ড যুদ্ধে রামচন্দ্র ইন্দ্রজিৎকে পরাজিত করিয়া গৃহে ফিরিলেন।

সপ্তম উচ্ছ্বাস—কৌশল্যা রামচন্দ্রের দেহে আঘাতের চিহ্ন দেখিয়া তাঁহাকে যুদ্ধে যাইতে নিষেধ করিলেন। রামচন্দ্র তাঁহাকে অনেক ভাবে বুঝাইয়া যুদ্ধে গিয়া পুনরায় ইন্দ্রজিৎকে আহত করিলেন। ক্রুদ্ধ রাবণ যুদ্ধে আসিলে তাঁহার বাণে রামচন্দ্র নিহত হইলেন।

অষ্টম উচ্ছ্বাস—সূর্য্যদেব রাক্ষসগণের বিরুদ্ধে দেবগণকে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। আর্য্যকুললক্ষ্মী জানকী রামচন্দ্রের মৃত্যু-সংবাদ দিয়া অভিমান প্রকাশ করিলে হুতাশন ক্রুদ্ধ হইলেন এবং দেবতারা সকলে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন। নিয়তি আসিয়া সকলকে নিবৃত্ত করিয়া ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ দেখাইলেন—ভারত পুনরায় গৌরব লাভ করিবে—কৌশল্যা-মাতার শিরে অযোধ্যার মুকুট শোভা পাইবে এবং রাক্ষসকুল বিনষ্ট হইবে। তবে এ-সকল কার্য্য কিভাবে সম্পাদিত হইবে তাহা ইন্দ্র কলির নিকটে জানিতে পারিবেন। জানকী আশ্বস্ত হইয়া কারাগারে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং ইন্দ্র কলির উদ্দেশ্যে গমন করিলেন।

নবম উচ্ছ্বাস—কলির রাজধানীর বর্ণনা ও কার্য্যকলাপের বর্ণনা সুন্দর। কলির ধূর্ত্ততাও কিছু প্রকাশিত হইয়াছে। প্রথমে ইন্দ্রকে না চিনিবার ভান করিয়া তিনি ইন্দ্রকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিবার আদেশ দেন। পরে সমস্ত বিষয় অবগত হইয়া এই সর্ত্তে সাহায্য করিতে সম্মত হন যে ইন্দ্র মনে রাখিবেন বিপদের সময় দেবরাজকেও কলির নিকটে আসিতে হয়।

দশম উচ্ছ্বাস—কলিরাজ বিভীষণকে গৃহবিরোধের উপদেশ দিলে বিভীষণ প্রথমে ক্রুদ্ধ হন। কিন্তু অবশেষে তাহাতেই মঙ্গল মনে করিয়া সেই পথ অবলম্বন করেন এবং পত্নী সরমার সাহায্যে রাজা দশরথকে কারাগৃহ হইতে মুক্ত করেন।

একাদশ উচ্ছ্বাস—রামচন্দ্রের স্ত্রী সরলা স্বামীর মৃত্যুতে শোকাকুল হইয়া দশরথের নিকট যুদ্ধে যাইবার অনুমতি চাহিলে দশরথ স্বয়ং যুদ্ধে গমন করিলেন।

দ্বাদশ উচ্ছ্বাস—রাম অমৃত সিঞ্চনে পুনর্জ্জীবন লাভ করিলেন। রাবণের সহিত দশরথের এবং ইন্দ্রজিতের সহিত রামের ঘোরতর যুদ্ধ হইল। ইন্দ্রজিৎ নিহত হইলেন—রাবণ পলায়ন করিলেন।

ত্রয়োদশ উচ্ছ্বাস—পরাজিত রাবণ রুদ্ধ রোষে ফুলিতে লাগিলেন। নিজের হৃত শক্তিকে ফিরাইয়া আনিয়া পুনরায় যুদ্ধে যাইতে প্রবৃত্ত হইলে দৈববাণীতে শুনিলেন—উমা এবং উমাপতি তখনও তাঁহার প্রতি সদয় আছেন এবং তিনি যদি জানকীকে ফিরাইয়া দেন তবে তাঁহার মঙ্গল হইবে। মন্ত্রীরাও রাবণকে সেই কার্য্যে পরামর্শ দান করিলে তিনি জানকীকে দশরথের নিকট প্রত্যার্পণ

করিবার সঙ্কল্প করিলেন। কিন্তু মন্দোদরী আসিয়া তাঁহাকে সে কাজে নিবৃত্ত করিয়া যুদ্ধে পাঠাইলেন।

চতুর্দ্দশ উচ্ছ্বাস—দশরথ ও রাবণের যুদ্ধ হইল। দেবতাগণ যুদ্ধে যোগদান করিলেন। রতিদেবী দশরথকে প্রভূত সাহায্য করিলেন। বিভীষণ দশরথকে ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপের পরামর্শ দিলেন এবং তাহাতেই রাবণ হত হইলেন। ভারতের হৃত-গৌরব ফিরিয়া আসিল এবং—

আনন্দে ধরিয়া দিব্য অভিনব ছবি
নির্ম্মল আকাশে আসি দেখা দিলা রবি
কেন্দ্রে কেন্দ্রে প্রতিঘাৎ করি ভীম ভাবে
ভারত মঙ্গল বাদ্য বাজে ঘোর রাবে। —(১৯০ পৃঃ)

কাব্যটিতে চরিত্রচিত্রণও সুন্দর হইয়াছে। কোন চরিত্রই ক্ষুণ্ণ হয় নাই। ইহাতে পয়ার, ত্রিপদী, চৌপদী ক ক খ গ গ খ খ রূপে সপ্ত পঙ্‌ক্তির স্তবক ও অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। ভাষা সহজ ও গতিশীল এবং সুখপাঠ্য।

'সাধারণী', 'সোমপ্রকাশ', 'বান্ধব', 'নবজীবন' প্রভৃতি সমসাময়িক পত্রিকা-গুলিতে কবির রচনা প্রকাশিত হইত। তাঁহার অন্যান্য কাব্য 'অদৃষ্ট-বিজয়' (১৮৮১), 'বষ্টম বউ' (১৮৮২), 'শিবাজীর ভবানী-পূজা', 'জীবন-সঙ্গীত', প্রভৃতি পাওয়া যায়। 'যোগিনী' এবং 'কমলাদেবী' নামক দুইখানি উপন্যাসও তিনি রচনা করিয়াছিলেন।

দশাস্য-সংহার-কাব্য—শশিভূষণ মজুমদার কর্ত্তৃক রচিত 'দশাস্য-সংহার-কাব্য'-টি ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। শূর্পণখার নাসিকা ও কর্ণ ছেদনের পর রাবণ-সভায় শূর্পণখার উপস্থিতি ও সমস্ত সংবাদ জ্ঞাপন হইতে রাবণবধ পর্য্যন্ত কাব্যে বর্ণিত হইয়াছে। ইহা গদ্যে-পদ্যে রচিত। কাব্যে চতুর্দ্দশটি সর্গ রহিয়াছে।

গদ্যাংশ—রাবণ-সভায় শূর্পণখার আগমন এবং আত্ম-অবমাননা বর্ণনা—রাবণ-কর্ত্তৃক মারীচকে আদেশ দান ও স্বর্ণমৃগের অবতারণা—সীতাহরণ—জটায়ুর যুদ্ধ ও রামকে সংবাদ দান এবং মৃত্যু—সুগ্রীবের সহিত রামচন্দ্রের মিত্রতা—বালিবধ—হনুমানের লঙ্কায় গমন, সীতার সহিত সাক্ষাৎ এবং লঙ্কাদহন—রামচন্দ্রের সীতার সংবাদ প্রাপ্তি।

পদ্যাংশ—সাগরে সেতু-নির্ম্মাণ—লঙ্কা-আক্রমণ—বিভীষণের অপমান ও রাবণ-পক্ষ ত্যাগ—রাবণপুত্রগণের যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ—কুম্ভকর্ণের পরাজয় ও নিধন—মেঘনাদ-বধ, শক্তিশেলে লক্ষ্মণের মৃত্যু—হনুমান-কর্ত্তৃক গন্ধমাদন-পর্ব্বত আনয়ন ও লক্ষ্মণের পুনর্জীবন প্রাপ্তি—রাবণের যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ ও শেষকৃত্য।

গদ্যাংশ রচনায় কাব্যটি ক্ষুণ্ণ হয় নাই—অনেকখানি নূতনত্ব আনিতে সক্ষম হইয়াছে। গদ্যাংশ প্রাচীন-রীতি-বর্জ্জিত। ছেদ প্রভৃতি যথোপযুক্তভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। ভাষায় উপমা-উৎপ্রেক্ষা এবং অনুপ্রাসের বাহুল্য থাকিলেও ভাষা অনেকখানি সহজ ও সরল। যেমন—

"দশানন ও সারণ এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময়ে সকল ভুবন-প্রকাশক দিনমণি অংশুমালী অস্তাচল-শিখরে অধিরোহণ করিলেন; রাবণের অজ্ঞাতসারে রক্ষঃ-কুল-গৌরব ভাস্করও যেন দিনমানের সহিত অবসান হইতে লাগিল। দিনকর সহস্র ময়ূখমালা সঙ্কোচিত করিয়া প্রজ্জলিত হুতাশন-মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। নলিনী দিনমণির বিরহে কাতরা হইয়া অবনতমুখী হইল; পশ্চিম গগন ঈষৎ রক্তিমাকার হইল।"—(১৫ পৃঃ)

পদ্যাংশে অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহাতে মাইকেলকে অনুকরণের চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। ভাষা ও ছন্দ মন্দ নয়, তবে মাঝে মাঝে অহেতুক শব্দগুলিকে দুরূহ করিয়া তোলাতে কাব্যরস কিছুটা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। একাদশ পরিচ্ছেদে ক খখ গগ রূপে ছন্দের মিল করিয়া স্তবক-রচনা দৃষ্ট হয় এবং ইহা সুখপাঠ্য। চরিত্র-চিত্রণ মামুলী—বিশেষত্ব কিছু নাই। ঘটনার মধ্যে দেবগণের অংশগ্রহণ ও ঘটনাকে নিয়ন্ত্রণ সুন্দরভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। গদ্য এবং পদ্যের মিশ্রিত ব্যবহার ব্যতিরেকে কাব্যটিতে নূতনত্ব কিছু নাই।

সীতা-চরিত—কবি কৃষ্ণেন্দ্র রায় কর্ত্তৃক রচিত 'সীতা-চরিত' কাব্যটি ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কবি 'গ্রন্থ-রচনা' শিরোনামায় লিখিয়াছেন—

"... ... ... বালিকারা প্রাচীনাদিগের রচিত ব্রতকথা এবং কবিতাগুলি যদ্রূপ শিক্ষা করিতে সচেষ্টিতা, জ্ঞান না হওয়া কালতক অন্য গ্রন্থাদি শ্রবণে তদ্রূপ মনোযোগ করে না। তদ্ধেতু সুকোমল-মতি বালিকার হৃদয়-ক্ষেত্রে সুপবিত্র সীতা-বৃক্ষের বীজ বপন মানসে আমি বক্তা ও শ্রোতা

উভয়কেই নারী সাজাইয়া এই ক্ষুদ্রতম 'সীতা-চরিত' গ্রন্থখানি প্রণয়ন করিলাম। . ... . ”

গ্রন্থটি চারিটি পরিচ্ছেদে সমাপ্ত। প্রত্যেক পরিচ্ছেদে প্রথম সোপান, দ্বিতীয় সোপান রূপে বিভাগ আছে। সীতার জীবন-আলেখ্য ইহার বিষয়বস্তু।

প্রথম পরিচ্ছেদে ১৫টি সোপান রহিয়াছে এবং প্রারম্ভেই—

ওলো লো ভগিনি! অপূর্ব্ব কাহিনী—
সীতা-গুণ করি গান।
সম্পত্তি-শালিনী, হও ভিখারিণী,
শুনিলে জুড়াবে প্রাণ॥ —(১ পৃঃ)

শব্দের ঝঙ্কারে ও ভঙ্গিতে কবি রমণীসুলভ সুরটি প্রকাশ করিয়াছেন। এই পরিচ্ছেদে রামের হরধনু-ভঙ্গ ও সীতাকে বিবাহ হইতে হনুমান-কর্ত্তৃক সীতার অন্বেষণে লঙ্কায় উপস্থিতি পর্য্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে।

সীতার রূপের কথা শুনিয়া এবং তাঁহাকে হরণ করিবার বাসনা করিয়া রাবণ কিন্তু মনে মনে অজ্ঞাত আশঙ্কায় অভিভূত হইলেন।

অপূর্ব্ব প্রাসাদে, বসিয়ে একাকী,
চিন্তিতেছে লঙ্কেশ্বর।
কি জন্য বিষাদে, মন থাকি থাকি,
কাঁপিতেছে থর থর॥ —(২০ পৃঃ)

মূল রামায়ণ হইতে কবি এখানে বিচ্ছিন্ন হইয়াছেন।

আবার স্বর্ণ-মৃগের ব্যাকুল আহ্বানে লক্ষ্মণ রামের সাহায্যের জন্য যাইতে না চাহিলে সীতা তাঁহাকে তিরস্কার করিলেন—

ভরত লয়েছে রাজ্য, তুই করি মনে ধার্য্য
আমারে লভিতে আলি বনে।
ওরে পাপী হীনবীর্য্য! প্রাণে নাহি হয় সহ্য,
দূর হয়ে যারে অন্য স্থানে॥ —(২৮ পৃঃ)

এ-স্থলে বাল্মীকির রামায়ণের অনুকরণ লক্ষণীয়।

রাবণ-কর্ত্তৃক সীতা-হরণ বর্ণনা করিবার পূর্ব্বে কবি কহিতেছেন—

যখন যাহার দশা বামে হেলে যায়।
দূর্ব্বাবনে তারে দিদি! বাঘে ধরে খায়॥ —(৩০ পৃঃ)

এই উপমা ও ভঙ্গির মধ্যে পুনরায় মেয়েলি কথার ভঙ্গিটি ফুটিয়া উঠিয়াছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ত্রয়োদশ সোপানে বিভক্ত। ইহাতে অশোক-কাননে সীতার অবস্থা হইতে সীতার অগ্নিপরীক্ষা এবং রামচন্দ্র-কর্ত্তৃক রাবণ-বিজয় পর্য্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে। এখানেও যুদ্ধে যাইবার পূর্ব্বে মন্দোদরী রাবণকে যুদ্ধে যাইতে নিষেধ করিলে রাবণ কহিলেন—

সমস্তই আমি জানি, স্বয়ং বিষ্ণু রঘুমণি,
অবতার রাক্ষস বধিতে।
ওকথা কি আমি শুনি, রণেতে পশি এখনি,
ত্যজি দেহ যাইব স্বর্গেতে॥ —(৭৭ পৃঃ)

এই স্থলে দেখা যায় কবি কৃত্তিবাসের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া রাবণকে জ্ঞানী ও ভক্তরূপে অঙ্কিত করিয়াছেন। এই পরিচ্ছেদে কবি রামচন্দ্র-চরিত্রেরও দুইটি দিক্ ব্যক্ত করিয়াছেন। সীতা লক্ষ্মণকে চিতা জ্বালিতে আদেশ করিলে লক্ষ্মণ রামের অনুমতি চাহিলেন। রামচন্দ্র তাঁহাকে চিতা জ্বালিবার আদেশ দিলেন। কিন্তু সীতা অগ্নিতে প্রবেশ করিলে তিনি কাঁদিয়া আকুল হইলেন এবং মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। একদিকে কর্ত্তব্যে কঠোর এবং অপরদিকে প্রেমে কোমল রামচন্দ্রের চরিত্র অঙ্কিত করিতে গিয়া চরিত্রটি কিছুটা দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ছয়টি সোপানে বিভক্ত। শ্রীরামচন্দ্রের অযোধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তন হইতে লবকুশের হাতেখড়ি পর্য্যন্ত ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সীতার চরিত্রের অপূর্ব্ব মাধুর্য এই পরিচ্ছেদে ব্যক্ত হইয়াছে। অত দুঃখের মধ্যেও সীতা নিজের জন্য দুঃখিত নহেন—তাঁহার দুঃখ রামচন্দ্রের নিমিত্ত। তিনি কহিয়াছেন—

মম দুঃখ যত, ভাগ্যে লেখা ছিল,
হল, খেদ নাহি তায়।
আর্য্যের যে কত, দুর্দ্দশা হইল,
তাহা না পাসরি হায়!!! —(১০৫ পৃঃ)

চতুর্থ পরিচ্ছেদ তিনটি সোপানে বিভক্ত। রামরাজ্যের বর্ণনা হইতে সীতার ধরণীগর্ভে প্রবেশ পর্য্যন্ত ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। এ-স্থলেও রামচন্দ্র-হৃদয়ের দুইটি দিক্ প্রকাশিত হইয়াছে। রামচন্দ্র সীতাকে বনবাসে দিয়া অহরহ বিরহানলে দগ্ধ হইতেছিলেন কিন্তু বাহিরে কেহই তাঁহার এই দুঃখের অভিব্যক্তি দেখিতে পায় নাই—

সীতা বনে দিয়ে রাজ্য করিছেন রাম।
বিরহ-অনলে দগ্ধ হন অবিরাম॥
অশেষ গুণেতে তিনি পণ্ডিত যখন।
অসাধ্য কি আত্মভাব করিতে গোপন॥ —(১৫৬ পৃঃ)

কবি যে উদ্দেশ্য লইয়া গ্রন্থটি রচনা করিয়াছেন তাহা কিছু পরিমাণে সার্থক হইয়াছে। কাব্যটি সহজ ও সরল ভাষায় রচিত—শিশুপাঠ্যের উপযোগী—কোথাও জটিলতা বা দুরূহতা নাই। কোন অবান্তর বর্ণনা বা ঘটনা নাই—কেবল সীতার জীবনের সমস্ত ঘটনাগুলি নানা ছন্দের ভিতর দিয়া সুললিতভাবে অভিব্যক্ত হইয়াছে। কোন কোন সোপানের প্রারম্ভে মেয়েলি কথার সুর দিয়া কবি ইহাকে মহিলা-কবি-কর্ত্তৃক রচিত মনে করাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন। কোন কোন স্থানে রমণী-চরিত্রের দোষ-গুণের বিচার করিয়াছেন। কিন্তু কোথাও তাহা অসঙ্গত হয় নাই বা মাত্রা ছাড়াইয়া যায় নাই। বর্ণিত কোন চরিত্রও ক্ষুণ্ণ হয় নাই। এক কথায় বলা চলে যে এই কাব্যে কবির উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে।

২

তিলোত্তমাসম্ভব-কাব্য—মাইকেল মধুসূদন দত্ত রচিত 'তিলোত্তমাসম্ভব' কাব্যের ১ম ও ২য় সর্গ প্রথমে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের 'বিবিধার্থ সংগ্রহে' ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে জুলাই ও আগষ্ট মাসে প্রকাশিত হয়। ইহাতে কবির নাম ছিল না। তারপর ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে ব্যাপ্টিষ্ট মিশন প্রেস হইতে ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

এই কাব্যেই সর্ব্ব প্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহৃত হইয়া বাংলা

কাব্য-সাহিত্যে যুগান্তরের সূত্রপাত করে এবং পরে ‘মেঘনাদবধ-কাব্যে’ ও 'বীরাঙ্গনা-কাব্যে’ তাহা সমৃদ্ধতর ও সুন্দরতর-রূপে আত্মপ্রকাশ করে। প্রথম সংস্করণের ‘মঙ্গলাচরণে’ কবি যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরকে উদ্দেশ করিয়া লেখেন—"...যে ছন্দোবন্ধে এই কাব্য প্রণীত হইল, তদ্বিষয়ে আমার কোন কথাই বলা বাহুল্য; কেন না এরূপ পরীক্ষা-বৃক্ষের ফল সদ্যঃ পরিণত হয় না। তথাপি আমার বিলক্ষণ প্রতীতি হইতেছে যে, এমন কোন সময় অবশ্যই উপস্থিত হইবেক, যখন এদেশে সর্ব্ব সাধারণ জনগণ ভগবতী বাগ্দেবীর চরণ হইতে মিত্রাক্ষরস্বরূপ নিগড় ভগ্ন দেখিয়া চরিতার্থ হইবেন।" কাব্যটির বিশেষত্ব এইখানেই।

ইংরাজী শিক্ষার ফলে মাইকেলের মনে ‘Epicling’ লিখিবার বাসনা জাগে এবং অমিত্রাক্ষর ছন্দ রচনার প্রচেষ্টার সহিত এই নব ধারার সূচনাও তাঁহার ‘তিলোত্তমাসম্ভব-কাব্যে’ প্রথম দৃষ্ট হয়। কাব্যে হোমর, কীট্স্, শেলী প্রভৃতি বিদেশী কবিগণের প্রভাব যেমন দৃষ্ট হয়—সেরূপ কালিদাস ও সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাবও কিছু দেখা যায়। ব্রহ্মার চরিত্রে Zeus এবং বিশ্বকর্ম্মার চরিত্রে Hepaistos চরিত্রের প্রভাব লক্ষিত হয়। কবির নিদ্রাদেবী, স্বপ্নদেবী, দেবদূতী ও দৈববাণীর পরিকল্পনা গ্রীক্ সাহিত্যের দেব-দেবীগণকে স্মরণ করাইয়া দেয়।

কাব্যটিতে চারিটি সর্গ আছে। ইহাতে পুরাতন রীতির অনুকরণে প্রতি সর্গের শেষে সর্গে বর্ণিত ঘটনার সংক্ষেপে নামকরণ রহিয়াছে; যেমন প্রথম সর্গের শেষে—

"ইতি শ্রীতিলোত্তমাসম্ভবে কাব্যে ধবল-শিখরো নাম প্রথমঃ সর্গঃ।"

প্রথম সর্গ—প্রথমে ধবলগিরির বর্ণনাটি অতি সুন্দর।

ধবল নামেতে গিরি হিমাদ্রির শিরে—
অভ্রভেদী, দেব-আত্মা, ভীষণ-দর্শন;
সতত ধবলাকৃতি, অচল, অটল;
যেন উর্দ্ধবাহু সদা, শুভ্রবেশধারী,
নিমগ্ন তপঃসাগরে ব্যোমকেশ শূলী—
যোগিকুল ধ্যেয় যোগ্য। —(১ পৃঃ)

তারপর কবি দেবী বীণাপাণির কৃপাভিক্ষা করিয়া কাহিনী আরম্ভ করিয়াছেন। সুন্দ-উপসুন্দ নামক দৈত্যের নিকট পরাজিত হইয়া ইন্দ্র ঐ ধবলগিরির উপর আসীন। নিদ্রাদেবী তাঁহার নিকট যাইতে সাহস না করিয়া স্বপ্নদেবীকে ভার দিলে স্বপ্নদেবী ইন্দ্রাণীকে আনয়ন করেন। দেবরাজ ইন্দ্রাণীর নিকট দেবগণের অনুরোধ শ্রবণ করিয়া ইন্দ্রাণীর সহিত ব্রহ্মলোকে যাইবার জন্য যাত্রা করিলেন।

দ্বিতীয় সর্গ—কবি এই সর্গের প্রথমে পুনরায় বীণাপাণির শরণ লইয়াছেন। তারপর দেবরাজ শচীদেবীর সহিত ব্রহ্মলোকে যাইবার পথে চন্দ্রলোক, সূর্য্যলোক প্রভৃতি পশ্চাতে ফেলিয়া ব্রহ্মলোকে উপস্থিত হইলেন। সেখানে দেবতাগণের মধ্যে তাঁহাদের দুর্ভাগ্যের কথা লইয়া আলোচনা চলিল। এই আলোচনার মধ্যে প্রতি দেবতার চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হইয়াছে।

কার্ত্তিক বিধাতার বিধান মানিয়া লইবার পক্ষে যুক্তি দিলেন, আর বরুণদেব সকলকে বিধাতার নিকট যাইতে পরামর্শ দান করিলেন। সকলে সেই প্রস্তাব সমর্থন করিলে দেবরাজ চিত্ররথ নামক গন্ধর্ব্বকে আহ্বান করিয়া নারীগণকে রক্ষার ভার দিলেন এবং সকলে ব্রহ্মার উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন।

তৃতীয় সর্গ—দেবগণ সমভিব্যাহারে ইন্দ্র ভক্তি ও আরাধনা দেবীকে স্তবে তুষ্ট করিয়া তাঁহাদের সহায়তায় ব্রহ্মার নিকট গেলেন এবং দেবগণের বিপদের বার্ত্তা জানাইলেন। ব্রহ্মা কহিলেন—

> …ভ্রাতৃভেদ ভিন্ন অন্য পথ নাহি
> নিবারিতে এ দানবদ্বয়ে।…

ভ্রাতৃভেদের উপায় স্থির করিবার জন্য দেবগণের মধ্যে পুরনায় আলোচনা চলিল এবং সেই সময় দৈববাণীতে তাঁহারা বিধাতার আদেশ পাইলেন যে বিশ্বের সমস্ত জিনিষ হইতে তিল তিল সৌন্দর্য্য লইয়া রমণীমূর্ত্তি সৃষ্টি করিয়া দানবের নিকট পাঠাইলে তাঁহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। ইন্দ্র প্রভঞ্জনকে বিশ্বকর্ম্মার নিকট প্রেরণ করিলেন। প্রভঞ্জন পথে যমপুরী এবং তথায় পাপিগণের যন্ত্রণার দৃশ্য দেখিলেন। দেবরাজের আদেশে বিশ্বকর্ম্মা যে রমণীমূর্ত্তি সৃষ্টি করিলেন তাহার বর্ণনা কবি স্বল্প কথায় সুন্দরভাবে পরিস্ফুট করিয়াছেন।

চতুর্থ সর্গ—বিন্ধ্যগিরিতে ঋতুরাজের সহিত তিলোত্তমাকে দানবগণের উদ্যানে পাঠাইয়া দেবগণ অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। এস্থলে তিলোত্তমার গমন কবি সুন্দরভাবে বর্ণনা করিয়া গীতিকাব্যের সুর ঝঙ্কৃত করিয়াছেন।

সুন্দ-উপসুন্দ অপূর্ব্ব রূপলাবণ্যময়ী রমণী দেখিয়া প্রথমে তাঁহাকে ভগবতী মনে করিলেন। কিন্তু মদনদেবের শরে জর্জ্জরিত হইয়া আপন আপন রমণী বলিয়া তাঁহাদের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইল এবং পরস্পরে যুদ্ধ করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। মদনদেব বিজয়-শঙ্খ বাজাইলে দেবগণ দানবগণকে বধ কারতে করিতে সুন্দ-উপসুন্দের মৃতদেহের নিকট গেলেন এবং সম্মানের সহিত দানবদ্বয়ের দাহকার্য্য সম্পন্ন করিলেন। তাঁহাদের মহিষীগণ সহমৃতা হইলেন। ইন্দ্র তিলোত্তমাকে সূর্য্যলোকে ইন্দিরার নিকট থাকিবার আদেশ দিলেন।

তিলোত্তমাসম্ভব-কাব্যে স্থান ও কালের বর্ণনার মধ্যে মহাকাব্যোচিত বিস্তৃতি ও গাম্ভীর্য্য বর্ত্তমান। তাহার তুলনায় আখ্যানবস্তু অকিঞ্চিৎকর হইয়া গিয়াছে। এইজন্য কাব্যের সুরে সর্ব্বত্র সমতা রক্ষিত হয় নাই। স্থানে স্থানে লিরিক কাব্যের ন্যায় ভাবাবেগও কাব্যরসকে ক্ষুণ্ণ করিয়াছে। তথাপি পৌরাণিক আখ্যায়িকা-কাব্য-ধারার মধ্যে ইহা নূতনত্ব আনিতে সমর্থ হইয়াছে। পূর্ব্বেকার পৌরাণিক আখ্যায়িকা-কাব্যে দেবদেবীর মহিমাই কীর্ত্তিত হইয়াছে এবং লেখকগণের এই উদ্দেশ্য সুস্পষ্টভাবে কাব্যে প্রচারিত হইয়াছে। এই কাব্যে তাহার ব্যতিক্রম লক্ষণীয়। ঘটনার পরিণতির মধ্যে দেবমহিমাই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে সত্য কিন্তু তাহা দ্বারা কবি-মানসের আগ্রহ পরিস্ফুট হয় নাই। বরঞ্চ লেখকের সৌন্দর্য্যপিপাসু মনের অভিব্যক্তি স্থানে স্থানে প্রকাশিত হইয়া নূতন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় বহন করিতেছে। কাহিনী-নির্ব্বাচন ও তিলোত্তমার সৌন্দর্য্য-বর্ণনার মধ্যে কবি-মানসের এই দিকৃটি পরিস্ফুট।

তিলোত্তমাসম্ভব-কাব্যের অভিনবত্ব ছন্দে। ইহাই প্রথম নিয়ম-তান্ত্রিকতার গণ্ডি হইতে মুক্তির বার্ত্তা আনিয়াছে। নূতনত্বের অপরিপক্বতা ছন্দের মধ্যে স্থানে স্থানে শৈথিল্য আনয়ন করিয়াছে সত্য এবং নূতন শব্দ-সৃষ্টিও সর্ব্বত্র সার্থক হয় নাই—তবু বাংলা আখ্যায়িকা-কাব্য-ক্ষেত্রে ইহার মূল্য অনস্বীকার্য্য।

রাজা হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান—দ্বারিকানাথ চন্দ্র রচিত 'রাজা হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান' কাব্যটি ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থশেষে কবি নিজ পরিচয় দিয়াছেন—

কলিকাতা আহিরীটোলা হয় মম ধাম।
বণিক কুলেতে জন্ম দ্বারিকানাথ নাম॥

সমগ্র পরিচ্ছেদের শেষেই কবির ভণিতা আছে। মুনি-কর্ত্তৃক জন্মেজয়কে গল্প বলিবার মধ্য দিয়া কাহিনীটি উক্ত হইয়াছে।

পাঁচটি অপ্সরী কন্যাকে মুক্ত করিয়া রাজা হরিশ্চন্দ্র বিশ্বামিত্রের নিকট অপরাধী হন এবং নিজের রাজ্য দান করিয়া এবং সস্ত্রীক নিজেকে বিক্রয় করিয়া অষ্ট কোটি হেম মুদ্রা দক্ষিণা-স্বরূপ দিয়া তিনি বিশ্বামিত্রের নিকট মুক্তিলাভ করেন। পুত্র রুহিদাসের সর্পদংশনে মৃত্যু হইলে তিনি প্রাণত্যাগ করিতে উদ্যত হন এবং কৃষ্ণের কৃপায় পুত্রকে ফিরিয়া পান। বিশ্বামিত্র হরিশ্চন্দ্রের দানে ও ত্যাগে মুগ্ধ হইয়া রাজ্য প্রত্যর্পণ করেন। রাজা অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া, পুত্রকে রাজ্য দিয়া সশরীরে প্রজামণ্ডলীসহ স্বর্গে যাইবার পথে ইন্দ্রের কৌশলে মধ্যপথে রহিয়া যান।

কাব্যের মধ্যে কোন বিশেষত্ব নাই। কাহিনী সহজভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। কোথাও কবিত্বের স্ফূরণ নাই। কাব্যটি একেবারেই ব্যর্থ রচনা।

সাবিত্রীচরিত-কাব্য—ভোলানাথ চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক রচিত 'সাবিত্রী-চরিত' কাব্যটি ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

সাবিত্রীর কাহিনী এই কাব্যের প্রতিপাদ্য বিষয়। ইহাতে কাহিনী-অংশ সহজভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। কোথাও কোন জটিলতা নাই বা তত্ত্বব্যাখ্যা নাই। তবে স্থানে স্থানে বর্ণনা-বাহুল্য কাব্যটির রসধারাকে ক্ষুণ্ণ করিয়াছে; যেমন—তপোবনের বর্ণনা, রাত্রির বর্ণনা, বিদায়কালীন শোক-বর্ণনা প্রভৃতি।

কাব্যটিতে রাজারাণীর বাৎসল্য—সখীর প্রীতি—ঋষি ও ঋষিপত্নীর স্নিগ্ধ মধুর স্নেহ মাধুর্য্য দান করিয়াছে। সাবিত্রী ও সত্যবানের মধ্যে প্রণয় স্বল্প সরল কথার ভিতর দিয়া সুন্দররূপে ব্যক্ত হইয়াছে। চরিত্রগুলি কোথাও ক্ষুণ্ণ হয় নাই। সাবিত্রী-চরিত্রের কোমলতা ও দৃঢ়তা, নম্রতা ও পবিত্রতা,

সাহসিকতা ও শক্তিমত্তা কাব্যটিকে রস-সমৃদ্ধ করিয়াছে। শ্বশ্রূকুটীরে আসিয়া ভক্তিমতী সাবিত্রী—

ক্ষণ পরে ত্যজি সতী সুনীল বসন,
কোমল শরীরে করে বাকল ধারণ।
রত্ন অলঙ্কার বালা খুলি অনাদরে,
কুশের বলয় পরে সুবলিত করে। —(১১৭ পৃঃ)

যমরাজের বর্ণনাটিও সুন্দর—

বিকট-শরীর-জ্যোতিঃ ধূমল-বরণ,
রক্তবাস-পরিধান, লোহিত-লোচন,
বক্রশির, দীর্ঘ দন্ত, মুখে অট্টহাস,
অপসব্যে ঘোর দণ্ড, বাম করে পাশ,
ভীষণ পুরুষ হেন পাশে উপনীত,
নিরখি সতীর ভয়ে হৃদয় কম্পিত। —(১৩৭ পৃঃ)

কাব্যের শেষে সত্যবানের স্বপ্ন-কাহিনী বিবৃতির মধ্য দিয়া সাবিত্রীর সহিত যমের কথোপকথনগুলি ব্যক্ত হওয়াতে কাব্যের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে।

কাব্যটিতে সাতটি সর্গ রহিয়াছে। সম্পূর্ণ গ্রন্থটিই পয়ার ছন্দে রচিত। ভাষা সহজ ও সাবলীল।

নিবাতকবচবধ-কাব্য—মহেশচন্দ্র তর্কচূড়ামণি রচিত 'নিবাতকবচবধ' কাব্যটির প্রথম সংস্করণ ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় এবং দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত হয়। প্রথম সংস্করণ অপেক্ষা দ্বিতীয় সংস্করণে চারিটি সর্গ বর্দ্ধিত হইয়াছে এবং উর্ব্বশীর শাপাংশ স্থানলাভ করিয়াছে। কবি কাব্যরচনায় সংস্কৃতরীতিকে অনুসরণ করিয়া নূতনত্ব আনিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। 'বিজ্ঞাপন' অংশে কবি লিখিয়াছেন—

"সংস্কৃত মহাকাব্যের লক্ষণানুসারে আমি এই কাব্যখানি প্রণয়ন করিলাম। যদিও ইহার ভাষা সংস্কৃত নহে বটে, তথাপি ঐ লক্ষণের লক্ষ্য অন্যান্য পদার্থ প্রায়ই ইহাতে লক্ষিত হইতে পারে।"

সমসাময়িক পত্রিকাগুলি ও বিদ্বজ্জনমণ্ডল কাব্যটি সম্বন্ধে প্রভূত

সমালোচনা করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের কিয়দংশ কাব্যের প্রারম্ভে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

মহাভারতের বন-পর্ব্বের অন্তর্গত ইন্দ্রের আহ্বানে অর্জ্জুনের স্বর্গে গমন—দেব-অস্ত্রাদির শিক্ষা ও প্রাপ্তি—উর্ব্বশীর অভিশাপ—নিবাতকবচ-দৈত্যগণকে বধ—এই কাব্যের বিষয়ীভূত।

গ্রন্থারম্ভে 'দুর্জ্জন ও সুজন' অংশে দুর্জ্জনের খল-স্বভাবের এবং সুজনের পরগুণগ্রাহিতার বর্ণনা করিয়াছেন। তারপর প্রথম সর্গে সরস্বতী-বন্দনায়—

যোগ্য পাত্র নহি বর মাগিব কেমনে,
দীনের মনের বাঞ্ছা রহিল সে মনে।
নূপুর হইয়া তবু লাগিনু চরণে,
অবশ্য হইব পাত্র ধূলি পরশনে।
দৃষ্টিমান্ অন্ধ হয় সামান্য ধূলিতে,
তব পদধূলি পারে দিব্য দৃষ্টি দিতে।
অভিষিঞ্চ জননি! কারুণ্য রস পূর,
প্ররূঢ় হউক মোর প্রতিভা অঙ্কুর॥ —(৫ পৃঃ)

এই বন্দনার মধ্যে একটু নূতন ভাবের প্রকাশ দেখা যায়।

বৃদ্ধের ছদ্মবেশে ইন্দ্রের রূপটিও কবি দক্ষতার সহিত বর্ণনা করিয়াছেন—

শ্মশ্রুতে হৃদয় ঢাকা তবু খোলা মন,
জরাতে অবশ অঙ্গ তবু বশী হন।
ক্ষীণপ্রায় দৃষ্টি তবু দেখে অবিকল,
ভূত ভব্য বর্ত্তমান বিষয় সকল॥
সূর্য্যের আলোক যেন দীপ্তিতে ঢাকিয়ে
পদে পদে ধরা যেন পবিত্র করিয়ে। —(৭ পৃঃ)

গ্রহগণের বর্ণনা ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যও সুন্দরভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। কামদেবের বর্ণনাটি মনোরম—

কোমল ইহার তনু কুসুম ইহার ধনু
অলিমালা ধনুর্গুণ পুষ্পগুলি তীর।

ভানুমতী পতিব্রতা ও পরদুঃখে কাতরা। অভিমন্যুর বধের সংবাদে ভানুমতী দুঃখিত-চিত্তে পতিকার্য্যের নিন্দা করিয়া পঞ্চ ভ্রাতার সহিত তাঁহাকে সদ্‌ভাব স্থাপন করিতে অনুরোধ জানাইলেন। দুর্য্যোধন ইহার জন্য তাঁহাকে তিরস্কার করিলেন এবং তাঁহার প্রতিজ্ঞা টলিবার নহে কহিলে পরও ভানুমতী তাঁহার চরণ ধরিয়া কহিলেন—

লক্ষ পরিবার দুঃখে করি নিমজ্জন,
লক্ষ গ্রাম করি ধ্বংস,
নাশিয়া আপন বংশ
কি পুণ্য করিবে নাথ তুমি উপার্জ্জন?

... ...

এ ঘোর নিধন ব্রত কর পরিহার।
পুরিল পাপের ভরা,
রক্তে রক্তময় ধরা,
হাহাকারে পূর্ণ আজি হল চারিধার। —(৫৩-৫৪ পৃঃ)

দুর্য্যোধনের আদেশে পঞ্চপাণ্ডবের মস্তক আনিবার জন্য সৈন্যগণসহ অশ্বত্থামার গমন কবি অতি নিপুণভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন এবং বিনাযুদ্ধে শত্রু-নিধন করাতে সকলের মনেই খেদ ও দুঃখের প্রকাশে তাঁহাদের বীর-হৃদয়ের পরিচয় দিয়া কাব্যকে শ্রীদান করিয়াছেন।

অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধে দ্রোণাচার্য্যের পতনের কারণ কবি দেখাইয়াছেন যে দ্রোণাচার্য্যের মনে হইয়াছিল সাহায্যের জন্য তাঁহার পুত্র তাঁহাকে আহ্বান করিতেছেন। ইহাতে তিনি অন্যমনস্ক হইয়া পড়েন এবং সেই অসতর্ক মুহূর্ত্তে তাঁহার পরাজয় ও মৃত্যু ঘটে। তাঁহার মৃত্যুর জন্য যুধিষ্ঠিরকে মিথ্যা বলান হয় নাই। যুধিষ্ঠির-চরিত্র নিষ্পাপ রহিয়া গেল। মহাভারতকে কবি এ ক্ষেত্রে অনুসরণ করেন নাই। জয়দ্রথ-বধেও শ্রীকৃষ্ণকে কোন কৌশল করিতে হয় নাই—অর্জ্জুনই তাঁহাকে বধ করেন।

গদাযুদ্ধে দুর্য্যোধন আহত হইলে তাঁহাকে দিয়াও কবি যেমন নিজ দুষ্কর্ম্মের জন্য অনুতাপ করাইয়াছেন ও যুধিষ্ঠির প্রভৃতির নিকট ক্ষমা ভিক্ষা

করাইয়াছেন সেরূপ ভীমসেন দ্বারাও তাঁহার উরুতে আঘাতের অপরাধে ক্ষমা প্রার্থনা করাইয়াছেন।

ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, কুন্তী প্রভৃতি কাশীধামে প্রাণত্যাগ করিলে এবং যদুবংশ ধ্বংস হইলে পাণ্ডবেরা মহাপ্রস্থানের পথে যাত্রা করেন। সঞ্জয়ও তাঁহাদের সঙ্গী হইয়াছিলেন। কিছুদূর গিয়া তাঁহারা সঞ্জয়কে ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ দেখাইতে বলিলে সঞ্জয় কহিলেন --

দেখ দেখ দেব ! পঞ্চনদ দেশ
গেল গেল রসাতল।
এক হস্তে অসি, অন্য হস্তে পুঁথি
দানবের দল ধায়। —(২১৭ পৃঃ)

এবং আর্য্যগণ তাঁহাদেরই পদলেহন করিতেছেন দেখিয়া পাণ্ডবেরা শিহরিয়া উঠিলেন। পরে ভারত-লক্ষ্মীর বিষণ্ণ মূর্ত্তি তাঁহাদের চিত্তকে ব্যথিত করিল। তাঁহারা পুনরায় হিন্দুর অভ্যুত্থানের দিন দেখিতে চাহিলে, সঞ্জয় দূরে ক্ষীণ আলোরেখা দেখাইলেন। এ স্থানে কবির দেশাত্মবোধ আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। কাব্যটির মধ্যে একটা দেশাত্মবোধের ব্যঞ্জনা, প্রাচীন গৌরব-কাহিনীর মধ্যে জাতীয়-জীবনের সার্থকতার সন্ধান এবং পরিশেষে ভবিষ্যতের প্রতি ইঙ্গিত পৌরাণিক কাব্য-কাহিনীর ক্ষেত্রে নূতনত্বের সূচনা করে। লেখকের আবেগ-অনুভূতি কাব্যটির স্থানে স্থানে লিরিকের সুর ধ্বনিত করে এবং লেখকের বর্ণিত বিষয় কেবলমাত্র কাহিনীর মধ্যেই নিঃশেষিত না হইয়া সুন্দর গৌরবান্বিত জীবনের জন্য অব্যক্ত বেদনায় অনুরণিত হইতে থাকে।

কাব্যটিতে ঘটনা-বিন্যাস ও চরিত্র-চিত্রণে কবির কৃতিত্ব লক্ষিত হয়। চরিত্রগুলি কোথাও ক্ষুণ্ণ হয় নাই। কয়েকটি চরিত্র জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। বিভিন্ন ছন্দ ব্যবহার করিতে গিয়া কবি স্থানে স্থানে মাত্রার সাম্য বা শব্দের গাম্ভীর্য্য বজায় রাখিতে পারেন নাই। তথাপি স্থানে স্থানে কবিত্বশক্তি ও কল্পনার স্ফুরণে কাব্যটি সমৃদ্ধ। ভাষাও দুরূহ নয় এবং স্থানে স্থানে ভাব-গভীর। এক কথায় কাব্যটিকে সুখপাঠ্য বলা চলে এবং আখ্যায়িকা-কাব্যের ক্ষেত্রে কিছু পরিমাণে সার্থকতা লাভ করিতে পারিয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

নৈশকামিনী-কাব্য—বিপিনবিহারী দে কর্তৃক রচিত 'নৈশকামিনী-কাব্য'-টি ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ইহাতে দণ্ডীরাজা ও উর্ব্বশীর উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে। 'দণ্ডীপর্ব্ব' কাব্যটি অপেক্ষা ইহার কাহিনী-ভাগ বিস্তৃততর ও বর্ণনাবহুল।

প্রথমে কবি বাণী-বন্দনা করিয়াছেন ও তাঁহার নিকট করুণা-ভিক্ষা করিয়াছেন—

বর্ণিব 'নৈশকামিনী' ভাবিয়াছি মনে।
পড়িয়া বিষম দায়—
ডাকিতেছি মা তোমায়,
তোমার করুণা বিনা হইবে কেমনে ?

স্থানে স্থানে কবির বর্ণনা উপভোগ্য। কবি তুরঙ্গীর বর্ণনা করিয়াছেন—

বিরাজে অপূর্ব্ব প্রভা বদনে তাহার।
যেন কত অনাদরে
শচীকণ্ঠ ত্যাগ করে
বিলুণ্ঠিত বনমাঝে পারিজাত হার॥ —(৫ পৃঃ)

মুগ্ধ দণ্ডীকে প্রণয়পথ হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য উর্ব্বশী বলিতেছেন—

থাকিলে দূরেতে সদা দেখিবে নবীন,
ছুঁয়োনাক ভালবাসা হইবে মলিন। —(২৯ পৃঃ)

দণ্ডী ও উর্ব্বশীর মধ্যে প্রণয়ের গভীরতা স্থানে স্থানে কবি অঙ্কিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাহার মধ্যেই প্রণয়ে নিজ ব্যর্থতার কথাও তিনি ব্যক্ত করিয়াছেন, কিন্তু তাহা কাব্যকে ক্ষুণ্ণ করিয়াছে। অবশেষে উর্ব্বশী শাপমুক্ত হইলে কবি নারী-প্রেমকে উর্ব্বশীর মুখ দিয়াই নিন্দিত করিয়াছেন—

জান না কি সখে ক্রূরা নারী জাতি
অন্তরে গরল মুখেতে মধু ?
আপনার ইষ্ট করিতে সাধন
পুরুষেরে বলে পরাণ বঁধু॥ —(১২৫ পৃঃ)

অথচ কিছু পূর্ব্বে এই উর্ব্বশীকে দিয়াই কবি দণ্ডীর প্রাণত্যাগের বাসনায় প্রাণত্যাগ করিতে উদ্যত দেখাইয়াছিলেন।

কাব্যটির মধ্যে স্থানে স্থানে প্রাকৃতিক বর্ণনাও রহিয়াছে।

কাব্যের দণ্ডী প্রেমিক ও দৃঢ়চেতারূপে অঙ্কিত হইয়াছেন। ভীমের প্রতিজ্ঞা ও স্বকর্ম্মে দৃঢ়তা মুগ্ধকর। শ্রীকৃষ্ণের ভক্তবৎসল রূপটি সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু জগদম্বা-কর্তৃক মহাদেবকে তিরস্কার ঠিক যেন গ্রহণ করা যায় না। যিনি সতী-শিরোমণি—স্বামীর ব্যর্থতায় তিনি পতিকে তিরস্কার করিবেন—ইহা যেন তাঁহার মহিমাকে ক্ষুণ্ণ করে। উর্ব্বশী-চরিত্র কিছু লঘু হইয়া পড়িয়াছে—স্বর্গের নর্ত্তকী হইলেও ইহা অধিকতর গাম্ভীর্য্য-মণ্ডিত হইলে ভাল হইত।

কাহিনী-বিন্যাসের ক্ষেত্রে বা চরিত্র-চিত্রণে কোথাও কোন নূতনত্বের পরিচয় নাই। তবে কাহিনীর অতিরিক্ত একটি ব্যঞ্জনা রহিয়াছে যাহা দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মধ্যে চিরন্তন সত্যের প্রতি ইঙ্গিত করে। কাব্যটির রচনা সর্ব্বত্র সার্থক ও সুন্দর না হইলেও এবং স্থানে স্থানে কবির স্ব-জীবনের কাহিনী চিত্রিত হইলেও কাব্যটি সুখপাঠ্য।

কাব্যটি চতুর্দ্দশ স্তবকে সমাপ্ত। ইহাতে চৌপদী ও ত্রিপদী ছন্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। ভাষা দুরূহ নহে।

দণ্ডী-উপাখ্যান—ভণিতায় কবির নাম 'উমাকান্ত' পাওয়া যায়।

ভণে কবি উমাকান্তঃ নারদ না হয় ভ্রান্তঃ
মন শান্ত ভাবে কৃষ্ণনাম ॥ —(২৯ পৃঃ)

পুস্তকটি খণ্ডিত। তাই কবির সম্পূর্ণ নাম ও পুস্তক-প্রকাশের সময় জানা যায় না। ভূমিকায় কবি গ্রন্থ-রচনার কারণ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

শ্রীযুত নৃসীংদাস তনয় তাহার।
সর্ব্বগুণ বোদ্ধা সুর পুত্র কমলার ॥
তাঁহার আদেশে পাঠ করিয়া পুরাণ।
দেখাইলা শরণা হইতে পরিত্রাণ ॥
প্রণয়ে কহিলা মোরে অনুগ্রহ করি।
রচিতে কবিতা কোমলন হরি ॥
... ...

মূলার্থ সংগ্রহ করি কহিলা আভাষ।
আমি নানা ছন্দে ভাষা করিনু বিন্যাশ॥
উপদেষ্ঠ উপদেশে করিনু বচন।
পুরাণস্ত সাতিভাষা দণ্ডী উপাক্ষণ॥ —(৫-৬ পৃঃ)

শুকমুনি জন্মেজয়কে গল্প বলিতেছেন। দুর্ব্বাসার শাপে উর্ব্বশীর তুরঙ্গিণী-রূপে অরণ্যে ভ্রমণ দণ্ডীরাজ-কর্ত্তৃক তাঁহাকে গৃহে আনয়ন—নারদ-কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণকে সংবাদ-দান এবং শ্রীকৃষ্ণ-কর্ত্তৃক তুরঙ্গিণী প্রার্থনা—দণ্ডীর অসম্মতি, আশ্রয়ের নিমিত্ত সকল স্থানে গমন ও ব্যর্থতা—ভীমসেন-কর্ত্তৃক আশ্রয়দান—শ্রীকৃষ্ণের সহিত পাণ্ডবগণের যুদ্ধ—পাণ্ডবগণের গৌরব-বৃদ্ধি—যুদ্ধক্ষেত্রে দেবগণের আগমন ও অষ্টবজ্রের মিলন—উর্ব্বশীর শাপমুক্তি—কাব্যের বর্ণিত বিষয়।

নারদমুনি-কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের সহিত রমণী লইয়া কৌতুকের অবতারণা দেব-চরিত্র ক্ষুণ্ণ করিয়াছে। আবার পার্ব্বতীর মহাদেবকে তিরস্কারও দেব-মহিমাকে হীন করিয়াছে। চরিত্র-চিত্রণে কবি দক্ষতা প্রদর্শন করিতে সমর্থ হন নাই।

প্রণয়-সম্বন্ধে কবি উর্ব্বশীর মুখ দিয়া কহাইয়াছেন—

পিরিতের এই রিত শুন মহাশয়।
দেখিলাম অনেকে হে শেষ নাহি রয়॥
পুরুষে বিচ্ছেদ করে কখন বা নারী।
এরা যদি নাহি করে তবে দেবে অরি।
কোনরূপে পিরিতি সুস্থির নাহি রয়।
যেন পদ্মপত্রে বারি লিপ্ত নাহি হয়॥ —(১৭৬ পৃঃ)

গ্রন্থটি ত্রিপদী ও পয়ার ছন্দে রচিত। ইহার রচনায় প্রাচীন রীতির অনুসরণ দেখা যায়। কাব্যটিকে সার্থক রচনা বলা চলে না।

রৈবতক, কুরুক্ষেত্র, প্রভাস—কবি নবীনচন্দ্র সেন রচিত 'রৈবতক' কাব্যটি ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে, 'কুরুক্ষেত্র' কাব্যটি ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে এবং 'প্রভাস' কাব্যটি ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই কাব্যত্রয়-সম্বন্ধে কবি নিজে লিখিয়াছেন—"রৈবতক কাব্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আদিলীলা, কুরুক্ষেত্র কাব্য

মধ্যলীলা এবং প্রভাস কাব্য অন্তিমলীলা লইয়া রচিত। রৈবতকে কাব্যের উন্মেষ কুরুক্ষেত্রে বিকাশ এবং প্রভাসে শেষ।”

রাজগৃহে কার্য্যোপলক্ষে অবস্থানকালে কবির মন মহাভারতের নানারূপ স্মৃতি দ্বারা উদ্বেলিত হইয়া উঠে। তিনি পুনরায় মহাভারত পাঠ করেন এবং সেখানে অবস্থানকালেই রৈবতকের প্রথমাংশ রচনা শেষ করেন।

মহাভারত-কাহিনী এবং গীতার দর্শনবাদের নূতনতর ব্যাখ্যা দিয়া কবি একটি মহাকাব্য রচনা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কবির সে প্রয়াস সর্ব্বাংশে সার্থক না হইলেও প্রেম-ভক্তি-জ্ঞানের যে প্রস্রবণধারা কবি এই কাব্যত্রয়ে প্রবাহিত করিয়াছেন তাহা অভিনব। কোঁতের মানবতাবাদ, গীতার নিষ্কাম-কর্ম্মবাদ এবং বৈষ্ণবের ভক্তি ও প্রেমের উজ্জ্বল ধারায় কাব্যত্রয় রসমধুর হইয়া উঠিয়াছে।

এই কাব্যত্রয়ীর মধ্যে একটা সমন্বয়ের সুরও ধ্বনিত হইয়াছে। বিভিন্ন মতবাদ, বিভিন্ন কর্ম্মপথ, বিভিন্ন প্রকৃতি এক বিরাট ভক্তিরসস্রোতে মিলিত হইয়া সার্থকতা খুঁজিয়া পাইয়াছে। প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের সাংস্কৃতিক সংঘর্ষের ফলে যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছিল এবং যে ভাবস্থিতির পথ অনুসন্ধান করা হইতেছিল লেখক যেন এই কাব্যত্রয়ীর মধ্য দিয়া তাহারই ইঙ্গিত দিতে চাহিয়াছেন। হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থানের জন্য তখনকার মনীষিগণ যে চেষ্টা করিয়াছিলেন সেই চেষ্টারই এক কাব্যিক রূপ ইহার মধ্যে পরিস্ফুট। তাই নূতন ও পুরাতনের মিলনের মধ্য দিয়া একটি গভীর ব্যঞ্জনা কাব্যগুলির মধ্যে লক্ষণীয়।

কাব্যত্রয়ের নায়ক শ্রীকৃষ্ণ। রৈবতকে তাঁহার পরিকল্পনার উন্মেষ ও ভিত্তি-স্থাপন, কুরুক্ষেত্রে কর্ম্মের মধ্যে পরিকল্পনার প্রতিষ্ঠা এবং প্রভাসে তাহার পরিণতি।

রৈবতক-কাব্যটি বিশটি সর্গে সমাপ্ত। ইহাতে প্রথমেই আমরা দেখিতে পাই—শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন জলধির অনন্তরূপে মগ্ন। উভয়ে নীরব। নানারূপ তত্ত্বের সন্ধান তাঁহারা লাভ করিতেছেন এবং মাঝে মাঝে সে-সকল বিষয় লইয়া আলোচনাও করিতেছেন। মহামুনি দুর্ব্বাসা কখন পশ্চাতে আসিয়া শ্রীকৃষ্ণকে আশীর্ব্বাদ করিলেন তাঁহারা জানিতে পারিলেন না। মুনিবর ক্রুদ্ধ হইয়া অভিশাপ দিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিবার কালে উভয়ের কর্ণে সেই অভিশাপ-

বাণী প্রবেশ করিল। ব্রাহ্মণকে তুষ্ট করিবার জন্য অর্জ্জুন অধীর হইলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে নিরস্ত করিলেন। আর্য্য-অনার্য্যের বিরোধের বীজ উপ্ত হইল। আত্মাভিমানী অহঙ্কারী ব্রাহ্মণ অনার্য্য-শক্তিকে আর্য্যের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া ক্ষত্রিয়-সমাজ এবং যদুবংশ ধ্বংস করিবার সঙ্কল্প গ্রহণ করিল। আর জ্ঞানদীপ্ত বীর আর্য্য-হৃদয় অযোগ্য ব্যক্তিকে শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করাকে অকর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া তাহাদের ক্রোধবহ্নিতে ঘৃতাহুতি দান করিল। ভারতের পতনের প্রথম কারণরূপে কবি এখানে জাত্যভিমান এবং জাতিগত ভেদবুদ্ধি প্রদর্শন করিয়াছেন।

পরাধীনতার অপমান, গ্লানি, দুঃখবোধ আহত নাগরাজের বাক্যে সুন্দর-ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণের গাভী উদ্ধার করিতে অর্জ্জুন যখন নাগরাজকে আহত করেন এবং 'তস্কর' বলিয়া ভৎর্সনা করেন, তখন নাগরাজের উক্তির মধ্যে দাসত্বের নিমিত্ত দুঃখবোধ যেমন প্রকাশিত হইয়াছে তেমনি প্রকৃত অন্যায়কারীর ও অত্যাচারীর প্রতিও ইঙ্গিত করা হইয়াছে। কৌশলে ও ভুজবলে সহজ সরল জাতিকে জয় করিয়া তাহাদের উপর প্রভুত্ব করিয়া যাহারা গর্ব্ববোধ করে এবং বিজিত জাতিকে মূর্খ ও দোষী বলিয়া নিন্দিত করে কবি তাহাদের সমর্থন করিতে পারেন নাই।

দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ কবি বারবার দেশের ও জাতির পতনের কারণ প্রদর্শন করিরা স্বদেশবাসীকে সচেতন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং সেই-সকল দোষত্রুটি সংশোধনের পথ নির্দেশ করিয়াছেন। এই অধঃপতনের হাত হইতে ভারতকে উদ্ধার করিবার উপায় শ্রীকৃষ্ণ স্থির করিলেন যে এক ধর্ম্ম এক জাতি ও এক রাজ্য স্থাপিত হইলে ভারতরাজ্য হইতে হিংসা-দ্বেষ, হানাহানি-মারামারি দূর হইবে এবং মহৎ আদর্শে জাতি শক্তিশালী হইয়া উঠিবে।

মূল মহাভারত গীতার দর্শনবাদের উপর ভিত্তি করিয়া রচিত—নিষ্কাম কর্ম্মবাদ সেখানে প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে—'ধর্ম্মের জয় এবং অধর্ম্মের পরাজয়' সেখানে মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। কিন্তু কবি এই রৈবতক-কাব্যে কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের কারণ হিসাবে শ্রীকৃষ্ণের স্বদেশপ্রীতি ও মানব-প্রীতিকে শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়াছেন। দেশের কল্যাণের জন্য, জাতির মঙ্গলের জন্য খণ্ড খণ্ড রাজ্যগুলিকে একত্রে গ্রথিত করিবার বাসনায় শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন নিষ্কাম কর্ম্মবাদ

গ্রহণ করিলেন এবং প্রয়োজন হইলে যুদ্ধ করিতেও মনস্থ করিলেন। কুরু-পাণ্ডবের বিরোধের পরিণতি হিসাবে যুদ্ধকে পাণ্ডবেরা গ্রহণ করেন নাই। বিভক্ত ভারতকে এক বিশাল রাজ্যে পরিণত করিয়া জাতির শক্তি বৃদ্ধি করিবার জন্য তাঁহারা যুদ্ধের পথ গ্রহণ করিয়াছিলেন। সমস্ত স্বার্থবোধের ঊর্দ্ধে যে নির্ম্মল সত্য-ন্যায়-সুন্দর বিরাজমান তাহাকেই মহাভারতের মধ্যে প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁহারা অসি ধারণ করিয়াছিলেন। কবি নবীন সেনের কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের পশ্চাতে পাণ্ডবগণের মনোভাবের এই বিশ্লেষণ তাঁহার নিজস্ব এবং অত্যন্ত ভাবসমৃদ্ধ।

অপরদিকে ক্রোধী, ঈর্ষ্যাপরায়ণ, কুচক্রী জরৎকারুর প্ররোচনায় নাগরাজ বাসুকি ব্যর্থ-প্রেমের হতাশায় প্রতিশোধ গ্রহণের নিমিত্ত প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিলেন এবং অনার্য্য-উদ্ধারের নিমিত্ত ভগ্নী জরৎকারুর সহিত দুর্ব্বাসার বিবাহ দিলেন। জরৎকারুও কৃষ্ণপ্রেমে ব্যর্থ হইয়া ভ্রাতার কার্য্যে সহায়তার নিমিত্ত নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই দুর্ব্বাসাকে স্বামিরূপে বরণ করিয়া ভ্রাতার ষড়্‌যন্ত্রে যোগদান করিলেন।

দুই পক্ষের দুই শপথের ফলস্বরূপ অর্জ্জুনের সহিত সুভদ্রার বিবাহ হইল এবং তাহা দ্বারা পাণ্ডবগণ যদুবংশের সহিত দৃঢ়ভাবে সখ্যসূত্রে আবদ্ধ হইলেন। অপরদিকে কৌরবগণের সহিত পাণ্ডবগণের শত্রুতা বৃদ্ধি পাইয়া যুদ্ধকে আসন্ন করিয়া আনিল এবং জরৎকারু ও বাসুকির গুপ্ত চক্রান্ত সফলতার পথে অগ্রসর হইল। রৈবতক-কাব্যে কবি এই বিরোধের বীজ উপ্ত করিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন।

কুরুক্ষেত্র-কাব্যটিতে ১৭টি সর্গ রহিয়াছে। ইহাতে গীতার তত্ত্ব-ব্যাখ্যা—গীতা-রচনা এবং কর্ম্মে তাহারই প্রয়োগ প্রদর্শিত হইয়াছে।

সুভদ্রা এই গীতার ধর্ম্ম অভিমন্যুকে বুঝাইয়া দিলেন। এইভাবে গীতার নিষ্কাম কর্ম্মবাদের প্রতিষ্ঠা করিবার এবং তাহার মূল তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা দেখা যায়। শরশয্যায় ভীষ্ম-কর্ত্তৃক গীতাপাঠ ও শান্তিলাভ দ্বারাও গীতার মধ্যে হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থান-যুগে যে শক্তি ও শান্তির পথ খোঁজা হইয়াছিল তাহার পরিচয় মিলে।

মূল গীতা রচনার পশ্চাতে ছিল ধর্ম্মবোধের প্রেরণা; কিন্তু নবীনচন্দ্র সেন দেখাইয়াছেন যে কৃষ্ণের কর্ম্মের পশ্চাতে অনুপ্রেরণা জোগাইয়াছে তাঁহার

দেশাত্মবোধ। স্বদেশবাসীর দুঃখ-দুর্দ্দশায় দুঃখিত অন্তঃকরণে তিনি যখন প্রকৃত পথের সন্ধান করিতেছিলেন তখনই নিষ্কাম কর্ম্মবাদের সন্ধান তিনি লাভ করেন এবং ব্যাসদেব তাহাই গীতায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কবি এই-রূপে গীতাকে নূতনভাবে ব্যাখ্যা করিয়া সমসাময়িক কালের সমস্যাবলির সমাধানের পথনির্দ্দেশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

সুভদ্রা ও সুলোচনার কথোপকথনের মধ্য দিয়া কবি নারী-ধর্ম্ম সম্বন্ধেও তৃতীয় সর্গে আলোচনা করিয়াছেন। বিভিন্ন মানুষের ধর্ম্ম বিভিন্ন রকমের। ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম তপস্যা, ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম যুদ্ধ, নারীর ধর্ম্ম স্নেহ-প্রেম ভালবাসা দ্বারা মানবের দুঃখ দূর করা এবং মানবের সেবা করা। সুভদ্রা কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে আহত ব্যক্তিগণকে শত্রু-মিত্র-নির্বিশেষে সেবা করেন।

সুলোচনা নারীস্নেহকে সুভদ্রার ন্যায় বিস্তৃততর-রূপে গ্রহণ করিতে বা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। তাঁহার নিকট শ্রীকৃষ্ণ-অর্জ্জুন-অভিমন্যু-উত্তরা প্রভৃতিকে ভালবাসার মধ্যেই জীবনের চরিতার্থতা। সুলোচনা-হৃদয়ের এই স্নেহকেও কবি অনাদর করেন নাই। সুভদ্রা যে স্নেহ বিশ্বজনকে বিলাইয়াছেন, সুলোচনা সেই স্নেহ পরিবারকে দিয়াছেন এবং এই স্নেহের মধ্য দিয়া দুইজনেই সার্থক হইয়াছেন। এইভাবে মানবীয় প্রেম-ভালবাসাকে মর্য্যাদা দিবার প্রয়াস প্রাচীন দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্ত্তনই সূচিত করে।

অভিমন্যু-বধ কুরুক্ষেত্র-কাব্যটির মধ্যে প্রধান ঘটনা। দুর্ব্বাসা, বাসুকি, কর্ণ প্রভৃতির অন্যায় যুদ্ধের মন্ত্রণা তাহার প্রতিই প্রযোজ্য হইয়াছে। অপর দিকে ব্যাসদেবের এবং শ্রীকৃষ্ণের আলোচনার মধ্যেও একটি বীরের অন্যায়-সমরে পতনের ইঙ্গিত তাহার ক্ষেত্রেই কার্য্যকরী হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ ভাবিয়াছিলেন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ দুই দিনে শেষ হইবে এবং ভীষ্ম-দ্রোণ প্রভৃতি ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তিগণ যুদ্ধে যোগদান করিবেন না। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে তাহা হয় নাই। অর্জ্জুনও আত্মীয়-স্বজনের সহিত মন দিয়া যুদ্ধ করিতেছিলেন না—খেলাচ্ছলে যুদ্ধ করিয়া চলিতেছিলেন। মানুষের দুর্দ্দশা শীঘ্র বিদূরিত করিতে এবং পাপের ধ্বংস দ্রুততর করিতে অর্জ্জুনের মনে রোষবহ্নি উদ্দীপিত করা প্রয়োজন এবং এই নিমিত্ত তাঁহার প্রিয় পুত্র অভিমন্যুর যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ অনিবার্য্য হইয়া উঠিল। আবার ন্যায়-যুদ্ধে অভিমন্যুর পতন হইলে অর্জ্জুন শোক পাইতেন কিন্তু ক্রুদ্ধ হইতেন না। তাই অন্যায়ভাবে সপ্তরথি-কর্ত্তৃক

অভিমন্যুর মৃত্যুসাধন করান হইয়াছে। অভিমন্যুর মৃত্যু তাই শুধু যুদ্ধক্ষেত্রের একটি ঘটনামাত্র নহে, ইহার পশ্চাতে রহিয়াছে বিশ্ববিধানের নীতিচক্র এবং মঙ্গলের সূচনা। দুঃখের ভিতর দিয়া, শোকের মধ্য দিয়া সংসারে কত কল্যাণ-কর্ম্ম সাধিত হয়, কবি এই ঘটনায় তাহাই পরিস্ফুট করিতে চাহিয়াছেন এবং শোককে মহান্ মর্য্যাদা দান করিয়াছেন। অভিমন্যু-বধের পরেই অর্জ্জুন যুদ্ধক্ষেত্রে সক্রিয় হইয়া উঠিলেন এবং কুরুক্ষেত্র ধর্ম্মক্ষেত্রে পরিণত হইল। যেখানে অধর্ম্মের বিনাশ এবং ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা হয় তাহাই তো ধর্ম্মক্ষেত্র। তাই কুরুক্ষেত্র-কাব্যে অভিমন্যু-বধকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঘটনারূপে অঙ্কিত করা হইয়াছে।

প্রভাস-কাব্যে প্রথমেই কবি সমুদ্রের বর্ণনা দিয়াছেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর সমস্ত কালিমা ধৌত হইয়া যেন চারিদিক্ নির্ম্মল আনন্দে হাসিতেছে। কিন্তু যে রুদ্র-শক্তি কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে শত্রুর বিরুদ্ধে জাগরিত করা হইয়াছিল তাহা প্রশমিত করিতে আরও কিছু দুঃখের ও শোকের প্রয়োজন ছিল। যদুবংশের ধ্বংসের ভিতর দিয়া যেন তাহাই সাধিত হইয়াছে।

রুক্মিণী ও সত্যভামার কথোপকথনের মধ্য দিয়া এই বিপদের ছায়া স্পষ্টতর হইয়া উঠে। রুক্মিণী সর্ব্বস্ব শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণ করিয়া সুখী। ভালতেও তিনি আনন্দ পান, মন্দতেও মঙ্গলময়ের মঙ্গল হস্ত দেখিতে পান। সত্যভামা ভাবপ্রবণ, নানারূপ অমঙ্গল-চিহ্ন দেখিয়া তিনি বিষাদগ্রস্ত। তিনি বুঝিতে পারিতেছেন যদুকুলেও পাপ প্রবেশ করিয়াছে। সকলে সুরাপানে মত্ত, নীতি-ধর্ম্ম কেহ মানে না, তাই যদুকুলের ধ্বংসও আসন্ন হইয়া আসিল।

শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যাখ্যানে অপমানিতা জরৎকারু প্রতিহিংসা লইবার বাসনায় দুর্ব্বাসার পাপ-কার্য্যের সহায়ক হইয়া যদুকুলের ধ্বংসকে ঘনীভূত করিলেন। তিনি সাত্যকিকে মিথ্যা প্রেমে বশীভূত করিয়া সুরাপান ধরাইলেন, প্রভাসে শৌণ্ডিকালয় স্থাপন করাইলেন এবং কৃতবর্ম্মার প্রতি সাত্যকির ঈর্ষ্যা ও বিদ্বেষ জন্মাইয়া উভয়ের মধ্যে বিবাদ এবং যুদ্ধ বাধাইয়া দিলেন। যদুবংশের অপরাপর ব্যক্তিগণ বিভিন্ন পক্ষ অবলম্বন করিয়া মারামারি করিয়া হত হইলেন।

আর সুভদ্রা ও শৈলজা আর্য্য-অনার্য্য-নির্ব্বিশেষে কৃষ্ণনাম বিতরণ করিয়া দুঃখার্ত্ত মানবকে ভক্তিপথে ও প্রেমের পথে লইয়া চলিয়াছেন। এক দিকে জরৎকারু দুর্ব্বাসার ষড়্‌যন্ত্রে যোগ দিয়া যদুকুলের ধ্বংসের বীজ বপন করিতেছেন

অপর দিকে সুভদ্রা ও শৈলজা মানবের কল্যাণের ব্রত গ্রহণ করিয়া কৃষ্ণভক্তি বিতরণ করিতেছেন। এক দিকে যখন কৃষ্ণবংশের ধ্বংস ঘনাইয়া আসিতেছে অপর দিকে তখন তাঁহারই মহিমাচ্ছটা বিচ্ছুরিত হইয়া মানুষকে জীবনের আদর্শের পথে, বৃহত্তর মুক্তির পথে আহ্বান জানাইতেছে।

তারপর জরৎকারু, দুর্ব্বাসা ও বাসুকির শ্রীকৃষ্ণের পদপ্রান্তে আসিয়া সত্যলাভ ও জীবন-সমাপ্তি, শ্রীক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ-বলরাম ও সুভদ্রার মন্দির স্থাপনার বাসনা, ব্যাসদেবকে জ্ঞাত করাইয়া শৈলজার জীবনাবসান এবং বলরাম প্রভৃতির দূরদেশ-অভিমুখে যাত্রা কাব্যত্রয়ীর পরিসমাপ্তিতে ভবিষ্যতের প্রতি ইঙ্গিত-ময়তায় পূর্ণ।

কাব্যত্রয়ীর মধ্যে ঘটনা-বিন্যাসে কবি কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই। যে বিরাট ভাব-কল্পনা লইয়া তিনি কাব্যত্রয়ী রচনার চেষ্টায় ব্রতী হইয়াছিলেন নেপথ্য ঘটনায় এবং তত্ত্বব্যাখ্যায় তাহার দার্শনিক দিক্ উদ্ঘাটিত হইলেও চরিত্রের ও ঘটনার কার্য্য-কারণ-সম্পর্কের মধ্য দিয়া তাহা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই। তাই বিষয়বস্তুর মধ্যে বিশালতা রহিয়াছে কিন্তু গভীরতা নাই। মহাকাব্যোচিত ভাব-সংহতির গাম্ভীর্য্য ক্ষুণ্ণ হওয়াতে ইহা কবির প্রচেষ্টাকে ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত করিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ যে অর্জ্জুন ও ব্যাসদেবের সহায়তায় বিশাল ধর্ম্মরাজ্য স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে কেহই কাব্যে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন নাই। কেবল তত্ত্বব্যাখ্যার ক্ষেত্রে তাঁহাদের সাক্ষাৎ মিলে। তাই সেই তত্ত্ব কাব্যের ক্ষেত্রে কোনরূপ গতি বা সুষমা দান করিতে পারে নাই—ভারস্বরূপ হইয়া পড়িয়াছে। আবার বিরুদ্ধ পক্ষকে পরাজিত করিয়া বা মানসিক প্রতিক্রিয়া দ্বারা তাহাদের মনোভাবের পরিবর্ত্তন করিয়া সেই আদর্শকে প্রতিষ্ঠার চেষ্টাও কাব্যে পরিস্ফুট হয় নাই। কোন এক অলক্ষ্য মন্ত্রবলে বিরুদ্ধ পক্ষের সমস্ত প্রচণ্ডতা ভক্তিরসে আর্দ্র হইয়া গিয়াছে। কাব্যের মধ্যে যতখানি আয়োজন ছিল ততখানি শক্তিমত্তা বা নৈপুণ্য ছিল না—তাই পূর্ব্বাপর সংহতি ক্ষুণ্ণ হইয়া কাব্য তিনটি অনেকখানি লঘু হইয়া পড়িয়াছে। দ্বিতীয়তঃ কাব্যের মধ্যে প্রেম-কাহিনীর আধিক্যও কাব্যের সুরকে নষ্ট করিয়াছে। এই কাহিনীগুলির প্রেমিক-প্রেমিকাগণ অত্যন্ত বেশী আত্মকেন্দ্রিক এবং প্রেমের রহস্যের মধ্যে আত্মহারা—তাই মহাকাব্যের মূল-কাহিনীর প্রতি তাহাদের ঔদাসীন্য কাব্যের মধ্যে সংঘাত

অংশটিকে পরিস্ফুট করিতে বাধা জন্মাইয়াছে। এই প্রেমিক-প্রেমিকাগণ ঘটনার স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে কাব্যের পরিণতিতে উপস্থিত হইয়াছে। বৃহৎ আদর্শের নিমিত্ত কেহ কোনরূপ ত্যাগ দ্বারা প্রেমকে মহাকাব্যের উপযোগী গৌরব ও মহিমা দান করে নাই। সকলেই প্রেমের সার্থকতায় বা ব্যর্থতায় নিজ নিজ সুখ-দুঃখ লইয়া ব্যস্ত। এইরূপ প্রেমচিত্র উপন্যাসের বা রোমান্টিক কাব্যের উপযোগী হইতে পারে কিন্তু মহাকাব্যের পটভূমিকায় ইহা একেবারেই অচল।

ভাষা ও ছন্দের ক্ষেত্রেও কবির ব্যর্থতাই নজরে পড়ে। কবির ভাষা লিরিকধর্ম্মী—উচ্ছ্বাস ও আবেগপূর্ণ। ভাষার মধ্যে প্রাণ আছে, আবেগ আছে, অনুভূতির স্ফূরণ রহিয়াছে—ছন্দের ভিতর গতি আছে, সুষমা আছে, সহজ সাবলীল ভঙ্গি রহিয়াছে, স্থানে স্থানে গাম্ভীর্য্য এবং ঝঙ্কারও রহিয়াছে; কিন্তু মহাকাব্যোচিত উদাত্ত ধ্বনি ও ভাব-সংহতি নাই—উচ্ছ্বাসে আবেগে তাহা তরল ও লঘু হইয়া পড়িয়াছে। সেইজন্য কবির প্রকাশভঙ্গিকেও মহাকাব্যের ক্ষেত্রে সার্থক বলা চলে না। তবে আখ্যায়িকা-কাব্য হিসাবে ইহাকে সম্পূর্ণ সার্থক রচনা বলা না গেলেও ইহার মূল্য একেবারে অকিঞ্চিৎকর নয়। ইহাতে পরিবেশ-সৃষ্টি, ঘটনা-সংহতি ও কাব্যরসের বিস্তার অনেকস্থলেই ত্রুটিপূর্ণ—তথাপি ইহাতে কাহিনী আছে, চরিত্র আছে, অনুভূতির আবেগ রহিয়াছে আবার বিষয়বস্তুর অতিরিক্ত ভাবব্যঞ্জনাও রহিয়াছে।

চরিত্র-চিত্রণেও কবির ব্যর্থতাই চোখে পড়ে। 'কৃষ্ণচরিত্রে' বঙ্কিমচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণকে ঐতিহাসিক চরিত্ররূপে গ্রহণ করিয়া নিষ্কাম কর্ম্মকে ব্যাখ্যা করিতে গিয়া জ্ঞানমার্গের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। নবীনচন্দ্রের কৃষ্ণচরিত্রেও ঐতিহাসিক রূপ দিবার চেষ্টা দেখা যায়; কিন্তু তিনি জ্ঞান অপেক্ষা ভক্তির আশ্রয় লইয়াছেন বেশী। তাহাতে চরিত্রটির স্বাভাবিকতা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে।

নবীনচন্দ্র সেনের কাব্যত্রয়ের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণকেই নায়কের ভূমিকায় দেখা যায়। তাঁহার চরিত্রে মানবত্ব ও দেবত্ব মিশ্রিত হইয়াছে। কখনও মনে হয় তিনি সাধারণ মানুষের ন্যায় নানাবিধ সমস্যার সমাধান খুঁজিতেছেন—কখনও দুঃখে অভিভূত হইতেছেন—কখনও আনন্দে বিহ্বল—কখনও ভক্তিতে উচ্ছ্বসিত—কখনও চিন্তায় মগ্ন। আবার কখনও সব সমস্যার সমাধান করিয়া

তিনি উচ্ছ্বাসের সহিত প্রচার করিতেছেন "আমি ভগবান"—"আমি মানবের স্বামী"—"আমি এই মহাবিশ্ব, এই বিশ্ব মম রূপ।"

এই-সকল স্থানে অবতারবাদ আসিয়া পড়িয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে রহিয়াছে ভাবুকতা, পরিকল্পনা, মানবের নিমিত্ত দুঃখবোধ, পরিহাস-রসিকতা এবং নিষ্কাম কর্ম্মের অভিব্যক্তি। বিশ্বজনের মঙ্গলের মধ্যে নিজ সুখ-দুঃখ-স্বার্থ-বুদ্ধিকে বিসর্জ্জন দিয়া কর্ম্মের অনুবর্ত্তন করাই তাঁহার কর্ম্মের আদর্শ এবং তাহাই তিনি প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছেন কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের মধ্যে এবং যদুকুলের ধ্বংসের মধ্যে। কিন্তু কোথাও তাঁহাকে আমরা সক্রিয় দেখিতে পাই না। তিনি সমস্যায় পড়িতেছেন, চিন্তার দ্বারা সমস্যার মীমাংসায় পৌঁছিতেছেন এবং অর্জ্জুনের নিকট তাহা ব্যাখ্যা করিতেছেন। তাঁহার ইচ্ছা যেন অলক্ষ্যে কার্য্য করিয়া চলিয়াছে। এই-সকল স্থানে মনে হয় শ্রীকৃষ্ণের দেবচরিত্র অঙ্কন করিবার বাসনাই কবির ছিল। কিন্তু স্থানে স্থানে আবার দেখা যায় তিনি ব্যাসদেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতেছেন, ভীষ্মদেবকে প্রণাম করিতেছেন, বিভিন্ন রাজ্যের সংবাদাদি গোপনে সংগ্রহ করিতেছেন ইত্যাদি। চরিত্রটি নানাগুণসম্পন্ন কিন্তু ব্যক্তিত্বের দীপ্তিতে উজ্জ্বল নয়। যে স্থানে তাঁহার ব্যক্তিত্ব স্ফুরণের সুযোগ আসিয়াছে সেখানে দেবভাব আসিয়া তাঁহার ব্যক্তিত্বকে ম্লান করিয়া দিয়াছে। এই চরিত্র-সৃষ্টিতে কবি বিশেষ দক্ষতা দেখাইতে পারেন নাই এবং সর্ব্বত্র পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্যও রক্ষা করিতে পারেন নাই। অর্জ্জুনের চরিত্রেও উল্লেখযোগ্য বিশেষ কিছু নাই। তিনি শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গী, তাঁহার সহিত নানাবিধ তত্ত্বালোচনা করেন। অপরের বিপদের সময় সাহায্যের নিমিত্ত প্রস্তুত এবং হৃদয়বান্। সুভদ্রাহরণ-ব্যাপারে তাঁহার শক্তির কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে তিনি প্রথমে বীরত্ব প্রকাশ করেন নাই—অভিমন্যুর মৃত্যুর পর তাঁহার মুখে কিছু বীরত্বের বাণী শোনা যায়। অর্জ্জুনের সমস্ত কার্য্যাবলী ও চরিত্রের ব্যাখ্যা বিভিন্ন ব্যক্তির মুখ হইতে প্রকাশিত হওয়ায় অনেকখানি নিষ্প্রভ মনে হয়। অর্জ্জুনের বীরত্ব ও ব্যক্তিত্বের সামনাসামনি দাঁড়াইয়া আমরা কখনও তাঁহাকে দেখিতে পাই না। তাঁহার মধ্যে সমস্ত গুণ থাকা সত্ত্বেও তিনি জীবন্ত নহেন।

ব্যাসদেবের চরিত্রটি সুন্দর। আর্য্য ঋষির যোগ্য গুণাবলী, জ্ঞান-বুদ্ধি-ত্যাগ ধৈর্য্য-সত্যদৃষ্টি-করুণা সবই তাঁহার মধ্যে বর্ত্তমান। তিনি শ্রীকৃষ্ণকেও

শিষ্যত্বে গ্রহণ করেন আবার অনার্য্যকন্যা শৈলজাকেও স্থান দেন এবং দীক্ষা দান করেন। তাঁহাকে আদর্শ-চরিত্রের ঋষি বলা চলে।

দুর্ব্বাসা-চরিত্রটি পাষণ্ডের চরিত্র। যে দুর্ব্বাসার নাম শুনিলে আমাদের মনে তপঃক্লিষ্ট তেজস্বী যোগীর চিত্র উদিত হয় কবি এই কাব্যগুলিতে তাঁহাকে হীন মনোভাবাপন্ন, চক্রান্তকারী, ঈর্ষ্যাপরায়ণ, মিথ্যাচারী, ভণ্ডরূপে অঙ্কিত করিয়া চরিত্রটিকে ক্ষুণ্ণ করিয়াছেন। তাঁহার কূটচক্রান্ত ও ষড়্‌যন্ত্রজাল যতখানি উৎসাহের সহিত বিস্তৃতিলাভ করিয়াছিল পরিণতির ক্ষেত্রে তাহার বিচার করিলে কোন সার্থকতা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এই চরিত্রটিকে অভিনবরূপে অঙ্কিত করিতে গিয়া কবি কেবল চরিত্রটিকেই নষ্ট করেন নাই তাঁহার কাব্যের সমস্ত গাম্ভীর্য্য ও কাহিনীর মধ্যে সমতা-রক্ষা ক্ষুণ্ণ করিয়াছেন।

অভিমন্যুর চরিত্রটি সুন্দর, তাঁহার শিশুসুলভ সরল চরিত্র নানাগুণে বিভূষিত। সুলোচনার প্রতি ব্যবহার এবং বনমাতার প্রতি দরদবোধ তাঁহার সহৃদয়তার পরিচয় বহন করে। তাঁহার মধ্যে স্থানে স্থানে গাম্ভীর্য্য আনিবার চেষ্টাও কবি করিয়াছেন—যেমন ভীষ্মের শরশয্যার চিত্র-অঙ্কন-ব্যাপারে এবং সুভদ্রার নিকট গীতার মর্ম্ম-ব্যাখ্যা শুনিবার কালে। যদিও অভিমন্যু ও উত্তরার ক্রীড়া-কৌতুক-বিবাদ প্রভৃতি কাব্যটিতে বিষাদের মেঘকে সরাইয়া আনন্দের উচ্ছ্বাস আনিতে সক্ষম হইয়াছে তথাপি ইহার দীর্ঘতা কাব্যরসকে ক্ষুণ্ণ করিয়াছে। কর্ণের মুখে তাঁহার চরিত্রের বর্ণনাটুকু হৃদয়গ্রাহী। সর্ব্বশেষে তাঁহার বীরত্ব ও পতন পাঠকচিত্তকে স্পর্শ করে।

বাসুকি-চরিত্র কাব্যে সবচেয়ে বেশী জীবন্ত চরিত্র। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার বাল্যসখা—তিনি শ্রীকৃষ্ণকে ভালবাসেন। সুভদ্রাকে দেখিয়া তিনি তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য সচেষ্ট। কিন্তু তাঁহার মনোবাসনা পূর্ণ হইবার নয়। তাই তিনি দুর্ব্বাসার সহিত ষড়্‌যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছেন এবং সুভদ্রাকে পাইবার আশায় নিজ বিবেকের বিরুদ্ধেও কাজ করিয়াছেন। তিনি কখনও নিজ কর্ম্মের নিমিত্ত অনুতপ্ত হইয়াছেন, কখনও দুর্ব্বাসার প্ররোচনায় উত্তেজিত হইয়া তাঁহার নির্দ্দিষ্ট পথে অগ্রসর হইয়াছেন। কর্ম্মে সাফল্যের নিমিত্ত তিনি প্রিয় ভগ্নী জরৎকারুকে দুর্ব্বাসার সহিত বিবাহ দিয়াছেন এবং শৈলজাকে অর্জ্জুনের নিধনের জন্য নিয়োগ করিয়াছেন। সর্ব্বত্রই তাঁহার বীর-হৃদয়ের প্রকাশ,

তাঁহার ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ পাঠকের প্রশংসা অর্জ্জন করিবার যোগ্য। অবশেষে ব্যর্থতার মধ্যে তিনি নিজের ভুল যখন হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন তখন শ্রীকৃষ্ণের চরণে পতিত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতেও তাঁহার কুণ্ঠা নাই। চরিত্রটি অনুভূতিময়, আবেগময়, ভালতে-মন্দতে মিশ্রিত, আশা-আকাঙ্ক্ষায় উদ্বেলিত, নিরাশায়-দুঃখে পথভ্রষ্ট, বীরত্বে ও প্রেমে উজ্জ্বল।

কাব্যের মধ্যে পুরুষ-চরিত্র অপেক্ষা নারী-চরিত্রগুলি বেশী জীবন্ত। আদর্শ নারীরূপে কবি সুভদ্রাকে অঙ্কিত করিয়াছেন। প্রথমে দেখি তিনি লজ্জানম্র ও প্রেমবিহ্বলা। বিবাহের পর কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে শত্রুমিত্র-নির্ব্বিশেষে তিনি আহতদিগের সেবায় নিযুক্ত এবং সুলোচনাকে তাঁহার হৃদয়ের আদর্শের কথা কহিয়া তিনি নারী-ধর্ম্মের ব্যাখ্যা করেন। ব্যাসদেব তাই গীতা রচনা করিয়া সুভদ্রার করেই তাহা অর্পণ করেন। তিনি যেন নিষ্কাম কর্ম্মের প্রতীক—অর্জ্জুন ও কৃষ্ণের মিলনস্থল। পুত্রের নিকট গীতার ব্যাখ্যা করিবার কালে তাঁহার জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায় এবং শৈলজার নিকট দুর্ব্বাসার সহিত কর্ণের মন্ত্রণার কথা শুনিয়াও তিনি অবিচলিতচিত্তে পুত্রকে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণ করিয়া নিজ দৃঢ় মনের পরিচয় দেন। আবার অভিমন্যুর মৃত্যুর পর সকলে যখন শোকে বিহ্বল, তিনি অবিচলিতভাবে পুত্র-শির ক্রোড়ে ধারণ করিয়া বিশ্বমানবের মধ্যে পুত্রের সন্ধান লাভ করিলেন। অবশেষে যুদ্ধের পর তিনি শ্রীকৃষ্ণের নাম প্রচার করিয়া দুঃখার্ত্ত মানবগণের সেবা করিয়া জগতের কল্যাণের ব্রত গ্রহণ করেন। অর্জ্জুনের প্রতি প্রণয়াসক্ত শৈলজাকে তিনি সহজ স্নেহে গ্রহণ করেন এবং তাঁহার দুঃখ দূর করিবার চেষ্টা করেন। তাঁহার চরিত্রে কোথাও কোন ত্রুটি বা ভুল নাই। তিনি যেন পৃথিবীর মানুষ নহেন। সেইজন্য চরিত্রটি স্বাভাবিক হইয়া উঠিতে পারে নাই।

রুক্মিণী ও সত্যভামার চরিত্র দুইটি আপন আপন বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। রুক্মিণী শ্রীকৃষ্ণে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া সুখী—পৃথিবীতে তাঁহার আকাঙ্ক্ষার কিছুই নাই। তিনি ধীর, স্থির, শান্ত। সত্যভামার মধ্যে মানববৃত্তিগুলির উন্মেষ দেখা যায়। তাঁহার মধ্যে আকাঙ্ক্ষা আছে, উদ্দামতা আছে, অভিমান আছে, দুঃখ আছে, আনন্দ আছে, এবং মঙ্গল ও অমঙ্গলের চিন্তা আছে। উভয়ের চরিত্র কবি সুন্দরভাবে চিত্রিত করিয়াছেন।

সুলোচনা শ্রীকৃষ্ণ-পরিবারের সখী—ফুলমালা গাঁথেন। তিনি বিধবা।

স্বামি-সম্বন্ধে তাঁহার মনে কোন স্মৃতি নাই। তিনি অর্জ্জুন কৃষ্ণ সত্যভামা রুক্মিণী সুভদ্রা অভিমন্যু উত্তরা প্রভৃতিকে ভালবাসিয়া সেবা করিয়া নিজ জীবনকে সার্থক মনে করেন। তিনি হাস্যরসিকা। অত্যন্ত গম্ভীর এবং গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারকেও তিনি হাস্যচ্ছটায় মণ্ডিত করিয়া তুলিতেন এবং প্রাণবন্যা প্রবাহিত করিতেন। তিনি বিদুষী নহেন, জ্ঞান-ভক্তি সম্বন্ধে তাঁহার কোন ধারণা নাই। সহজ-সরল রমণী-স্নেহে তাঁহার বক্ষ পূর্ণ। সুভদ্রার তত্ত্বব্যাখ্যা, গীতার দর্শনবাদ, বিশ্বমানবের মঙ্গলের মধ্যে আনন্দের সন্ধান প্রভৃতি তিনি বুঝিতে পারেন না। তাঁহার বাক্যের মধ্যে সব সময় শ্লীলতা বোধ থাকে না, সব সময় মাত্রাবোধ থাকে, না কিন্তু তাঁহার অবস্থার সখীর পক্ষে তাহা খুব বিসদৃশ নয়। তবে কুরুক্ষেত্র-কাব্যের ষষ্ঠ সর্গে তাঁহার রসিকতা যেন মাত্রা ছাড়াইয়া গিয়া কাব্যের গাম্ভীর্য্যকে নষ্ট করিয়া দিয়াছে। তারপর অভিমন্যুর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারও মৃত্যু তাঁহার স্নেহের পরিচয় দেয়। আপন বৈশিষ্ট্যে চরিত্রটি উজ্জ্বল।

উত্তরার চরিত্রটি পুষ্পের সহিত তুলনা করা চলে। তিনি কিশোরী, চপলা, প্রেমবিহ্বলা, অপরের দুঃখে কাতরা। অভিমন্যুর মৃত্যুতে তিনি উন্মাদিনী। আবার বংশরক্ষার নিমিত্ত নিজ বিরহ-যন্ত্রণা সহ্য করিয়াও তিনি প্রাণত্যাগের পথ বর্জ্জন করিয়াছেন এবং পুত্রের জন্মের পরেই চিতায় প্রাণবিসর্জ্জন দিয়া বিরহের অবসান করিয়াছেন। চরিত্রটি মধুর।

অনার্য্যা রমণী শৈলজা ও জরৎকারু আপন আপন বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত। উভয়েই শৈশবে পিতামাতা হারাইয়া বাসুকির স্নেহে প্রতিপালিত। প্রেমের ক্ষেত্রে উভয়েই ব্যর্থতা লাভ করিলেন। জরৎকারু শ্রীকৃষ্ণকে ভালবাসিয়া প্রত্যাখ্যান লাভ করেন এবং প্রতিহিংসা লইবার জন্য দুর্ব্বাসার সহায়তা করিয়া যদুবংশের ধ্বংস সাধন করেন ও শ্রীকৃষ্ণকেও আহত করেন। জরৎকারুর চরিত্রে প্রাণময় অনুভূতির অনুকরণ চরিত্রটিকে একটি স্বকীয়তা দান করিয়াছে। কবি ইহার মধ্যে কোন আদর্শবাদকে জোর করিয়া অনুপ্রবিষ্ট করিবার চেষ্টা করেন নাই। তাই চরিত্রটি জীবন্ত। আর শৈলজা বাসুকির প্ররোচনায় অর্জ্জুনের জীবননাশের সহায়তার জন্য ছদ্ম-পরিচয়ে ভৃত্যের কর্ম্ম গ্রহণ করেন। কিন্তু অর্জ্জুনের প্রতি প্রণয়াসক্ত হইয়া বাসুকির কর্ম্মের বিরোধিতা করেন এবং অর্জ্জুন তাঁহাকে কন্যারূপে গ্রহণ করিতে চাহিলে অর্জ্জুনের নিকট হইতে প্রস্থান

করেন। তারপর অরণ্যে তপস্যা করিয়া প্রেমে সিদ্ধিলাভ করেন এবং সমস্ত বিশ্ব অর্জ্জুনময় এবং সমস্ত সম্বন্ধের মধ্যে দিয়া অর্জ্জুনকে তিনি মনোরাজ্যে উপলব্ধি করিতে থাকেন। তারপর তিনি ব্যাসদেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া কৃষ্ণপ্রেম লাভ করেন এবং গীতার নিষ্কাম কর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করেন। তিনি অভিমন্যুর বনমাতা হইয়া তাঁহাকে পুত্ররূপে গ্রহণ করেন। এইরূপে স্নেহে প্রেমে প্রীতিতে মানবের সেবা করিয়া, অনার্য্যের মধ্যে কৃষ্ণনাম বিতরণ করিয়া তিনি জীবনকে সার্থক করিয়া তুলিয়াছেন। কিন্তু চরিত্রটি স্বাভাবিক হইতে পারে নাই। একটা কষ্টকল্পিত আদর্শের প্রতিষ্ঠা যেন তাঁহার দ্বারা কবি সংসাধিত করাইয়াছেন।

কাব্যের মধ্যে অমিত্রাক্ষর, ত্রিপদী, পয়ার প্রভৃতি ছন্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। অনেক স্থলে কথোপকথনের মধ্য দিয়া কাব্যগুলি অগ্রগতির পথে চলিয়াছে। অনেক স্থলে প্রকৃতি ও মানুষ এক হইয়া গিয়াছে—অনেক স্থলে প্রকৃতির প্রভাব মানুষকে অভিভূত করিয়াছে। নিসর্গ-বর্ণনায় পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণ হইতে এই কাব্যগুলিতে পার্থক্য দৃষ্ট হয়। প্রকৃতিকে অনেক সময় ঘটনার পশ্চাৎ-পটরূপে অঙ্কিত করিয়া ঘটনার পরিণতির প্রতি ইঙ্গিত করিতেও দেখা যায়। কাব্যগুলির মধ্যে স্থানে স্থানে গীতিকাব্যের ভাবানুভূতি ও উচ্ছ্বাসও লক্ষিত হয়। তবে ভাষা সর্ব্বত্র সংযত না হওয়াতে ভাব সব সময় রসঘন হইয়া উঠিতে পারে নাই। স্থানে স্থানে একই শব্দের বহুল প্রয়োগ কাব্য-মাধুর্য্যকে ক্ষুণ্ণ করিয়াছে।

কাব্যে আর্য্য-অনার্য্যের বিরোধ ও কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের পরিণতিতে ভক্তির ক্ষেত্রে উভয়ের মিলন প্রদর্শন করিয়া কবি নূতন দৃষ্টিভঙ্গি আনিবার চেষ্টা করিয়াছেন—যাহা মূল মহাভারতে নাই। তবে, সর্ব্বশেষে এই কথা বলা চলে যে কবি এই কাব্যত্রয়ের মধ্যে মহাভারতের যে নূতন ব্যাখ্যা দিবার চেষ্টা করিয়াছেন তাহাতে সর্ব্বাংশে সার্থক না হইলেও অনেকখানি কৃতকার্য্য হইয়াছেন। কাব্যত্রয়ীর পরিধি বিশাল হইলেও মহাকাব্য-হিসাবে সার্থক বলা চলে না। তথাপি পৌরাণিক আখ্যায়িকা-কাব্যের ক্ষেত্রে ইহা যে নূতন দৃষ্টিভঙ্গি, নূতন রূপ, নূতন গতি ও নূতন সুর আনিতে সক্ষম হইয়াছে তাহাকে উপেক্ষা করা চলে না।

৩

মদনভস্ম—ভারতচন্দ্র সরকার প্রণীত 'মদনভস্ম' কাব্যটির প্রথম খণ্ড ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। কাব্যটি চারিটি সর্গে বিভক্ত। ইহাতে আখ্যানভাগ সমাপ্ত হয় নাই। মহাদেবের ধ্যান ভাঙ্গিতে যাইবার জন্য দেব-রাজকে সম্মতি দান করিয়া এবং পরদিন প্রভাতে আসিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া মদনদেব গৃহের উদ্দেশ্যে প্রস্থান করিলেন—প্রথম খণ্ডে কাহিনীর এই অংশ পর্য্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে। কবির দ্বিতীয় খণ্ডও লিখিবার ইচ্ছা ছিল বোঝা যায়। কিন্তু দ্বিতীয় খণ্ড রচিত হয় নাই।

প্রথম সর্গ—কাব্যের প্রারম্ভে একটু অভিনবত্ব দৃষ্ট হয়। রমণীকণ্ঠের ক্রন্দনধ্বনি শুনিয়া কবি বীণাপাণির করুণাভিক্ষা করিলেন এবং কল্পনাদেবীর আশ্রয় লইলেন। অন্যান্য কাব্যে প্রথম হইতেই অসুর প্রভৃতির নির্য্যাতনে দেবতাগণের দুঃখ-কষ্টের বর্ণনা দেখা যায়। এখানে আখ্যানভাগের শেষাংশের সূত্র ধরিয়া কাহিনীর বিস্তার পৌরাণিক কাব্যে একটু অভিনব।

দ্বিতীয় সর্গ—ক্রন্দনরতা রমণীর বিলাপ হইতে কবি বুঝিতে পারিলেন তিনি রতিদেবী এবং প্রিয়বিরহে তিনি ব্যাকুল।

তৃতীয় সর্গ—এস্থলে পুনরায় বাণীদেবীর নিকট কৃপাভিক্ষা করিয়া কবি অগ্রসর হইয়াছেন। মদনদেবের মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধান করিয়া কবি জানিলেন যে তারকাসুরের অত্যাচারে নির্য্যাতিত দেবগণ মদনদেবকে দূত দ্বারা নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন।

চতুর্থ সর্গ—রতিদেবী মদনদেবের সজ্জা দেখিয়া অন্য নারীর নিকটে গমন করিতেছেন বলিয়া সন্দেহ প্রকাশ করিলেন এবং সঙ্গে যাইতে চাহিলেন। দেবরাজের আদেশ জানাইয়া মদনদেব রতিদেবীকে নিবৃত্ত করেন। তিনি দেবসভায় তারকাসুরের অত্যাচারের ঘটনা শুনিয়া এবং মহাদেবের ধ্যান ভাঙ্গাইবার কাজে উৎসাহিত বোধ করিয়া দেবরাজের অনুরোধ রক্ষা করিতে সম্মতি দান করেন।

কাব্যটি অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত। ভাষা অত্যন্ত দুরূহ—ছন্দও গতিহীন। নামধাতু যোগে মাইকেলের অনুকরণে নূতন শব্দের সৃষ্টি করিতে গিয়া কবি একেবারে ব্যর্থ হইয়াছেন। স্থানে স্থানে এরূপ শব্দের ব্যবহারে কাব্যের অর্থ

ব্যাহত হইয়াছে। উপমা, রূপক, উৎপ্রেক্ষা প্রভৃতি স্থানে স্থানে নিরর্থক ও সৌন্দর্য্য-হানিকর। কাব্যটিতে মাইকেলের অনুকরণের চেষ্টা দেখা যায়— কিন্তু কবি তাহাতে কৃতকার্য্য হন নাই; ইহাকে সার্থক রচনা বলা চলে না।

কালীবিলাস-কাব্য—দ্বিজ কালিদাস বিরচিত 'কালীবিলাস' কাব্যটির দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮৭৪ খ্রীঃ মুদ্রিত হয়। বিষয়বস্তু-সম্বন্ধে কাব্যের প্রথমেই আছে—"ইহা মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত সপ্তসতী চণ্ডী, কুমার সম্ভাবীয়, কালী-পুরাণ এবং যোনিতন্ত্র, এই সকল মূল গ্রন্থ প্রমাণান্তর" বিরচিত।

প্রথমে গণেশ-বন্দনা ও গুরুবন্দনা—তারপর মেধস মুনির নিকট স্বরথ রাজা ও সমাধি বৈশ্যের মায়া-প্রকরণ সম্বন্ধে প্রশ্ন এবং নানাবিধ পৌরাণিক কাহিনীর উল্লেখে মুনি-কর্ত্তৃক তাহার ব্যাখ্যা—কাব্যের বিষয়বস্তু। স্বষ্টি-প্রকরণে দেখা যায়—ব্রহ্মাণ্ডে প্রথমে সব জলময় ও অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল। কেবল—

মহামায়া মায়া করে শক্তিরূপা শবরে,
ভগবানে কেবল রাখিলা
বটপত্রে শয্যা করে, বৃদ্ধাঙ্গুলিকায় ধরে,
নাভিপদ্মে বিধাতা হইলা॥ —(৫ পৃঃ)

আর বিষ্ণু—

বটপত্রে নারায়ণ, যোগনিদ্রা অচেতন
জলধিতে ভাসিতে লাগিলা। —(৫ পৃঃ)

তারপর ব্রহ্মা স্বষ্টির বাসনায় 'কর্ণমলা'তে মধু-কৈটভ নামক দুই দৈত্যের স্বষ্টি করিলেন। ব্রহ্মাকে দেখিয়া তাহারা খাইতে উদ্যত হইলে যোগমায়ার ধ্যান করিয়া ব্রহ্মা মায়ায় আচ্ছন্ন হইলেন এবং বিষ্ণুর চেতনা ফিরিল। তিনি দৈত্যদ্বয়ের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহাদের পরাস্ত করিতে পারিলেন না। মহামায়ার প্রভাবে দৈত্যগণ বিষ্ণুকে বর প্রার্থনা করিতে বলিলে তিনি কহিলেন—

তোমরা দোহেতে, আমার করেতে
বধ্য হও শীঘ্রগতি॥ —(১০ পৃঃ)

তাহারা চারিদিকে জল দেখিয়া জলশূন্য স্থানে বধ করিবার বর দান করিলে বিষ্ণু জঘনের উপর তুলিয়া তাহাদের বধ করেন।

মেধস মুনি তারপর মহামায়ার মহাশক্তির বিভিন্ন রূপের বিকাশ ও দেবগণকে উদ্ধারের কাহিনী বিবৃত করেন। সেই প্রসঙ্গে জম্ভাসুরের শিব-আরাধনা, ত্রিলোক-বিজয়ী পুত্র লাভের বর প্রাপ্তি, ইন্দ্র-কর্ত্তৃক তাহার বিনাশ, মহিষাসুর-নামক পুত্রের জন্ম, স্বর্গ-বিজয়, মহাশক্তির আবির্ভাব ও মহিষাসুর-বধ প্রভৃতি স্থান পাইয়াছে। কিছুকাল পরে শুম্ভ-নিশুম্ভ-নামক দৈত্যদ্বয় পুনরায় স্বর্গরাজ্য অধিকার করিলে দেবগণ মহাশক্তির আরাধনা করেন। মহামায়া দেবগণকে অভয়দান করিয়া মোহিনী-বেশে হিমালয়ে গমন করেন এবং সেখানে ধূম্রলোচন, চণ্ডমুণ্ড, রক্তবীজ, নিশুম্ভ ও শুম্ভ প্রভৃতিকে বধ করিয়া দেবগণের উদ্ধার সাধন করেন।

তারপর দক্ষযজ্ঞের কাহিনী। শিবহীন যজ্ঞ, যজ্ঞ নষ্ট, বীরভদ্র-কর্ত্তৃক দক্ষরাজের মস্তক কর্ত্তন, শিবের পুনরায় মস্তক সংযোজন ও দক্ষের জীবনপ্রাপ্তি, মহাদেবের সতীদেহ লইয়া ভ্রমণ ও বিষ্ণু-কর্ত্তৃক সুদর্শন দ্বারা সতীদেহ কর্ত্তন এবং একান্নটি পীঠস্থানের সৃষ্টি।

অবশেষে হিমালয়-গৃহে গৌরীর জন্ম, কন্যালাভ করিয়া সকলের ক্ষোভ, ত্রিনেত্র দেখিয়া অমঙ্গলের আশঙ্কা এবং হিমালয়-কর্ত্তৃক কন্যাকে জলে ভাসাইয়া দিবার উদ্যোগ, মহাদেবের আবির্ভাব ও প্রকৃত পরিচয় দান করিয়া গৌরীর প্রাণরক্ষা। বালিকা গৌরীর ক্রীড়া সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে ;—

রান্ধিয়া ধূলার ভাত তাতে দেন বড়ি।
ধূলার রান্ধেন ঝোল ধূলা চচ্চড়ি ॥ —(৭০ পৃঃ)

সঙ্গিনীগণের নিকট শিবপূজা করিতে শিক্ষা—এবং শিবপূজা করিলে—

কৈলাসে শিবের গাত্রে পড়ে ফুল জল। —(৭১ পৃঃ)

গৌরীর পঞ্চতপা—যোগীর বেশে মহাদেবের ছলনা—গিরিরাজ-গৃহে মহাদেব-কর্ত্তৃক কন্যাকে বিবাহ করিবার বাসনা প্রকাশ ও নানাবিধ রঙ্গ—অবশেষে নারদের মাধ্যমে হর-গৌরীর মিলন।

কাব্যটিতে কোন সর্গ-বিভাগ নাই। প্রতি পরিচ্ছেদের পূর্ব্বে ধুয়া রহিয়াছে। ইহাতে লঘুত্রিপদী, দীর্ঘ-ত্রিপদী ও পয়ার ছন্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। কাব্যে নূতনত্ব কিছু নাই। আখ্যানভাগ, ভাব-ভাষা-ছন্দ সবই মামুলী ধরণের। একসঙ্গে অনেক ঘটনার অবতারণা করিতে গিয়া কোথাও

যোগসূত্র বিশেষ ছিন্ন হয় নাই, তবে আখ্যানভাগগুলি অনেকস্থলে সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারে নাই। চরিত্রগুলির উপরেও লৌকিক ভাবধারার প্রভাব দৃষ্ট হয়।

সুরারিবধ-কাব্য—রামগতি চট্টোপাধ্যায় রচিত 'সুরারিবধ-কাব্য'টি ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। কাব্যের প্রতিপাদ্য বিষয় দেবী-কর্তৃক শুম্ভ-নিশুম্ভ বধ। বিজ্ঞাপনে কবি লিখিয়াছেন—"এই প্রবন্ধটি মার্কণ্ডেয় চণ্ডী হইতে ছায়ামাত্র অবলম্বন-পূর্ব্বক 'সুরারিবধ' কাব্য নামে পরিণত করিলাম।" কাহিনী-অংশে নূতনত্ব বিশেষ কিছু নাই।

কাব্যের প্রথমে কবি সরস্বতী দেবীর বন্দনা করিয়া কৃপাভিক্ষা করিয়াছেন—

লিখিতে সুরস কাব্য নীরস লেখনী
আশার ছলনে, হায়, ধরিনু, জননি!
মহা মহা কবিগণ কৃপায় তোমার
ঢালিলা কবিতা সুধা অক্ষয় অপার।
সেই সুধা ঢালিবারে আমার বাসনা,
অনিবার্য্য দুরাশার দারুণ ছলনা। —(১ পৃঃ)

দেবতাগণকে জয় করিবার বাসনা লইয়া শুম্ভ-নিশুম্ভ তপস্যা আরম্ভ করিলে অরণ্য-দেবতা তপঃপ্রভাবে তাপিত হইয়া ব্রহ্মার নিকটে কৃপাভিক্ষা করেন। ব্রহ্মা তখন দানবদ্বয়কে বর প্রদান করিয়া বনভূমিকে শীতল করেন। এস্থলে অরণ্য-দেবের পরিকল্পনার মধ্যে একটু নূতনত্ব দৃষ্ট হয়।

মহামায়ার আরাধনা করা স্থির করিয়া ইন্দ্র দেবগণের নিকট মহামায়ার আবাসস্থলের বর্ণনা করিয়াছেন। ইন্দ্রের মুখে এই বর্ণনাটি যুক্তিযুক্ত হয় নাই —মনে হয় পর্ব্বতের বর্ণনা দিবার জন্যই ইহা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। যাইবার পথে দেবগণ যে-সকল দৃশ্য দেখিলেন তাহার মধ্যেই এই বর্ণনাটি থাকিলে ভাল হইত।

মহামায়া দেবগণের তপস্যায় তুষ্ট হইয়া তাঁহাদের সমক্ষে আবির্ভূত হইলেন এবং আগমনের হেতু জিজ্ঞাসা করিলেন। এমন সময় দেবীর দেহ হইতে একটি রমণী-মূর্ত্তি বাহির হইয়া দেবীকে কহিলেন—

"আমার তপস্যা এই অমর নিকর
করিতেছে ভক্তি মনে সহ পুরন্দর।" —(২৩ পৃঃ)

তারপর সেই রমণী-মূর্ত্তি দেবগণকে আশীর্ব্বাদ করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। এই রমণী-মূর্ত্তির আবির্ভাব-ব্যাপারটি ঠিক বোঝা যায় না।

চণ্ডমুণ্ডকে বধ করিবার জন্য মহামায়া কালিকার সৃষ্টি করিলেন। কালিকার বর্ণনাটি অতি সুন্দর হইয়াছে—

হইলা প্রচণ্ডা কালী করাল বদনা
অগ্নিশিখা-ত্রিলোচনা, ভীষণ-দর্শনা।
মুণ্ডমালা গলে দোলে ভয়ঙ্কর বেশ,
ঈষৎ মত্ততা তাহে সুরার আবেশ।
দ্বীপিচর্ম্ম-পরিধানা, বিস্তৃত-বসনা,
লোলজিহ্বা, অসিহস্তা, অতীব ভীষণা।
আরক্ত-নয়না শ্যামা, পাশাঙ্কুশ করে,
বিচিত্র খট্টাঙ্গ বাণ শোভিত অপরে। —(৬৯ পৃঃ)

রক্তবীজের সহিত যুদ্ধের নিমিত্ত বিভিন্ন নারী-শক্তির সমাবেশ হইয়াছে। ব্রহ্মাণী, অভয়া, ইন্দ্রাণী প্রভৃতির বর্ণনা রহিয়াছে। কিন্তু অবশেষে চামুণ্ডার সৃষ্টি করিতে হইল এবং তিনি জিহ্বা প্রসারিত করিয়া রক্তবীজকে নিহত করেন।

নিশুম্ভের নিধনের পর কবি রাত্রির বর্ণনা দিয়াছেন—

রণক্ষেত্রে স্থানে স্থানে চিতা অগ্নি জ্বলে,
ভীষণ আকৃতি ছায়া চলে দলে দলে।
লইয়া মড়ার মাথা শূন্যমার্গে ছুড়ি'
অগ্রে লুফিবার জন্য করে হুড়াহুড়ি।
খোঁনা খোঁনা কথা কয় হাসে খল খল,
কৃত্রিম সমর করে মিলি প্রেতদল। —(৭১ পৃঃ)

এই বর্ণনায় একটি ভয়ঙ্কর রাত্রির দৃশ্য চক্ষের সমক্ষে ফুটিয়া উঠে।

শুম্ভের সহিত যুদ্ধে প্রথমে দেবী আহত হইয়া পড়িলে মহাদেব আসিয়া তাঁহাকে রুদ্রতেজ দান করেন এবং দৈত্যের শরীর হইতে রুদ্রতেজ সংহত করিয়া লন। তারপর দেবী শুম্ভকে নিহত করিতে সমর্থ হন। দেবীর আদেশে ইন্দ্র দৈত্যপতির সৎকার করেন।

যুদ্ধের ব্যাপার শেষ হইলে দেবী শচীকে নিজ দেহ হইতে বাহির করিয়া

ইন্দ্রকে পুরস্কৃত করেন। দৈত্যগণ স্বর্গ জয় করিলে শচীদেবী অপমানের ভয়ে মহামায়ার আশ্রয় লইলে তিনি শচীদেবীকে নিজ দেহে লুক্কায়িত করিয়া রক্ষা করিয়াছিলেন।

কাব্যটিতে দুই-এক স্থলে নৈসর্গিক বর্ণনাও দেখা যায়। রাত্রির বর্ণনা—

হেনকালে অস্তগত হৈল দিনমণি।
তিমির বসনাবৃতা আইলা রজনী।
সুনীল গগনতলে তারকার দল
ঝিকিমিকি করে যেন হীরক-উজ্জ্বল॥
সিংহের গর্জ্জন উঠে পর্ব্বত কন্দরে।
অজস্র তুষাররাশি ঝরে ঝরঝরে।
হিমালয়োপরি জ্বলে ওষধি সকল
তুহিন মণ্ডিত দেশ করিয়া উজ্জ্বল। —(৭১ পৃঃ)

প্রভাতের বর্ণনা—

বিভাবরী অবসান হইল এখন,
পূর্ব্বাঞ্চলে উষা দেবী দিলা দরশন।

... ...

পরিধিয়া দিবাকর-কররূপ-বাস
প্রকৃতি নূতন ভাবে পাইল প্রকাশ। —(৭২ পৃঃ)

কাব্যটি আটটি সর্গে বিভক্ত। কাহিনীটি সহজ সরল ভাষায় রচিত—কোথাও দুরূহ জটিলতা বা তত্ত্বের বিশ্লেষণ বা ভাষার কাঠিন্য নাই। সর্ব্বত্রই পয়ার ছন্দ ব্যবহৃত হইয়াছে—কেবল প্রত্যেক সর্গের শেষাংশে ত্রিপদী অথবা চৌপদীর ব্যবহার করিয়া বৈচিত্র্য আনিবার প্রয়াস রহিয়াছে।

অপূর্ব্ব প্রণয় বা দক্ষবধ-কাব্য—ললিতমোহন মুখোপাধ্যায় 'অপূর্ব্ব প্রণয় বা দক্ষবধ'-নামক কাব্যটি রচনা করেন। ইহার প্রকাশ-কাল ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দ। ইহা কবির রচিত দ্বিতীয় কাব্য। প্রথম রচনাটি মুদ্রিত হয় নাই। তাই 'বিজ্ঞাপনে' কবির মনের দ্বিধা ও সঙ্কোচ প্রকাশিত হইয়াছে।

কাব্যে ছয়টি সর্গ রহিয়াছে। সতী দক্ষালয়ে যাইবার পর কৈলাসের বর্ণনা এবং মহাদেবের সতীর নিমিত্ত চিন্তা বর্ণনা করিয়া কবি কাব্যের আরম্ভ

করিয়াছেন এবং দক্ষবধের পর দক্ষকে পুনর্জ্জীবন দান, সতীদেহ লইয়া মহাদেবের ভূমণ্ডল ভ্রমণ এবং নারায়ণ-কর্ত্তৃক সতীদেহ একান্ন খণ্ডে কর্ত্তন, মহাদেবের চেতনালাভ এবং সতীর ধ্যানে নিমগ্ন হওয়া পর্য্যন্ত কাব্যে স্থান লাভ করিয়াছে। কাব্যটির স্থানে স্থানে বর্ণনা-মাধুর্য্য লক্ষণীয়। সতীর দেহ-ত্যাগের সংবাদ পাইয়া মহাদেবের বিলাপ—

যাও প্রাণ যাও যথা সতী পাও,
না পাও এখানে এস না আর।—(৮ পৃঃ)

ভূতপ্রেতদিগকে দক্ষযজ্ঞ নষ্ট করিবার আদেশ দিলে যজ্ঞস্থলের অবস্থা—

এক ভিতে বসি দক্ষ রতন আসনে,
গর্ব্বিত গম্ভীর মূর্ত্তি বিরস বদন।
এদিগে যজ্ঞের কাণ্ড হতেছে সমাধা,
হেনকালে ঝড় যেন উঠিল আকাশে।
চারিদিগে হু হু শব্দ অন্ধকারময়,
ঘন ঘন বজ্রাঘাত, হয় বা প্রলয়।
মহাবেগে বহে বায়ু কাঁপিল মেদিনী,
কাঁপে তরু, মেরু, সিন্ধু, দক্ষের নগরী।
ত্রস্থ সভাস্থ সবে চারিদিগে চায়,
একি! একি! কি হইল, দেখিতে না পাই।
... ...
হর হর হর হর ঘোর কলরব,
থর থর থর থর কাঁপে যজ্ঞস্থল।
ববম্ ববম্ বম্ বাজাইয়া গাল,
লাফে লাফে বীরদাপে মারে মালসাট্। —(২২-২৩ পৃঃ)

সতীর দেহ খণ্ডিত হইয়া একান্ন স্থানে পতিত হইলে মহাদেব কৈলাসে গিয়া দেখিলেন—

চাহিলেন চারিদিকে, আঁধার জগৎ—
নিত্য সুখময় শৈল বিষসম আজ।
মুদিত করিয়া আঁখি দেখিলা হৃদয়ে—
বিরাজিত সতীমূর্ত্তি শশাঙ্ক লাঞ্ছিয়ে;

বসিলেন বিল্বমূলে যোগাসন করি,
করে মালা, মুখে জপ, সতী নামাবলী,—
সতী জ্ঞান, সতী ধ্যান, একতানমনে,
নিষ্ক্রিয় ইন্দ্রিয় সব, নিস্তব্ধ মহেশ,—
জগৎ উলটি যেন মহাঝড় শেষে
নীরবে নিস্তব্ধে বসি দেবতা পবন,
অথবা বাত্যার অন্তে মহাভয়ঙ্কর,
নিস্তব্ধ জগৎ কিম্বা নিস্পন্দ সাগর। —(৩৭-৩৮ পৃঃ)

স্থানে স্থানে ছন্দের মধ্যে দোষ-ত্রুটি লক্ষিত হয়। ভাষা সহজ সরল। বর্ণনা-রীতিটি সুন্দর। কাহিনীতে নূতনত্ব কিছু নাই, তবে শেষাংশে সমস্ত বিশ্বজগৎ হইতে মহাশক্তিকে অপসারিত করিয়া মহাদেবের হৃদয়ে তাঁহার স্থান নির্দ্দেশ দ্বারা কবি যে সত্য উদ্ঘাটিত করিতে চাহিয়াছেন তাহা অভিনব এবং ব্যঞ্জনাময়। তাই কাব্যটি কেবল কাহিনী-সর্ব্বস্ব হয় নাই—একটি গভীর ভাব-সত্যকে মূর্ত্ত করিয়া তুলিতে সক্ষম হইয়াছে।

তারক-সংহার-কাব্য—অক্ষয়কুমার সরকার প্রণীত 'তারক-সংহার-কাব্যটি' ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। কার্ত্তিকেয়-কর্ত্তৃক তারকাসুর-বধ কাব্যের প্রতিপাদ্য বিষয়। ইহা নয়টি সর্গে সমাপ্ত।

কাব্যটির কাহিনী-বিন্যাসে ও চরিত্রচিত্রণে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বৃত্রসংহার কাব্যের প্রভাব সুস্পষ্ট। তবে বৃত্রসংহার-কাব্যে ঘটনা-বিন্যাসের ক্ষেত্রে হেমচন্দ্রের অক্ষমতা এই কাব্যে দৃষ্ট হয় না। কাহিনী-অংশ সুসংবদ্ধ। কিন্তু চরিত্রসৃষ্টি সার্থক নয়।

প্রথম সর্গ—প্রথমে সরস্বতীর বন্দনা করিয়া কবি কাব্য আরম্ভ করিয়াছেন। তারকাসুর-কর্তৃক পরাজিত ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতাগণ হিমাদ্রি-শিখরে মন্ত্রণায় রত। দেবতা-গণের এই মন্ত্রণার মধ্যে উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীর মনে যে স্বাধীনতাবোধ এবং যে পরাধীনতার প্রতি বিরূপতা জাগিয়াছিল তাহার প্রকাশ দেখা যায়। ইন্দ্র দেবগণকে নিষ্ক্রিয় দেখিয়া ক্রোধ প্রকাশ করিলেন—

দেবত্ব দাসত্বে এবে হলো পরিণত,
বাকি মাত্র আছে নিতে দৈত্যপদধূলি। —(৪ পৃঃ)

অনলদেব ক্ষুব্ধ হইয়া ইন্দ্রের দোষ দেখাইয়া অনুযোগ করিলে পবনদেব

ইন্দ্রের প্রতি রাজকীয় ভক্তির পরিচয় দিয়া অনলদেবকে ব্যঙ্গ করিয়া কহিলেন—

অথবা কিঙ্কর বেশে দৈত্যরাজ পাশে
তোষ গিয়া মন তাঁর বিবিধ প্রকারে,
জানিয়া শরণাগত ক্ষমিবে তোমারে,
সেবিবে দৈত্যেশপদ মনের উল্লাসে।

স্বাধীনতা মহাব্রত করি উদযাপন,
দৈত্যপদরজঃ শিরে করিয়া ধারণ,
স্বর্গসুখ ভুঞ্জি সুখে করিবে ভ্রমণ,
কৃতার্থ হইবে আত্মা সকল জীবন।—(৮-৯ পৃঃ)

জলদেবতা আত্ম-কলহকে নিন্দা করিয়া কহিলেন—

পশুর (ও) জাতীয় প্রেম বিরাজে অন্তরে,
তা হতেও হেয় কিসে দেবতা সকলে,—(১০-১১ পৃঃ)

অবশেষে যমরাজের পরামর্শে সকলে ব্রহ্মার উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন।

দ্বিতীয় সর্গ—নৈমিষ কাননে শচীদেবী সুরবালাগণের সহিত দুঃখের ও বিরহের দিন অতিবাহিত করিতেছেন। রতিদেবী শচীকে সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিতেছেন। এমন সময় সখী চপলা আসিয়া দেবগণের ব্রহ্মার উদ্দেশ্যে যাত্রার সংবাদ দিলে ইন্দ্রাণী দুঃখের দিন অবসান হইতে দেরী আছে দেখিয়া অস্থিরচিত্তে রোদন করিতে লাগিলেন।

তৃতীয় সর্গ—ইহাতেও প্রথমে সরস্বতীর বন্দনা এবং পূর্ব্ব-কবিগণের বন্দনা স্থান পাইয়াছে। স্বর্গের দেবসভায় দানবরাজ আসীন—পাত্রমিত্র চতুর্দ্দিকে। দৈত্য-গুরু শুক্রাচার্য্য তারকাসুরের সাফল্যলাভে আনন্দিত হইয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলে দৈত্যরাজ বিনীতভাবে গুরুর পদধূলি লইলেন। একদিকে নম্রতা ও ভক্তি অপর দিকে বলিষ্ঠতা ও বীর্য্য দৈত্যরাজের চরিত্রটিকে মহাকাব্যের উপযোগী করিয়া তুলিয়াছে।

দেবগণের কার্য্যকলাপ গোপনে জানিবার নিমিত্ত দূত প্রেরিত হইয়াছে। তাহার প্রত্যাবর্ত্তনে বিলম্ব দেখিয়া দৈত্যরাজ অমাত্যকে নিজ চিন্তার কথা কহিতে লাগিলেন। এমন সময় দূত আসিয়া দেবগণের পুনরায় যুদ্ধ করিবার বাসনা লইয়া ব্রহ্মার উদ্দেশ্যে যাত্রার সংবাদ দিলে দৈত্যপতি উচ্চৈঃস্বরে হাস্য

করিয়া দেবগণের নির্লজ্জতার প্রতি ইঙ্গিত করিলেন। রাত্রি হইলে দৈত্যরাজ সভাভঙ্গ করিয়া অন্তঃপুরে গেলেন এবং বিষণ্ণবদনা নিরাভরণা মহিষী সুরসাকে দেখিলেন। সুরসা-সম্বন্ধে কবি লিখিয়াছেন—

নির্জ্জনে মিশায়ে বিধি সুধায় গরলে.
থুয়েছে কি দানবীর হৃদয় কমলে ?
অমৃতে গরল মিশি, বামার অন্তরে পশি,
বিষম বিষের বহ্নি হৃদে যবে জ্বলে,
কি যে তাহা কি ভাব সে বর্ণিব কি বলে। —(৫৮ পৃঃ)

দৈত্যরাজ মহিষীর বিষাদের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া শুনিলেন যে সুরসা রতিদেবীকে কেশবন্ধন করিয়া দিতে এবং চরণে অলক্ত দিতে কহিলে রতিদেবী তাহা উপেক্ষা করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহাকে দাসীরূপে না পাইলে মহিষীর সম্মান থাকে না। দানবপতি রতিদেবীকে আনিয়া দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া পত্নীকে খুসী করিলেন।

বীর দানবকুল যখন দেবগণকে তাড়াইবার জন্য নানারূপ কূট চিন্তায় মগ্ন তাহাদের অন্তঃপুরে তখন সুখৈশ্বর্য্যের হিসাব এবং নারীসুলভ ঈর্ষ্যা ও হিংসার দ্বন্দ্ব চলিতেছে। সুরসা দাম্ভিক, অভিমানী, ঈর্ষ্যাপরায়ণ ও স্বার্থপর, ইন্দ্রাণীর উপর তাঁহার ঈর্ষ্যার শেষ নাই এবং এই ঈর্ষ্যার বশবর্ত্তী হইয়া তিনি রতিদেবীর সেবা চাহিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে ব্যর্থকাম হইয়া তাঁহার ক্রোধাগ্নি প্রজ্বলিত হইলে তিনি কোন ন্যায়-অন্যায়কে মানিতে সম্মত হইলেন না; নিজ স্বার্থসিদ্ধির পথ খুঁজিতে লাগিলেন। দানবেরা স্বর্গরাজ্য জয় করিয়াছে বটে কিন্তু গৃহে বা বাহিরে তাহারা শান্তি খুঁজিয়া পায় নাই—কারণ দেবতাগণের শিক্ষা ও দীক্ষা তাহাদের নাই। তাহাদের হীন মনোবৃত্তি লইয়াই তাহারা অহেতুক জ্বলিতেছে।

চতুর্থ স্বর্গ—ব্রহ্মার নিকট যাইবার কালে দেবগণ তপস্যারত দেবমাতা অদিতিকে দেখিলেন এবং তাঁহার আশীর্ব্বাদ লাভ করিলেন। তারপর তাঁহারা নদ-নদী-গিরি অতিক্রম করিলেন—গ্রহ-উপগ্রহের রাজ্য উত্তীর্ণ হইলেন—মুনিঋষিগণের বাসস্থানের নিকট সামগান শুনিলেন এবং দেখিলেন—

অনন্ত ভক্তির স্রোত মৃদু প্রবাহিত
শান্তির সাগরে গিয়া মিলে অবিরত,

প্রেমের লহরী তায় উঠিয়া নিয়ত
ভক্তের হৃদয় বেলা করিছে প্লাবিত। —(৫৪ পৃঃ)

স্থানটির বর্ণনা অত্যন্ত সুন্দর হইয়াছে—ভক্তি ও শান্তির স্নিগ্ধতা যেন মূর্ত্ত হইয়া উঠে। কাহিনীর মাঝে মাঝে এইভাবে চিরন্তন সত্যকে রূপ দিবার এবং মানবের অতৃপ্ত আত্মাকে শান্তি ও আনন্দের পথের সন্ধান দিবার চেষ্টা দেখা যায়।

ব্রহ্মা দেবগণের মুখে দানবের অত্যাচারের কাহিনী শুনিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন। তাঁহার নয়ন হইতে অগ্নি-নিঃসরণ হইয়া দানবপতির প্রাসাদ প্রকম্পিত করিল। ব্রহ্মার এই ক্রোধাগ্নি বর্ণনার ভিতর কবির রচনা-নৈপুণ্য ব্যক্ত হইয়াছে। দেবতার ক্রোধাগ্নি তো সামান্য নয়। কবি সেই ভয়ঙ্করতাকে রূপ দিতে সক্ষম হইয়াছেন। এই ক্রোধাগ্নির বর্ণনা—

দেখিতে দেখিতে অগ্নি প্রচণ্ড নিঃস্বনে,
গর্জ্জিল গভীর নাদে দৈত্য বিনাশিতে,
প্রলয়ের শিখা যেন উঠি আচম্বিতে,
দহিতে উদ্যত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ভুবনে।
ত্রাসিত অমরবৃন্দ ভয়ঙ্কর রবে,
কম্পিত কাতর চিত ভীত কলেবরে
না পারি সহিতে তেজ সভয় অন্তরে,
ধাতার পশ্চাতে গিয়া লুকাইল সবে। —(৬০ পৃঃ)

ব্রহ্মার সহিত দেবগণ বিষ্ণুর নিকট গিয়া শুনিলেন পার্ব্বতীর পুত্র কার্ত্তিকেয়ের হস্তে তারকাসুরের বধ নির্দ্ধারিত।

পঞ্চম সর্গ—প্রথমে কবি দ্বৈপায়নের নিকট করুণা ভিক্ষা করিয়াছেন। সুমেরু পর্ব্বতে দেবগণ মহাদেবের ধ্যান ভাঙ্গাইবার উপায় নিরূপণের নিমিত্ত মন্ত্রণায় রত। কিন্তু ঐ কর্ম্মভার লইতে কেহই সম্মত নহেন। অবশেষে মদনদেবের উপর ভার অর্পিত হইলে মদনদেব দেবরাজের ক্রোধের ভয়ে ঐ কার্য্যে সম্মত হইলেন।

ষষ্ঠ সর্গ—দানবপতি ব্রহ্মার রোষবহ্নি দর্শনে অত্যন্ত চিন্তিত। চিন্তান্বিত দানবের অবস্থা—

বিষাদ কালিমা রেখা পড়িয়াছে ভালে,
নাহি দীপ্তি প্রভান্বিত, চিন্তা রাহু কবলিত

আবৃত অদৃষ্ট রবি দুঃখ ঘন জালে,
চিন্তিত অন্তরে সদা কি আছে কপালে।—(৮১ পৃঃ)

পতির মন ভুলাইবার জন্য সুসজ্জিত হইয়া সুরসা আসিলেন এবং দৈত্যরাজ তাঁহার প্রতিজ্ঞা পালন করেন নাই বলিয়া তিরস্কার করিলেন। দৈত্যরাজ নিজ দুশ্চিন্তার কথা মহিষীকে কহিয়া রতিকে দাসীরূপে পাইবার আশা ত্যাগ করিতে বলিলে মহিষী অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন ও কহিলেন—

থাক সুখে প্রাণনাথ! অনুচর সনে,
বহুশ্রমে রাজ্যধন, করিয়াছ উপার্জ্জন,
মিটাও মনের ক্ষোভ ভুঞ্জি সুখ মনে,
না চাহে সুরসা তব তুচ্ছ রাজ্যধনে। —(৮৯ পৃঃ)

স্বামীর দুঃখের অংশ সুরসা লইতে চাহেন না। নিজ ঐশ্বর্য্য ও শক্তির গর্ব্বে তিনি পূর্ণ। অপর দিকে কবি শচীর চিত্র আঁকিয়াছেন। রতি কুস্বপ্ন দেখিয়া ও দৈত্যরাজের প্রতিজ্ঞার কথা শুনিয়া দুঃখে ও দুশ্চিন্তায় বিচলিত—তখন শচীদেবী চপলার দ্বারা ইন্দ্রের নিকট অনুরোধ জানাইলেন যে মদনদেবকে যেন মহাদেবের নিকট প্রেরণ করা না হয়। শচীদেবী কহিলেন—

পরের অন্তরে অর্পিয়া যাতনা
না করে ইন্দ্রাণী সুখের কামনা,
তুচ্ছ রাজ্যধনে কি হবে বল না,
অনিত্য সকল (ই) নহে চিরন্তন। —(৯৪ পৃঃ)

দানব-রাজ্ঞী যখন স্বামীর বিপদেও বিচলিত না হইয়া নিজের দাম্ভিকতা ও স্বার্থসিদ্ধির উপায় লইয়া ব্যস্ত, ইন্দ্রাণী তখন এক সখীর দুঃখে দুঃখিত-চিত্তে দেবকুলের সুখভোগের উপায়ও জলাঞ্জলি দিতে প্রস্তুত। পাশাপাশি এই দুইটি চিত্রের মধ্যে দেবতা ও দানবের চরিত্রগত পার্থক্য ফুটিয়া উঠিয়া কবির শিল্পী মনের পরিচয় দেয়।

সপ্তম সর্গ—মহাদেব ধ্যানে মগ্ন। গৌরী শিবপূজা করিয়া অদূরে দণ্ডায়মান, দেবরাজের আদেশে মদনদেব ধনুকে টঙ্কার দিলে মহাদেবের তৃতীয় নেত্র হইতে অগ্নিকণা বহির্গত হইয়া মদনদেবকে ভস্ম করিল। দেবগণ স্তবে তাঁহার ক্রোধের উপশম করিয়া গৌরীর সহিত তাঁহার বিবাহের প্রস্তাব তুলিলে তিনি তুষ্ট হন। এদিকে রতি মদনদেবের দগ্ধ হইবার বৃত্তান্ত অবগত হইয়া প্রথমে হতচেতন

হন। পরে মহাদেবের নিকট আসিয়া ইন্দ্রকে চিতা প্রজ্বলিত করিতে অনুরোধ জানাইলে ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ মহাদেবের নিকট স্তব করিলেন এবং মহাদেবের কৃপায় মদনদেব পুনর্জ্জীবন লাভ করিলেন।

মদনদেবের পুনর্জ্জীবন প্রাপ্তি পুরাণ-লিখিত আখ্যানভাগে নাই। তাহাতে বর্ণিত আছে যে মহাদেবের অনুগ্রহ লাভ করিয়া রতি মর্ত্ত্যে কৃষ্ণের গৃহে দাসীরূপে ছিলেন এবং সেখানে মদনদেব জন্মলাভ করিলে উভয়ের পুনরায় মিলন হয়।

অষ্টম সর্গ—হর-পার্ব্বতীর নিকট কার্ত্তিকেয়কে প্রার্থনা করিয়া আনিয়া দেবগণ কার্ত্তিকেয়কে সেনাপতি-পদে বরণ করিলেন এবং,

ধাইল প্রচণ্ড রবে, নির্ভয় অন্তরে
স্বর্গের দুয়ারে গিয়া বাজাল দুন্দুভি। —(১২৩ পৃঃ)

নবম সর্গ—তারকাসুর যুদ্ধক্ষেত্রে কার্ত্তিকেয়কে দেখিয়া চিন্তিত হইলেন। কার্ত্তিকেয়ের বর্ণনা—

শিখীধ্বজ ষডানন, সহাস্য বদন,
প্রসর উরস কায়,
বীরচিহ্ন স্পষ্ট তায়,
হেরি নাই হেন যোদ্ধা জীবনে কখন। —(১২৮)

যুদ্ধে কার্ত্তিকেয় প্রথমবার হতজ্ঞান হইলেন। পার্ব্বতীর চঞ্চলতা দেখিয়া মহাদেব চপলার দ্বারা ত্রিশূল পাঠাইয়া দেন এবং তাহা দ্বারা প্রচণ্ড যুদ্ধের পর দানবরাজের মৃত্যু হয়। মহিষী সুরসা জলধিগর্ভে প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করেন।

কাব্যটিতে নয়টি সর্গ থাকিলেও ইহা বৃহৎ নয়। কবি ইহাতে চরিত্র-চিত্রণে দক্ষতা দেখাইয়াছেন। দানবরাজ-পত্নী স্বার্থান্ধ এবং দাম্ভিক। সুরসা-চরিত্রের উপর হেমচন্দ্রের ঐন্দ্রিলা-চরিত্রের প্রভাব দৃষ্ট হয়। দুইটি চরিত্রই একরূপ—স্বার্থপর, দাম্ভিক, পরশ্রীকাতর এবং কুটিল। দানবরাজের বলিষ্ঠতা ও বীর্য্যবত্তা এবং ভক্তি ও দেবপরায়ণতা সুন্দর। তবে দানবরাজের উপর বিধাতার ক্রোধের হেতু যেন কিছু দেখা যায় না। স্বর্গরাজ্য-জয় যদি দানবরাজের অন্যায় হয় তবে তিনি যুদ্ধে জয়লাভ করিলেন কি করিয়া বোঝা যায় না ; কারণ, হিন্দুর বিশ্বাসক্রমে—যথায় ধর্ম্ম তথায় জয়।

শচীদেবীর চরিত্রটিও অল্পের মধ্যেই আপন মহিমায় উজ্জ্বল। ইন্দ্রের চরিত্র সব সময় গাম্ভীর্য্য ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেয় না—চরিত্রটি অনেকখানি ক্ষুণ্ণ হইয়াছে।

কাব্যে ক খ খ ক রূপে চৌপদী, ত্রিপদী, কক খ খ ক ক রূপে স্তবক, ক ক ক খ রূপে চৌপদী প্রভৃতি ব্যবহৃত হইয়াছে। ভাষা সহজ ও গতিশীল। কাব্যটি সুখপাঠ্য। স্থানে স্থানে কবিত্বশক্তির নিদর্শন পাওয়া যায়। কাব্যটির মধ্যে মহাকাব্যের বলিষ্ঠতা নাই। কারণ বেশীর ভাগ চরিত্রই দুর্ব্বল। তারপর দানবের পতনের কোন হেতু প্রদর্শিত না হওয়ায় কাব্যটির গাম্ভীর্য্য এবং কাহিনীর গুরুত্ব নষ্ট হইয়াছে। তবে পৌরাণিক আবরণের অন্তরালে উনবিংশ শতাব্দীর জাতীয় জাগরণের সুরটি অলক্ষ্যে তখনকার জাতি-মানসকে রূপদান করিতে সমর্থ হইয়াছে। অগ্রগতির ইতিহাসে ইহা উপেক্ষণীয় নয়।

সতী-সংবাদ বা দক্ষযজ্ঞ ও পার্ব্বতী-পরিণয়-বিষয়ক কাব্য—হরিবালা দেবী রচিত 'সতী-সংবাদ বা দক্ষযজ্ঞ ও পার্ব্বতী-পরিণয়-বিষয়ক কাব্য'টি ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই কাব্যটি লেখিকা পঞ্চদশ বর্ষ বয়ঃক্রম-কালে রচনা করেন। কাব্যটিতে সতীর জন্ম হইতে দেহত্যাগ এবং গৌরীরূপে হিমালয়-গৃহে জন্ম ও মহাদেবের সহিত বিবাহ বর্ণিত হইয়াছে।

প্রথমে গণেশ, সরস্বতী, শিব, দুর্গা, শ্রীকৃষ্ণ ও কমলার বন্দনা করিয়া গ্রন্থের আরম্ভ। তারপর সৃষ্টিতত্ত্বের ব্যাখ্যা—

স্থাবর জঙ্গম নাই চন্দ্র সূর্য্য তারা।
জীব জন্তু নাই সব অন্ধকারে ভরা॥

মহাশক্তি তখন সৃষ্টির বাসনায় ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরকে সৃষ্টি করেন এবং তাঁহাদের পরীক্ষা করিবার জন্য গলিত শবরূপে ভাসিতে ভাসিতে যান। ব্রহ্মা তাঁহাকে দেখিয়া মুখ ফিরাইয়া লইলেন, বিষ্ণু পলায়ন করিলেন আর মহাদেব তাঁহাকে আসন করিয়া বসিলেন। মহামায়া মহাদেবের প্রতি তুষ্ট হইয়া মর্ত্ত্যে জন্মলাভ করিয়া মহাদেবের পত্নী হইবার প্রতিশ্রুতি দেন। তারপর মহামায়া ব্রহ্মাকে আদেশ দিলে ত্রিভুবন সৃষ্টি করিয়া ব্রহ্মা মানস পুত্রগণকে সৃষ্টি করিলেন এবং ক্রমে মানুষের সৃষ্টি হইল।

দক্ষরাজ মহামায়াকে কন্যারূপে পাইবার নিমিত্ত তপস্যা করিয়া তাঁহাকে লাভ করেন। কন্যার স্বয়ংবর-সভায় দক্ষ মহাদেবকে আমন্ত্রণ করেন নাই।

সতী মহাদেবের উদ্দেশ্যে মাল্য অর্পণ করিলে মহাদেব অন্তরীক্ষ হইতে তাহা গ্রহণ করেন। অন্যান্য দেবগণের মধ্যস্থতায় বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হইল। কিন্তু দেব-ঋষিগণের যজ্ঞে শ্বশুর ও জামাতার মধ্যে গোলযোগের সৃষ্টি এবং উভয় পক্ষের মধ্যে শাপ-শাপান্তের পর মহাদেবের প্রস্থান, দক্ষের সহিত মহাদেবের বিরোধিতাকেই বর্দ্ধিত করিল। দক্ষযজ্ঞে শিবের নিমন্ত্রণ হইল না। সতী দশ-মহাবিদ্যা দেখাইয়া শঙ্করকে ভীত করিলেন। মহাদেব ভীত হইয়া তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে দেবী কহিলেন—

"জগন্মাতা আমি পরমা প্রকৃতি।"

যজ্ঞস্থলে দক্ষ শিবনিন্দা করিলে—

পতিনিন্দা শুনি সতী হইলেন চিন্তিত।
অঙ্গ হতে অন্য নারী সৃজিলেন ত্বরিত॥
বলিলেন ছায়া সতী শুন মম বচন।
দক্ষে কটু বাণী বলে ত্যাগ করো জীবন॥
এত বলি দিব্য জ্ঞান দিলেন যে তাহারে।
অন্তর্হিত হন দেবী রাখি ছায়া সতীরে॥
মহামায়ার এ মায়া কেহ নাহি জানিল।
ছায়া সতী ভগবতী সকলই ভাবিল॥ —(৫৩ পৃঃ)

সতী দেহত্যাগ করিলে বীরভদ্র সমস্ত যজ্ঞ লণ্ডভণ্ড করিয়া দেয় এবং দক্ষের মস্তক কাটিয়া যজ্ঞানলে ভস্মীভূত করে। সতীর মাতা মহাদেবকে স্তব করিলে তিনি ছাগমুণ্ড বসাইয়া দক্ষকে পুনর্জ্জীবিত করেন। তারপর সতীর দেহ লইয়া মহাদেব সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ঘুরিয়া বেড়ান,

চরণ ভরেতে পৃথ্বী টলমল।
পদ নিক্ষেপেতে যায় রসাতল॥
তুলিলে আবার ভাসিয়া উঠিছে।
ফেলিলে সাগর সলিলে ডুবিছে॥ —(৮০ পৃঃ)

বিষ্ণু সুদর্শন দ্বারা সতী-অঙ্গ কাটিয়া ফেলিলে একান্নটি পীঠস্থানের সৃষ্টি হয়। মহাশক্তি মহাদেবের শোক নিবারণের জন্য হিমালয়ের গৃহে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিবার প্রতিশ্রুতি দান করেন। হিমালয় তপস্যা করিলে তাঁহার গৃহে মহাশক্তি গৌরীরূপে জন্মগ্রহণ করিলেন। কিন্তু সখীর সহিত মহাদেবের

নিকট গিয়া তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ করিতে সমর্থ হইলেন না। ইন্দ্র মদনদেবকে তাঁহার সাহায্যে পাঠাইলে মদনদেবের শরনিক্ষেপে মহাদেবের ধ্যান ভাঙ্গিল বটে, কিন্তু মদনদেব ভস্মীভূত হইলেন। উমা মদনদেবের নিমিত্ত কৃপাভিক্ষা করিয়া মহাদেবের চরণে অনুরোধ জানাইলে মহাদেব উমাকে চিনিতে না পারিয়া চলিয়া গেলেন। দুঃখিত-চিত্তে উমা কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন,—

স্বর্ণ জিনিয়া বর্ণ বিবর্ণ হইল
বিমলিন বদন চন্দ্রিমা।
কমল জিনিয়া অঙ্গ অস্থিচর্ম্মসার
ঘোর তপে পড়েছে কালিমা॥ —(১২২ পৃঃ)

গৌরী তথাপি শিবকে না পাইয়া অগ্নিতে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে গেলে দৈববাণীতে গৃহে ফিরিবার আদেশ পাইলেন। তপস্যা ও সাধনা না হইলে জগতে কিছুই লাভ করা যায় না। মহাশক্তিকেও তপস্যা করিয়া মহাদেবকে লাভ করিতে হইয়াছিল। বিবাহ-সভায়ও শিবকে লইয়া গোলমাল। তাঁহার ললাটে অগ্নি—অঙ্গে ফণী, রমণীকুল লজ্জিত ও ভীত। উমা তখন শ্বেত মক্ষিকারূপে শিবের নিকট গিয়া মনোহর মূর্ত্তি ধরিবার জন্য অনুরোধ করিলে তিনি তাঁহার মনোবাসনা পূর্ণ করেন। পুনরায় গৌরী মাল্যদান করিতে গেলে মাহাদেব পঞ্চানন হইলেন। গৌরী দশভুজা হইয়া তাঁহাকে মালা দেন। তারপর উভয়ে কৈলাসে গমন করেন।

কাব্যটিতে কোন সর্গ-বিভাগ নাই। ত্রিপদী, পয়ার, একাবলী, চৌপদী, এবং ক ক, খ খ, গ গ রূপে ছয় পঙ্‌ক্তির স্তবক কাব্যে ব্যবহৃত হইয়াছে। কাব্যটি সহজ ও সাবলীল। স্থানে স্থানে বর্ণনা মনোরম। তবে আখ্যানভাগ মামুলী, পৌরাণিক তত্ত্ব-ব্যাখ্যা মাঝে মাঝে স্থান লাভ করিয়াছে।-

ত্রিদিব-বিজয়—শশধর রায় কর্ত্তৃক রচিত 'ত্রিদিব-বিজয়' কাব্যটি ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। 'ভূমিকায়' কবি লিখিয়াছেন—

"এই গ্রন্থে যে-সকল যুক্তাক্ষর ব্যবহৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে কতিপয় যুক্তাক্ষরকে এবং কোনও কোনও স্থলে দীর্ঘস্বরকে দীর্ঘ উচ্চারণ করিতে হইবে।

"কোনও কোনও স্থানে শব্দের কোন কোন অক্ষরকে লুপ্ত রাখা হইয়াছে। যথা—'অবতীর্ণ' স্থলে 'বতীর্ণ' পরিণয় স্থলে 'পরিণ'। আশা করি ইহাতে যতিভঙ্গ কিম্বা অর্থবোধের ব্যাঘাত জন্মিবে না।"

কাব্যের বিষয়বস্তু—তারকাসুর-বধ। প্রথমে হিমালয়ের বর্ণনার মধ্যে একটু নূতনত্ব দেখা যায়, যেমন—

বিরাট বিশাল মূর্ত্তি প্রশান্ত ভৈরব,
বিস্তারি গগন-পটে, শৈলকুলপতি
বিরাজেন রাজেশ্বর। শোভিছে শিখরে,
বিচিত্র মুকুট সম অনন্ত তুষার,
খচিত বিবিধ বর্ণে, মণিময় যেন।
রাজদণ্ড রূপে ধরিছেন নগরাজ
মহাদ্রুমশ্রেণী করে দৃঢ় আকর্ষণে।
শ্যামল, ধবল, পীত, বিবিধ ভূষণে
ভূষিত প্রস্তর রাজি, গৈরিকাদি ধাতু
আচ্ছাদিছে রাজবপুঃ রাজপরিচ্ছদে।
কটিবন্ধ বাঁধিয়াছে মেঘমালাদলে।
পদতলে ভ্রমি গাইছেন প্রভঞ্জন
গম্ভীর মল্লারে, স্তুতিগীত, গায় যথা
বন্দিদল নৃপতিবন্দনা। —(১ পৃঃ)

হিমালয়ের বর্ণনায় 'বিরাট বিশাল মূর্ত্তি প্রশান্ত ভৈরব' অথবা 'শোভিছে শিখরে বিচিত্র মুকুট সম অনন্ত তুষার'—উপমাগুলি সুপ্রচলিত। কিন্তু তাহার রাজবেশের বিভিন্ন পরিচ্ছদ ও স্তবস্তুতির কল্পনার মধ্যে কবির নিজস্ব ভাবধারা অভিব্যক্ত হইয়াছে। এই বর্ণনার গাম্ভীর্য্য ও বিশালতার পটভূমিকায় আমরা একটি বৃহৎ ঘটনার সম্মুখীন হইবার আশা করি এবং কাব্যের বিষয়বস্তুর পক্ষে সেইজন্য ইহা অতীব উপযোগী হইয়াছে।

হিমালয়ের উপর তারকাসুর-কর্ত্তৃক পরাজিত দেবরাজ নিজ কৃতকর্ম্মের কথা ভাবিতেছেন। দিক্‌পালগণকে দশ দিকের ভার দিয়া নিজে তিনি বিলাস-ব্যসনে এবং আমোদে মগ্ন ছিলেন। প্রজাবৃন্দের উপর অত্যাচারের সংবাদ রাখেন নাই। প্রতিধ্বনি অবিচারের কথা জানাইতে আসিলে তিনি অবিশ্বাস করিয়া কর্ণরোধ করিতেন এবং সেইজন্য—

দৈত্যসহ মিশি তেঁই জীবকুল যত,
গ্রহ, উপগ্রহ, কিম্বা নক্ষত্রনিবাসী,—

সাধিলা এবাদ এবে। কে জানিত কবে
অশরীরী, অস্ত্রহীন, জীবাত্মার দল
ঘটাইবে এ বিপদ। —(৬ পৃঃ,)

বিপদ্ যখন আসে তখন সব দিক্ হইতেই আসে এবং তাহা কৃতকর্ম্মের ফলরূপেই আসে। গ্রহ-উপগ্রহ-নক্ষত্রাদি প্রতিকূল থাকার জন্যই তারকাসুর ইন্দ্রকে পরাজিত করিতে পারিয়াছেন। এই ব্যাখ্যাটি হিন্দুর বিশ্বাসানুগ।

ইন্দ্র মানুষের ন্যায় নিজ দুর্ভাগ্যের জন্য বিধাতাকে দোষারোপ করিলেন। বিধাতা তাঁহাকে বিশাল সাম্রাজ্য দিয়াছেন এবং তাহাতে নিয়ম-শৃঙ্খলা রক্ষা করা কাহারও পক্ষেই সম্ভব নয়। তারপর ইন্দ্র অন্যান্য দেবগণকে দেখিতে পাইলেন—

… … কতক্ষণ পরে
হেরিলা সম্মুখে, দেবকুলে, অঙ্গার
যেমতি ম্লান রহিয়াছে পড়ি ভূতলে। —(৭ পৃঃ)

হীনবীর্য্য দেবগণের বিষাদের চিত্রটি সুন্দর হইয়াছে। প্রভঞ্জন হিমালয়ের শীতলতা সম্বন্ধে কহিলেন—

… … যে অসহ্য হিম
সহি, রহিয়াছি এতদিন, আর
না পারিব প্রভু। জড় হ'ল যেন দেহ,
ঘন অচঞ্চল। —(৮ পৃঃ)

তুষার-স্পর্শে প্রভঞ্জনের অবস্থা-প্রকাশে বর্ণনাটি মনোরম। আর কুবের স্বর্গরাজ্য ত্যাগ করিয়া আসিবার কালে অনেক মণিরত্ন সঙ্গে আনিয়াছিলেন। তিনি তাহাদের সজ্জিত করিতেই দিনরাত কাটাইতেছেন—অন্য কোন দিকে তাঁহার লক্ষ্য নাই। কবি লিখিয়াছেন—

… … আনিয়াছে
ধনরাশি আপন সংহতি, ধনলোভী!
হায় রে জগতে সদা এই সবাকার
এ পাপের এই ফল, এই পরিণতি। —(৯ পৃঃ)

এই-সকল বর্ণনা দ্বারা দেবচরিত্র অনেকখানি ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। অবশ্য দেবগণ মহিমাভ্রষ্ট না হইলে অসুরগণের নিকট পরাজিত হইতেন না, ইহা

মহাদেবের সহিত গৌরীর বিবাহকালে "ইন্দ্রলোকে স্পন্দিল লোচন বাম তারক অসুরে।"—(৬৬ পৃঃ)

বিবাহের পর গৌরী দশভুজা ত্রিনয়নী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া হরের অঙ্গের সহিত মিশিয়া অর্দ্ধাঙ্গ হইয়া অন্তর্হিতা হইলেন।

কার্ত্তিক অস্ত্রশিক্ষার নিমিত্ত বিশ্বকর্ম্মার নিকট গেলেন এবং নিজের শিশুকালের ক্রীড়ার কথা উল্লেখ করিয়া বলিলেন—

বিচরি বিশাল শূন্যে, গ্রহ উপগ্রহে
ধরিতাম ক্রীড়াচ্ছলে, আকর্ষি নিগ্রহে,
ছুড়ি ফেলিতাম দূরে শৈশব বিক্রমে,—
কিম্বা পরস্পরে, ঠুকাঠুকি করিতাম
কৌতুক আবেগে, চূর্ণ চূর্ণ হয়ে যবে
পড়িত ভাঙ্গিয়া, মহারঙ্গে সে স্ফুলিঙ্গ
ধরিতাম করে, লম্ফে লম্ফে। মল্লযুদ্ধ
করিতাম কভু, পবন দেবের সনে
মহা মহোল্লাসে। বড় কৌতুহল মোর
হ'য়েছে এখন শিখিবারে অস্ত্রশিল্প। —(৭১ পৃঃ)

তারকাসুরকে বধ করিবার জন্য যাঁহার জন্ম তাঁহার উপযুক্ত বাল্যক্রীড়াই এস্থলে বর্ণিত হইয়াছে। বিশ্বকর্ম্মা সমস্ত অস্ত্রের চালনা শিখাইবার পর কার্ত্তিককে ক্ষমা-অস্ত্র দান করিলেন। শক্তির সহিত ক্ষমা না থাকিলে তাহা অত্যাচারে পরিণত হয়।

দেবগণের মধ্যে যখন যুদ্ধের আলোচনা চলিতেছিল সে সময় একজন দৈত্যদূত আসিয়া স্বর্গরাজ্য দেবগণকে প্রত্যর্পণ করিতে দানবরাজের ইচ্ছার কথা কহিল। কার্ত্তিক ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে ভৎর্সনা করিয়া কহিলেন যে দেবগণ স্বর্গরাজ্য ভিক্ষা চাহেন না—ভুজবলে তাঁহারা তাহা অধিকার করিবেন। দেব-সেনাপতির উপযুক্ত কথা।

দেব-দানবের মধ্যে সাতদিন যুদ্ধের পর সকলে যখন বিশ্রাম লইতেছিলেন তখন বিকটাক্ষ দৈত্যরাজকে অসতর্ক দেবগণকে আক্রমণ করিবার পরামর্শ দিলে দৈত্যরাজ ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে ভৎর্সনা করিলেন। কিন্তু তাঁহার মনে ঐ পাপ চিন্তা ঘুরিতে লাগিল। এমন সময় শিব-অনুচর নন্দী তাঁহার কর্ণে

কহিয়া গেলেন—"শঙ্কর বিমুখ"। দৈত্যরাজের চেতনা ফিরিল। তিনি মহাদেবকে ধ্যান করিবার চেষ্টা করিলেন কিন্তু ব্যর্থ হইলেন। তখন তিনি শীঘ্র যুদ্ধে দেবগণকে পরাজিত করিয়া বহুবর্ষব্যাপী তপস্যায় মগ্ন হইবেন স্থির করিলেন এবং দেবগণকে আক্রমণ করিলেন। কার্ত্তিক মহামায়া-প্রেরিত স্তম্ভন-শূল দ্বারা আঘাত করিয়া দৈত্যরাজকে আহত ও বন্দী করেন। বন্দী অবস্থায় তারকাসুর মহাদেবকে ডাকিতে থাকিলে মহাদেবের আদেশে নন্দী আসিয়া তাঁহাকে নানারূপ তত্ত্বকথা শুনাইলেন। তারপর তারকাসুর নানারূপ বিভীষিকা দেখিতে দেখিতে অচৈতন্য হইলে নন্দী কার্ত্তিককে স্মরণ করিলেন। কার্ত্তিক তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া পবিত্র করিলেন, তারপর ত্রিশূল দ্বারা তাঁহার আত্মাকে মুক্ত করিলেন।

দানবরাজের অন্তর্দ্বন্দ্ব, যুদ্ধ, বিভীষিকাদর্শন, প্রভৃতি অতি সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। বিভিন্ন তত্ত্ব-ব্যাখ্যা সরল ভাষায় ভাব-সমৃদ্ধ হইয়া কাব্যকে গাম্ভীর্য্য ও সৌন্দর্য্য দান করিয়াছে। বিভিন্ন স্থান ও কার্য্যের ব্যাখ্যার মধ্যে কবির কল্পনাশক্তির বিকাশ যেমন দৃষ্ট হয় তেমনি অনুভূতির গভীরতাও উপলব্ধি করা যায়। দেবচরিত্র এবং দানবচরিত্র আপন আপন মহিমায় উজ্জ্বল।

ইহাতে আটটি সর্গ রহিয়াছে। সম্পূর্ণ কাব্যটিই অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত। দুই-এক স্থলে ছন্দের অনুকূলে শব্দের সঙ্কোচন হওয়াতে ভাষা কোথাও অবোধ্য বা শ্রুতিকটু হয় নাই। অমিত্রাক্ষর ছন্দের ব্যবহারেও কবির দক্ষতা লক্ষণীয়।

দেবীযুদ্ধ—শরচ্চন্দ্র চৌধুরী বিরচিত 'দেবীযুদ্ধ' কাব্যটি ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। মহাদেবকে পূজা করিয়া শুম্ভ-নিশুম্ভ অত্যন্ত প্রতাপশালী হন এবং স্বর্গরাজ্য অধিকার করেন। পরাজিত দেবগণ মহাশক্তির আরাধনা করেন। মহাশক্তি তুষ্ট হইয়া শুম্ভ-নিশুম্ভকে নিহত করেন। ইহাই কাব্যের প্রতিপাদ্য বিষয়।

কাব্যটিতে বিষয়বস্তুর অবতারণায় একদিকে পৌরাণিক আখ্যান ও জনসাধারণের বিশ্বাস যেমন অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে—অপর দিকে তত্ত্ব-ব্যাখ্যায় এবং দেবগণের পরাধীনতার কারণ নির্ণয় প্রভৃতি বিষয়ে উনবিংশ শতাব্দীর ভাবধারার প্রকাশও রহিয়াছে।

দানবগণ স্বর্গরাজ্য জয় করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই—দেবগণকে নজরবন্দী করিয়া রাখিয়াছে। কেবলমাত্র পবনদেব বিশ্বপ্রাণ বলিয়া মুক্ত রহিয়াছেন।

দেবতাগণ তাই পবনদেবের শরণ লইয়া দৈত্য-কারাগারে বন্দী দেবগুরু বৃহস্পতির নিকট জয়লাভের উপায় জানিবার ব্যবস্থা করিলেন এবং দেবগুরুর উপদেশে নিদ্রাদেবীর সাহায্যে দানবগণকে নিদ্রায় আচ্ছন্ন করিয়া পরামর্শের সুযোগ করিয়া লইলেন। এই ভাবটুকুর মধ্যে কাব্যটি বেশ জমিয়া উঠিয়াছে। দেবতাদের পতনের কারণ বিভিন্ন দেবতার মুখে ব্যক্ত হইয়াছে।

মহাদেব কহিলেন যে, দেবগণ যখন বিলাস-ব্যসনে মত্ত, দানবগণ তখন তপস্যা করিয়া শক্তি অর্জ্জন করিয়াছে। সুতরাং—

যে পথে শত্রুর গতি, বিঘ্ন চাই সেই পথে,
তপস্যাই প্রতিকার ঘোরতর তপস্যার,
তপোবলে দৈত্যপতি ত্রিলোকের অধীশ্বর,
বাক্যবলে পরাজয় কখন হবে না তার।
বংশগত বিলাসিতা, বংশগত অহঙ্কার,
বংশগত বলগর্ব্বে দেবতার অধঃপাত,
কর্ম্মবীর দেবকুল বাক্যবীর এবে হায়।
করিয়া কর্ম্মের পূজা শুম্ভ বিশ্বনাথ। —(৩৪ পৃঃ)

শারব নিদ্রিত অবস্থায় দানবগণকে হত্যা করিবার উপদেশ দিলে কার্ত্তিক ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে ভৎর্সনা করিলেন। মহাদেব গৃহ-বিচ্ছেদ সম্বন্ধে সতর্ক করিয়া কহিলেন—

কি দেবতা, কি মানব, সবারি বিপদ-কালে
একতা প্রধান বল, অনৈক্যেতে সর্ব্বনাশ,
এখন দেবের দলে প্রবেশে অনৈক্য যদি,
তবে আর দেবতার ঘুচিবে না কারাবাস। —(৪৫ পৃঃ)

দেবগুরু বৃহস্পতি উপদেশ দিলেন—

তপোবলে তপোবল করিতে হইবে জয়,
জাতীয় উদ্ধারে ঘোর জাতীয় সাধন চাই,
নির্জ্জিত দেবতাকুল, জাতীয় সাধন বিনে,
জাতীয় এ মহারোগে অন্য মহৌষধ নাই।

অন্তর্হিতা মহাশক্তি অদৃষ্টের অন্তরালে,
কঠোর সাধনে তাঁর করা চাই উদ্বোধন,
মজ্জিত জাতীয় তরী দুর্দ্দশা সিন্ধুর নীরে,
সমবেত শক্তি বিনে কে করিবে উত্তোলন ?
... ...
মহাশক্তি আরাধনে জাতীয় সাধন লাগে,
জাতীয় হৃদয় প্রাণ, জাতীয় কৌশল বল,
ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, সুখ-দুঃখ, ক্ষতি লাভ,
জাতীয় সাধনে চাই বলিদান এ সকল। —(৫২ পৃঃ)

এই-সকল পঙ্‌ক্তিতে জাতীয়তা-বোধের উদ্বোধন লক্ষণীয়।

দেবগণ বৃহস্পতির উপদেশে শক্তিক্ষেত্রের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে অনৈক্য, হিংসা, প্রভুত্ব, লোভ ও অবসাদ আসিয়া বিঘ্ন জন্মাইতে লাগিল। দেবগুরু এই বিঘ্নগুলির কারণ ব্যাখ্যা করিয়া কহিলেন—

ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা, আর লক্ষ্যের স্থিরতা,
এ সকল গুণ নাই চরিত্রে যাহার,
নিতান্ত যে অপদার্থ, শক্তি সে পাইলে,
করিত নিমেষে এ বিশ্ব ছারখার। —(৬৯ পৃঃ)

সাধনার পথে বিঘ্নের প্রয়োজন এবং বিঘ্নের অগ্নি-পরীক্ষায় কলুষতা ও গ্লানির ক্ষয় সুন্দরভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। এই-সকল তত্ত্বব্যাখ্যার মধ্যে ঊনবিংশ শতাব্দীর যুক্তিবাদের প্রকাশ লক্ষিত হয়।

অবসাদ-ভূমিতে দেবগণ কর্ম্মের স্পৃহা হারাইয়া দৈত্যের অধীনতা স্বীকার করিয়া কিরূপে স্ব স্ব স্বার্থসিদ্ধি করিতে পারেন তাহার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। দেবগুরু তাঁহাদের নানাভাবে উপদেশ ও উৎসাহ দিয়া ব্যর্থমনোরথ হইয়া যখন বিশ্বের মঙ্গলের জন্য ধ্যানে বসিলেন তখন—

ক্ষণপরে সেই জ্যোতিঃ বিশ্ব-বিভাসন,
দেবগুরু-দেহ ভেদি হইল বাহির,
প্লাবিত হইল তাহে নিখিল ভুবন,—
অবসাদ-পরিমুক্ত দেবের শরীর। —(১০০ পৃঃ)

কাব্যটিতে দেবগুরুর চিত্রটি অতি সুন্দরভাবে অঙ্কিত করা হইয়াছে। যে সকল গুণাবলী থাকিলে দেবগণের গুরুপদ লাভ করা যায় তাহার সব গুণই বৃহস্পতির মধ্যে রহিয়াছে। দেবগুরুর নিকট শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া দেবগণ শক্তির আরাধনা করিলেন। শক্তিলোকের বর্ণনার মধ্যেও কবির কল্পনাশক্তির ও তত্ত্ব-দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন—

জড় জগতের মধ্য-বিন্দু-রূপে
ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রে শক্তিলোক শোভে,
বিশ্বপিতা সহ বিশ্বের জননী
বিরাজেন তথা সদা দ্বন্দ্ব-ভাবে।
... ...
চরণ হইতে তাড়িত-প্রবাহ
বহিছে যুড়িয়া অনন্ত গগন,
সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ ত্রিধারায় সদা
বহিছে, ব্রহ্মাণ্ড-সৃষ্টির কারণ।
বহিতেছে মায়া, বাসনা, কল্পনা,
প্রেম-প্রীতি-ধারা বহে সারি সারি,
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড করিয়া প্লাবিত
বহে মাতৃ-স্নেহ-অমৃত-লহরী। —(১০২-৩ পৃঃ)

দেবগণের স্তবে তুষ্ট হইয়া মহাশক্তি তাঁহাদের নিকট আবির্ভূতা হইলেন এবং তাঁহাদের ত্রৈলোক্য-বিজয়-মন্ত্র দিয়া নানাবিধ উপদেশ দান করিলেন ও কহিলেন—

ন্যায়-ধর্ম্ম তরে সর্ব্বস্ব ছাড়িতে,
স্বদেশের হিতে আত্মবলি দিতে
যে জাতি বিমুখ, যে জাতির ভয়,
স্বাধীনতা সুধা সে জাতির নয়। —(১৩১ পৃঃ)

দানবগণের পতনের কারণরূপে কবি তাহাদের অত্যাচারের সুন্দর বর্ণনা দিয়াছেন। তপস্যার দ্বারা শক্তি লাভ করিয়া তাহারা শক্তির অপব্যবহার করিয়াছে। অবিচার, অনাচার ও অত্যাচার তাহাদের রাজনীতির মূলমন্ত্র। দানবপতি তাঁহার অনুচরবর্গকে কহিতেছেন—

যখন তখন সবে ধর্ম্মের দোহাই দিবে,
করিয়া ধর্ম্মের ভান প্রতারিবে প্রজাকুল,
যেমন করিয়া পার রাখ সদা পদানত
জিত জাতি, শাসনের নীতি মন্ত্র এই মূল।
প্রতারণা, প্রবঞ্চনা, নরহত্যা, মিথ্যা কথা,
বিচারেতে পক্ষপাত, নির্দ্দয়তা, ব্যভিচার,
সম্পাদিতে এ সকল সঙ্কুচিত চিত্ত যার,
দানব-নামের যোগ্য নয় সেই কুলাঙ্গার। —(১৫০ পৃঃ)

শক্তির এই অপব্যবহারে মহাশক্তি ক্রুদ্ধ হইলেন এবং অপূর্ব্ব রমণী-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া দৈত্যবধের নিমিত্ত কাঞ্চনগিরিতে আবির্ভূত হইলেন। দৈত্য-রাজ সংবাদ পাইয়া দেবতাদিগের দলত্যাগী বিশ্বাসঘাতক প্রতীন্দ্রকে দেবী-আনয়নের আদেশ দিলে সে নিজ অন্যায় কর্ম্মের জন্য অনুতাপ করে এবং দানবগণও তাহার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে বলিয়া দোষারোপ করে। স্বর্গরাজ্য পাইবার লোভে সে দেবগণকে ত্যাগ করিয়া দৈত্যরাজের সহায়তা করিয়াছে ও স্বজাতির প্রতি অত্যাচার করিয়াছে। কিন্তু দানবগণ তাহাদের প্রতিজ্ঞা রাখে নাই এবং প্রতীন্দ্র সেই প্রতিজ্ঞার কথা কহিলে মন্ত্রী বলিলেন—

রাজ্য-লোভে মতিচ্ছন্ন হইয়া যদ্যপি
স্বজাতির সর্ব্বনাশে শঙ্কা না করিলে,
কি বিশ্বাস, দৈত্যসহ রাখিবে সদ্ভাব,
ত্রিদিবের আধিপত্য স্বহস্তে পাইলে? —(১৬৩ পৃঃ)

প্রতীন্দ্র ক্রোধে, অপমানে ও অনুতাপে দেবী-আনয়নে অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়া দানব-কারাগারে বন্দীত্ব স্বীকার করিয়া কহিলেন—

স্বদেশ-স্বজাতি-দ্রোহী দেবাধম আমি,
প্রতারণা সে পাপের যোগ্য পুরস্কার,
স্বজাতির শোণিতে যে কলঙ্কিত-বাহু,
চিরকাল অনুতাপ প্রায়শ্চিত্ত তার। —(১৬৬ পৃঃ)

এবং,

বুঝিয়াছি স্বাধীনতা দান-দ্রব্য নহে,
পরের সাহায্যে নাহি মিলে এ রতন,

বীরভোগ্যা বসুন্ধরা বীরের আশ্রিত,
ত্রিদিব-দুর্লভ, নহে ভিক্ষার এ ধন। —(১৭০ পৃঃ)

দেবতার এই বিশ্বাসঘাতকার চিত্রে দেব-চরিত্রে কিছু কালিমা আনা হইয়াছে। অবশ্য যেখানে দেবগণও অদৃষ্টের দাস, যেখানে তাঁহারাও ভ্রান্তিতে মগ্ন হইয়া পরাধীনতা ভোগ করিতেছেন, সেখানে তাঁহাদের মধ্যে কেহ একজন বিশ্বাসঘাতকতা করিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কিছু নাই। তথাপি মনে হয় স্বদেশদ্রোহীর পরিণাম দেখাইবার উদ্দেশ্যেই কবি প্রতীন্দ্রের চরিত্রটি অঙ্কিত করিয়াছেন।

দানবরাজের আদেশে ধূম্রলোচন দেবীকে আনিতে গেলে এবং ভস্মীভূত হইলে রাজা চণ্ড-মুণ্ডকে ঐ কার্য্যের ভার দিলেন। চণ্ড রাজভক্ত, রাজাদেশ পালন করিতে তাহার মনে বিন্দুমাত্র দ্বিধা নাই। মুণ্ড সেরূপ নহে। সে রাজার কার্য্যের বিচার করিতে চায়। উভয়ের কথোপকথনের মধ্যে পরের দাসত্বের ভাল-মন্দ, রাজশক্তির সুফল-কুফল বিবৃত হইয়াছে।

রাজা আদর্শ চরিত্রের না হইলে প্রজার দুঃখেরই কারণ হন। মুণ্ড তাই কহিল—

স্বার্থ-লোভে অন্ধ, পরার্থ বিস্মরি,
পর-রাজ্যে রাজা করে অভিযান,
নির্দ্দোষ শোণিতে কলঙ্কিত ধরা,
করভারে প্রজা কণ্ঠাগতপ্রাণ!
জগৎ জুড়িয়া প্রজা-স্বার্থ এক,
বিরোধ কেবল রাজায় রাজায়,
রাজার জিগীষা, দম্ভ অহঙ্কার,
বিনা অপরাধে প্রজারে মজায়। —(১৮৭ পৃঃ)

এই-সকল কথাবার্ত্তার মধ্যে চণ্ড-মুণ্ডের চরিত্র কোথাও ক্ষুণ্ণ হয় নাই বরং দানবপতির পতনের কারণ নির্ণীত হইয়াছে। অপর দিকে উনবিংশ শতাব্দীর রাজশক্তির বিরুদ্ধে জাতির মনের ক্ষোভও যেন প্রতিধ্বনিত হইয়াছে।

চণ্ডমুণ্ডের পতনের পর রক্তবীজও যুদ্ধে নিহত হইল। নিশুম্ভ যোদ্ধবেশে সজ্জিত হইয়া পত্নী বীরভদ্রার নিকট গেলেন। বীরভদ্রা সখী বিরজাকে মণি-মুক্তা বাছিয়া দিতেছিলেন মালা গাঁথিবার জন্য—কিন্তু তাঁহার মনে অমঙ্গলের

ছায়া পড়াতে তিনি বিষণ্ণ ছিলেন। স্বামীকে যুদ্ধে পাঠাইতে তাঁহার মন সায় দিতেছিল না। তিনি স্বামীর অনুগামী হইতে চাহিলেন এবং অবশেষে সখী শার্দ্দুলাক্ষীকে সঙ্গে দিলেন। নিশুম্ভ যুদ্ধে নিহত হইলে বীরভদ্রা আসিয়া স্বামিদেহ লইয়া গেলেন। শুম্ভ দেখিলেন,—

চমকে দানব দেখিল চাহিয়া,
চণ্ডীর প্রভাব বীরভদ্রা-দেহে,
দেব-শক্তি-তেজে দৈত্য-শক্তি-তেজ
মিশিতে দেখিয়া চিত্রপ্রায় রহে। —(২৫০ পৃঃ)

নারী মহাশক্তির অংশ—এই ধারণার প্রকাশ পঙ্ক্তিগুলিতে লক্ষিত হয়। যুদ্ধ-ঝঞ্ঝা-অশান্তির মধ্যে বীরভদ্রার পতিপরায়ণতা যেন অনেকখানি স্নিগ্ধতা আনয়ন করে। চরিত্রটির অবতারণা এইজন্য সার্থক হইয়াছে।

শুম্ভ দেবীর সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়া অন্যান্য শক্তির আবির্ভাব দেখিয়া দেবীর একাকী যুদ্ধ করিবার প্রতিজ্ঞা স্মরণ করাইয়া দিলে অপর শক্তিগুলিকে সংহৃত করিয়া—

কহিলা চণ্ডিকা হাসি 'অজ্ঞান দানব !
একাকী জগতে আমি, দ্বিতীয় কে আর ?
আমার বিভূতি-চয় বহুরূপ ধরি,
ব্যাপিয়া রাখিছে নিত্য নিখিল সংসার।' —(২৫৬ পৃঃ)

বিশ্ব-ব্যাপী এক মহাশক্তির লীলা এবং বিভিন্ন মূর্ত্তিতে একেরই প্রকাশ ইহাতে সুন্দরভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। দেবীর অস্ত্রের আঘাতে দানব-পতির পতন হইলে দেবী তাঁহাকে পুনরায় চেতনাদান করেন। কারণ—

(১) আছিল দানবপতি স্বজাতি-বৎসল, (২৬০ পৃঃ)
(২) শুম্ভের দ্বিতীয় গুণ—প্রতিজ্ঞা অটল। (২৬১ পৃঃ)

দেবী ভক্তের বাঞ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য শুম্ভকে নিজ কেশ আকর্ষণ করিতে দিলেন এবং পরে নিহত করিলেন।

কাহিনীভাগ 'চণ্ডী' হইতে গৃহীত। ইহাতে মূল আখ্যানের সহিত কোথাও পার্থক্য দৃষ্ট হয় না। দেব-দেবীর চরিত্র সুন্দরভাবে অঙ্কিত হইয়াছে —কোথাও কোন চরিত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই। দানবচরিত্রের মধ্যেও তাহাদের বলিষ্ঠতা, নিষ্ঠা এবং অত্যাচার ও নির্ম্মমতা চরিত্রগুলিকে সজীব করিয়াছে

এবং পরিণতির দিকে চালিত করিয়াছে। স্থানে স্থানে পার্শ্ব-চরিত্রের মধ্যে এবং কার্য্যকারণ-সম্বন্ধ নির্ণয়ের মধ্যে উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালী-মনের স্বজাতি-প্রীতি ও যুক্তিবাদ প্রকাশ পাইয়াছে। পৌরাণিক কাহিনীর আবরণে জাতীয় জীবনের পরাধীনতার গ্লানি ও লজ্জাবোধ এবং তাহা হইতে মুক্তির উপায় বিবৃত হইয়াছে। তাই পৌরাণিক কাহিনী-কাব্যের ক্ষেত্রে ইহাতে নূতন স্বর ধ্বনিত হইতে দেখা যায় এবং ক্রমবিবর্ত্তনের ক্ষেত্রে ইহাই সুস্পষ্টভাবে ইতিহাসাশ্রিত কাহিনী-কাব্য রচনার প্রভাব ইঙ্গিত করে।

কাব্যটি একাদশ সর্গে সমাপ্ত। ইহাতে বিভিন্ন মাত্রা ও যতি-ভেদে চৌপদী ছন্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। ছন্দের গতি সরল, ভাষা সহজ—কাব্যটিকে সুখপাঠ্য বলা চলে।

৪

উদ্ধব-সংবাদ—কবি জয়রাম রচিত 'উদ্ধব-সংবাদ' কাব্যটি ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত হয়। গ্রন্থে লেখকের কোন নামোল্লেখ নাই, ভণিতায় আছে—

জয়রাম বন্দে ছন্দে দেহি পদে শরণং॥ —(১ পৃঃ)

অথবা,—

ময়ি দিন কুসন্তানে, রেখো রেখো চরণে
স্বকরুণে জয়রাম কয়॥ —(৫ পৃঃ)

কাব্যের কাহিনী-অংশ ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে। মথুরায় শ্রীকৃষ্ণ রাজা হইয়াও আনন্দ পাইতেছেন না—বৃন্দাবনের কথা, শ্রীরাধার কথা, পিতামাতার কথা স্মরণ করিয়া তিনি দুঃখের মধ্যে দিন কাটাইতেছেন। একদিন বৃন্দাবনের সংবাদ আনিবার জন্য তিনি উদ্ধবকে প্রেরণ করিলেন। উদ্ধবও শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় দেখিতে। বৃন্দাবনবাসী প্রথমে তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া ভ্রম করিলেন—কিন্তু ভ্রম দূর হইতে দেরী হইল না। উদ্ধব সকলের বিরহ-অবস্থা এবং শোক দেখিয়া সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইলেন না। অবশেষে শ্রীকৃষ্ণকে একবার বৃন্দাবনে লইয়া আসিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া মথুরায় আসিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত শুনিলেন, কিন্তু বৃন্দাবনে যাইতে

স্বীকৃত হইলেন না। কারণ শ্রীদামের অভিশাপ রহিয়াছে যে শ্রীরাধাকে শত বৎসর শ্রীকৃষ্ণের বিরহ ভোগ করিতে হইবে।

কাব্যে কোন চরিত্রই সম্পূর্ণ পরিস্ফুট নয়—সকলেরই আংশিক পরিচয় পাওয়া যায় এবং স্বল্প পরিসরের মধ্যেই তাঁহাদের প্রকাশ। শ্রীকৃষ্ণের রাধা-বিরহ ও বেদনা সুন্দরভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। আবার উদ্ধবের অনুরোধেও বৃন্দাবনে যাইতে তাঁহার অস্বীকৃতি ভক্তের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে কোমল-কঠোররূপে চিত্রিত করিয়াছে। নন্দ ও যশোদার বাৎসল্যের চিত্রটুকুও সুন্দর। যশোদার বিলাপ ও উক্তির মধ্যে স্নেহপরায়ণ মাতৃহৃদয়ের সুন্দর অভিব্যক্তি হইয়াছে। বিরহ-যন্ত্রণার মধ্যে রাধার প্রেমপরায়ণা বিরহকাতরা রূপটিও মধুর। সখীগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভৎর্সনা করিয়া স্ব স্ব বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করিয়াছেন।

কাব্যটি ত্রিপদী ও পয়ার ছন্দে রচিত। বিরহের বর্ণনাই কাব্যটিতে প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে। কাহিনী-কাব্য হিসাবে কাব্যটিকে সার্থক বলা চলে না—ইহা একটি ঘটনার বিবৃতিমাত্র।

দ্বারকা-বিলাস—জয়নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'দ্বারকা-বিলাস' কাব্যটি ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত হয়।

প্রথমে গণেশ-বন্দনায় বাংলার সহিত সংস্কৃত শব্দের মিশ্রণ দেখা যায়। মধ্যযুগের স্তবস্তুতিতে এই রীতির প্রচলন ছিল।

কাব্যটিতে শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকার লীলা বর্ণিত হইয়াছে। পুরাণের ন্যায় ইহাতেও কবি শ্রীকৃষ্ণের জন্ম দুরাত্মাদিগের নিধনের নিমিত্ত বলিয়া দেখাইয়াছেন। ধরিত্রী পাপিগণের ভার সহ্য করিতে না পারিয়া ব্রহ্মার নিকটে গেলেন—

সত্য ত্রেতা যুগে যত অসুর মরিল।
দ্বাপরান্তে ক্ষত্রিকুলে ক্ষিতিতে জন্মিল॥
যাগ যজ্ঞ নাশে আর করে বলাৎকার।
মদে মত্ত হয়ে করে অশুভ আচার॥
তাহাদের ভারে পৃথ্বী হয়্যা ভারান্বিতা।
ব্রহ্মার নিকটে গিয়া হয় উপনীতা॥ —(১-২ পৃঃ)

ব্রহ্মা তাঁহাকে আশ্বাস দিলে ধরিত্রী চলিয়া গেলেন। ব্রহ্মা দেবগণসহ বিষ্ণুর আরাধনা করিলেন ও দৈববাণীতে শুনিলেন—

আপনি জন্মিব আমি এ মহিমণ্ডলে।
হরিব ক্ষিতির ভার ভেব না সকলে॥ —(২ পৃঃ)

তারপর শ্রীকৃষ্ণের জন্ম, কংস-বধ, জরাসন্ধের সহিত যুদ্ধ ও বিজয় লাভ, দ্বারকাপুরীর নির্ম্মাণ, নারদ-কর্ত্তৃক লক্ষ্মীবিহনে দ্বারকাপুরীর সৌন্দর্য্য সম্পূর্ণ নহে উক্তির দ্বারা রুক্মিণীর সহিত বিবাহের প্রস্তাব, বিদর্ভরাজের কৃষ্ণের সহিত কন্যার বিবাহদানে সম্মতি, রুক্মীর বিরোধিতা ও শিশুপালের সহিত ভগ্নীর বিবাহ স্থিরীকরণ, রুক্মিণী-কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের নিকট গোপনে পত্রপ্রেরণ, গাত্র-হরিদ্রার দিন শ্রীকৃষ্ণের আগমন ও কন্যাহরণ, অন্যান্য রাজন্যবর্গের সহিত কৃষ্ণের যুদ্ধ ও জয়লাভ, রুক্মিণীর গর্ভে মদনদেবের জন্ম, রাজা সম্বর-কর্ত্তৃক মদনদেবের হরণ ও সমুদ্রে নিক্ষেপ, দাসীরূপে রতি-কর্ত্তৃক মৎস্য কাটিতে গিয়া মদনদেবকে প্রাপ্তি ও প্রতিপালন করা, মদন-কর্ত্তৃক সম্বর বধ ও রাজ্য অধিকার, সত্রাজিতের কণ্ঠে স্যমন্তক মণি দর্শনে শ্রীকৃষ্ণের প্রশ্ন, ঐ মণি কণ্ঠে ধারণ করিয়া প্রসেনের শিকারে গমন ও সিংহ দ্বারা নিহত হওন, জাম্ববান্-কর্ত্তৃক সিংহের নিধন, শ্রীকৃষ্ণের নিন্দা, কৃষ্ণের প্রসেনের সন্ধানে গমন এবং জাম্ববানের সহিত যুদ্ধ ও জাম্ববতীকে বিবাহ, কৃষ্ণ-কর্ত্তৃক সত্রাজিৎকে মণি অর্পণ, সত্যভামার সহিত কৃষ্ণের বিবাহ ও সত্রাজিৎ-কর্ত্তৃক মণি দান, নারদ-দত্ত পারিজাত-পুষ্প কৃষ্ণ-কর্ত্তৃক রুক্মিণীকে দান, সত্যভামার অভিমান, ইন্দ্র-কর্ত্তৃক পারিজাত-বৃক্ষ-দানে অসম্মতি, কৃষ্ণের যুদ্ধে গমন ও পথিমধ্যে নরকের সংহার ও ষোল সহস্র নারীকে বিবাহ, ইন্দ্রের সহিত কৃষ্ণের যুদ্ধ, মহাদেবের মধ্যস্থতায় ইন্দ্র-কর্ত্তৃক বৃক্ষ দান, রুক্মিণীর অভিশাপে পারিজাত-বৃক্ষের মাদার-বৃক্ষে পরিণতি, বাণরাজকন্যা উষার সহিত মদনপুত্র অনিরুদ্ধের গান্ধর্ব্ব বিবাহ, বাণরাজ-কর্ত্তৃক অনিরুদ্ধকে বন্দীশালায় স্থাপন, কৃষ্ণের যুদ্ধযাত্রা, বাণরাজ-পক্ষে শিবের যুদ্ধ ও পরাজয়লাভ, বিরাট যদুবংশ দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের ব্রহ্মশাপের বাসনা ও দুর্ব্বাসার অভিশাপ, মুষলের জন্ম, উলুখাগড়ার উৎপত্তি ও অবশিষ্টাংশ দ্বারা অস্ত্র তৈয়ারী, কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের বিষয় সম্পর্কে তর্ক করিয়া উলুখাগড়া লইয়া যাদবগণের মারামারি ও ধ্বংসপ্রাপ্তি, বালিপুত্রের ব্যাধরূপে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তীর নিক্ষেপ ও শ্রীকৃষ্ণের নিধন, অর্জ্জুনের বিষ্ণুতেজের উপশম, রুক্মিণী প্রভৃতি রমণীগণের প্রাণত্যাগ ও পাষাণত্ব-প্রাপ্তি—কাব্যটিতে বর্ণিত হইয়াছে।

অনেক ঘটনার সমাবেশে কাব্যের মাধুর্য্য ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। সর্ব্বত্র যোগসূত্রও

পাওয়া যায় না। চরিত্র-চিত্রণেও কোন বিশেষত্ব নাই। স্থানে স্থানে দেব-দেবীগণের চরিত্র ক্ষুন্ন হইয়াছে। লক্ষ্মী-স্বরূপিণী রুক্মিণীর বৈধব্য-পালন বিসদৃশ মনে হয়। সত্যভামার ঈর্ষ্যা ও অভিমান এবং পারিজাত-বৃক্ষ আনীত হইলে রুক্মিণীর ক্রোধ ও অভিশাপ-দান যেন চরিত্রগুলিকে ক্ষুন্ন করিয়াছে। যাঁহারা দেব-দেবীর আদর্শরূপে মানুষ দ্বারা পূজিত তাঁহাদের চরিত্রে সাধারণ নরনারীর ন্যায় হীন মনোবৃত্তির প্রকাশ কাব্যের সৌন্দর্য্যহানি করিয়াছে। অবশ্য এই ঘটনাগুলি বিশ্বাসের পরিপন্থী নয়।

কাব্যে ত্রিপদী, পয়ার, দীর্ঘ চৌপদী, দীর্ঘ ত্রিপদী, তূণক, যমক প্রভৃতি ছন্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। ভাষা এবং উপমা, উৎপেক্ষা প্রভৃতি প্রাচীনপন্থী। নারীগণ-কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের নিন্দা এবং দেবকী-কর্তৃক তাহা শ্রবণ ও শ্রীকৃষ্ণের নিকট জ্ঞাপন অংশটি গদ্যে রচিত। শ্রীকৃষ্ণ-কর্তৃক মণির উদ্দেশ্যে গমন ও জাম্ববানের দাসীর মুখে সংবাদ-লাভ অংশটিও গদ্যে রচিত। গদ্যাংশ অনেকখানি প্রাচীন রীতি মুক্ত। কমা, ছেদ, প্রভৃতি প্রায় যথোপযুক্ত স্থানে সন্নিবেশিত হইয়াছে, যেমন—

"দাসীর প্রমুখাৎ এই বাক্য শ্রবণ করতঃ শ্রীকৃষ্ণ আহ্লাদসাগরে নিমগ্ন হইয়া বিবেচনা করিলেন যে মণির উদ্দেশ্য প্রাপ্ত হইলাম তখন শ্রীকৃষ্ণ সেই দাসীর প্রতি কৌশল বাক্য দ্বারায় জিজ্ঞাসা করিলেন, হে দাসী যদ্যপি তোমাদিগের জাম্বুবানের কুশলবার্ত্তা কহ তবে স্যামন্তক মণি আমাকে অবিলম্বে সমর্পণ করহে।…" —(৬২ পৃঃ)

কাব্যখানিকে কোনদিক্ হইতেই সার্থক রচনা বলা চলে না।

কংসবিনাশ-কাব্য—দীননাথ ধর কর্তৃক রচিত 'কংসবিনাশ-কাব্য'টি ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ইহার প্রথম খণ্ডে চারিটি সর্গ রহিয়াছে এবং শকটাসুরের কৃষ্ণ-বধের নিমিত্ত গমন ও শিব-কর্তৃক শিশুকে রক্ষার নিমিত্ত দূত-প্রেরণ পর্য্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে। দ্বিতীয় খণ্ড রচিত বা মুদ্রিত হয় নাই।

প্রথমে সরস্বতীর বন্দনা করিয়া কবি কাব্য আরম্ভ করিয়াছেন—

কি ক্ষমতা ধরি হেন, ভবতল ছাড়ি।
তব সঙ্গ বিনে সুরলোক যেতে পারি॥
সেই হেতু দয়াময়ি, রসনাতে উর।
দয়া করি এ দাসের মনোবাঞ্ছা পূর॥ —(১ পৃঃ)

তারপর স্বর্গ ও নরকের বর্ণনা। নরক-বর্ণনা এস্থলে অবান্তর এবং কাব্য-রসের হানিকর।

দুষ্টের দমনের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ ধরাধামে জন্মগ্রহণ করিলেন পুরাণ-বর্ণিত এই কারণটি কবি গ্রহণ করিয়াছেন, কংসের অত্যাচার দেখিয়া আরাধনাদেবী ভক্তিদেবীর সহিত বৈকুণ্ঠে গিয়া কেশবের পদে জানাইলেন—

দুর্জ্জয় দনুজ দুষ্ট কংস দুরাচার।
দলিল সকল, দেব, নাশিল সংসার॥
কাটিল ধর্ম্মের দাম অধর্ম্ম অসিতে।
পাপভার ধরামাতা, না পারে সহিতে॥ —(৯ পৃঃ)

শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের আশ্বাস দিয়া কহিলেন—

চলি যাও সুখে, সুতে যথা সুরগণ।
কহি, ধরাভার নিজে, করিব হরণ॥ —(৯ পৃঃ)

সনকের সহিত শ্রীকৃষ্ণ মর্ত্তে আগমন করিয়া বৃন্দাবনের দৃশ্যাদি দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন এবং সেইস্থানে জন্মগ্রহণ করিবার বাসনা প্রকাশ করিলেন। এইখানে বৃন্দাবনের বর্ণনা স্থানে স্থানে সুন্দর হইয়াছে। কিন্তু বর্ণনার দৈর্ঘ্য কাব্যটিকে ক্ষুণ্ণ করিয়াছে। সনক-কর্ত্তৃক ভবিষ্যৎ শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন-লীলা-দর্শন সুন্দরভাবে সংযোজিত হইয়াছে, কিন্তু ইহার দৈর্ঘ্যও কাব্যের বিষয়বস্তুর তুলনায় সমতা রক্ষা করিতে পারে নাই।

পার্ব্বতীর গঙ্গার প্রতি সপত্নীদ্বেষ এবং মহাদেবের প্রতি কটূক্তি দেবীর মহিমা ক্ষুণ্ণ করিয়াছে।

বসুদেব-কর্ত্তৃক পুত্রকে নন্দগৃহে রাখিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পর রাত্রির বর্ণনাটি মনোরম—

গভীর যামিনী অর্দ্ধ, নিস্তব্ধ ধরণী।
ঝিকৃমিকে তারাবলী, নয়নরঞ্জিনী॥
ভৈরবীর ভালে যথা ভাতে আধ শশী।
সুধাংশুর অংশ দিব্য, নভঃশিরে বসি॥ —(৫৪ পৃঃ)

পূতনা, পরন্তপা, শকটাসুর, বিকটাসুর প্রভৃতির বর্ণনা এবং তাহাদের বাসস্থানের বর্ণনাগুলি সুন্দর। তাহাদের কার্য্যকলাপ ও মায়া-বিস্তার এবং শকটাসুরের স্বপ্নদর্শন প্রভৃতি কাব্য-রসকে সমৃদ্ধি দান করিয়াছে।

সম্পূর্ণ কাব্যটিই পয়ার ছন্দে রচিত। কাহিনী-অংশ সাধারণ জনশ্রুতিকেই অবলম্বন করিয়াছে। প্রাকৃতিক বর্ণনা স্থানে স্থানে কবিত্বে মণ্ডিত। কিন্তু কোন কোন স্থানে উপমা-বাহুল্য ও বর্ণনার দৈর্ঘ্য কাব্যরসকে ক্ষুণ্ন করিয়াছে। মাঝে মাঝে দুরূহ শব্দের ব্যবহারেও কাব্যটির সৌন্দর্য্য নষ্ট হইয়াছে

কবি চরিত্র-চিত্রণে কংসকে ক্রোধপ্রবণ ও উগ্ররূপে অঙ্কিত করিয়া পাঠকচিত্তে বিরাগ জন্মাইবার চেষ্টা করিয়াছেন এবং শিশুহত্যা প্রভৃতি নিষ্ঠুর কর্ম্মের হেতু নির্দ্ধারণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু চরিত্রটির মধ্যে মহত্ত্ব বা বীরত্ব কোথাও ফুটিয়া ওঠে নাই। বসুদেবের পত্নীপ্রীতি ও কর্ত্তব্যবোধ চরিত্রটিকে মাধুর্য্য দান করিয়াছে এবং দেবকীর সন্তান-বিয়োগে শোক ও অপরের কন্যার কংসের হস্তে বিনাশের কথা ভাবিয়া ব্যাকুলতা-প্রকাশ, মাতৃস্নেহের মূর্ত্তিটি ব্যক্ত করিয়াছে।

কাব্যটি পাঠ করিয়া মন তৃপ্ত হয় না, কারণ কাব্যটি কোথাও জমিয়া উঠে নাই।

দ্বারকাকেলি-কৌমুদী—বনওয়ারীলাল রায় কর্ত্তৃক রচিত 'দ্বারকাকেলি-কৌমুদী' কাব্যটি ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ভূমিকা পাঠে বোঝা যায় কবি বৃন্দাবনলীলা-সম্বন্ধীয় একটি কাব্যগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা নষ্ট হওয়াতে তিনি ভাগবতের দশম স্কন্ধ অবলম্বন করিয়া এই কাব্যটি রচনা করেন। ইহার উপর গোস্বামী তন্ত্রগুলির প্রভাবও দৃষ্ট হয়।

মঙ্গলাচরণে নারায়ণের বন্দনা আছে। তারপর কাহিনীর আরম্ভ। মথুরায় কংসকে বধ করিয়া কৃষ্ণ-বলরাম দেবকী ও বসুদেবের সহিত সাক্ষাৎ করেন। বহুদিনের দুঃখ-কষ্টের পর পুত্রকে ক্রোড়ে পাইয়া তাঁহাদের আনন্দের সীমা নাই। ইহার পর কৃষ্ণ-কর্ত্তৃক কুব্জাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ—জরাসন্ধের কংসবধ-সংবাদ-প্রাপ্তি এবং যুদ্ধে গমন ও পরাজয়—কৃষ্ণ-কর্ত্তৃক বিশ্বকর্ম্মাকে দ্বারকাপুরী নির্ম্মাণের আদেশ দান—সকলের দ্বারকায় গমন—মুচুকুন্দ রাজা কর্ত্তৃক কালযবন-বধ—মুচুকুন্দের কাহিনী, শ্রীকৃষ্ণের দর্শন-প্রাপ্তি ও বদরিকাশ্রমে গমন—জরাসন্ধ-কর্ত্তৃক প্রবর্ষণ-গিরি দগ্ধকরণ, রেবতীর সহিত বলরামের বিবাহ—শ্রীকৃষ্ণ-কর্ত্তৃক রুক্মিণী হরণ এবং তাহার সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিবাহ—প্রদ্যুম্নের জন্ম ও সম্বর দৈত্য কর্ত্তৃক হরণ—রতি-কর্ত্তৃক মদনের

পরিচয় লাভ ও লালন-পালন—প্রদ্যুম্ন ও সম্বরের যুদ্ধ—স্যমন্তক মণির কাহিনী ও জাম্ববতী এবং সত্যভামার সহিত কৃষ্ণের বিবাহ, শতধন্বা-কর্ত্তৃক সত্রাজিৎ বধ—শ্রীকৃষ্ণ-কর্ত্তৃক শতধন্বা বধ—কালিন্দী, নগ্নজিতী, ভদ্রা ও লক্ষণার সহিত কৃষ্ণের বিবাহ—কৃষ্ণ-কর্ত্তৃক মুরদৈত্য ও নরকাসুর বধ—ষোল সহস্র কন্যার উদ্ধার ও বিবাহ—কৃষ্ণের পারিজাত হরণ—সুরোচনার সহিত অনিরুদ্ধের বিবাহ—বলরাম-কর্ত্তৃক রুক্মী বধ—বাণ রাজার শিবের নিকট বরপ্রাপ্তি, উষার সহিত অনিরুদ্ধের বিবাহ—বাণ রাজার সহিত শ্রীকৃষ্ণের যুদ্ধ ও বাণ রাজার পরাজয়—উপবন-ভ্রমণে গমন করিয়া কুমারগণ-কর্ত্তৃক কৃকলাস দর্শন—বলরামের রাসলীলা—পৌণ্ড্রক, কাশীরাজ, জরাসন্ধ, শিশুপাল, শাল্ব, দন্তবক্র ও বিদুরথ প্রভৃতি বধ—যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ—শ্রীকৃষ্ণের সপরিবারে প্রভাস তীর্থে গমন—সুভদ্রা-হরণ—অর্জ্জুনের দর্প-নাশ—শ্রীকৃষ্ণের স্তব প্রভৃতি কাব্যে স্থান পাইয়াছে।

ভাগবতকে অনুকরণ করিয়া ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের জন্মের কারণ কবি কৃষ্ণের মুখ দিয়া ব্যক্ত করাইয়াছেন—

দুষ্টেরে দমন করি শিষ্টেরে পালিব।
ভারাক্রান্তা বসুমতী সে ভার হরিব॥ —(১৫ পৃঃ)

বিদর্ভ নগরে শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে সকলে আগমন করিল। এস্থলে মনু-সংহিতার প্রভাব অনুভূত হয়—

অন্ধের হইল নেত্র গমনাভিলাষে।
পঙ্গুর হইল পদ ধাইল উল্লাসে॥ —(১০২ পৃঃ)

জরাসন্ধের বধের পর শ্রীকৃষ্ণ জরাসন্ধের পুত্র সহদেবকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করিয়া উপদেশ দিয়াছিলেন—

অকারণ কারো ধন করো না হরণ।
ভুলে যাবে বিপক্ষের মন্দ আচরণ॥
দেশের করিবে হিত অশেষ প্রকারে।
মন্দ কর্ম্ম ভুলে তবে যাবে একেবারে॥ —(৩১২ পৃঃ)

এখানে দেশের প্রতি কবির নজর পড়িয়াছে দেখা যায়।

কাব্যে বার বার শিবকে শ্রীকৃষ্ণের নিকট পরাভূত করিয়া কৃষ্ণমাহাত্ম্যকে শ্রেষ্ঠ স্থান দিবার চেষ্টা দেখা যায়।

গ্রন্থশেষে কবি নিজ পরিচয় দিয়াছেন—

হরিপাল গ্রামে ধাম, বিশেষ বিখ্যাত নাম,
গোষ্ঠীপতি শিবদাস রায়।
তাঁহার বংশেতে দীন, বনোয়ারি জ্ঞানহীন,
কৃষ্ণলীলা রচিল ভাষায়॥ —(৪১০ পৃঃ)

কাব্যটিতে পয়ার, ত্রিপদী, দীর্ঘ পয়ার প্রভৃতি ছন্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহাতে স্থানে স্থানে তত্ত্বব্যাখ্যা দৃষ্ট হয়। কাহিনীর মধ্যে কোন নূতনত্ব নাই। বিভিন্ন পুরাণ ও ভাগবত হইতে কৃষ্ণ-সংক্রান্ত সমস্ত লীলা-কাহিনীই ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। কাব্যটির ভাষা গতিশীল ও সরল। তবে কবিত্বের স্ফুরণ কোথাও দৃষ্ট হয় না।

ভদ্রোদ্বাহ-কাব্য—হরিচরণ চক্রবর্ত্তী প্রণীত 'ভদ্রোদ্বাহ-কাব্য'টি ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। কাব্যটিকে একাধিক খণ্ডে প্রকাশিত করিবার ইচ্ছা কবির ছিল। তাই প্রথম খণ্ডে তিনটি সর্গে তিনি শ্রীবৎস রাজা ও চিন্তার শনিকোপে হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া দীন পল্লীতে অবস্থানের জন্য গমন পর্য্যন্ত বর্ণনা করিয়াছেন। পরবর্ত্তী খণ্ডগুলি প্রকাশিত হয় নাই।

প্রথম সর্গে লক্ষ্মী ও শনির বিরোধ এবং শ্রীবৎস রাজা কর্ত্তৃক লক্ষ্মীর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন লিপিবদ্ধ হইয়ছে।

দ্বিতীয় সর্গে শ্রীবৎস রাজার নানাবিধ আপদ্‌-বিপদ্‌, রাজার সস্ত্রীক বনগমন, শনি-কর্ত্তৃক সামান্য সম্বলও হরণ বিবৃত হইয়াছে।

তৃতীয় সর্গে শনির ছলনায় দগ্ধ শোল মৎস্যের পলায়ন এবং রাজা-রাণীর নগরের দীন পল্লীর দিকে গমন বর্ণিত হইয়াছে।

পয়ার ছন্দে কাব্যটি রচিত। তবে সর্ব্বত্র অন্তপদে যতি না পড়িয়া ছত্রমধ্যে যতিচ্ছেদ দৃষ্ট হয়। ভাষা কষ্টকল্পিত। স্থানে স্থানে দুরূহ ও দুর্ব্বোধ্য শব্দ ব্যবহার করিয়া কবি ফুটনোটে তাহার অর্থ লিখিয়া ব্যাখ্যা করিয়া দিয়াছেন। এই শব্দগুলির ব্যবহারে কাব্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন না করিয়া গতিকে ব্যাহত করিয়াছে। উপমা-রূপকাদিও সর্ব্বত্র যুক্তিযুক্তরূপে ব্যবহৃত হয় নাই। কাব্যটি কোথাও জমে নাই—কবিত্বের স্ফুরণও কোথাও নাই।

ঊষাহরণ—হরানন্দ রায় গুপ্ত কবিকেশরি 'ঊষাহরণ' কাব্যটি রচনা করেন। ইহাতে মুদ্রণের সময়ের উল্লেখ নাই। 'গ্রন্থকারের পরিচয়'

শিরোনামায় রচিত ছত্র হইতে বুঝা যায় কবি নবদ্বীপের অধিবাসী এবং সে সময় মহারাজ রাজেন্দ্র নবদ্বীপের অধিপতি ছিলেন—

নবদ্বীপ অধিপতি, মহোদয় মহামতি
মহারাজা রাজেন্দ্র নৃপতি।[1]

কবি নিজের পরিচয় দিয়াছেন—

ভীষক ভবানী শঙ্কর, রায়াখ্য ভবানী কিঙ্কর,
আয়ুর্ব্বেদে দক্ষ মহাশয়।
সুকবি পণ্ডিত নীত, হিতবক্তা উপস্থিত
সুরসিক সত্ত্বগুণময়॥
তাঁহার তনয় রায় হরানন্দ পরিচয়
পিতার চরণে রাখি মন।
পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম্ম, তপ জপ যজ্ঞ কর্ম্ম
চতুর্ব্বর্গ ষড় দরশন॥

ভূমিকায় কবি কাব্য-রচনার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে লিখিয়াছেন তারপর গণেশের ও সরস্বতীর বন্দনার পর গ্রন্থের আরম্ভ। বাণরাজকন্যা উষার সহিত অনিরুদ্ধের বিবাহ কাব্যের বিষয়বস্তু।

স্বপ্নদর্শনের পর উষাকে শান্ত করিবার জন্য এবং উষার দৃষ্ট ব্যক্তির পরিচয় জানিবার জন্য চিত্রলেখা সখী ভূমণ্ডলের সকলের চিত্র অঙ্কিত করিতে লাগিল। মদনদেবের চিত্র দেখিয়া উষা—

কামিনী কামের স্নুষা, শ্বশুরে দেখিয়া উষা
লজ্জাযুক্তা হইয়া আপনি।
আপনি আপন শিরে, ঘোমটা টানিয়া ধীরে,
ধীরে ধীরে ধরিয়া ধরণী॥ —(১৪ পৃঃ)

ঘটনাটি কৌতুকজনক। শ্বশুরের চিত্র দেখিয়াই পুত্রবধূ লজ্জায় অবগুণ্ঠনবতী হন—ইহা বাড়াবাড়ি মনে হয়।

উষার ভগ্নী ধূমাবতীর অবতারণা কাব্যে হাস্যরসের সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছে এবং কন্যাগণ-কর্তৃক জামাই ঠকাইবার রীতিটি বাঙ্গালীর সামাজিক রীতিরই প্রতিচ্ছবি ও উপভোগ্য।

একথাল কাব্য করে, জলপান দিল বরে,
উভয় দ্রব্যের এককার।
পিঠালির দধি ক্ষীর, চিনিপানা লোনানীর,
যুবতীর যে আছে ব্যাভার॥ —(৫৩ পৃঃ)

কালিকাকে কাব্যে শ্রেষ্ঠ স্থান দেওয়া হইয়াছে। অনিরুদ্ধ খাদ্য-গ্রহণ-কালে পিতামহী রুক্মিণীকে স্মরণ করিলে দৈববাণী শুনিলেন—

আদ্যাশক্তি ভগবতী আমি সে ত্রিগুণে।
নিরাকারে সাকার করেছি ছয় জনে॥ —(৫৭ পৃঃ)

আবার অনিরুদ্ধের বন্ধন-যন্ত্রণা হ্রাসের নিমিত্ত নারদ তাঁহাকে শ্রীদুর্গার মন্ত্র দান করেন এবং তাহা দ্বারা যন্ত্রণার লাঘব হয়। কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধেও বাণরাজ মহামায়ার স্তব করিলে তিনি বাণরাজের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ মহামায়ার স্তব করিয়া তাঁহাকে তুষ্ট করিলেন। অবশেষে হরি-হরের একাত্মভাব প্রচার করিবার জন্য হরি-হরের যুদ্ধের পরিসমাপ্তিতে কবি লিখিয়াছেন—"সর্ব্বশেষে হর গিয়া হরিতে মিশিলা" —(১৯৯ পৃঃ)। পরে তাহারই ব্যাখ্যা করিয়া লিখিয়াছেন—

মহারাজ চক্রবর্ত্তী নবদ্বীপ ভূপ।
স্থাপিলা অভেদ মূর্ত্তি রূপ সুধা কূপ॥
ঘুচালে মনের ভ্রান্তি মহা মহোদয়।
বৈষ্ণব শৈবের হৈল জ্ঞান পরিচয়॥
পশুপতি সতীগণ পতি দিবাকরে।
অভেদাত্মা সদাত্মা বুঝিবে হরি হরে॥
পঞ্চদেবে ভিন্ন যেবা মানে মূঢ় জন।
ইতর বিশেষ কৈলে নরকে গমন॥ —(২০৪ পৃঃ)

কাব্যটির মধ্যে কাহিনীই প্রধান। স্থানে স্থানে ভক্তিতত্ত্ব ও দর্শনতত্ত্ব ব্যাখ্যার প্রয়াস আছে। ইহা প্রাচীন রীতি অনুসরণে রচিত এবং পয়ারাদি ছন্দে লিখিত। ইহার মাঝে মাঝে গ্রন্থপাঠের সুফল বর্ণিত হইয়াছে এবং সর্ব্বশেষে 'ফলশ্রুতি' শিরোনামায় কবি লিখিয়াছেন—

উষাহরণের গান, একচিত্তে নারীগণ,
শুনিলে পতির শুয়া হয়।

ভক্তিযোগে শুনে গান তারে পতি দেখে প্রাণ
লোকে তারে পতিব্রতা কয়॥ —(২২৭ পৃঃ)

ইহাতে ছন্দের সাহায্যে কাহিনীর বিবৃতি রহিয়াছে কিন্তু কবিত্ব বা কাহিনীকাব্যের ব্যঞ্জনা কোথাও নাই।

নরক-সংহার—হরিলাল গোস্বামী প্রণীত 'নরক-সংহার' কাব্যটি ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ইহাতে দুইটি ভাগ আছে এবং সর্ব্বসাকুল্যে একুশটি সর্গ আছে।

কবি প্রথমে ব্যাসদেবের স্তব করিয়া অনুগ্রহ ভিক্ষা করিয়াছেন। নরকাসুর-কর্তৃক স্বর্গবিজয় এবং দেবমাতা দাক্ষায়ণীকে অপমানিত করিবার পর দেবগণের নিকট দাক্ষায়ণীর মর্ম্ম-বেদনা জ্ঞাপন ও দেবগণের কৈলাসের উদ্দেশ্যে যাত্রা হইতে কাহিনীর আরম্ভ। ব্রহ্মলোক, শিবলোক, প্রভৃতির বর্ণনা—আরাধনা ও ভক্তি দেবীর সাহায্যে মহাদেবের নিকট উপস্থিতি এবং শ্রীকৃষ্ণের হস্তে নরকাসুরের বধের উপায় শ্রবণ। শ্রীকৃষ্ণ দেব-শত্রুগণকে নিধন করিবার জন্য মর্ত্ত্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সেই সময় গুরুগৃহে অবস্থান করিতেছিলেন। ইন্দ্রের নিকট সংবাদ পাইয়া বিদায় লইবার কালে গুরুপত্নীর নিকট তিনি গুরুর মৃতপুত্রকে ফিরাইয়া আনিবার প্রতিশ্রুতি দান করেন। মথুরায় রাজা হইবার পর শ্রীকৃষ্ণের সহিত জরাসন্ধের যুদ্ধ হয়। তারপর যমুনার তীরে অসংখ্য চিতা প্রজ্বলিত দেখিয়া এবং একটি মাতাকে মৃতপুত্র-ক্রোড়ে দণ্ডায়মান দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ যমরাজকে শাস্তি দিবার বাসনা করেন। বসুন্ধরা পাপভার লাঘব করিতে যমরাজের প্রয়োজন কহিয়া তাঁহাকে ক্রোধ সংবরণ করিতে অনুরোধ জানান। শ্রীকৃষ্ণ যমত্ব হরণ না করিয়া শাস্তি দিবার অভিপ্রায় বসুন্ধরাকে জানাইলেন। যমরাজের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হইল এবং তাঁহার অনন্ত রূপ দেখিয়া যমরাজ বশ্যতা স্বীকার করিলেন ও শ্রীকৃষ্ণের গুরুর মৃতপুত্রকে প্রত্যর্পণ করিলেন। তারপর শ্রীকৃষ্ণ প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে নরকাসুরের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে পরাজিত ও নিহত করেন।

কাব্যে শ্রীকৃষ্ণের জন্মের কারণ দেখাইতে গিয়া কবি ভাগবতকেই অনুসরণ করিয়াছেন। চতুর্থ সর্গে সৃষ্টি ও লয়-তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে করিতে কবি বঙ্গদেশের পূর্ব্ব গৌরব লইয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন—

হায় এ বঙ্গ ভাণ্ডারে ছিল যত,
কীর্ত্তি পুরাতন, খনির গরভে মণি
সম, হত সে সকল ইহার প্রসাদে। —(৪০ পৃঃ)

এই বর্ণনা স্থানের উপযোগী হয় নাই এবং কাব্য-সৌন্দর্য্য হানি করিয়াছে। ছন্দের ক্ষেত্রেও ইহা কবির অক্ষমতারই দ্যোতক।

নরকাসুর-পত্নীর স্বল্প পরিচয়টুকু বৃত্রসংহারের দানব-পত্নীর কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। পুত্রশোকে মুহ্যমান মহিষীকে নরকাসুর কহিলেন—

হে দেবি! কীর্ত্তিমান পুরুষের, হয় কি
মরণ কভু? মরিয়া অমর সে সতী,
এ ভবমণ্ডলে। ইহা জানিবে নিশ্চয়
বিধুমুখী। হইনু ধন্য আমি, তুমিও
ধন্য হইলে হে আজি, তবে পুত্রযশঃ
সুধা পানে……

দানবপত্নী ইহাতে সান্ত্বনা লাভ করিলেন না। পুত্রহন্তাকে বধ করিবার জন্য তিনি দানবপতিকে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন।

যুদ্ধে যাইবার প্রাক্কালে দানবপতি-কর্ত্তৃক নানারূপ বিভীষিকা দর্শন এবং মহাদেব-কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হওয়া সে সময়ে রচিত সকল কাব্যের অনুরূপ।

কাব্যটির কাহিনী-অংশ যেমন দুর্ব্বল অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার তেমনি ত্রুটিপূর্ণ—নূতনত্বও কোথাও নাই। কাব্যটিকে সার্থক রচনা বলা যায় না।

৫

পদ্মগন্ধা-উপাখ্যান—বনমালী ঘোষাল কর্ত্তৃক রচিত 'পদ্মগন্ধা-উপাখ্যান'-টি ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। কবি প্রথমে গণেশ-বন্দনা করিয়া তাঁহার কৃপাভিক্ষা করিয়াছেন।

বদরিকাশ্রমে যুধিষ্ঠির প্রভৃতির আগমন-বার্ত্তা শুনিয়া ব্যাসদেব সাক্ষাৎ করিতে আসেন এবং তাঁহাদের মনে আশা ও উৎসাহ দিবার জন্য পদ্মগন্ধার উপাখ্যান কহেন।

বারাণসের নিঃসন্তান ভূপতি ভীমসেনের গৃহে অন্নদার অনুগ্রহে পদ্মগন্ধার

জন্ম হয়। তিনি রূপে-গুণে অতুলনীয়া। কিন্তু দৈব-নিবন্ধন বিবাহের পূর্ব্বেই তিনি গর্ভবতী হন। সেই অবস্থায় তিনি মাতা কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইয়া গলায় রজ্জু বন্ধন করিয়া প্রাণত্যাগের চেষ্টা করিলে এক যক্ষ তাঁহাকে রক্ষা করেন। পদ্মগন্ধা যক্ষের অত্যাচার হইতে নিষ্কৃতিলাভের জন্য কালীকে স্তব করিলে নন্দীর দ্বারা দেবী তাঁহাকে উদ্ধার করাইয়া ভার্গবের গৃহদ্বারে স্থাপন করান এবং ভার্গব দেবীর আদেশে তাঁহাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করেন। পুত্র নিবারণের অন্নপ্রাশনে ভগবতী ও মহাদেব পুত্রকন্যাগণ-সহ পদ্মগন্ধার মাতা ও পিতার রূপে আসিয়া সকলকে ভোজন করাইয়া নিবারণকে আশীর্ব্বাদ করিয়া গেলেন।

নিবারণ অবন্তী নগরে নানা শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিয়া প্রত্যাবর্ত্তনের পথে নিস্তারিণী দেবীর পুরোহিত কর্ত্তৃক বলির নিমিত্ত সাদরে গৃহীত হন এবং অবশেষে পুরোহিত-কন্যা যোগমায়ার দ্বারা উদ্ধার-প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করেন। কিন্তু একদিন কাশ্মীরের অবিবাহিতা রাণী হেমাঙ্গিনীর প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দান করিয়া তাঁহাকে বিবাহ করিয়া নিবারণ সে স্থানে রহিয়া গেলেন। অবশেষে নিস্তারিণী দেবীর কৃপায় যোগমায়া অনেক কৌশলে স্বামী লাভ করেন। সকলে স্বদেশে ফিরিয়া ভীমসেনকে গন্ধর্ব্ব-হস্ত হইতে উদ্ধারের চেষ্টা করেন—হেমাঙ্গিনী যুদ্ধ-যাত্রা করিয়া শ্বশুরকে উদ্ধার করিয়া আনিলেন। সকলের আনন্দে দিন কাটিতে লাগিল। ভীমসেনের মৃত্যু হইলে রাণী সহমৃতা হইলেন। পদ্মগন্ধা ও ভার্গব এক রথে স্বর্গারোহণ করেন। পরে পুত্র শরচ্চন্দ্রকে রাজ্য দিয়া যোগমায়া-নিবারণ-হেমাঙ্গিনী একত্রে স্বর্গে গমন করেন।

ভার্গবের চরিত্রটি কবি যথোপযুক্তভাবে অঙ্কিত করেন নাই। স্ত্রী নাই বলিয়া দুর্ব্বাসা-মুনি ভৎর্সনা করিলে ভার্গব মনের দুঃখে ব্রহ্মার নিকট গিয়া বিবাহের সম্বন্ধে সম্মতি লাভ করিয়া অধীর হইয়া পড়িলেন, তাঁহার অবস্থা—

ব্যস্ত অতি বাড়াবাড়ি, মুড়াতে বাসনা দাড়ি,
পয়সা কড়ি সঙ্গে ছিল নাই।
নিজে ত পণ্ডিত-ধীর, মনে মনে যুক্তি স্থির,
হস্তেতে মাখেন লয়ে ছাই ॥

তাহাতে আস্তের কেশ, মুড়ান না হয় বেশ,
সার মাত্র হইল যন্ত্রণা ॥

দেখিলে পরের মেয়ে ধরিতে ছোটেন ধেয়ে
ভয়ে কার ভার পথে যাওয়া।
বিশেষতঃ গর্ভবতী, বালা বৃদ্ধা কি যুবতী
দৃষ্ট মাত্রে কন নিজ জায়া ॥—(২১ পৃঃ)

এইরূপ চিত্র দ্বারা ভার্গব-চরিত্র ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। যিনি সৃষ্টিকর্ত্তার পৌত্র, চিরদিন তপস্যায় রত, দুর্ব্বাসার বাক্যে অতখানি বিচলিত হওয়াও তাঁহার পক্ষে যেমন অস্বাভাবিক—নারীলাভের নিমিত্ত উন্মত্ত হওয়াও তেমনি বিসদৃশ।

যোগমায়ার স্বামীকে ছলনার ব্যাপারটি অত্যন্ত উপভোগ্য ও হাস্যোদ্দীপক। অতঃপর ভীমসেনের সহিত পৌত্রবধূ যোগমায়া ও হেমাঙ্গিনীর রসিকতা ও হাস্যরসের অবতারণা করিয়া কাব্যে বৈচিত্র্য আনা হইয়াছে।

কাব্যটিতে কাহিনী সরল ভাষায় পয়ার, ত্রিপদী, মালঝাঁপ প্রভৃতি ছন্দে রচিত। কোথাও দর্শনতত্ত্বের ব্যাখ্যা নাই। মামুলী ভাষায় দেবীর কৃপায় ভীমসেনের কন্যালাভ হইতে আরম্ভ করিয়া নিবারণ প্রভৃতির স্বর্গপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে। আখ্যানভাগ তিনটি কাহিনীর সমাবেশে জটিল হইয়া উঠিয়াছে এবং স্থানে স্থানে যোগসূত্র হারাইয়াছে। কবি শেষাংশে এই যোগসূত্রগুলি সুসংযতভাবে সজ্জিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন এবং কিছুটা কৃতকার্য্যও হইয়াছেন। তবে বহু ঘটনার অতি দ্রুত সমাপ্তি কাহিনীর রসকে ও শিল্পকে অনেকখানি ব্যাহত করিয়াছে এবং কবিত্বের স্ফুরণও কোথাও নাই। ছন্দের সাহায্যে ইহা একটি কাহিনীর বিবৃতিমাত্র।

অজোদ্বাহ কাব্য—জগচ্চন্দ্র দেব সরকার চৌধুরী রচিত 'অজোদ্বাহ-কাব্য'টি ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই কাব্যের ছন্দ সম্বন্ধে কবি বিজ্ঞাপনে লিখিয়াছেন—

"…নূতন ছন্দঃ শ্রবণে এবং অমিত্রাক্ষরতা বিলোকনে অনেকে এই পুস্তক ছন্দকে অমিত্রাক্ষর বলিয়াই বিবেচনা করিতে পারেন,…এইক্ষণ এই পুস্তকস্থ মন্দাবিক্রুত ছন্দের কথঞ্চিদ্বিবরণ প্রকটিতব্য।

"পদ্যের প্রথম পদের শেষে যে স্বরবর্ণ, কিম্বা হলযুক্ত যে স্বরবর্ণ থাকে, পর

পদের শেষেও তাহাই অথবা তত্তুল্য হইলে তাহার (মত্নুদ্বোধিত ছন্দের) নাম সমস্বরান্ত বলিয়া স্থির করা গেল।

"স্বারযুগ্যে সম্পাদিত সমস্বরান্তের নাম সস্বারযুগ্য সমস্বরান্ত (বৃত্ত)।

"স্বারযুগ্যে কেবল সমস্বরান্তই রচিত হইতে পারে এমত নহে, মিত্রাক্ষর এবং মিত্রেতরও হইতে পারে; স্বারযুগ্য-নিষ্পাদিত মিত্রাক্ষর সর্ব্বাপেক্ষা মধুরতম।"

কবি যাহাকে মধুরতম-রূপে উপলব্ধি করিয়াছেন তাঁহার কাব্যে ছন্দের সেই রূপটি আমরা দেখিতে পাই না। কাব্যে নানারূপ ছন্দ ব্যবহৃত হইয়াছে—কিন্তু তাহার সহজ গতি বা ঝঙ্কার নাই। ভাষাও অহেতুক দুরূহ এবং আড়ষ্ট হইয়া পড়িয়াছে।

অযোধ্যার রাজা দণ্ডী শুক্রমুনির আশ্রমে শাস্ত্রাদি শিক্ষালাভের জন্য গমন করেন এবং তাঁহার অনুপস্থিতিতেই কন্যা অজাকে বিবাহ করেন। শুক্রমুনি ঘটনাটি জানিতে পারিলে অজাকে তিরস্কার করেন এবং অভিশাপ দিতে উদ্যত হন।

গ্রন্থটি সুখপাঠ্য নয়। কাব্যরস কোথাও জমে নাই। ইহাতে সাতটি সর্গ আছে এসং নূতন ছন্দ প্রবর্ত্তনের চেষ্টা রহিয়াছে। উপমা-রূপকাদি কষ্ট-কল্পিত। কাব্যে কবিত্ব কোথাও নাই।

কাদম্বরী-কাব্য—ব্রজনাথ মিত্র কাদম্বরী কাব্যটি রচনা করেন। ইহার প্রকাশ-কাল ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দ। বরুণদেবের কন্যা কাদম্বরীর সহিত কলিরাজের বিবাহ ও তাঁহার রাজ্য-বিস্তার এই কাব্যের বর্ণিত বিষয়। এই গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কবি বিজ্ঞাপনে লিখিয়াছেন—"সুরাপান নিবারণ ইহার প্রধান উদ্দেশ্য।" কবির উদ্দেশ্য এই কাব্য রচনা দ্বারা সংসাধিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। কারণ, কলির অত্যাচারে মানুষের দুঃখকষ্ট দুই-এক পৃষ্ঠায় বর্ণিত হইয়াছে এবং তাহাও সুরাপানের ফলস্বরূপ দেখান হয় নাই। কলির কুকর্ম্ম অপেক্ষা ধর্ম্মরাজ দ্বাপরের মৃত্যু এবং তাঁহার পত্নী সরলার নিমিত্ত দেবতাগণের দুঃখবোধ ও সরলার শোক কাব্যে অধিক স্থান অধিকার করিয়াছে। অবশ্য কলি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দ্বাপরকে রাজ্যলোভে হত্যা করিয়াছে—ইহা উক্ত হইয়াছে। কিন্তু চারিদিকের শোকোচ্ছ্বাসের মধ্যে এই নিষ্ঠুরতা যেন চাপা পড়িয়া যায়।

কলিরাজ কোথাও স্থান না পাইয়া জলধিপতির গৃহে স্থান পাইলেন। তাঁহার প্রতি কাদম্বরী আকৃষ্ট হইলেন। এই স্থানেও ঘটনার বিবৃতি-মাত্র লিপিবদ্ধ হইয়াছে। কলিরাজের কার্য্যকলাপ কিছুই চিত্রিত হয় নাই এবং পাঠকের মনে কোনরূপ বিরুদ্ধ ভাব অঙ্কিত করিতে পারে নাই। কাদম্বরীর বিবাহ-সভায় দেবগণ কলিকে লইয়া কাণাকাণি করিয়াছেন, দৈত্যের সহিত দেবকন্যার বিবাহে আপত্তি করিয়াছেন। কিন্তু কলির রূপের নিকট সকলের রূপ হার মানিয়াছে—"কলিরূপ হেরি হয়েছে বিকলা সবে" (৬১ পৃঃ)। আর কাদম্বরীর অবস্থা—

কাদম্বরী অঘরাজ নয়নে নয়ন,
রহিলা যে কতক্ষণ কি বলিব আর।
প্রণয়জলধিকূল উথলি পড়িল,
ভাসি গেল উরসিজ, ভাসিল দুকূল,
থর থরে মধুময়ী লাগিলা কাঁপিতে। —(৬৭ পৃঃ)

মহাদেব জলধিপতির কন্যাকে কলিরাজকে পতিরূপে পাইবার বর দান করিয়াছিলেন এবং বিবাহ-বাসরে তিনি কলিকে নিজ শূল দিয়া কহিয়াছিলেন—

দিনু এই শূল তোরে, রাখিস যতনে,
মম বরে যথা তথা জয়ী হবি তুই।
গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, দেব, যক্ষ, রক্ষ, নর
ডরিবে সকলে তোরে, কিন্তু যদি কভু,
হানিস ধার্ম্মিকে, তবে ঘটিবে বিপদ। —(৭ পৃঃ)

দেবতার এই অনুগ্রহদানের পশ্চাতে কোন কারণ কবি দেখান নাই। কলিরাজ তপস্যা করিয়াছেন বলিয়া কোথাও উল্লেখ নাই। তার উপর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ধর্ম্মরাজ-দ্বাপরকে হত্যা করিবার পরও কিরূপে তিনি দেবতার অনুগ্রহ পাইবার যোগ্য হইলেন তাহাও বোঝা যায় না। কারণ অন্যায়-ভাবে ধার্ম্মিককে হত্যা করিবার পাপ তাঁহার পূর্ব্বেই হইয়াছে—তথাপি বিপদের পরিবর্ত্তে তিনি সম্পদই লাভ করিয়াছেন। পাপের প্রতি পাঠকের মনে বিতৃষ্ণা জন্মাইবার কোনরূপ চেষ্টা কবি দ্বিতীয় সর্গ পর্য্যন্ত করেন নাই। কেবল তৃতীয় সর্গে কলির অত্যাচার কিছুটা বিবৃত হইয়াছে—কিন্তু তাহাও তাঁহার উদ্দেশ্য

সাধনের পক্ষে যথেষ্ট নয়। পাপকর্ম্মরত কলির দুর্দ্দশা কবি দেখাইয়াছেন যে, শয্যাগ্রহণ করিয়া কলি স্বস্তি পাইতেছেন না, তাঁহার সর্ব্ব অঙ্গে কণ্টকবিদ্ধ হইবার মত জ্বালা করিতেছে। হয়তো পরবর্ত্তী খণ্ডে কবির অধিকতররূপে কলির দুরবস্থার চিত্র অঙ্কিত করিবার বাসনা ছিল।

কাব্যটিকে সার্থক বলা চলে না। কারণ কাব্যের নাম যদিও 'কাদম্বরী-কাব্য' এবং নায়িকা কাদম্বরী, তথাপি প্রথম হইতে দ্বাপররাজের মৃত্যু এবং সরলার নিমিত্ত স্বর্গে-মর্ত্ত্যে বিষাদের আলোড়ন কাব্যে প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে—কাদম্বরী অনেকখানি ম্লান হইয়া পড়িয়াছেন।

এই কাব্যে তিনটি সর্গ রহিয়াছে। ইহা অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত। স্থানে স্থানে বর্ণনাবাহুল্য ও উপমাবাহুল্য কাব্যরস ব্যাহত করিয়াছে। তবে ছন্দ গতিশীল, ভাব-ভাষাও মন্দ নয় তথাপি কাহিনীর দিক্ হইতে এবং কবির উদ্দেশ্যসাধনের দিক্ হইতে বিচার করিলে কাব্যটির সার্থকতা কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

সম্বরণবিজয়-কাব্য—প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'সম্বরণবিজয়' কাব্যটি ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ইন্দ্রের ক্রোধে হস্তিনাপুরের ধার্ম্মিক প্রজাবৎসল ও সর্ব্বাগুণান্বিত রাজা সম্বরণের দেশে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয় এবং সমস্ত সম্পদ্ নষ্ট করে। সেই সময় পঞ্চালরাজ ঐ রাজাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিলে তিনি হিমালয়ের এক অরণ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন। বশিষ্ঠ মুনি দৈববাণীতে সম্বরণকে সাহায্য করিবার আদেশ লাভ করেন এবং পঞ্চালরাজের নিকট হস্তিনানগর প্রত্যর্পণ করিবার অনুরোধ জানান। পঞ্চালরাজ প্রথমে তাঁহার প্রস্তাবে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন। কিন্তু মহর্ষি বশিষ্ঠ অভিশাপ দিবার ভয় দেখাইলে তিনি মহর্ষির প্রস্তাবে সম্মত হন। কলি এই অবস্থায় তুষ্ট না হইয়া ইন্দ্রকে সমস্ত বিষয় অবগত করাইলে ইন্দ্র অস্ত্রশস্ত্র লইয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন কিন্তু নারায়ণের আদেশে নিরস্ত হন। কলি স্থান না পাইয়া বৈরাগ্য অবলম্বন করিলে বসুমতী পঞ্চালরাজের পতন সম্ভব নয় দেখিয়া নারদকে দিয়া কলিকে পঞ্চালরাজের আশ্রয়ে থাকিতে সম্মত করাইলেন, এবং সম্বরণকে সিন্ধুতটে ইন্দ্রের তপস্যা করিয়া অভীষ্ট-সিদ্ধির উপায় অন্বেষণ করিতে আদেশ দিলেন। সম্বরণ বশিষ্ঠকে প্রণাম করিয়া তপস্যার জন্য বিদায় লইলেন।

কাব্যটির প্রথম খণ্ডে সম্বরণ নৃপতির তপস্যার নিমিত্ত গমন পর্য্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে। ইহার দ্বিতীয় খণ্ড আর বাহির হয় নাই। কাব্যটিতে ৬টি সর্গ রহিয়াছে। ইহা অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত ; কিন্তু ছন্দ রচনায় কবির অক্ষমতাই প্রকাশিত হইয়াছে।

বসুমতী পাপীর অত্যাচারে মহাদেবের নিকট যাইবার কালে কৈলাসে শ্মশান দেখিলেন—

......কোথায় ভীষণা
ভয়ঙ্করী ভীমা যত যোগিনী, তাদের
ঘন ঘোর হুহুঙ্কারে তিনলোক কাঁপে
গলিত চিকুরজাল,—রূপে ভয়ঙ্করী,—
ত্রিনয়না, লোলজিহ্বা সিক্ত রক্তধারে,
বিকট দশনে রণহাসি ঘোরতরা,
নরকরকাঞ্চিতে কাঁকাল সুবেষ্টিত,
নরমুণ্ডমালা গলে, উন্নত বক্ষজ
শোণিতাক্ত, খর্পর খাণ্ডা হাতে করিছে
হরষে শোণিত পান। নরদেহরাশি,
পড়িয়া পচিছে কোথা,—বিকট দর্শন। —(৩৬-৩৭ পৃঃ)

এরূপ স্থানে বসিয়া মহাদেব ধ্যান করিতেছেন। মহাদেবের আবাস-স্থলের এরূপ বর্ণনা অপর কোন কাব্যে পাওয়া যায় নাই।

কাব্যটিতে উপমা, রূপক প্রভৃতির মধ্যে নূতনত্ব দৃষ্ট হয় এবং সেগুলি দ্বারা রসহানি ঘটে নাই। ছন্দ এবং ভাষা আড়ষ্ট। ইহা অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত। কাব্যটি কোথাও জমে নাই।

অদৃষ্ট-বিজয়—হরিমোহন কবিভূষণ রচিত 'অদৃষ্ট-বিজয়' কাব্যটির প্রথম খণ্ড ১৮৮১ সালে প্রকাশিত হয়। ইহার দ্বিতীয় খণ্ড বাহির হয় নাই। ভূমিকা পড়িয়া জানা যায় কবি অনেক দুঃখকষ্টের মধ্য দিয়া মানুষ হইয়াছিলেন এবং পাঁচ বৎসর বয়সে পিতৃমাতৃহীন হইয়াছিলেন। তাই সাধনার দ্বারা মানুষ সমস্ত দুঃখকষ্টকে অতিক্রম করিয়া ভাগ্যকে কিভাবে জয় করিতে পারে এই কাব্যে সত্যব্রতের সাধনা, নিষ্ঠা, দৃঢ়তা দ্বারা কবি তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং কৃতকার্য্যও হইয়াছেন।

প্রথম সর্গে বীণাপাণিকে সম্বোধন করিয়া কবি বিষয়বস্তু সম্বন্ধে কহিয়াছেন—

গাও, মা বাগ্‌দেবি! জয় প্রাক্তনে করিয়া
উঠিল কেমনে পুনঃ পতিত মানব।
কেবা সে ধীমান্, দেবি, যোগাসনে বসি,
বিসর্জ্জি সংসার সুখে, ছিঁড়ি মায়াজাল,
কঠোরে কঠোর ব্রত উদ্‌যাপন করি
লভি যোগবল, আহা, একতা-শৃঙ্খলে
বাঁধিলা মানবজাতি, সে সঙ্গে কেমনে
ত্যজিয়া পাতালপুরী ঘোর কুম্ভীপাক,
উঠিলা দনুজরাজ! মানব-গৌরব
অক্ষয় সুকীর্ত্তি-স্তম্ভে শোভিল কিরূপ
রবিরে বিরূপ করি……। —(১-২ পৃঃ)

কাব্যটির ভবিষ্যৎ-সম্বন্ধেও কবির আশা কম নয়। তিনি লিখিয়াছেন—

কিন্তু মা যে মহাসিন্ধু সিঞ্চিয়া যতনে
গাঁথিব রতনমালা, অপূর্ব্ব অদ্ভুত
অক্ষয় উজ্জ্বল যথা ধর্ম্মের প্রতিমা,
শোভিবে গম্ভীরভাবে রবে যত কাল
ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডল, হবে একদিন যবে
জন্মিবে মানবজাতি বুঝিবে প্রভাব,
হাসি এবে উপহাসে অসার প্রলাপে। —(৫ পৃঃ)

নিজের জীবন-সম্বন্ধে কবি লিখিয়াছেন—

ভাগ্যহীন আমি অতি,
দিগ্‌ভ্রান্ত পান্থের মত এ ভব কান্তারে
শূন্যমনে শূন্যপ্রাণে, নিরাশা-সাগরে
ঘুরিতেছি, ভাসিতেছি, সম্পদ সহায়,
হীনবন্ধু—লালায়িত উদরান্ন তরে।
বাদী দুর্য্যোধন, মাতঃ, নির্ব্বাসিলা বনে। —(৩ পৃঃ)।

দুঃখকষ্টের মধ্যে পড়িয়াও কবি আশা হারাইতে চাহেন নাই। আত্মার সম্পদ্ মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ্। সাধনা দ্বারা সেই সম্পদ্ লাভ করিতে

পারিলেই মানব-জীবন চরিতার্থ হইয়া উঠে। তাহা ছাড়া মানুষ যাহা কিছু পাইবার আশা করুক না কেন সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়া দৃঢ়তা, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সহিত সাধনা করিলে সিদ্ধিলাভ করিবেই—এই বিশ্বাস কবিকে 'অদৃষ্ট-বিজয়' কাব্য রচনা করিতে প্রেরণা দিয়াছে। মানুষের এই আত্মিক সাধনার ক্ষেত্রে দুঃখ-দারিদ্র্য-লাঞ্ছনা বাধা হইয়া দাঁড়ায় না বরং শক্তিদান করে।

রাজা বিষ্ণুযশের পুত্র সত্যব্রত মাতার চক্ষে জল দেখিয়া এবং দেবতার প্রতি মাতার বিদ্বেষভাব দর্শন করিয়া জানিয়াছিলেন যে পিতার মহাযজ্ঞে বিঘ্ন ঘটাইয়া ইন্দ্র তাঁহাদের অরণ্যে প্রেরণ করেন এবং একদিন পিতাও নিরুদ্দেশ হন। দ্বাদশবর্ষীয় বালক সে সময় পিতার রাজ্য পুনরুদ্ধার করিয়া পিতাকে রাজ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার সঙ্কল্প গ্রহণ করেন এবং মাতার নিকট বিদায় লইয়া বিরাট বিশ্বে একাকী বাহির হন। এক জ্যোতির্ময় তপস্বীর দর্শন পাইয়া নিজ নিষ্ঠা ও দৃঢ়তা দ্বারা তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়া তিনি দীক্ষালাভ করেন এবং তপস্যায় সিদ্ধিপ্রাপ্ত হন। তপস্যার সময়ে ইন্দ্র মায়াদেবীর সাহায্যে এক নারীকে বিঘ্ন জন্মাইতে প্রেরণ করেন—কিন্তু কৃতকার্য্য হন নাই। নারী সত্যব্রতের প্রতি আসক্ত হন এবং সেখানেই ধ্যানে নিমগ্ন হন। সত্যব্রত সিদ্ধিলাভ করিয়া তাঁহাকে পত্নীত্বে বরণ করেন। এদিকে বিষ্ণুযশের রাজলক্ষ্মী জলধিপতির নিকট হইতে রাজাকে সাহায্যদানের প্রতিশ্রুতি লইয়া বিষ্ণুর নিকট নিজ বাসনা ব্যক্ত করিলে বিষ্ণু তাঁহাকে আশ্বাস দান করেন। সত্যব্রত সিদ্ধি-লাভের পর পিতৃরাজ্যে ফিরিলে রাজলক্ষ্মীই জীর্ণ প্রাসাদকে সজ্জিত করেন এবং সত্যব্রতকে অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করেন। সত্যব্রত রাজ্যে ফিরিয়া দান-ধ্যান প্রভৃতি করিতে লাগিলেন। অপর দিকে পাতালে দানবপতি বালি পরিবার-বৃন্দকে মুক্তিদানের চেষ্টা করিতেছিলেন। তিনি নিজ শক্তির সহিত সত্যব্রতের শক্তি মিলিত করিয়া স্বর্গরাজ্য আক্রমণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সত্যব্রত বালিরাজের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। চারিদিকে 'সাজ' 'সাজ' রব পড়িয়া গেল। ইন্দ্রও সংবাদ পাইয়া সজ্জিত হইতে লাগিলেন।

কাব্যের মধ্যে স্থানে স্থানে বর্ণনায় ত্রুটি লক্ষিত হয়—যেমন—লক্ষ্মী বিষ্ণু-লোকে গিয়া দেখিলেন—

বুধমাঝে বৃহস্পতি, নারীমাঝে সতী,
ব্রিটিশ কেশরী কিম্বা হিন্দুরাজ-মাঝে,

অথবা ধর্ম্মের শোভা মধুর গম্ভীর
দেব নর দৈত্যে যথা, বসিয়া তেমতি
সে শোভা সৌন্দর্য্যে হয়ে শোভিত সুন্দর
যোগীন্দ্র-মানস-হংস কংসারি কেশব
নিরাকার।······ —(৭২-৭৩ পৃঃ)

এস্থলে ব্রিটিশ কেশরীর সহিত তুলনাটি যুক্তিযুক্ত হয় নাই। কবি কাব্যটিকে ডব্লিউ, ডব্লিউ, হাণ্টার মহাশয়কে উৎসর্গ করিয়াছেন—হয়তো তাঁহাকে খুসী করিবার জন্যই এরূপ লিখিয়াছেন। কিন্তু ইহা দ্বারা কাব্যরস ব্যাহত হইয়াছে।

নারায়ণ কমলাকে মানুষের দুঃখের কারণ বলিলেন—

······আজি হায় প্রবাহিত
প্রবল কলুষ স্রোত ভবনে ভবনে,
ভ্রূণহত্যা, নারীহত্যা, কত! ধর্ম্মপথ
ত্যজি আজি অসন্মার্গগামী, হায়,
ধর্ম্মপুত্রগণ! কার দোষ, প্রিয়তমে!
বিধবা-বিবাহ ধর্ম্মসঙ্গত পদ্ধতি
প্রচলিত কেন, দেবি! করেনা মানব? —(৮১ পৃঃ)

বিশ্বামিত্র চলিয়া গেলে সত্যব্রত সমস্ত মানবকুলকে আহ্বান জানাইতে লাগিলেন—তাঁহার কণ্ঠে সরস্বতী অধিষ্ঠিতা হইলেন—

হও হও ভাগ্যজয়ী, উদ্যম উৎসাহে
প্রকাশি মহিমা নিজ সাহস বিক্রম,
নতুবা দেবেরে কহ ত্রিদশ মণ্ডল,
পুরাণ বিধির পুনঃ করহ সংস্কার।
... ...
মানব! প্রকাশি বল, ব্রহ্মা বা নিয়তি
অথবা দেবেতে শ্রেষ্ঠ ইন্দ্র বা কেশব,
মানব জগৎরাজ্য শাসিবে মানব,
... ...
পদদম্ভে বীরনাদে, আয়ুধ আলোকে,
প্রতিজ্ঞা গাম্ভীর্য্য পণে কাঁপাও জগৎ! —(১৭৮-৭৯ পৃঃ)

দেবতার বিরুদ্ধে মানবের যুদ্ধ-ঘোষণার ইতিহাস বারেবারে মানুষ লিখিয়াছে—আবার দেবতার নিকট নতি স্বীকার করিয়া দেবত্বকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করিতেও মানুষ কুণ্ঠাবোধ করে নাই। এই-সকল কাহিনীর মধ্যে সাধনার অমোঘ শক্তির কথাই বিশেষভাবে ব্যক্ত হয়।

কাব্যটি মহাকাব্যরূপে লিখিবার বাসনা কবির ছিল। কিন্তু প্রথম খণ্ডে কাব্যের সমস্ত ঘটনা সন্নিবেশিত হয় নাই এবং পরবর্তী কোন খণ্ডই বাহির হয় নাই। এইজন্য অসমাপ্ত খণ্ডটিকে মহাকাব্য বলা চলে না।

সত্যব্রতের চরিত্র কবি অদৃষ্টকে জয় করিবার মত বলিষ্ঠরূপে চিত্রিত করিতে পারিয়াছেন। তাঁহার মাতার চরিত্রও সুন্দর। ভাবে ভাষায় কাব্যটি সুখপাঠ্য। ছন্দে স্থানে স্থানে ত্রুটি লক্ষিত হইলেও ছন্দ গতিহীন নয়। ইহা অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত। কাব্যটিতে দশটি সর্গ রহিয়াছে। ভাষায় বা ভাবে কোথাও জটিলতা বা দুরূহতা নাই। স্থানে স্থানে কবিত্বের স্ফুরণ দেখা যায়।

৬

হেলেনা-কাব্য—কবি আনন্দচন্দ্র মিত্র হোমারের ইলিয়ডের কাহিনী অবলম্বন করিয়া 'হেলেনা-কাব্য'টি রচনা করেন। স্পার্টার রাজা ম্যানিলুসের রূপবতী পত্নী হেলেনাকে লইয়া পারিসের স্বদেশে পলায়ন এবং তাহার উদ্ধার করিয়া যুনানী-রাজ্যের সম্মান রক্ষার জন্য ট্রয়-রাজ্য আক্রমণ ও ধ্বংস—এই কাব্যের বিষয়ীভূত ঘটনা। কাহিনী-অংশ বিদেশী সাহিত্য হইতে সংগৃহীত হইলেও কবি ইহাতে দেশীয় ভাব, রুচি ও কল্পনা সংযোগ করিয়া ইহাকে সুখ-পাঠ্য করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ইউরোপীয় দেব-দেবীর নামের স্থলে অনেক-ক্ষেত্রে হিন্দু দেব-দেবীর নাম উল্লিখিত হইয়াছে এবং তাঁহাদের কার্য্যাবলীও এদেশের দেব-দেবীর অনুরূপ করিবার প্রয়াস দেখা যায়। ইহাতে কাব্যটি অনেকটা এ-দেশীয় হইয়াছে বটে কিন্তু কাহিনীর সৌন্দর্য্য অনেকখানি নষ্ট হইয়াছে। দুই দেশের সংস্কার ও বিশ্বাসের ধারাকে একই সূত্রে গ্রথিত করিতে গিয়া কবি অনেক স্থলে সামঞ্জস্য রাখিতে পারেন নাই—দুই দেশের নামের সংমিশ্রণে কাব্যটি যেন জটিল হইয়া উঠিয়াছে।

কাব্যটি অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত এবং ত্রয়োদশটি সর্গে বিভক্ত। ছন্দ সুন্দর।

অমিত্রাক্ষর ছন্দ রচনায় কবির কৃতিত্বকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই এবং ভাষাও সহজ মাধুর্য্যে পূর্ণ।

প্রথম সর্গে প্রথমেই কবি লিখিয়াছেন—

কি কাজ বাজায়ে আর সুষুপ্ত ভারতে
তূরী ভেরী পাঞ্চজন্য আশার ছলে!
আর কি জাগিবে কেহ, আর কি গাইবে
বীরগাথা, বীররসে ভাসিবে উল্লাসে। —(১ পৃঃ)

তারপর তিনি কবিতেশ্বরীর কৃপা ভিক্ষা করিয়া কাব্য আরম্ভ করিয়াছেন।

দ্বিতীয় সর্গে হেলেনা ও ইন্দিরার কথোপকথন মেঘনাধবধ-কাব্যের সীতা-সরমার কথোপকথনের ধারাটির কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। হেলেনা বলিতেছেন—

দেখিতাম মনোরঙ্গে রাজহংসকেলি
বিমল সরসীজলে! যাইতাম সখি
কভু বা কন্দরতলে, ফুলসাজে সাজি
বসিতাম ফুলবনে, গাইতাম গীত
মনের উল্লাসে বনবিহঙ্গিনী-সহ। —(৩য় সং, ৩১ পৃঃ)

হেলেনার মুখ দিয়া কবি বঙ্গদেশেও তাঁহার কলঙ্ক-কাহিনী লইয়া গীত রচিত হইবার জন্য লজ্জা প্রকাশ করাইয়াছেন—

এ কলঙ্ক কথা মোর ঘোষিবে জগতে,
হেলেনার ঘরে ঘরে, সুদূর বৃটনে,
বিষাদে গাইবে কবি দূর বঙ্গভূমে। —(৩য় সং, ৩৭ পৃঃ)

এই বঙ্গভূমির উল্লেখ যেন সামঞ্জস্যহীন বলিয়া মনে হয়।

সপ্তম সর্গে কবি ভারতের পূর্ব্ব গৌরবের স্থানগুলিকে স্মরণ করিয়া দুঃখ করিয়াছেন—

কোথা সে অযোধ্যা আর্য্য গৌরবের ভূমি,
কবিগুরু বসি যার কুসুম কাননে
কাব্য পারিজাত তরু রোপিলা কৌশলে।
... ...
কোথা সেই ইন্দ্রপ্রস্থ হিমাদ্রি তনয়া
কালিন্দীর কনিষ্ঠ ভূষা ইন্দ্রালয়াধিক,

গাইতা জীমূতমন্দ্রে কবীন্দ্র যেখানে
বীরেন্দ্রের কীর্ত্তিরাশি অতুল জগতে।—(৩য় সং, ৮২-৮৩ পৃঃ)

ট্রয়ের রাজলক্ষ্মীর বিষাদ কবি বর্ণনা করিয়াছেন—

কমল আসনে বসি কাঁদেন কমলা
জলতলে, কোটি কোটি রত্নরাশি যথা
প্রভাময়! চারুশোভা জলেশের পুরী। —(৮৪ পৃঃ)

আর কমলাকান্ত—

শায়িত কমলাকান্ত অনন্তশয়নে,
মহাতন্দ্রাবেশে দেব সতত নিরত
ভাবনায়, ভবদুঃখ সংহারিতে হরি। —(৮৫ পৃঃ)

এ-সকল ক্ষেত্রে কবি হিন্দু দেবদেবীর নাম তো ব্যবহার করিয়াছেনই উপরন্তু তাঁহাদের গুণাবলী ও কার্য্যকলাপও আরোপ করিয়াছেন। দেবার্চ্চনায়ও সর্ব্বত্র কবি হিন্দুর রীতি-নীতির বর্ণনা করিয়াছেন। যুদ্ধশেষে স্বদেশ-যাত্রার প্রাক্‌কালে উল্লিসিস্ দেবার্চ্চনার কথা কহিলে—

নিরমিয়া শত বেদী বসাইলা আগে
শতেক মঙ্গল ঘট, পল্লব সংহতি,
আনিলা চন্দন-কাষ্ঠ শত স্তূপাকারে,
ঘৃতকুম্ভ এক শত, শত মেষশিশু
বলি-হেতু, শত সাজী সজ্জিত কুসুমে। —(১৯৯ পৃঃ)

কবি এই কাব্যে ভারতীয় দেব-দেবীর নাম ও কার্য্যকলাপ চিত্রিত করিলেও উভয় দেশের মূলগত পার্থক্য সহজেই অনুভূত হয়। রামায়ণের সহিত এই কাব্যের তুলনা করিলে ইহা বোঝা যায়। রামায়ণে সীতা নির্দ্দোষ ছিলেন। রাবণ তাঁহাকে হরণ করিয়া ক্লেশ দেওয়াতে রাবণের পতন হইয়াছে। হেলেনা-কাব্যে হেলেনা ও পারিস উভয়েই প্রণয়াসক্ত, উভয়ে সুখ ভোগ করিয়াছে এবং পরে অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়াছে। তাহাদের পাপে দুইটি রাজ্য বীরশূন্য হইয়াছে। রামায়ণে সীতার প্রতি পাঠকের যে করুণা-বোধ ও মমত্ববোধ জাগে, রামচন্দ্রের বীরত্ব এবং সর্ব্বশেষে সীতাকে ত্যাগের পশ্চাতে যে আদর্শবাদ দেখা যায় হেলেনা-কাব্যে তাহা নাই। হেলেনার প্রতি পাঠকের কোনরূপ সহানুভূতি জাগে না। তবে অনুতাপ-অনলে একটি রমণী

উন্মাদ হইলে মনে যে করুণার সঞ্চার হয়, হেলেনার প্রতি সেই করুণাবোধ জাগে। দেব-দেবীর রোষে মানুষকে কতখানি দুঃখ ও অপমান ভোগ করিতে হয়, ইহা যেন তাহারই নিদর্শন। ভারতীয় পৌরাণিক কাহিনীর পশ্চাতে এইরূপ দেবরোষের অভাব নাই—কিন্তু সেই দেব-দেবীগণ বেশী প্রাণবন্ত ও সংবেদনশীল। হেলেনা-কাব্যে দেব-দেবীগণকে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিষ্ক্রিয় দেখা যাইতেছে। কেবল ইলাদেবী পুত্রের সাহায্যের নিমিত্ত অলক্ষ্যে যুদ্ধ করিয়াছেন এবং ট্রয়ের অধিষ্ঠাত্রী বামাদেবী দুঃখিত-অন্তরে অভিশাপ দিয়াছেন। ইহারা কেহই শ্রেষ্ঠ দেব-দেবীগণের মধ্যে গণ্য নহেন। দেব-সভায় অক্ষিলিস ও হিরণ্যকের যুদ্ধ ও মল্লযুদ্ধ দেবদূতের আদেশে সংঘটিত হইয়াছে। ইন্দুমতী-চরিত্রে মাইকেলের প্রমীলার ছায়া দেখা যায়। তবে প্রমীলা অধিকতর প্রাণময়ী, দীপ্তিশালিনী ও বীরত্বশালিনী। ইন্দুমতী সে তুলনায় অধিকতর হৃদয়শালিনী ও স্নেহ-প্রবণা। পারিস ও ম্যানিলুসের বিশেষ পরিচয় এই কাব্যে পাওয়া যায় না। হেলেনা ম্যানিল্যুস-সম্বন্ধে কহিয়াছেন—

> পুণ্য-অবতার তিনি এ মর্ত্ত্যভবনে,
> জানি আমি, নীচ বলে ক্ষমিবেন তিনি।—(১৪৮-৪৯ পৃঃ)

তিনি মহৎ এবং বীর। তাঁহার সহিত যুদ্ধে পারিস পরাজিত ও নিহত হন।

কাব্যের নায়ক পারিসের পরিচয় যদিও আমরা বেশী পাই না—তবু তাঁহার প্রতি যেন কিছু সহানুভূতি জাগে। পাপ পারিস ও হেলেনা উভয়েই করিয়াছেন। কিন্তু বীর-হৃদয়ের সমস্ত বীরত্ব ও শৌর্য্য লইয়া তিনি চোরের মত গৃহকোণে লুক্কায়িত রহিলেন—পাপের লজ্জায় মুখ দেখাইতে পারিতে-ছিলেন না। তাঁহার দেশের বীরবৃন্দ ও আত্মীয়-স্বজন সকলে ধ্বংস হইলেন তাঁহারই কারণে। অবশেষে যাঁহার নিমিত্ত তাঁহার জীবনের এত বড় বিড়ম্বনা তিনিও তাঁহাকে ঘৃণা করিতে ও তিরস্কার করিতে আরম্ভ করিলেন এবং যুদ্ধে তাঁহারই প্রেমযুদ্ধের প্রতিদ্বন্দ্বী ম্যানিলুসের হস্তে তিনি নিহত হইলেন। ভাগ্যের বিড়ম্বনায় তিনি জীবনে শান্তিলাভ করিতে পারেন নাই। অপরাপর কোন চরিত্রই সম্পূর্ণভাবে ফুটিয়া উঠে নাই। ঘটনা-স্রোতে যাহার যখন প্রয়োজন হইয়াছে সে তখন রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হইয়াছে। কাব্যের মধ্যে চরিত্র-অংশ প্রধান নয় ঘটনা-সংঘাতই বড় হইয়া উঠিয়াছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

জীবনী-কাব্য

ষোড়শ শতাব্দীতে চৈতন্যদেবকে লইয়া জীবনীকাব্যের যে ধারার সূচনা হয় উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধেও তাহা একেবারে লুপ্ত হয় নাই। শ্রেষ্ঠ মানবকে হৃদয়ের শ্রদ্ধার্ঘ্য দিয়া পূজা করার বাসনা চিরকালই মানুষকে জীবনী-কাব্য রচনার প্রেরণা জোগাইয়াছে। তবে বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি ও বিভিন্ন রচনা-রীতির মাধ্যমে তাহা নব নব রূপে ও রসে ব্যক্ত হইয়া সেই যুগের বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে।

উনবিংশ শতাব্দী বাঙ্গালীর জাগরণের যুগ। ভক্তিপ্রবণ ভাবুক জাতি তখন যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিতে সচেষ্ট এবং সমস্ত কার্য্য-কারণের পশ্চাতে বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা অনুসন্ধানে উন্মুখ। তাই এ-যুগে যে-সকল জীবনীকাব্য রচিত হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে স্থানে স্থানে অবতারবাদের প্রাধান্য লক্ষিত হইলেও যুক্তির বনিয়াদের উপর তাহা প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রয়াস দৃষ্ট হয়। আলোচ্য সময়ে জীবনীকাব্য বিশেষ রচিত হয় নাই। তবে সমসাময়িক গুণী ব্যক্তিগণকে লইয়া কাব্য লিখিবার একটি ঝোঁক এই সময়েও দেখা যায়। নিদর্শনস্বরূপ 'রাধাকান্তদেবের জীবনচরিত' (?), অনূপচন্দ্রের রচিত 'প্রতাপ-চন্দ্রলীলারস সঙ্গীত' (১৮৪৩) এবং আনন্দচন্দ্র মিত্রের 'ভারত-মঙ্গল' কাব্যের (১৮৯৪) উল্লেখ করা যাইতে পারে। নবীনচন্দ্র সেন পূর্ব্ববর্ত্তী মনীষিগণের জীবন লইয়া তিনটি কাব্য রচনা করেন—'খৃষ্ট' (১৮৯০), 'অমিতাভ' (১৮৯৫) এবং 'অমৃতাভ' (১৯০০)। এই কাব্যগুলির ভাষাতে আধুনিক কালের ছাপ রহিয়াছে—যুক্তি-তর্কের অবতারণা রহিয়াছে, ঘটনাগুলির মনস্তাত্ত্বিক ও বাস্তব ব্যাখ্যা দিবার প্রয়াস রহিয়াছে—তথাপি রচনার মধ্যে পূর্ব্ব কাঠামো ও পুরাতন ধারার শেষ হয় নাই। অলৌকিক ঘটনাবলীর সমাবেশ, রূপকের মধ্য দিয়া তত্ত্ব-ব্যাখ্যার রীতি, স্থানে স্থানে অবতারবাদের পরিকল্পনা কাব্যগুলিকে সার্থক হইতে দেয় নাই। ইহারা প্রাচীনকালের বিশ্বাসের পথেও অগ্রসর হয় নাই—আবার আধুনিক কালের যুক্তির কষ্টিপাথরেও সব সময় যাচাই হইতে রাজী

নয়। সেজন্য কাব্যগুলির মধ্যে ভাব ভাষা ঘটনা গতি ছন্দ সব থাকা সত্ত্বেও জীবনীকাব্য-হিসাবে খুব সমাদর লাভ করে নাই। ইহাদের মধ্যে অমিতাভ কাব্যটি দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার যোগ্য। বুদ্ধদেবের জীবনের অলৌকিক ঘটনাবলী কাব্যে স্থান পাইলেও ইহাতে কবির বাস্তব দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়।

জীবনীকাব্যগুলির ভাষা এবং ছন্দ অলঙ্কার-বাহুল্য-বর্জ্জিত সরল এবং গতিশীল।

খৃষ্ট :—খৃষ্ট-কাব্যটি ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। কবি নবীনচন্দ্র সেন কর্ত্তৃক রচিত জীবনীকাব্যগুলির মধ্যে ইহাই প্রথম রচনা। কবি অবতারবাদে বিশ্বাস করিতেন এবং কাব্যের ভিতর যীশুখৃষ্ট-জীবনের অলৌকিক ঘটনাবলীই ব্যক্ত করিয়াছেন। সূচনাতে কবি লিখিয়াছেন—"সকল ধর্মের ভিত্তিভূমি অবতারবাদ। ঈশ্বরের পুত্রই বল, আর ঈশ্বরের দূতই বল, সকলই ঈশ্বর হইতে অবতীর্ণ, সকলেই ঈশ্বরের অবতার।..."

কাব্যটিতে যীশুর জন্ম—প্রাচ্যদেশীয় জ্ঞানিগণ-কর্তৃক তাঁহাকে দর্শন ও ধন-রত্নদান, পুত্রসহ মাতাপিতার পলায়ন—রাজা হিরডের শিশুহত্যা—হিরডের মৃত্যুর পর দেবাদেশে নেজারতগ্রামে বাস—জনের নিকট যীশুর দীক্ষালাভ—পাপ-কর্ত্তৃক যীশুর পরীক্ষা ও শয়তানের পরাজয়—শিষ্যলাভ—যীশু-কর্তৃক রোগ আরোগ্য ও ধর্ম্মপ্রচার—পাঁচটি রুটিতে পাঁচ হাজার ব্যক্তির আহার—শিষ্যের বিশ্বাসঘাতকতা এবং ধর্ম্মযাজকগণ ও অধ্যাপকগণ-কর্ত্তৃক যীশুকে বন্ধন ও অত্যাচার—রাজসভায় যীশুর বিচার ও প্রাণদণ্ডাদেশ—ক্রুশবিদ্ধ যীশুর উপর অত্যাচার ও বিদ্রূপ—দেহত্যাগ—পর্ব্বতগুহায় মৃতদেহ স্থাপন—ভূমিকম্প প্রভৃতি দুর্যোগ, রবিবার দেবদূতের সহিত যীশুর স্বর্গযাত্রা—পথিমধ্যে শিষ্যগণের নিকট দর্শনদান ও উপদেশ প্রভৃতি ঘটনাগুলি কাব্যে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

শিষ্যগণ জগতের শেষ কিরূপ হইবে জিজ্ঞাসা করিলে যীশু কহিয়াছিলেন—

ভূমিকম্প, মারিভয়, দুর্ভিক্ষ, অনল,
ছাইবেক স্থানে স্থানে অবনীমণ্ডল।
... ...
সে দারুণ বিপ্লবের অন্তে প্রভাকর
হইবে তিমিরাবৃত, নাহি দিবে কর
নিশানাথ, তারাগণ পড়িবে খসিয়া।

দেখিবে তখন
মানব তনয় গর্ব্বে করি আরোহণ
স্বর্গীয় মেঘের পৃষ্ঠে আসিছে আবার
অতুল গৌরবান্বিত, শকতি আধার। —(৫০-৫১ পৃঃ)

সেইদিন মানবের বিচার হইবে। সুকৃতকারিগণ পুরস্কৃত হইবেন এবং এবং দুষ্কৃতকারিগণ শাস্তি পাইবে।

যীশুর উপর অত্যাচার—

অঙ্গে দিল থুথু সবে, কেড়ে নিয়া তাঁর
করের সে যষ্টি, শিরে করিল প্রহার।
... ...
বধ্যভূমে পিপাসায় হইলে কাতর
দিল তিক্তমিশ্র সির্কা নিষ্ঠুর বর্ব্বর।—(৬৪পৃঃ)

কাব্যটিতে ১৫টি অধ্যায় আছে। ত্রিপদী, চৌপদী, পয়ার, প্রভৃতি ছন্দ ইহাতে ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু ভাষা আড়ষ্ট ও গতিহীন। কাব্যটির কোথাও কবিত্বের স্ফুরণ হয় নাই। কবির নিজস্ব যে আবেগ, উচ্ছ্বাস ও ভাবপ্রবণতা অন্যান্য কাব্যে লক্ষণীয়, এই কাব্যে তাহার একান্ত অভাব। সেইজন্য কাব্যে কোথাও প্রাণ সঞ্চারিত হয় নাই। ইহাতে মেথু-রচিত গ্রন্থের প্রভাব পরিস্ফুট এবং সেই গ্রন্থের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়া কবি নিজস্ব রচনা-রীতি ও ভাববিন্যাস হারাইয়া ফেলিয়াছেন। খৃষ্ট-জীবনের সমস্ত ঘটনাই ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে—কিন্তু অধিকাংশক্ষেত্রে তাহা উপদেশের ভিতর দিয়া ব্যক্ত হইয়াছে। কাব্যের ভিতর ভক্তি-বিশ্বাসও স্ফুরিত হয় নাই, যুক্তি এবং তত্ত্ব-ব্যাখ্যাদিও স্থান পায় নাই। কাব্যটি একেবারেই ব্যর্থ হইয়াছে।

ভারতমঙ্গল :—ভারতমঙ্গল-কাব্যটি আনন্দচন্দ্র মিত্র কর্ত্তৃক রচিত ও ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। রাজা রামমোহন রায়ের জীবনী লইয়া বিভিন্ন খণ্ডে মহাকাব্য রচনা করিবার বাসনা কবির ছিল। কিন্তু একটি খণ্ড প্রকাশিত হইবার পর হয়তো সমালোচনার তীব্রতায় তিনি সে বাসনা ত্যাগ করেন। কাব্যটির নামকরণ সম্বন্ধে কবি ভূমিকায় লিখিয়াছেন—"ভূভারতের মঙ্গলসাধন করিবার জন্যই রামমোহনের অভ্যুদয়, এই নিমিত্ত কাব্যের নাম ভারতমঙ্গল রাখা গিয়াছে।"

কবি কাব্যের বিষয়বস্তু-নির্ব্বাচন-সম্বন্ধেও ভূমিকায় লিখিয়াছেন—"ইংরাজাধিকৃত ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্ত্তনে, প্রাচীন ভারতের ভক্তি, বৈরাগ্য ও নিষ্ঠার সঙ্গে আধুনিক ইউরোপের জ্ঞান, প্রেম ও কর্ম্মশীলতার সংযোগ হইয়া নিঃশব্দে যে মহাবিপ্লব সংঘটিত হইতেছে, ভারতের ব্রাহ্মসমাজ তাহারই শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন।...

"বিধাতার কৃপার ফলে, যে মহাপুরুষ ভারতে অভ্যুদিত হইয়া এই মহাবিপ্লবের অধিনায়করূপে কার্য্য করিয়াছেন, সেই রাজর্ষি রামমোহন অচিন্তনীয় প্রতিভা, অগাধ বিদ্যাবুদ্ধি, অদ্বিতীয় ভক্তিবিশ্বাস এবং অতুলনীয় কর্ম্মশীলতা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

"রামমোহনের অভ্যুদয়; তাঁহার প্রবর্ত্তিত নবযুগে, যে সকল চিন্তা ও ভাব মানুষের অন্তঃকরণে উদিত হইয়া জনসমাজকে অভিনব মূর্ত্তি প্রদান করিতেছে তাহা জাতীয় সাহিত্যের অঙ্গীভূত করিতে প্রাণে বড়ই ইচ্ছা জন্মিয়াছে, সেই জন্যই আমার এই চেষ্টা।"

রাজা রামমোহন রায় জন্মগ্রহণ করিবার পূর্ব্বে ভারতবর্ষের এবং বাংলাদেশের সমাজে যে-সকল দুর্নীতি বিদ্যমান ছিল কবি প্রথমে তাহারই চিত্র অঙ্কিত করিয়া পশ্চাৎপটভূমিকা রচনা করিয়াছেন। এই অনাচার ও অবিচার-প্রপীড়িতা ভারতজননী শত শত বৎসর তপস্যা করিয়া ঈশ্বর-কৃপা লাভ করেন এবং তাঁহারই ভক্তিমতী কন্যা বঙ্গজননীর গৃহে রামমোহনের আবির্ভাব হয়। পশ্চাৎপটভূমিকার অবতারণা করিতে গিয়া কবি মানবমনের বিভিন্ন সুপ্রবৃত্তি-গুলিকে স্বর্গরাজ্যের অধিবাসী এবং কুপ্রবৃত্তিগুলিকে পাতালে দানবরাজ্যের অধিবাসিরূপে কল্পনা করিয়া উভয়ের সঙ্ঘর্ষের ভিতর দিয়া সমাজের বিভিন্ন দিকের চিত্র পরিস্ফুট করিয়াছেন। নানাবিধ যুক্তি ও বিচার দ্বারা ন্যায়বোধ ও সত্যবোধ উদ্বুদ্ধ করিবার প্রয়াস ইহাতে দেখা যায়। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন ও বিচিত্র ঘটনাবলীর কার্য্যকারণ-সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়া বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা দিবার চেষ্টাও আছে। এক কথায়, স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতালের বর্ণনা ও কার্য্যাবলী পৌরাণিক কাব্যের অনুকরণে বর্ণিত হইয়াছে কিন্তু তাহার ভিতর আধুনিক-যুগের যুক্তিবাদ ও মনস্তাত্ত্বিক বিচার স্থান লাভ করিয়াছে। কাব্যের শেষ সর্গে রামমোহন রায়ের জন্ম বর্ণিত হইয়াছে এবং পূর্ব্বের সর্গগুলিতে তাঁহারই আবির্ভাবের প্রয়োজনীয়তা ও সম্ভাবনা এত বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে

যে কাব্যের মূল অংশটি তাহা দ্বারা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। যদিও কবি অবতারবাদ ও অলৌকিকতাবাদ পরিহার করিবার চেষ্টা করিয়া ফুটনোটে মানসিক বৃত্তি-গুলির ব্যাখ্যা সংযোজিত করিয়াছেন, তথাপি কাব্যটির ভিতর যে পরিবেশের সৃষ্টি হইয়াছে তাহাতে ইহাকে আপাতদৃষ্টিতে কল্পনারাজ্যের কাহিনী বলিয়া ধরিলে ভুল করা হয় না। কাব্যটির স্থানে স্থানে কবিত্ব পরিস্ফুট—তত্ত্বব্যাখ্যা ও সমস্যার মীমাংসা সুন্দর, রচনাভঙ্গিও গতিশীল ও সুখপাঠ্য, তথাপি জীবনী-কাব্য-হিসাবে ইহাকে সার্থক রচনা বলা চলে না। হয়তো পরবর্ত্তী খণ্ডগুলি প্রকাশিত হইলে এই প্রথমখণ্ডে যাহা সমতা রক্ষা করিতে পারে নাই তাহাই ভারসাম্য রক্ষা করিয়া ইহাকে কিছুটা মর্য্যাদালাভের উপযোগী করিতে পারিত, কিন্তু ঐ খণ্ডগুলি প্রকাশিত না হওয়াতে প্রথম খণ্ডের বিষয়বস্তু একেবারে ব্যর্থ হইয়াছে। জীবনীকাব্য রচনার ক্ষেত্রে কবি একটি নূতন দৃষ্টি-ভঙ্গি লইয়া অগ্রসর হইয়াছিলেন কিন্তু পৌরাণিক কাব্যের রূপধারা গ্রহণ করিয়া এবং অর্দ্ধপথে কাব্যটির ছেদরেখা টানিয়া কাব্যটিকে সার্থক করিতে পারেন নাই।

কবি প্রথমে বন্দনাতেই তাঁহার কাব্যের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে ইঙ্গিত করিয়াছেন—

> জয় জয় বিশ্বপতি, অনাদি মহান্
> অচিন্ত্য অনন্ত বিভু ব্রহ্ম সনাতন,
> ... ...
> লীলার তরঙ্গ এক উঠি বঙ্গভূমে
> ছাইল ভারতভূমি, কাঁপাইল ধরা
> হইবে সত্যের জয়, ডুবিবে সত্বরে
> জগতের পাপ তাপ শান্তিসিন্ধুনীরে।
> স্বর্গরাজ্য অবতীর্ণ হইবে কিরূপে
> পৃথিবীতে, পুণ্যকথা কহিব হে আমি,
> গাইব সে মহাগীত অবনী-মণ্ডলে
> অভিনব, ক্ষুদ্র আমি রুদ্রতালে মাতি। —(১৭-১৮ পৃঃ)

তারপর বাল্মীকি, ব্যাস, মিল্টন প্রভৃতি কবিগণের যশোগান করিয়া মধু-সূদনকে উদ্দেশ্য করিয়া লিখিয়াছেন—

অবশেষে বন্দি কবি শ্রীমধুসূদন
বঙ্গকবি কলাধর, কাব্যের কাননে
ভাষার ভাণ্ডার মোরে খুলি দেহ তুমি।
ঐন্দ্রজালিকের ক্ষুদ্র পেটিকা হইতে
নব নব রত্নরাজি বাহিরায় যথা,
বাহিরাবে সেইরূপ এ হৃদয় হতে
সাজাব তা সবে আমি—দীনা বঙ্গভাষা
দেহ বর কবিবর, বাণীপুত্র তুমি। —(২০ পৃঃ)

কবির এই প্রার্থনা ব্যর্থ হয় নাই। তিনি সমস্ত কাব্যটিই অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচনা করিয়াছেন এবং ছন্দ কোথাও সুষমা বা তাল হারায় নাই। যদিও মাইকেলের কম্বুনিনাদ আনন্দচন্দ্র মিত্রের এই কাব্যে ধ্বনিত হয় নাই তথাপি অমিত্রাক্ষর ছন্দে কবির দক্ষতা স্বীকার করিতে হয়।

প্রথম সর্গ—দেবলোক। দেবলোকের বর্ণনা—

সৌরজগতের পরে সুদূর অম্বরে
রম্য দেশ, সোমসূর্য্য অদৃশ্য সেখানে।
দিব্য দীপ্তিময় সেই দ্যুলোক নিয়ত,
নাহি দিবা বিভাবরী, অন্ধকার কিবা
মার্ত্তণ্ড-ময়ূখ-জ্বালা ভূলোকে যেমতি।
প্রহরে প্রহরে কিবা নব বেশ ধরে
নভঃস্থল, সমুজ্জ্বল শত সৌরকরে
কভু বা, অমৃত-কণা কভু অঙ্গে মাখা। —(২১ পৃঃ)

পুরাণের স্বর্গের কল্পনার সহিত কবির বর্ণনার সামঞ্জস্য রহিয়াছে। এই স্বর্গরাজ্যের রাজা ধর্ম্মরাজ—তাঁহার পত্নী সাধনা। ধর্ম্মরাজের বর্ণনা—"ধর্ম্মের প্রবীণ মূর্ত্তি স্ফূর্ত্তির আধার, সৌম্য কান্তি, স্নেহময় বীর্যভাতি মাখা"; ঐ রাজ্যের সেনাপতি সত্য এবং সত্যের পত্নী প্রীতি। স্বর্গরাজ্যের কোথাও দুঃখ বা নিরানন্দ নাই।

দ্বিতীয় সর্গ—মর্ত্ত্যযাত্রা। ধর্ম্মরাজের দুই পুত্র—ভাবদেব এবং জ্ঞানদেব, ও এক কন্যা—ইচ্ছাময়ী। তাঁহারা একদিন পিতামাতার অনুমতি লইয়া মর্ত্ত্যভ্রমণে যাত্রা করিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে দেবদূত জয়ন্ত ও জাহ্নবী চলিলেন।

জয়ন্ত ও জাহ্নবী পৃথিবীতে দেহত্যাগ করিলে স্বর্গে দেবদূত ও দেবদূতীর পদ লাভ করিয়াছিলেন। মর্ত্ত্যে যাইবার কালে সকলে কাঞ্চনশৃঙ্গে অবতরণ করিলেন।

তৃতীয় সর্গ—পাতালপুরী। পাতালপুরীতে দুষ্কৃতকারিগণের নানাবিধ শাস্তিভোগের চিত্র বর্ণিত হইয়াছে। পাতালের রাজা অধর্ম্মরাজ ভণ্ডাসুর-নামক সেনাপতিকে দেব-পুত্রকন্যাগণকে বিতাড়িত করিবার কার্য্যে নিয়োগ করিলেন।

চতুর্থ সর্গ—অবনী-পর্য্যটন। দেবদূত যাত্রা-পথের সমস্ত তথ্যাদি দেবত্রয়কে কহিতে লাগিলেন। ভারতবর্ষের পরিচয়, আদম-ইভের কাহিনী, পিরামিড, য়ুনানীরাজ্য ও হেলেনের কাহিনী, ইউরোপ ও আমেরিকার বিবরণ। অবশেষে সকলে সেতুবন্ধ রামেশ্বরে অবতরণ করিলেন।

পঞ্চম সর্গ—তপস্যা। ভারতবর্ষের দুঃখ-দুর্দ্দশার অবসান-হেতু ভারতজননী শত শত বর্ষ ধরিয়া তপস্যায় রত। তাঁহার বর্ণনা—

অহো কি অপূর্ব্ব কান্তি ভারতজননী
পুণ্যময়ী! সুপ্রশস্ত উজ্জ্বল ললাটে
ভক্তির চন্দনচর্চ্চা, স্তিমিত নয়নে
বিস্ফুরিত জ্ঞানজ্যোতি পশ্চিম আকাশে
অর্দ্ধ নিমজ্জিত প্রভাকর প্রভা সম। —(৮৬ পৃঃ)

ঊনবিংশ শতাব্দীতে যে জাতীয়তাবোধ বাঙালী-জীবনে আত্মপ্রকাশ করে তাহারই ফলরূপে দেশমাতৃকার বর্ণনা ও বন্দনা কাব্যে স্থান পাইয়াছে। সেখানে—

অপূর্ব্ব লাবণ্যময়ী সুশ্যাম-বরণা
নারী এক প্রবেশিলা পুণ্য তপোবন; (৮৮ পৃঃ)

তিনি বঙ্গজননী। ভারতমাতা চক্ষু উন্মীলিত করিলে তিনি বঙ্গদেশের অনাচার, ও অত্যাচারের কথা কহিলেন—

···দগ্ধে, অহর্নিশি
অবিরাম দুঃখানলে স্বর্ণ বঙ্গভূমি!
সতত অধর্ম্মাচারী বঙ্গবাসী যত
মদ্য মাংসে উন্মত্ত কুকাণ্ডে নিরত,

নিষ্ঠুর পাষণ্ড-সম নৃমুণ্ড লইয়া
করে কেলি, নৃকপালে ঢালি পিয়ে সুরা ; (৯২ পৃঃ)

সেখানে মেয়েদের প্রতি অসম্মান ও অবিচার প্রকট হইয়া উঠিয়াছে—

…সতী-ধর্ম্ম কলুষিত মাতঃ
বঙ্গভূমে, দহে অঙ্গ প্রদীপ্ত অনলে ; (৯২ পৃঃ)

নারীগণকে শিক্ষার আলোক হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখা হইয়াছে—

অবরুদ্ধা অন্তঃপুরে পিঞ্জর মাঝারে
বিহঙ্গশাবক-সম বঙ্গ কুলবালা
অসহায় জ্ঞানহীনা চির অন্ধকারে। (৯৩ পৃঃ)

সতীদাহ-প্রথা মেয়েদের দুর্দ্দশাকে চরমে লইয়া গিয়াছে—

ইহার অধিক আর মুখে নাহি সরে
দুঃখের কাহিনী মাতঃ বঙ্গবাসী যত
পাপিষ্ঠ পুরুষ মত্ত বৃথা অভিমানে
অনিচ্ছায় চিতানলে দগ্ধে অবলায়
শত শত ! যাতনায় অধীরা রমণী
কাতরে কাঁদয়ে যবে, কাংস্য করতালি
বাজাইয়া সে ক্রন্দন করে নিমজ্জিত
কোলাহলে, সকপটে করি হরিধ্বনি
কর্ব্বুরের দল যেন মদগর্ব্ব-ভরে ! —(৯৪ পৃঃ)

ভারতমাতা কন্যার অশ্রু মুছাইয়া সান্ত্বনা দিয়া কহিলেন—

শোন বৎস, হৃদিমাঝে শুনিয়াছি আমি
অমৃত-আশ্বাস-বাণী, সহস্র বৎসরে
যাবে ভারতের দুঃখ, উদিবে আকাশে
উজ্জ্বল পবিত্র আলো তমোরাশি নাশি ; —(৯৯ পৃঃ)

বঙ্গমাতাও স্বপ্নে দেখিয়াছেন—ইউরোপের জ্ঞান ও সভ্যতা ভারতবর্ষের অন্ধকার অনেক পরিমাণে দূর করিবে এবং তখন—

সহসা দেখিনু মাগো পড়িল খসিয়া
উজ্জ্বল নক্ষত্র যেন দামোদর তীরে।

ক্রমে সে নক্ষত্র ধরি মহাবীর-বেশ
উজলিয়া দিক্ দশ সুদিব্য কিরণে
পশিল সংগ্রাম-ক্ষেত্রে, নেত্র সমুজ্জ্বল
প্রশস্ত ললাট বক্ষ, বিলম্বিত বাহু,
সমুন্নত দেববপু প্রকাশিল তার
প্রেমপরাক্রম কিবা পারি না কহিতে।
সকলে নিরস্ত্র করি অস্ত্রশস্ত্রবিনা
মহাবীর, গাইলেন দেব-কণ্ঠস্বরে
শান্তির সঙ্গীত কিবা সুমধুর তানে। —(১০২-৩ পৃঃ)

তাঁহার প্রেরণায় সকলে মাতৃভাবাপন্ন হইয়া ভেদাভেদ ভুলিয়া গেল এবং

জয় ব্রহ্ম জয়! রবে পূর্ণ হলো মাগো,
স্বর্গমর্ত্ত্য, দেবগণ নামিয়া ভূতলে
গাইয়া মানব সহ জয় ব্রহ্ম জয়!
নাচিতে লাগিলা সবে ব্রহ্মানন্দে মাতি।
দেবমানবের এই শুভ সম্মিলনে
পৃথিবীর পশুভাব—হিংসাদ্বেষ যত
গেল দূরে, স্বর্গ রাজ্য আইল জগতে। —(১০৬-৭ পৃঃ)

রাজা রামমোহনের আবির্ভাব কবি ভারতমাতার তপস্যার ফলস্বরূপ চিহ্নিত করিয়াছেন। বঙ্গমাতা মাতৃভক্তির পুরস্কারস্বরূপ তাঁহাকে লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছেন।

ষষ্ঠ সর্গ—ভারত-ভ্রমণ। লঙ্কাধাম দর্শন—রামসীতার কাহিনী—নীলগিরি ও দাক্ষিণাত্য দর্শন—উজ্জয়িনী ও কালিদাসের কথা—শুম্ভনিশুম্ভের যুদ্ধকাহিনী—বুদ্ধগয়া ও শাক্যসিংহের বিবরণ—প্রয়াগ, বৃন্দাবন, মথুরা, ইন্দ্রপ্রস্থ ও মহাভারতের কথা—হরিদ্বার ও তীর্থমাহাত্ম্যের কথা এই সর্গে বর্ণিত হইয়াছে।

সপ্তম স্বর্গ—আবেদন। মন্দাকিনী-তীরে অশোক-কানন। সেখানে দেববালাগণ পতিভক্তি শিক্ষার জন্য সীতার নিকটে আগমন করেন। একদিন দেবনারীগণ সভা করিলেন—প্রীতিদেবী সভাপতি হইলেন—

ভারতনারীর দুঃখে ব্যথিত মরমে
দেবলোকে দেববালা, সীতার আশ্রমে

করিলা বিপুল সভা ; আইলা আপনি
প্রীতিদেবী পরহিতব্রত পরায়ণা
সভাপতিরূপে শত সহচরীসহ। —(১৩৯ পৃঃ)

এই সভার কল্পনায় পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব অনুভূত হয়।

মাতাপিতা কন্যাগণের অনিচ্ছাসত্ত্বেও প্রণয়ী ব্যতিরেকে অপর ব্যক্তির সহিত বিবাহ দেন—এই প্রথার বিরোধিতা করিয়া সাবিত্রী দেবী কহিলেন—

মনের অগ্রাহ্য যেবা, পতিরূপে তারে
পূজে যেই লজ্জাভয়ে দেহ উপচারে,
ব্যভিচারে রত সেই ; এই পশ্বাচারে
পতিত ভারতভূমি প্রেতভূমি সম। —(১৪৩ পৃঃ)

দময়ন্তী বাল্যবিবাহ ও বৈধব্য পালন করাইবার রীতির আলোচনা করিয়া কহিলেন—

নাহি যার প্রেমস্মৃতি, শূন্য যার হিয়া,
তার তরে ব্রহ্মচর্য্য ঘোর বিড়ম্বনা।—(১৪৯ পৃঃ)

গার্গীদেবী সতীদাহ-প্রথার কুফল প্রদর্শন করিলেন এবং ধর্ম্মের সত্যমর্ম্ম ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন—

নহে কভু আত্মতৃপ্তি কিম্বা আত্মত্যাগ
ধর্ম্মের চরম লক্ষ্য, সুখ-দুঃখাতীত
সত্যধর্ম্ম রত নিত্য কর্ত্তব্য-সাধনে ;
... ...
জ্ঞানহীন ভক্তি আর ভক্তিহীন জ্ঞান
লয়ে যায় ভ্রান্তি আর সংশয় আঁধারে
অনুদিন, দহে নিত্য অশান্তি অনলে। —(১৫৬-৫৭ পৃঃ)

গার্গীদেবী সকলকে ধর্ম্মরাজের নিকট যাইবার আহ্বান জানাইয়া কহিলেন—

এ দুঃখের প্রতিকার নাহি হয় যদি,
নিশ্চিন্ত নিরস্ত মোরা হইব না কভু। —(১৫৮ পৃঃ)

দেবীগণের আবেদন শুনিয়া ধর্ম্মরাজ আশ্বাস দিয়া কহিলেন—

ভারত-নারীর দুঃখ সমধিক বটে
অবনীতে ; অবতীর্ণ হইবে ভারতে

সত্য ধর্ম্ম তেঁই আগে, পূর্ব্বভাগে যথা
সৌরকর ; সত্যালোকে ঘুচিবে সত্বরে
অবলার দুঃখরাশি সমগ্র জগতে। —(১৬৩-৬৪ পৃঃ)

অষ্টম স্বর্গ—হরণ। দেবপুত্রকন্যাগণ গন্ধর্ব্বরাজ্যে আসিয়া সেস্থানে কিছুকাল অবস্থান করিবার বাসনা প্রকাশ করিলে জয়ন্ত ও জাহ্নবী তাঁহাদের অনুমতি লইয়া জন্মভূমি দর্শনে গেলেন। জয়ন্ত জন্মভূমির প্রতি আকর্ষণ সম্বন্ধে কহিলেন—

প্রিয়তররূপে জাগে প্রাণের মাঝারে
আপনি সে প্রিয়ভূমি বিধির বিধানে।
শিশুর জননীসম প্রিয় জন্মভূমি
মানবের ;······। —(১৭৩ পৃঃ)

জ্ঞান-ভাব-ইচ্ছা ভ্রমণ করিতে করিতে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলেন। ভণ্ডাসুর সেই সুযোগে ভাবদেবকে তাপসের বেশে, জ্ঞানদেবকে পণ্ডিতের বেশে এবং ইচ্ছাদেবীকে কর্ম্মীর ছদ্মবেশে প্রতারণা করিয়া অধর্ম্ম-রাজ্যে বিভ্রান্ত করিয়া রাখিল।

নবম সর্গ—বিষাদ। জয়ন্ত ও জাহ্নবী প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ভ্রাতাভগ্নীগণকে না দেখিয়া এবং অন্বেষণে ব্যর্থমনোরথ হইয়া ধর্ম্মরাজকে সংবাদ দিলে তিনি সত্য-সেনাপতিকে সৈন্যসহ তাঁহাদের উদ্ধারের জন্য প্রেরণ করিলেন।

দশম সর্গ—অন্বেষণ। দেবসেনা কাঞ্চনশৃঙ্গে শিবিরস্থাপন করিয়া অনুসন্ধান করিতে করিতে জ্ঞানদেব ও ভাবদেবকে উদ্ধার করিলেন।

একাদশ সর্গ—দৈত্যনীতি। ইচ্ছাদেবীকে হরণ করিতে সমর্থ হইয়াছে বলিয়া পাতালে উৎসব—ভণ্ডাসুরকে দৈত্যবাহাদুর উপাধিদান—ভণ্ডাসুর-কর্ত্তৃক দৈত্যনীতির ব্যাখ্যা। উপাধিদান ব্যাপারটিতে ইংরাজ রাজত্বের নীতির প্রভাব দৃষ্ট হয়।

দ্বাদশ সর্গ—সন্ধান। রাত্রে বনদেবীর নিকট স্বপ্নদেবী আসিলেন। নানাবিধ আলোচনার পর স্বপ্নদেবী তাঁহার দর্পণে জাহ্নবীর যে চিত্র প্রতিবিম্বিত করিয়াছেন বনদেবীকে তাহা দেখাইয়া কহিলেন যে মানবী হইয়াও জাহ্নবী দেবতাগণের মধ্যে বাস করেন এবং তাঁহার ব্রহ্ম-উপাসনার সময় দেবগণও অভিভূত হইয়া পড়েন। এই-সকল ঘটনার উল্লেখ করিয়া কবি মানব-সাধনার সিদ্ধি কতখানি ফলপ্রদ হইতে পারে—তাহাই দেখাইয়াছেন।

স্বপ্নদেবীর কথায় বনদেবী ইচ্ছাদেবীর অপহরণ এবং পাতালরাজ্যে অবস্থানের কথা কহিলে স্বপ্নদেবী জয়ন্তকে সে সংবাদ দিবার জন্য গেলেন। প্রাতঃকালে জয়ন্তের স্বপ্নবৃত্তান্ত শুনিয়া সত্য-সেনাপতি পাতালরাজ্যে গিয়া ইচ্ছাদেবীকে শত শত বাসনাদানবী দ্বারা পরিবেষ্টিত দেখিলেন এবং তাঁহাকে উদ্ধারের বাসনায় সৈন্যগণকে লইয়া যাইবার জন্য প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

ত্রয়োদশ সর্গ—পূর্ব্বাভাস। ভারতজননী ও বঙ্গজননীর কথোপকথনের ভিতর দিয়া রামমোহনের আবির্ভাবের সূচনা বর্ণিত হইয়াছে। ঐশীকৃপাও বঙ্গজননীকে আশ্বাস দান করিয়া কহিলেন—

ঘুচাতে যাতনা তব, পতিত ভারতে
উদ্ধারিতে, মহাবীর করিবে প্রচার
সনাতন সত্য ধর্ম্ম মানবসমাজে।
বিস্তারি উদার শিক্ষা, জ্ঞানের আলোকে
ঘুচাইবে অন্ধকার যুগযুগ-ব্যাপী,
পাইয়া উদার শিক্ষা, দীক্ষা সত্য পথে,
জ্ঞানভক্তি কর্ম্মযোগে করিবে মানব
ব্রহ্মপূজা ঘরে ঘরে, ব্রহ্মকৃপাবলে
প্রেমরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে জগতে। —(২৭০-৭১ পৃঃ)

চতুর্দ্দশ সর্গ—বিভ্রাট। দেবসৈন্যের পাতালে প্রবেশ, দৈত্যালয়ে নৃত্যগীত ও আমোদ—খলাসুরের ভাবী বিপদ-বর্ণনা—অধর্ম্মাসুরের আশঙ্কা ও মন্ত্রণা। অবিশ্বাস সেনাপতি ধর্ম্মপথে ভ্রান্তিসৃষ্টির পরামর্শ দিয়া কহিলেন—

ধরিবে, ধর্ম্মের ধ্বজা, সর্ব্বাঙ্গে পরিবে
ধর্ম্মচিহ্ন, স্বার্থ ভিন্ন ভাবিবে না কিছু। —(২৮০ পৃঃ)

অহঙ্কার সেনাপতি জাতীয়তার নামে স্বার্থপরতায় প্রচার করিতে উপদেশ দিলেন—

প্রচারি সংবাদপত্র বৃক্ষপত্র যথা
শিশিরে, দেশানুরাগ দিবে ছড়াইয়া।
মাতিয়া জাতীয়ভাবে, হইবে তাহারা
অজেয় জগতীতলে, কিন্তু না জানিবে,
জাতি কিম্বা জাতীয়তা জাগ্রত স্বপনে। —(২৮২-৮৩ পৃঃ)

মোহ-সেনাপতির পরামর্শ—ভ্রান্তশিক্ষা-প্রচার—

গ্রন্থকার, গ্রন্থনির্ব্বাচক আর যত
শিক্ষকে দিউক শিক্ষা দৈত্যনীতি যাহা,
ফলিবে যে ফল আশু, শোন দৈত্যপতি,
কহি আমি ক্রমে ক্রমে এ শিক্ষার ফলে। —(২৮৫ পৃঃ)

কামাসুর রঙ্গালয়ে বারবনিতাদিগের নৃত্যগীতের দ্বারা মানবের মন হইতে পবিত্রতা ও ধর্ম্মপ্রীতি লোপ করিবার পরামর্শ দিলেন। এমন সময় দেবগণের হস্তে দৈত্যনারীগণের লাঞ্ছনা ও খেদ শুনিয়া দৈত্যগণের যুদ্ধযাত্রা—দেব-দানবের যুদ্ধ ও দেবগণের পরাজয় বর্ণিত হইয়াছে। দেবতাগণের পরাজয়ের কারণ—

কিন্তু আসি দৈত্যদেশে দেবের বীরত্ব
কলঙ্কিত অনাচারে, ভগ্ন স্বাস্থ্য যথা
কর্ম্মিষ্ঠ বলিষ্ঠ যুবা জরাক্রান্ত দেশে। —(২৯৪-৯৫ পৃঃ)

পঞ্চদশ সর্গ—বিলাপ। সত্য-সেনাপতির বিরহে প্রীতিদেবীর অবসাদ—জাহ্নবীদেবী-কর্ত্তৃক প্রেমতত্ত্বের ব্যাখ্যা ও সান্ত্বনাদান, জয়ন্তের দেবসভায় আগমন ও ধর্ম্মরাজের নিকট দেবগণের পরাজয়ের সংবাদ দান, ধর্ম্ম-কর্ত্তৃক দেবগণকে আহ্বান—সাধনার প্রীতিকে সান্ত্বনা দান—জয়ন্ত ও জাহ্নবীর মিলন। এই সর্গে দেখানো হইয়াছে যে মানবের সাধনাও দেবগণকে রক্ষা করিতে পারে। দেবগণ পরাজিত হইলে জাহ্নবীর ব্রহ্ম-আরাধনার ফল তাঁহা-দিগকে রক্ষা করিয়াছিল। জয়ন্ত ধর্ম্মরাজের নিকট ঘটনাটি বর্ণনা করিয়া-ছিলেন—

হেনকালে প্রবাহিল আকাশ ব্যাপিয়া
তপ্তবায়ু, অগ্নিস্রোত তাহার পশ্চাতে,
দীপ্ত-দাবানলসম দহিল দানবে
সে অনল, দৈত্যদল ভঙ্গ দিয়া রণে
পলাইলা দশদিকে ত্রাহি ত্রাহি রবে। —(৩১২ পৃঃ)

ষোড়শ সর্গ—বিজয়। দেবতারা ব্রহ্মপূজা করিয়া ব্রহ্মের বাণী শুনিলেন—

যাইয়া দৈত্যের দেশে মম আজ্ঞা বিনা,
দেবত্ববিহীন দেব, রত ভ্রষ্টাচারে,

নিরস্ত্র শত্রুর অঙ্গে তাই প্রহারিলা
অস্ত্ররাশি, অনায়াসে করিলা লাঞ্ছনা
অবলার, কাটি কেশ কর্দ্দম লেপিয়া।
মাতৃরূপে অবতীর্ণ অবলায় আমি
এ জগতে, মাতৃঘাতী মহাপাপী সেই,
পরশে অবলা অঙ্গ অপবিত্রচিত্তে
যে জন, পশুর সম পতিত সে ভবে,
ভ্রষ্টাচারে দেবগণ হীনবীর্য্য, তেঁই,
নিপতিত মৃতপ্রায় দানবসমরে,
সতীর প্রার্থনা শুধু রক্ষিছে তা সবে
এ বিপদে।··

... ...

পঞ্চশত দেবনারী, পতিত যাদের
পতি রণে, প্রীতিসহ যাউক সে দেশে,
পত্নীর পরশে পতি লভিবে জীবন,
পুণ্যপরাক্রম, হবে বিজয়ী সমরে। —(৩৪০-৪১ পৃঃ)

ইহার পর পাতালে দেবীগণের স্পর্শে দেবসৈন্যগণের শক্তিলাভ ও সমর-বিজয়।

অষ্টাদশ সর্গ—স্বর্গযাত্রা। ইচ্ছাদেবীর উদ্ধার ও অনুশোচনা—স্বর্গযাত্রার পথে প্রেতপুরী দর্শন—মধ্যলোক দর্শন ও স্বর্গে গমন।

উনবিংশ সর্গ—অভিষেক। সকলের দেবসভায় আগমন—জ্ঞান-ভাব-ইচ্ছার ক্ষমাপ্রার্থনা—ধর্ম্মরাজ-কর্ত্তৃক জয়ন্ত ও জাহ্নবীকে দেবত্বে বরণ—ব্রহ্মের আদেশে দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন ও রামমোহনের জন্ম এবং অভিষেক।

দেবগণ ভারতমাতাকে লইয়া বঙ্গদেশে গিয়া দেখিলেন—

শ্রীরাধানগর গ্রামে সুন্দর কুটীরে,
ভূমিষ্ঠ হয়েছে শিশু, জ্বলিছে যেমতি
ঘৃতের প্রদীপ ক্ষুদ্র দেবগৃহতলে।
কে জানিত সে সময়ে, এ ক্ষুদ্র দেউটী

ধরি প্রভাকর-প্রভা করিবে উজ্জ্বল
বঙ্গভূমি, অন্ধকার ঘুচাবে জগতে? —(৬৮৮ পৃঃ)

ভারতজননী শিশুকে আদর করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন—

বেঁচে থাক বাছা মোর, করহ উজ্জ্বল
মাতৃমুখ, ধরিত্রীর পাপদুঃখরাশি
কর নাশ, মাতৃ-আশা পুরাও সত্বরে।
অব্যর্থ ব্রহ্মের বাণী হউক সফল
তোমা হতে এ জগতে, হোক প্রতিষ্ঠিত
শান্তিরাজ্য, জয় ব্রহ্ম গাউক সকলে।

দেবতারাও সে সময় জয় ব্রহ্ম জয় রবে আকাশ-বাতাস মুখরিত করিয়া তুলিলেন।

কাব্যটিতে জীবনীকাব্যের ভাবধারায় নূতন সুর আনিবার চেষ্টা দেখা যায়। যদিও ইহা কবির সার্থক রচনা নহে, তথাপি উনবিংশ শতাব্দীতে ইংরাজী শিক্ষার ফলে বাঙ্গালীর মনে যে সত্যের প্রতি আকর্ষণ ও যুক্তির প্রতি ঝোঁক আসিয়াছিল—এই কাব্যে তাহা পরিস্ফুট।

অমিতাভ—কবি নবীনচন্দ্র সেন কর্তৃক রচিত 'অমিতাভ'-কাব্যটি ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। কাব্যটির কয়েকটি অধ্যায় 'জন্মভূমি' নামক মাসিক পত্রিকায় বাহির হইয়াছিল। কবি গ্রন্থটি সম্বন্ধে 'অমিতাভ' শিরোনামায় লিখিয়াছেন—

"এ কাব্যখানির প্রণয়ন সম্বন্ধে আমি পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থকারদের কাছে বিশেষরূপে ঋণী। তবে তাঁহারা প্রায় সকলেই বুদ্ধদেবকে অল্পাধিক অতিমানুষিকভাবে চিত্রিত করিয়াছেন। আমি যথাসাধ্য তাঁহাকে মানুষিক ভাবাপন্ন করিতে যত্ন করিয়াছি। এ অবতারদিগকে মানুষিকভাবে দেখিলে যেন আমার হৃদয় অধিক প্রীতিলাভ করে, তাঁহাদিগকে অধিক আমাদের আপনার বলিয়া বোধ হয়। বুদ্ধদেবের ধর্ম্মও সম্পূর্ণরূপে দর্শনমূলক। অতএব তাঁহাকে অতিমানুষিকভাবে চিত্রিত করিবার প্রয়োজন বিশেষ নাই।"

'অমিতাভ'-কাব্যে বুদ্ধদেবের জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে এবং তাহার পশ্চাৎপটভূমিকায় দেখান হইয়াছে যে মানবের দুঃখ বৈকুণ্ঠে বিষ্ণুকে

বিচলিত করিলে দুঃখার্ত্ত নর-নারীকে উদ্ধার করিবার জন্য তিনি ধরাধামে অবতীর্ণ হইবার বাসনা প্রকাশ করেন।

কাব্যের মধ্যে কোথাও বুদ্ধদেবকে অবতাররূপে অঙ্কিত না করিলেও প্রথম 'অবতার'-নামক অধ্যায়ে কবির অবতারের পরিকল্পনাই পরিস্ফুট হইয়াছে এবং এই ধারণাই পাঠকের মনে সর্ব্বক্ষণ জাগরিত থাকে। তাহা ছাড়া অনেক অলৌকিক ঘটনার সমাবেশও কাব্যে দৃষ্ট হয়। অবশ্য মহামানবের জীবনে অসাধারণ ঘটনা সংঘটিত হওয়া হয়তো অসম্ভব নয়।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে রচিত জীবনীকাব্যগুলির মধ্যে এই কাব্যটিকে শ্রেষ্ঠ স্থান দেওয়া চলে। ভাবে, ভাষায়, ছন্দে, বর্ণনায়, ঘটনা-সন্নিবেশে এবং তত্ত্ব-ব্যাখ্যায় কাব্যটি সত্যই প্রশংসনীয়। বুদ্ধদেবের জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনা বর্ণনার মধ্যেও কবি বুদ্ধদেবের যে অন্তর্দ্বন্দ্ব, যে করুণাবোধ, যে মহানুভবতা ফুটাইয়া তুলিয়াছেন তাহা মুগ্ধকর ও রসসমৃদ্ধ। বর্ণনা কোথাও বিবৃতিমাত্র হয় নাই। কবির উপলব্ধিই যেন কাব্যে মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়াছে।

বুদ্ধদেবের জীবনে নর-নারীর নিমিত্ত যে বেদনা-বোধ জাগরিত হইয়া তাঁহাকে ত্যাগের পথে ও তপস্যার পথে লইয়া গিয়াছিল তাহার মূলে কবি যেমন অবতারের কল্পনা আনিয়াছেন তেমনি তাঁহার মাতা মহামায়ার অন্তরেও জগতের দুঃখে ব্যাকুলতা প্রদর্শন করিয়া বাস্তব কারণ দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। বুদ্ধদেবের জন্মেরও পূর্ব্বে তাঁহার মাতার অবস্থা বিবৃত হইয়াছে।

> জগতের দুঃখে সদা কাঁদিত মায়ের প্রাণ
> আয়ার মূরতি মহামায়া
> কহিতেন—নারায়ণ লভি এক জন্ম আর
> দুঃখী জীবে দেহ পদছায়া। —(২য় সং, ৬ পৃঃ)

রাজপুত্র বিলাস-ব্যসনে পালিত। শোক, দুঃখ, কষ্ট, অভাব, ব্যথা-সম্বন্ধে কোন জ্ঞান নাই। তথাপি মৃগয়া করিতে গিয়া তিনি পশুর প্রতি তীর নিক্ষেপ করিতে পারিতেন না। ধনুকে তীর সংযোজিত করিয়াও হঠাৎ নিবৃত্ত হইতেন এবং অন্যমনস্ক হইয়া পড়িতেন। বেদনা-সম্বন্ধে কোন জ্ঞান তখনও তাঁহার হৃদয়ে ছিল না—তথাপি অজ্ঞাতে তাঁহার অন্তর আলোড়িত হইয়া উঠিত—

জগতের দুঃখ কিছু কুমার ত নাহি জানে,
দেখে নাই, শুনে নাই, ভাবে নাই মনে,
তথাপি হৃদয়ে ধীরে, ত্রিদিব করুণা-উৎস
হইতেছে সঞ্চারিত অজ্ঞাতে কেমন।— (২য় সং, ১৫ পৃঃ)

তারপর দেবদত্ত-কর্ত্তৃক তীরবিদ্ধ হংসকে দেখিয়া তাঁহার হৃদয়ে প্রথম ব্যথা সম্বন্ধে জ্ঞান সঞ্চারিত হইল এবং হলোৎসবে তাহাই পরিবর্দ্ধিত হইয়া তাঁহাকে ধ্যানে নিমগ্ন করে। মহামানবের মনস্তত্ত্বের এইভাবে স্তরে স্তরে বিশ্লেষণ করিয়া কবি অত্যন্ত নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন এবং বুদ্ধদেবকে পৃথিবীর মানুষরূপে জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছেন।

বিবাহের পূর্ব্বে তাঁহার মনে অন্তর্দ্বন্দ্ব আসিল। তিনি পিতার নিকট সাত দিনের সময় লইয়া অনেক চিন্তা করিলেন। বিবাহ করিলে মায়ার বন্ধন আসিয়া পড়িবে, দুঃখ বাড়িবে। বিবাহ না করিলে পিতামাতা দুঃখ পাইবেন। তাহা ছাড়া মায়ার মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়াও নির্ব্বিকার থাকিবার সাধনা করাই তো প্রয়োজন। তিনি অবশেষে স্থির করিলেন—

বিকার-সমুদ্রে ডুবি রব নির্ব্বিকারে,
পঙ্কজ পঙ্কেই বাড়ে, জলে শোভে আর।
পূর্ব্ব মহাজনগণ ছিলেন সংসারে
অনাসক্ত অগ্নিদেব যেমতি অঙ্গারে। —(২য় সং, ২৭ পৃঃ)

তিনি সর্ব্বগুণসম্পন্না কন্যার সন্ধানের নিমিত্ত পিতাকে অনুরোধ জানাইলেন। পিতা ঐরূপ কন্যা দুর্ল্লভ ভাবিয়া একদিন অশোকভাণ্ড উৎসবের ব্যবস্থা করিলেন। স্থির হইল শাক্য কুমারীগণকে সিদ্ধার্থ একটি করিয়া অশোকভাণ্ড দান করিবেন। উৎসবের দিন ঐরূপ দান করিতে করিতে হঠাৎ গোপা-নাম্নী বালিকার প্রতি সিদ্ধার্থের দৃষ্টি নিবদ্ধ হইল—যেন পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি তাঁহার মনে উদিত হইতে লাগিল। তিনি গোপার আঙ্গুলে নিজ অঙ্গুরী পরাইয়া দিলেন। গোপাও পরিবর্ত্তে নিজ অঙ্গুরী দিয়া কহিলেন—

এ অঙ্গুরী করুন গ্রহণ।
রত্ন বিনিময়ে এই তৃণ অকিঞ্চন।
আমি উপাসিকা নহে বাসনা আমার
আভরণহীন কর দেখি আপনার।—(২য় সং, ৩১ পৃঃ)

গোপাকে বিবাহ করিয়া সিদ্ধার্থ আনন্দলাভ করিলেন। তাঁহাদের নিমিত্ত প্রমোদ-প্রাসাদ নির্মিত হইল। সিদ্ধার্থ বৈরাগ্যের চিন্তা বিস্মৃত হইলেন। কিন্তু একদিন রাত্রে কক্ষান্তরে এক সখীর বাঁশরীধ্বনি তাঁহার মনে বেদনার ঝঙ্কার তুলিল এবং সত্যের সন্ধানলাভ করিবার জন্য তিনি ব্যাকুলতা অনুভব করিতে লাগিলেন। সিদ্ধার্থের মনে ভাবান্তর আনিতে বাঁশরীধ্বনির অবতারণা কবির বাস্তবদৃষ্টি ও সূক্ষ্ম-রসবোধের পরিচয় দেয়।

সিদ্ধার্থের মনে ব্যাকুলতা জাগিল কিন্তু দ্বন্দ্ব ঘুচিল না। জগতের দুঃখ দূর করিবার নিমিত্ত প্রিয় পরিজনদের মনে ব্যথা দিতে তাঁহার দরদী হৃদয় বেদনা অনুভব করিতে লাগিল। অতঃপর পুত্রের জন্ম সংবাদ নূতন মায়ার বন্ধনের আশঙ্কা তাঁহার মনে জাগাইল এবং পুত্রমুখ দর্শন করিয়া তিনি এই বন্ধনকে দৃঢ়তররূপে অনুভব করিলেন—

> সুবর্ণ সংসার পাত্রে জীবন্ত অমৃত
> সিদ্ধার্থ দেখিলা যেন, হৃদয় তাঁহার
> করি আকর্ষিত, করি প্লাবিত, কম্পিত। (২য় সং, ৫৫ পৃঃ)

তিনি সেই রাত্রেই সংসারত্যাগ করিবার সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়া পিতার নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলে পিতা যখন তাঁহাকে গৃহে থাকিতে কহিলেন এবং সিদ্ধার্থের সমস্ত আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিবার প্রতিজ্ঞা করিলেন তখন সিদ্ধার্থ কহিলেন—

> জরায় যৌবন ফুল যেন না শুকায়;
> ব্যাধি যেন কভু নাহি পরশে আমায়;
> মৃত্যু যেন নাহি আসে নিকটে আমার;
> পাই সে সম্পদ যাহা অক্ষয় অপার। —(২য় সং, ৬৫ পৃঃ)

পিতার জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলিত হইল। পুত্রের মধ্যে তিনি নারায়ণকে দেখিতে পাইলেন। নিজ হৃদয়ের স্নেহ-দুর্ব্বলতাকে জয় করিয়া জগতের কল্যাণের নিমিত্ত এবং পুত্রের আনন্দের নিমিত্ত তিনি গৌতমের কার্য্যে সম্মতি প্রদান করিলেন। তাঁহার চক্ষু দিয়া অশ্রু পড়িতে লাগিল। এই মুহূর্ত্তটিকে কবি বর্ণনা করিয়াছেন—

> এ মুহূর্ত্ত, এই যোগ, এ বিয়োগ আর,—
> মানবের কি অনন্ত আশা-পারাবার। —(২য় সং, ৬৭ পৃঃ)

গৃহত্যাগের পূর্ব্বে নিজগৃহে আসিয়া নিদ্রিত পত্নী ও পুত্রকে দেখিয়া গৌতমের চক্ষে অশ্রু আসিল। সংসারের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন নাই—মায়া-দয়া-প্রেম ও কারুণ্যের স্রোত তাঁহাকে সন্ন্যাসের পথে সত্য-সন্ধানের নিমিত্ত বাহির করিয়াছে। তাই গৃহত্যাগের পূর্ব্বেও তাঁহার হৃদয়ে স্নেহ-প্রেম-প্রীতি সমভাবেই বিরাজিত ছিল। তাই—

কেবল দুইটি বিন্দু অশ্রু দুনয়নে
আসিল, ভাসিল ধীরে,—মায়ার চরণে
সিদ্ধার্থের সুশীতল শেষ উপহার।—(২য় সং, ৭৪ পৃঃ)

পুনরায় জগতের বেদনা মূর্ত্ত হইয়া তাঁহাকে আহ্বান করিতে লাগিল—

চাহিয়া চাহিয়া পত্নী পুত্র মুখ পানে
হইলেন ধ্যানমগ্ন। শুনিলেন কর্ণে
জরা ব্যাধি ব্যথিতের ঘোর হাহাকার।
ঘোর দুঃখপূর্ণ ধরা—কত নর নারী,
কত গোপা, কত শিশু, ব্যাপি ভবিষ্যত
পুড়িতেছে দুঃখানলে, দেখিলা নয়নে।— (২য় সং, ৭৫ পৃঃ)

সিদ্ধার্থ চলিয়া যাইবার পর রাজ্যের সকলে সাত দিন অন্নজল ত্যাগ করিয়া রহিল। শুদ্ধোদন নিশ্চল অভিভূত—গৌতমী অচেতন—গোপা জ্ঞানহারা। অশ্বরক্ষকের মুখে সিদ্ধার্থের সন্ন্যাস-গ্রহণের সংবাদ পাইয়া গোপা নিজ কেশ কর্ত্তন করিয়া সন্ন্যাসিনী-বেশ ধারণ করিলেন এবং ব্যথিত গৌতমীকে কহিলেন—

তিনি নারায়ণ, তাঁহার সন্ন্যাস
উদ্ধার করিতে নরে ;
আমি ক্ষুদ্র নারী, আমার সন্ন্যাস
তাঁহার চরণ তরে।—(২য় সং, ৯৪ পৃঃ)

ইহা সিদ্ধার্থের পত্নীর উপযুক্ত কথা।

সন্ন্যাসের পথে গিয়াও প্রথমেই সিদ্ধার্থ সব ভ্রান্তিমুক্ত হইতে পারেন নাই। প্রথমে বৈশালীনগরে আরাড়কালাম ঋষির নিকট শাস্ত্র শিক্ষা করিলেন—কিন্তু তাহার মধ্যে পথ দেখিতে পাইলেন না। অনেকদিন ভ্রমণ করিয়া ও চিন্তা করিয়া তাঁহার মনে হইল—

কেমনে পাইব জ্ঞান কেমনে পাইব অগ্নি
শুষ্ক কাষ্ঠে শুষ্ক কাষ্ঠ না করি ঘর্ষণ
শুষ্ক দেহে শুষ্ক মন করি যদি সংঘর্ষণ
তবে বুঝি জ্ঞান অগ্নি পাব দরশন।

ছয় বৎসর তপস্যা করিলেন—অনেক জ্ঞান লাভ করিলেন—কিন্তু সিদ্ধিলাভ হইল না। শরীর রুগ্ন ও জীর্ণশীর্ণ। নানারূপ ছলনা, নানারূপ বিভীষিকা আসিয়া তাঁহাকে ভয় দেখাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। ব্যর্থতায় তিনি নিরাশ হইয়া পড়িলেন এবং বুঝিলেন দেহকে উপেক্ষা করিয়া, রুগ্ন করিয়া কোন সাধনায় সিদ্ধি পাওয়া যায় না। এমন সময় ইন্দ্রদেব আবির্ভূত হইয়া যেন তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া গেলেন।

এইরূপ নিরাশা, ভ্রান্তি ও বিফলতা আনিয়া কবি সিদ্ধার্থের চরিত্রকে অনেকখানি জাগতিক করিয়াছেন। সিদ্ধার্থকে তিনি একেবারেই পূর্ণমানব-রূপে অঙ্কিত করেন নাই। তাঁহার জীবনে কবি দুঃখ আনিয়াছেন, কষ্ট আনিয়াছেন, তপস্যা আনিয়াছেন এবং পর্য্যায়ক্রমে তাঁহার সিদ্ধির পথে অগ্রগতি প্রদর্শন করিয়াছেন। সুজাতার পায়সান্ন ভক্ষণ করিয়া কয়েকদিনের মধ্যে তিনি সুস্থ হইলেন। অবশেষে পুনরায় ধ্যানমগ্ন হইলেন এবং সত্যজ্ঞান লাভ করিলেন। তখন তাঁহার—

পুলকে ভরিল প্রাণ, পুলকে পূরিত
হইল শরীর শীর্ণ, পলকে পলকে
হইতে লাগিল সেই দেহ সঞ্জীবিত।
বহুক্ষণ এ পুলকে থাকি নিমজ্জিত
অমৃত শশাঙ্ক গর্ভে,—স্থির অবিচল,
ধীরে ধীরে বুদ্ধদেব মেলিলা নয়ন,
মেলিলা অরুণ-আঁখি দিবস যেমন। —(২য় সং, ১৩৫ পৃঃ)

কিন্তু সিদ্ধিলাভ করিয়া সাত দিন সাত রাত আনন্দে মগ্ন থাকিবার পর তাঁহার ভাবনা হইল তাঁহার প্রদর্শিত পথ কেহই গ্রহণ করিবে না। কারণ,—

শ্রুতিজাত কামনার স্রোতে খরতর
ভাসিছে ভারতভূমি ;…। —(২য় সং, ১৩৯ পৃঃ)

তারপর তাঁহার ধর্ম্মপ্রচার ও অলৌকিক ঘটনাসমূহের বিবরণ রহিয়াছে। পিতা-পুত্র-পত্নী হইতে রাজা বিম্বিসার ও জ্ঞানহীন, বিত্তহীন জনসাধারণ পর্য্যন্ত সকলেই তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। চণ্ডালের প্রদত্ত মাংসান্ন ভোজন করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াও তিনি ক্ষমা ও দয়ার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন। চণ্ডাল তাহার কর্ম্মের নিমিত্ত পাছে মর্ম্মাহত হয় তাই সিদ্ধার্থ আনন্দ-নামক শিষ্যকে কহিলেন—

কহিলা—আনন্দ! দেখ যদি কহে কেহ
চণ্ডের মাংসান্নে মৃত্যু ঘটিল আমার,
পাইবে সে বড় ব্যথা। কহিও চণ্ডেরে—
সুজাতার অন্নে বুদ্ধ হইলাম আমি,
লভিলাম নিরবাণ অন্নেতে তাহার। —(২য় সং, ১৮২ পৃঃ)

কাব্যটি—অবতার, শুভজন্ম, ভবিষ্যৎ—এইভাবে পরিচ্ছেদে ভাগ করিয়া রচিত। ইহাতে পয়ার, ত্রিপদী, চৌপদী ও অমিত্রাক্ষর ছন্দ এবং ক খ গ ক রূপে অন্তপদের মিল দৃষ্ট হয়।

অমৃতাভ—'অমৃতাভ' কাব্যটি নবীনচন্দ্র সেনের সর্ব্বশেষ রচনা। তিনি ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে ইহা প্রণয়ন করিতে আরম্ভ করেন এবং ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে শেষ সর্গটি লেখেন। ইহা তাঁহার অসমাপ্ত কাব্য। হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় ভূমিকায় লিখিয়াছেন—

"ফলতঃ অমৃতাভের অনেকস্থলে অমিয় নিমাই চরিতের প্রভাব লক্ষিত হয়। অমৃতাভের ঘটনা-সংস্থান ও বাক্য-বিন্যাস বিষয়ে নবীনবাবু স্থানে স্থানে শিশির-বাবুর নিকট ঋণী। কিন্তু সর্ব্বত্রই কবিত্ব তাঁহার নিজস্ব।.........

"তাঁহার এক নিকট আত্মীয়ার ধ্রুব ধারণা এই যে চৈতন্যলীলাই তাঁহার শেষ কাব্য। এই কাব্য সমাপ্তির সহিত তাঁহার জীবনও সমাপ্ত হইবে। সেই ধারণার অনুরোধে তিনি ধীরে ধীরে কাব্য রচনা করিতেছিলেন।"

আত্মীয়ার ধারণাই সত্য হইয়াছিল। এই কাব্য লিখিতে লিখিতেই কবি ইহধাম ত্যাগ করেন।

কবি স্থচনায় এই কাব্যটি রচনার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"তিনি সেই কাতর আবাহন শ্রবণ করিয়া ৪০০ বৎসর পূর্ব্বে নবদ্বীপে অমৃতাভ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য রূপে অবতীর্ণ হইয়া প্রেম-ভাগীরথীর প্রবল বন্যায় এই বঙ্গদেশ প্লাবিত

করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই প্রেমের বিন্দুমাত্রের জন্য পিপাসায় আকুল হইয়া আমি এই অমৃতাভ প্রণয়ন করিলাম।"

কাব্যটিতে প্রথম 'আবাহন' নামক একটি অধ্যায় রহিয়াছে। ইহাতে ব্রজ-গোপীগণ, রাধিকা, রাখালগণ, মাতা যশোদা ও পিতা নন্দ সকলেই গান করিয়া করিয়া কৃষ্ণকে আহ্বান করিতেছেন। কৃষ্ণ তাঁহাদের সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন, রাধিকা তাঁহার চরণে পতিত হইয়া পৃথিবীর দুঃখ হরণ করিবার অনুরোধ জানাইলে তিনি রাধিকাকে তুলিয়া কহিলেন—

প্রেমময়ি! আরাধিকা রাধিকা আমার।
কাঁদে প্রাণ যুগে যুগে এরূপে তোমার
মানবের মহা দুঃখে। করুণা উচ্ছৃত
নব ধর্ম্ম ভাগীরথী হয় প্রবাহিত
যুগে যুগে; করুণার এই আকর্ষণে
লভি জন্ম যুগে যুগে তব আবাহনে।

—(২য় সং, আবাহন, ৬ পৃঃ)

তারপর তান্ত্রিকের বামাচার, শুষ্ক মায়াবাদ প্রভৃতি দ্বারা সংসার মরুময় হইয়াছে কহিয়া তিনি নবদ্বীপে ভক্তি-স্রোত প্রবাহিত করিবার বাসনা প্রকাশ করিলেন—

অবতরি এইবার জাহ্নবীর তীরে,
ভাসাইব ধরাতল প্রেম অশ্রুনীরে।
কাঁদাইনু দ্বাপরেতে; কাঁদিব এবার;
দুই নেত্রে প্রেমগঙ্গা বহিবে আমার।

—(২য় সং, আবাহন, ৮ পৃঃ)

এই-সকল বলিয়া নারায়ণ রাধিকাকে বক্ষে ধারণ করিলে—

হইল যুগল এক অঙ্গ পরিণত
সলিলে সলিল, দীপে দীপশিখা মত।
কিবা গৌর-হরি রূপ! নেত্রে প্রেমধারা,
করে দণ্ড কমণ্ডলু, প্রেমে আত্মহারা।

—(২য় সং, আবাহন, ১০ পৃঃ)

এই 'আবাহন' সর্গে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের চিত্রটি সুন্দরভাবে ব্যক্ত হইয়াছে।

প্রথম সর্গ—অবতরণ।

দোল পূর্ণিমা। নবদ্বীপে চারিদিকে রঙের ছড়াছড়ি।

আবির কুঙ্কুমে রঞ্জিত সৈকত
রঞ্জিত জাহ্নবী-জল
নগরবাসীর হৃদয় আনন্দে
আবির কুঙ্কুমোজ্জ্বল। —(১২ পৃঃ)

পণ্ডিতগণ শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিতেছেন—ছাত্রগণ জ্ঞান আহরণ করিতেছেন। কবি আক্ষেপ করিয়া কহিতেছেন—

যায় ভক্তি গঙ্গা পতিতপাবনী
বহিয়া শীতল ধারা,
তৃষিত মানব দেখে না তাহাকে
শুষ্ক শাস্ত্রে দিশাহারা। —(১৫ পৃঃ)

এমন সময় আচার্য্য অদ্বৈত তাঁহার শিষ্যবৃন্দ লইয়া "হরিবোল হরি" বলিয়া নারায়ণকে আহ্বান করিতে লাগিলেন।

দ্বিতীয় সর্গ—শৈশব-লীলা।

সেই পূর্ণিমার রাত্রে নিমাই জন্ম গ্রহণ করিলেন। জন্মাবধিই তাঁহার মধ্যে অলৌকিকত্বের প্রকাশ—

কাঁদিতেছে শিশু, কহ হরিনাম,
কি বিস্ময় শিশু হইয়া নীরব,
চাহি শূন্যপানে রহে আত্মহারা,
যেন মৃগশিশু শুনি বংশীরব। —(২২ পৃঃ)

বালক গৌরাঙ্গের দৌরাত্ম্যে সকলে অস্থির এবং মাতাপিতার নিকট তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগের শেষ নাই। কিন্তু কেহই তাঁহাকে শান্ত করিতে সমর্থ হন না। সকলকে তিনি হরিনাম কহিতে বলেন এবং তাঁহার কথা না শুনিলে যথেচ্ছ অত্যাচার করেন। তাঁহার একটি দল জুটিয়া গেল এবং সারাদিন তাঁহারা হরিনামে পাড়া মাতাইয়া রাখিতেন।

তৃতীয় সর্গ—বিশ্বরূপ।

নবদ্বীপে পশুবলি এবং ধর্ম্মের নামে অনাচার দেখিয়া বিশ্বরূপের হৃদয় কাঁদিয়া উঠে। তিনি অদ্বৈত আচার্য্যের গৃহে হরিনাম-গীতে যোগদান করেন

এবং নিমাই-এর জন্য মাঝে মাঝে চিন্তা করেন। তারপর সংসারের কল্যাণের নিমিত্ত তিনি গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন।

চতুর্থ সর্গ—উপনয়ন।

বিশ্বরূপের অদর্শনে নিমাই-এর কাতরতা এবং অচৈতন্য অবস্থায় বিশ্বরূপকে দর্শন এবং সংসার ত্যাগের আহ্বান শ্রবণ ও নিমাই-কর্তৃক পিতামাতাকে ছাড়িয়া যাইতে অস্বীকৃতি। নিমাই-এর নবম বৎসরে উপনয়ন ও জ্ঞান-দৃষ্টির উন্মেষ—অজ্ঞান জগন্নাথ মিশ্র কর্তৃক পুত্রের ভবিষ্যৎ জীবনে সন্ন্যাস গ্রহণের চিত্র দর্শন ও মনোবেদনা—জগন্নাথ মিশ্রের মৃত্যু—নিমাই-এর শোক।

পঞ্চম সর্গ—চঞ্চল পণ্ডিত।

নিমাই দুঃখে অভিভূত হইয়া কিছুদিন শান্ত হইয়া রহিলেন।—

হাসির জ্যোৎস্না মাখা ক্রীড়ার হিল্লোল
লুকাইল, লুকাইল কৌতুক কল্লোল। —(৫৭ পৃঃ)

তিনি অগাধ পাণ্ডিত্যলাভ করেন এবং একটি ন্যায়শাস্ত্রের গ্রন্থ রচনা করেন। কিন্তু সহপাঠী রঘুনাথের দুঃখের কথা শুনিয়া তিনি তাহা গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করেন। পুনরায় নিমাই-এর দৌরাত্ম্য আরম্ভ হইল। মুকুন্দ, শ্রীবাস, শ্রীধর প্রভৃতিকে তিনি উত্ত্যক্ত করিতে লাগিলেন। কাশ্মীরের দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত কেশবকে তিনি কাব্যশাস্ত্রের বিচারে চমৎকৃত করেন। তারপর পিতৃস্থান শ্রীহট্টে গিয়া নিমাই পূর্ব্ববঙ্গে নবধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। সেখানে সকলে তাঁহার ভক্তিধর্ম্মে প্রভাবান্বিত হইয়া পড়িলেন। গৃহে ফিরিয়া আসিলে শুনিলেন তাঁহার পত্নী লক্ষ্মীর মৃত্যু হইয়াছে। মাতাকে নিমাই সান্ত্বনা দিলেন।

ষষ্ঠ সর্গ—পূর্ব্বরাগ।

বালিকা বিষ্ণুপ্রিয়া প্রত্যহ গঙ্গাস্নান করেন এবং শচীমাতাকে প্রণাম করেন। শচীমাতার হৃদয়ে তাঁহার প্রতি স্নেহ জাগে। এদিকে নিমাই হরিনাম লইয়া মাতিয়া উঠেন এবং সঙ্গিগণ স্ব স্ব কল্পনা অনুযায়ী তাঁহার ভিতর আরাধ্য দেবতার প্রতিমূর্ত্তি দেখিতে পান।

সপ্তম সর্গ—মহাপ্রকাশ।

নিমাই-এর ভক্তি দিন দিন অধিকতররূপে প্রকটিত হইতে লাগিল এবং মুকুন্দ, মুরারী, গদাধর, শ্রীধর, অদ্বৈত আচার্য্য, শ্রীবাস, হরিদাস, নিত্যানন্দ,

প্রভৃতি কর্ত্তৃক ভগবৎ কৃপালাভ এবং নিমাই-এর ভিতর দেবতার প্রকাশ দৃষ্ট হইল।

অষ্টম সর্গ—ভাবাবেশ।

ভাবাবেশে নিমাই-এর চক্ষু দিয়া অশ্রু বর্ষিত হয়। সকলে উন্মাদ রোগ বলিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করেন। শ্রীবাস সকলের ভ্রম সংশোধন করেন। শ্রীবাসের আঙ্গিনায় প্রথম কীর্ত্তনের আরম্ভ। পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির বাহ্য সজ্জার পশ্চাতে ভক্ত হৃদয়ের সন্ধান পাইয়া গদাধরের ভ্রান্তি দূর। নিতাই-এর প্রত্যাবর্তন এবং ভারতের বিভিন্ন স্থানে ধর্ম্মহীনতা ও ভক্তিহীনতায় আক্ষেপ।

মাতার সহিত নিতাই-এর সাক্ষাৎ। মাতা-কর্ত্তৃক নিতাইকে গৃহে থাকিয়া সংসারধর্ম্ম করিতে উপদেশ দান। তাঁহার ইচ্ছা—

কর সংকীর্ত্তন, প্রেমে নাচ দুই ভাই
নিমাই নিতাই মোর কানাই বলাই।
দিয়া হরিনাম কর জীবের উদ্ধার,
ততোধিক ধর্ম্ম বাপ! কিবা আছে আর। —(১৪৫ পৃঃ)

নিতাই-এর মাতার বাক্যে সম্মতিদান।

নবম সর্গ—পাষণ্ড।

রুক্মিণী-হরণ পালায় নিমাই-এর রুক্মিণীর ভূমিকায় অভিনয় ও ভাবাবেশ—নিতাই ও হরিদাসকে গৃহে গৃহে হরিনাম বিতরণের নিমিত্ত প্রেরণ—জগাই-মাধাই-কর্ত্তৃক উভয়ে অনুধাবিত ও বিপর্য্যস্ত—পণ্ডিতগণ-কর্ত্তৃক কাজির নিকট নালিশ—নিমাই-কর্ত্তৃক পরদিবসে নগরসংকীর্ত্তনের আদেশ।

দশম সর্গ—পতিতোদ্ধার।

নগর-সংকীর্ত্তন—জগাই-মাধাই উদ্ধার—কাজির পরিবর্ত্তন। জগাই-মাধাই-হৃদয়ের পরিবর্ত্তন কবি সুন্দর বর্ণনা করিয়াছেন—

ধীরে ধীরে গোধূলি আকাশে
ফুটিছে নক্ষত্র ক্ষুদ্র সমুজ্জ্বল ;
পাপীর হৃদয়ে সঞ্চারি গোধূলি
ফুটিছে পুণ্যের নক্ষত্র নির্ম্মল। —(১৮৫ পৃঃ)

একাদশ সর্গ—সন্ন্যাস সঙ্কল্প।

পণ্ডিতগণের মধ্যে মহাক্রোধ উদ্দীপ্ত হইল। তাঁহারা নিমাই-এর অনিষ্ট-চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাহাতে—

উঠিল কি দেশব্যাপী ঘোরতর কোলাহল,
জ্বলিল ভীষণ বেগে সামাজিক দাবানল। —(২০৬ পৃঃ)

শিষ্যগণ অত্যাচারিত হইয়া নিমাই-এর নিকট আসিলে তাহাদের দুঃখে নিমাই অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার সঙ্কল্প করিলেন। কেহই তাঁহাকে সঙ্কল্পচ্যুত করিতে পারিল না।

দ্বাদশ সর্গ—বিদায়।

শচীমাতা সন্ন্যাসের সঙ্কল্প লোক-পরম্পরায় শুনিলেন, নিমাই গৃহে ফিরিলে তিনি দুঃখিতচিত্তে ব্যাকুলভাবে কহিলেন—

তোর মুখ চাহি আছি শুধু বাঁচি,
তোর স্নেহ অনুরাগে।
দুটো দিন আর থাক বুকে বাপ!
জননী এ ভিক্ষা মাগে। —(২২১ পৃঃ)

নিমাই জননীর এই কাতরতা সহ্য করিতে না পারিয়া মায়ের নিকট কথা দিলেন—

না দিলে বিদায় প্রসন্ন বদনে
লব না সন্ন্যাসব্রত। —(২২২ পৃঃ)

কাব্যটিতে অবতারবাদ তো আছেই, তাহার সহিত কবি-হৃদয়ের উচ্ছ্বাসে ও আবেগে কাব্যটি পূর্ণ। অলৌকিক ঘটনাবলী স্থান পাইলেও কাব্যটি অনেকখানি জীবন্ত। চরিত-কাব্য অপেক্ষা পৌরাণিক কাব্য হিসাবে ইহার স্থান নির্দ্দিষ্ট করিলেই যেন বেশী যুক্তিসঙ্গত হয়। ভাব-ভাষা-ছন্দ সুন্দর। তবে স্থানে স্থানে কবির ব্যক্তি-জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হওয়াতে এবং প্রবাসী পুত্রের মঙ্গলকামনা বিদ্যমান থাকাতে কাব্যরস অনেকখানি ক্ষুণ্ন হইয়াছে।

কাব্যে ত্রিপদী, চৌপদী ও পয়ার ছন্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। স্থানে স্থানে ক খ খ ক এবং ক খ গ খ রূপে অন্তপদের মিল লক্ষিত হয়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ইতিহাসাশ্রিত বা দেশপ্রেমমুখ্য আখ্যায়িকা-কাব্য

ইতিহাসাশ্রিত বা দেশপ্রেমমুখ্য কাব্যগুলি উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধের বিশেষ সৃষ্টি। ইহার পূর্ব্বে বিভিন্ন কাব্যের মধ্যে ইতিহাসকে আমরা বিক্ষিপ্ত-ভাবে পাই এবং দুই-চারিখানি ঐতিহাসিক কাব্য যাহা রচিত হইয়াছিল তাহারও মধ্যে ঐতিহাসিক তথ্য ব্যতীত আর কিছুই দৃষ্ট হয় না। এ যুগে ইতিহাসাশ্রিত কাব্যগুলি রচনার পশ্চাতে যে জাতীয়তাবোধ, যে স্বজাতি-প্রীতি এবং স্বদেশপ্রেম আত্মপ্রকাশ করে পূর্ব্ববর্ত্তী কোন কাব্যে তাহা পাওয়া যায় না। ইহারা ইংরাজী শিক্ষার ফল। স্বদেশের অতীত গৌরব ও ঐতিহ্যকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া দেশবাসীর মর্ম্মমূলে স্থাপন করিবার উদ্দেশ্য লইয়াই এই কাব্যগুলি রচিত হইয়াছিল। কবিবর রঙ্গলাল এই বিষয়ে প্রথম অগ্রণী। 'পদ্মিনী উপাখ্যানে'র ভূমিকায় তিনি লিখিয়াছেন—

"১২৫৬ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে একদা বীটন সমাজের নিয়মিত অধিবেশনে কোন কোন সভ্য বাঙ্গালা কবিতার অপকৃষ্টতা প্রদর্শন করেন। কোন মহাশয় সাহসপূর্ব্বক এরূপও বলিয়াছেন যে বাঙ্গালীরা বহুকাল পর্য্যন্ত পরাধীনতা শৃঙ্খলে বদ্ধ থাকাতে তাহাদিগের মধ্যে প্রকৃত কবি কেহই জন্মগ্রহণ করেন নাই····· আমি উক্ত মহাশয়দিগের অযুক্তি নিরসন নিমিত্ত ঐ সভায় এক প্রবন্ধ পাঠ করি, তাহা পুস্তকাকারে নিবদ্ধ হইয়া প্রচার পাইলে অনেক অনুগ্রাহক মহাশয় আমার প্রতি বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করেন। বিশেষতঃ লেখকদিগের পরমবন্ধু রঙ্গপুরের অন্তঃপাতী কুণ্ডীর প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী মৃত বাবু কালীচন্দ্র রায় চৌধুরী উক্ত প্রবন্ধ পাঠান্তে আমাকে যে পত্র লেখেন, তন্মধ্যে এই আক্ষেপোক্তি করিয়াছিলেন—

আধুনিক যুবাজনে স্বদেশীয় কবিগণে,
ঘৃণা করে নাহি সহে প্রাণে।
বাঙ্গালীর মনঃপদ্ম, কবিতা সুধার সদ্ম,
এই মাত্র রাখহে প্রমাণে।"

এই বিবরণ পাঠ করিয়া ইহাই স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে কবিবর রঙ্গলালের হৃদয়ে যে দেশপ্রীতি ও জাতীয়তাবোধ ছিল তাহাই তাঁহাকে বিদেশীয়ের উক্তির প্রতিবাদ করিতে অনুপ্রেরণা দিয়াছিল এবং পরে ঐ একই কারণে তিনি কালীচন্দ্র রায় চৌধুরী কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া স্বদেশের গৌরবের ইতিহাস ও কাহিনীকে অবলম্বন করিয়া তাঁহার স্বদেশপ্রীতির পুণ্যধারা প্রবাহিত করেন। বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের যে স্থান, বাংলা অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্ত্তন করিয়া মাইকেল মধুসূদন যে সম্মানের যোগ্য, বাংলা কাব্যে স্বাদেশিকতার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিয়া রঙ্গলালও সেই গৌরবের অধিকারী। বঙ্কিম ও মাইকেলের ন্যায় রঙ্গলালের প্রতিভা ছিল না সত্য কিন্তু বাংলা কাব্যধারায় একটি নূতন পথ-প্রদর্শকের সম্মান তাঁহাকেই দিতে হয়। তিনি বাংলা কাব্যের গতিপথকে বীরত্বব্যঞ্জক রোমান্‌সের পথে চালিত করিয়া একটা গতি ও শক্তি দান করিয়াছিলেন। বাংলা কাব্য যখন গতানুগতিকতার আবর্ত্তে এবং আদিরসাত্মক কাহিনীর পঙ্কিলতায় রুদ্ধস্রোত রঙ্গলাল তখন নূতন প্রাণস্রোত আনিয়া সেই পঙ্কিলতা ও আবিলতা দূর করেন। পরবর্ত্তী কবিগণের উপর তাঁহার প্রবর্ত্তিত এই ধারা যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। তিনি 'পদ্মিনী-উপাখ্যানে'র ভিতর যে উৎসের সন্ধান দিয়াছিলেন তাহা হইতেই হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের শঙ্খনিনাদে ভাগীরথীর ন্যায় দু-কূল প্লাবিত করিয়া কাব্য-প্রবাহ আসিয়া মৃত গতানুগতিকতার বালুচর হইতে বাংলা-কাব্যকে মুক্তিদান করিয়াছিল এবং মহাসাগরের আহ্বান শুনাইয়াছিল। যদিও আজ হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের প্রভাব লুপ্ত হইয়াছে তথাপি ইহাও অস্বীকার করা যায় না যে তাঁহাদের সমসাময়িক যুগ তাঁহাদের কাব্য দ্বারা অভিভূত ও অনুপ্রাণিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান যুগে রবীন্দ্রনাথের বিশালতর ও বৃহত্তর প্রতিভার সৃষ্ট প্রবাহের নিকট সকলের সব ধারা লুপ্ত হইয়াছে সত্য কিন্তু রবীন্দ্রপূর্ব্ব যুগে বাংলার কাব্য-সিংহাসনে এবং স্বাদেশিকতার মর্ম্মমূলে তাঁহারাই উজ্জ্বলভাবে দীপ্যমান ছিলেন।

সে যুগের সাহিত্যের অন্যান্য শাখার ন্যায় ইতিহাসাশ্রিত কাব্যগুলিও ইংরাজী সাহিত্যের নিকট ঋণী। তখনকার যুগে যাঁহারা সত্যিকারের সাহিত্যিক ও সাহিত্য-দরদী ছিলেন তাঁহারা ইংরাজী সাহিত্যের সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইতেন এবং নিজেদের সাহিত্যে তাহাকেই রূপ

দান করিতে সচেষ্ট হইতেন। কবি রঙ্গলালও সেইরূপ স্কট, বায়রন, টমাস মুর প্রভৃতি কবিগণ দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন এবং অকুণ্ঠিতচিত্তে তাহা স্বীকারও করিয়াছেন। 'পদ্মিনী-উপাখ্যানে'র ভূমিকাতে তিনি লিখিয়াছেন—

"কাব্যের স্থানে স্থানে অনেকানেক ইংলণ্ডীয় কবিতার ভাবাকর্ষণ আছে, সেই সকল দর্শনে ইংলণ্ডীয় কাব্যামোদীগণ আমাকে ভাবচোর জ্ঞান না করেন, আমি ইচ্ছাপূর্ব্বকই অনেক মনোহর ভাব স্বীয় ভাষায় প্রকাশ করণে চেষ্টা পাইয়াছি, যেহেতু তাহা করণের দুই ফল।"

এই সময়ে রচিত ইতিহাসাশ্রিত কাব্যগুলিকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা যায় —(১) রাজপুত-বীরত্ব-ব্যঞ্জক, (২) বাঙালীর বীরত্ব-ব্যঞ্জক, (৩) মহারাষ্ট্রের বীরত্ব-ব্যঞ্জক, (৪) বিদেশী বিষয় অবলম্বনে রচিত, (৫) কাল্পনিক ও বিবিধ।

রাতপুত-বীরত্বের কাহিনী লইয়া কবি রঙ্গলাল কর্তৃক রচিত 'পদ্মিনী-উপাখ্যান' (১৮৫৮), 'কর্ম্মদেবী' (১৮৬২), 'শূরসুন্দরী' (১৮৬৮), এবং দুর্গাচন্দ্র সান্যাল রচিত 'মহামোগল কাব্য—তৃতীয় খণ্ড—জয়সিংহ পর্ব্ব' (১৮৭৭) পাই।

বাঙালীর বীরত্ব লইয়া নবীন চন্দ্র সেন 'পলাশীর যুদ্ধ' (১৮৭৭), শ্যামাচরণ শ্রীমাণী 'সিংহল বিজয়' (১৮৭৫) এবং যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ 'বঙ্গের বীরপুত্র' (১৮৮৪) নামক কাব্য রচনা করেন।

মহারাষ্ট্রের গৌরব-কাহিনী লিখিতে গিয়া কবিগণ শিবাজীর অভ্যুত্থান ও শৌর্য্যবীর্য্য চিত্রিত করিয়াছেন। এইরূপ কাব্য পাওয়া যায় দুর্গাচন্দ্র সান্যাল রচিত 'মহামোগল কাব্য—২য় খণ্ড—শিবাজী পর্ব্ব' (১৮৭৬) এবং ধীরেন্দ্রনাথ পাল রচিত 'যামিনীপ্রভাত' (১৮৭৯)।

এই সময়ে বিদেশী বিষয় অবলম্বনে রচিত নবীন সেনের 'ক্লিওপেট্রা' (১৮৭৭) এবং কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'লুক্রেশিয়া' (১৮৭৯) পাওয়া যায়।

কাল্পনিক বিষয় অবলম্বন করিয়া কাব্য রচনা করেন হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'বীরবাহু-কাব্য' (১৮৬৪), বনোয়ারীলাল রায় 'জয়াবতী' (১৮৬৫), ললিতমোহন ঘোষ 'অচলবাসিনী' (১৮৭৫) কালীকান্ত শিরোমণি 'সিন্ধুনন্দিনী' (?) এবং নবীনচন্দ্র সেন 'রঙ্গমতী' (১৮৮০)। ঔরংজেবের চরিত্র লইয়া দুর্গাচন্দ্র সান্যাল 'মহামোগল কাব্য—প্রথম খণ্ড—ঔরঙ্গজেব পর্ব্ব' (১৮৭৫) রচনা করেন এবং উড়িষ্যার ইতিহাস লইয়া রঙ্গলাল 'কাঞ্চীকাবেরী' (১৮৭৯) কাব্য লেখেন।

এ-দেশের কোন ধারাবাহিক ইতিহাস না থাকাতে এই ইতিহাসাশ্রিত

কাব্যগুলির বিষয়বস্তু অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। টডের রাজস্থান সে-সময় রচিত অনেক সাহিত্যকে উপাদান ও তথ্য জোগাইয়াছিল। প্রাচীনে প্রচলিত ও লৌকিক কাহিনীও কিছু কিছু সাহায্য করিয়াছিল। স্বদেশের গৌরবের কাহিনী ও বীরত্বব্যঞ্জক রোমান্সকে রূপদান করিতে গিয়া কবিগণের দৃষ্টি রাজপুত-ইতিহাসের প্রতি অধিকতররূপে আকৃষ্ট হইয়াছিল। রাজপুত বীরগণের স্বদেশ-নিষ্ঠা, বীরত্ব, ত্যাগ, সততা, স্বজাতিপ্রীতি প্রভৃতি অনেক কাব্যেই স্থান লাভ করিয়াছিল এবং স্বদেশবাসীকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল। ইহা ছাড়া কয়েকটি কাব্যে শিবাজীর সাহস, কৌশল, বুদ্ধিমত্তা, দেশপ্রীতি প্রভৃতি চিত্রিত হইয়াছে। কোন কোন কাব্যে কবি বাঙালী বীর বিজয়সিংহ ও প্রতাপাদিত্যের কাহিনী চিত্রিত করিয়া বাংলার গৌরবময় ইতিহাসকে রূপ দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। আবার বাঙালীর পরাধীনতার কারণ সম্বন্ধে সচেতন করিবার জন্য 'পলাশীর যুদ্ধ'ও রচিত হইয়াছে।

এই কাব্যগুলির মধ্যে লক্ষণীয় এই যে প্রায় সব কাব্যেই মুসলমান-শক্তিকে বিরুদ্ধপক্ষে স্থাপন করা হইয়াছে। ইহাদের ভিতর কবিগণ শত্রুপক্ষের নিষ্ঠুরতা, অত্যাচার ও বিশ্বাসঘাতকার চিত্র আঁকিয়া পাঠকচিত্তে বিরাগ জন্মাইবার চেষ্টা করিয়াছেন এবং অপর দিকে হিন্দুদিগের বীরত্ব, সাহসিকতা, ন্যায়বোধ, ত্যাগ, নিষ্ঠা ও স্বদেশপ্রেমের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দিয়া দেশবাসীর হৃদয়ে শক্তি-আশা-সাহস সঞ্চারিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। অনেক কবি কল্পিত কাহিনী অবলম্বন করিয়াও বিরুদ্ধপক্ষে যবন ও মোগলকে স্থাপন করিয়াছেন। শত শত বৎসর ধরিয়া পরাধীনতার গ্লানি সহ্য করিয়া বাঙালীর সাজাত্যবোধ ও স্বদেশপ্রীতি যখন জাগরিত হইয়াছিল তখন কবিদের দৃষ্টি পড়িয়াছিল তাঁহাদের উপর যাঁহারা প্রথম ভারতবাসীর স্বাধীনতা হরণ করিয়া ভারতকে অশেষ দুঃখকষ্ট ও লাঞ্ছনার ভিতর নিমজ্জিত করিয়াছিল। ঐ-সকল কাহিনী রচনার ভিতর আর একটি সুবিধা হইয়াছিল এই যে সে-সময়কার সঠিক ইতিহাস কোথাও পাওয়া যায় না। যাহা পাওয়া যায় তাহার মধ্যে অনেক জনশ্রুতি ও অতিশয়োক্তি বর্ত্তমান। সুতরাং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনাকে অবলম্বন করিয়া কবিগণ কল্পনার পক্ষ বিস্তার করিবার সুবর্ণ সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন।

এই কাব্যগুলির ভিতর বিষয়বস্তু ও ভাবধারা যেমন নূতন, ভাষা-ছন্দ এবং রচনা-নৈপুণ্যও তেমনি অনেকখানি জড়তামুক্ত এবং অভিনব। ইহারা পরবর্ত্তী

যুগের ক্রমবিকাশের পথের ধারাবাহক। ইহাদের মধ্যে শুধু জাতীয় আত্ম-সচেতনতার ইঙ্গিতই নাই, সাহিত্যেরও বলিষ্ঠতা এবং শক্তিলাভের দ্যোতনাও আছে।

পদ্মিনী-উপাখ্যান—'পদ্মিনী-উপাখ্যান' কাব্যটি কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক রচিত হয়। ইহার প্রকাশকাল ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দ।

বাংলা কাব্য-সাহিত্যে 'পদ্মিনী-উপাখ্যানে'র একটি বিশেষ স্থান আছে। বাংলা কাহিনী-কাব্যে এ-যুগে যে আদিরসের বাহুল্য কাব্যরসকে পঙ্কিল করিয়া তুলিয়াছিল এই ইতিহাসাশ্রিত রোমান্টিক কাব্যটি নূতন গতিপথ উন্মুক্ত করিয়া তাহাকে নূতন খাতে প্রবাহিত করিল। ইহাতে ইংরাজী সাহিত্যের অনুকরণে ইতিহাসাশ্রিত ও বীরত্বব্যঞ্জক কাহিনী অবলম্বন করিয়া রোমান্‌স্ সৃষ্টির চেষ্টা দেখা যায়।

এই গ্রন্থখানি রচনার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কবি লিখিয়াছিলেন—

"স্বদেশীয় লোকের গরিমা প্রতিপাদ্য পদ্যপাঠে লোকের আশুচিত্তাকর্ষণ এবং তদ্দৃষ্টান্তের অনুকরণ প্রবৃত্তি প্রধাবন হয়, এই বিবেচনায় উপস্থিত উপাখ্যান রাজপুত ইতিহাস অবলম্বন পূর্ব্বক মৎকর্ত্তৃক রচিত হইল।"

তাঁহার মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য কবি ভারতীয় রমণীগণের গৌরবোজ্জ্বল কাহিনী অবলম্বন করিয়াছেন। ত্যাগে, প্রেমে, নিষ্ঠায়, বুদ্ধির প্রাখর্য্যে ও সাহসিকতায় যাঁহারা অমলিন-দীপ্তিতে ভারতের চিত্তাকাশে উদ্ভাসিত তাঁহাদেরই তিনি কাব্যে রূপ দিয়াছেন। পরাধীনতার গ্লানির ভিতর দিয়া তিনি বোধ হয় অনুভব করিয়াছিলেন যে পুরুষের ন্যায় নারীগণেরও দেশের উন্নতি সাধনের ক্ষেত্রে অনেক দায়িত্ব এবং কর্ত্তব্য রহিয়াছে—সমাজের এক অংশ পঙ্গু হইয়া থাকিলে অপর অংশের সক্রিয়তায় অগ্রগতি সম্ভব হয় না। তিনি যে যুগে কাব্য লেখেন নারী-প্রগতির ইতিহাসে তাহা অন্ধকার যুগ। মেয়েদের তখন সঙ্কীর্ণ গণ্ডির ভিতর আবদ্ধ করিয়া রাখা হইত। সেখানে না পৌঁছাইত বাহিরের আলোক, না পৌঁছাইত জ্ঞানের দীপ্তি। মুসলমানযুগে যে পর্দ্দার প্রচলন হইয়াছিল তাহারই কুফল সেই সময়ে নির্ম্মমভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। তাই কবি তাঁহার প্রতিটি ইতিহাসাশ্রিত কাব্যের ভিতর দিয়া নারীর বীর্য্যবত্তার ও মহিমার বর্ণনা করিয়া দেশকে আদর্শের পথে উদ্বুদ্ধ করিতে চাহিয়াছেন।

'পদ্মিনী-উপাখ্যানে' যে কাহিনী-অংশ স্থান পাইয়াছে, দেশে প্রচলিত

জনশ্রুতি তাহার সমর্থক। টডের বিরচিত রাজস্থানেও ইহা সম্পূর্ণটাই রহিয়াছে। তবে ইহার সবটুকুই ঐতিহাসিক সত্য কিনা তাহা নির্দ্ধারণ করা শক্ত। কারণ বিশুদ্ধ ইতিহাস এ-দেশে পাওয়া যায় না। চারণগণের নিকট শুনিয়া পুরাবৃত্ত এবং চাঁদ কবি ও আবুল ফজল প্রভৃতির রচনা পাঠ করিয়া টড সাহেব তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। উহা সব একেবারে ঐতিহাসিক সত্য তাহা রাজস্থান-প্রণেতাও জোর করিয়া বলেন নাই—আর সেরূপ নিছক ইতিহাস রচনা করা বোধহয় তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না। তিনি লিখিয়াছেন—

I should observe that it never was my intention to treat the subject in the severe style of history, which would have excluded many details useful to the politician as well as to the curious student. (Page—viii—Vol. I.)

কবি রঙ্গলাল এই রাজস্থান হইতে তাঁহার কাব্যের উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন। ইহার ভিতর ভীমসিংহ, আলাউদ্দীন ও পদ্মিনী ঐতিহাসিক চরিত্র। সুতরাং কাব্যটিকে আমরা ইতিহাসাশ্রিত রোমান্‌স্ বলিতে পারি।

কাব্যের নায়িকা পদ্মিনীর চরিত্র কবি হৃদয়ের সমস্ত আবেগ ও দরদ দিয়া চিত্রিত করিয়াছেন। তিনি রূপে যেমন অদ্বিতীয়া, বিদ্যায় বুদ্ধিতে সাহসে ও ত্যাগে সেরূপ সমুজ্জ্বল।

পদ্মিনীর এই সৌন্দর্য্যখ্যাতি দিল্লীর সম্রাট আলাউদ্দীনকে আকৃষ্ট করিল। যে সৌন্দর্য্য মানুষকে আনন্দ দান করে তাহাই আবার একদিন ধ্বংসের কারণ হয়। পদ্মিনীর অতুল সৌন্দর্য্য সেরূপ একদিন তাঁহার নিজ পরিবারের ধ্বংসের কারণ হইল এবং দিল্লীর সিংহাসনকেও বিচলিত করিয়া গেল।

দিল্লীর সম্রাট্ আলাউদ্দীন চিতোর আক্রমণ করার পর ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ দেখিয়া যখন পদ্মিনীকে একবার দেখাইবার সর্ত্তে সন্ধির প্রস্তাব পাঠাইলেন তখন ভীমসিংহ ক্রোধে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। কিন্তু প্রজার মঙ্গলের কথা চিন্তা করিয়া এবং বংশের গৌরবের কথা ভাবিয়া পদ্মিনী পরামর্শ দিলেন—

পাল প্রজাকুল, হয়েছে আকুল,
অনাহারে নষ্ট হয়।
একের কারণ, মরে অগণন,
এ দুঃখ কি প্রাণে সয়? —(৪৬ পৃঃ)

ইহার মধ্যে প্রজাদের প্রতি পদ্মিনীর স্নেহ ও দরদ যেমন প্রকাশিত হইয়াছে বুদ্ধির দীপ্তিও সেরূপ স্ফুরিত হইয়াছে। তাঁহার স্থির বুদ্ধি ও রাজনৈতিক জ্ঞানের আরও প্রমাণ পাওয়া যায়। আলাউদ্দীন দর্পণে প্রতিবিম্ব দেখিতে সম্মত হইবেন কিনা রাণা যখন ইহা চিন্তা করিতেছিলেন তখন পদ্মিনী যুক্তি দেখাইলেন—

পরাস্ত যে জন, সন্ধি সংস্থাপন,
তাহারি বাসনা হয়॥ —(৪৭ পৃঃ)

আলাউদ্দীন রাণাকে শঠতা করিয়া বন্দী করিলে পতিপরায়ণা পদ্মিনী প্রথমে ব্যাকুল হইলেন। কিন্তু শীঘ্রই বীর রমণী-হৃদয়ে যুদ্ধ করিবার বাসনা জাগিল। অবশেষে তাহা কার্য্যকরী হওয়া শক্ত বিবেচনা করিয়া তিনি শঠতার দ্বারা শঠতার প্রতিশোধ লইবার সঙ্কল্প করিলেন। সমস্ত ভয়-ভাবনা তুচ্ছ করিয়া পথের সব কষ্ট স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া আসন্ন বিপদের মাঝখানে বীর রমণী অগ্রসর হইলেন। তাঁহার সহিত সহস্র সৈন্য নারীবেশে চলিল। রাজপুত রমণীর বীরত্ব ও কৌশলের নিকট দিল্লীর সম্রাটের সহস্র সহস্র সেনা ও চাতুরী পরাজিত হইল।

ইহার এক বৎসর পর পুনরায় আলাউদ্দীন-কর্ত্তৃক চিতোর আক্রান্ত হইলে এবং কালিকার আদেশে ১০টি পুত্রকে যুদ্ধে হারাইলে অবশিষ্ট একটি পুত্রকে না পাঠাইয়া রাণাকে যুদ্ধে যাইবার জন্য পদ্মিনী অনুরোধ জানাইলেন। ভীমসিংহও সেই প্রস্তাব লইয়াই আসিয়াছিলেন। যে যুদ্ধে পরাজয় অবশ্যম্ভাবী এবং মৃত্যুও সুনিশ্চিত সেরূপ যুদ্ধেও স্বামী ও পুত্রকে যুদ্ধের নিমিত্ত পাঠাইতে রাজপুত রমণীগণের হৃদয় বিচলিত হইত না। দাসত্ব অপেক্ষা মৃত্যুকে তাঁহারা শ্রেয়ঃ মনে করিতেন। অবমাননা অপেক্ষা আত্মবিসর্জ্জনকে তাঁহারা সুখের ও গৌরবের মনে করিতেন। দেশের মঙ্গলসাধনের ও স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা তাঁহাদের মজ্জাগত এবং এই দুইটিকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে তাঁহারা নিজেদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক স্বার্থ বলি দিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করিতেন না। পদ্মিনী-চরিত্রের এই দৃঢ়তার ভিতর দিয়া রাজপুত-চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ফুটিয়া উঠিয়াছে।

স্বামীকে যুদ্ধে পাঠাইয়া তিনি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইলেন এবং অন্যান্য রমণীগণও যাহাতে আত্মসম্মান বাঁচাইবার নিমিত্ত মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হন

সেইজন্য পদ্মিনী তাঁহাদের আহ্বান করিয়া উৎসাহ দিতে লাগিলেন। তারপর সূর্য্যের স্তব করিয়া ও অগ্নিকে প্রদক্ষিণ করিয়া তাঁহারা অগ্নিতে আত্মাহুতি দিলেন। অত্যাচারী রাজ্য জয় করিল—হৃদয় জয় করিতে পারিল না—অদম্য চেষ্টা সত্ত্বেও শত্রুর দুরাশা অপূর্ণ ই রহিল। চরিত্রটিতে অনেক গুণের সমাবেশ থাকিলেও উহা জীবন্ত হইতে পারে নাই।

ভীমসিংহের চরিত্র এই কাব্যে গৌণ। যদিও আলাউদ্দীনের সহিত বিরোধ তাঁহারই,—তাঁহাকেই যুদ্ধ করিতে হইয়াছে,—বন্দী হইয়া অশেষ ক্লেশ-ভোগ করিতে হইয়াছে এবং অবশেষে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণবিসর্জ্জনও করিতে হইয়াছে—তথাপি পদ্মিনীর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, সাহস ও সতীত্ব-রক্ষার গৌরবোজ্জ্বল ঘটনাগুলির নিকট তাহা অনেকখানি নিষ্প্রভ।

রাণা ভীমসিংহ রাজপুত বীর। আলাউদ্দীন চিতোর আক্রমণ করিলে তিনি ভীত বা পশ্চাৎপদ হন নাই। সৈন্যগণ লইয়া বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিয়াছেন।

কয়েকদিন যুদ্ধের পর উভয় পক্ষেরই সৈন্যের অবস্থা শোচনীয় হইল। তাহা দেখিয়া প্রজাবৎসল রাণার হৃদয় বিচলিত হইল। প্রজারক্ষা ও দেশরক্ষার উপায় তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন।

আত্মসম্ভ্রমবোধও তাঁহার কম নয়। আলাউদ্দীন পদ্মিনীকে দর্শনের অভিলাষ জানাইয়া পত্র পাঠাইলে তিনি অপমানিত বোধ করিলেন এবং নিজ জীবনকে ধিক্কার দিলেন।

ভীমসিংহের ভিতর ভদ্রতাবোধ ও সৌজন্যের অভাব ছিল না। আলা-উদ্দীন শত্রু হইলেও দর্পণে পদ্মিনীকে দর্শন করিয়া প্রত্যাবর্ত্তনকালে ভীমসিংহ দেহরক্ষী না লইয়া সৌজন্যের খাতিরে তাঁহার সহিত গেলেন।

যবনরাজ এ সুযোগ ছাড়িলেন না—রাণাকে বন্দী করিলেন এবং পদ্মিনীকে সমর্পণ করিবার প্রস্তাব করিলেন। রাণার মনে তখন আত্মমর্য্যাদাবোধ ও সৌজন্য-বোধ আহত হইল এবং লজ্জা, ঘৃণা, ক্রোধের উদ্রেক হইল। তাঁহার অবস্থা—

> যবনের বাক্য শুনি ভীমসিংহ রায়।
> ক্রোধে ভয়ে, লাজে, খেদে থর থর কায়॥
> অভিমানে অশ্রু আসি প্রকাশিতে চায়।
> লজ্জা আর ক্রোধ গিয়ে রুদ্ধ করে তায়॥ —(৫৭ পৃঃ)

এই বর্ণনায় প্রবঞ্চিতের মনোভাব সুন্দররূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। বন্দী

অবস্থায়ও শঠ যবনরাজকে তিরস্কার করিতে তিনি ভীত হইলেন না। সম্রাটের আদেশে তাঁহার উপর অমানুষিক অত্যাচার চলিল। তথাপি রাণার তেজ ও দৃঢ়তা অটুট রহিল। কুলের গৌরব, দেশের কল্যাণ তাঁহার নিকট প্রাণ অপেক্ষা মূল্যবান্। সমস্ত অত্যাচার, অবিচার, বিদ্রূপ তিনি নীরবে সহ্য করিতে লাগিলেন। কিন্তু যখন পদ্মিনীর আত্মসমর্পণের পত্র সম্রাট্ তাঁহাকে দেখাইলেন তখন বীর-হৃদয় বিচলিত হইল।

বীরত্বাভিমানী রাজপুত ভীমসিংহের ভিতর মানুষ ভীমসিংহ আত্মপ্রকাশ করিল। যাঁহার সম্মান বাঁচাইতে তিনি সমস্ত লাঞ্ছনা-গঞ্জনা নীরবে সহ্য করিয়াছেন সেই পদ্মিনী যখন আত্মসমর্পণের পত্র লিখিলেন তখন রাণা নিজ আত্মশক্তি হারাইয়া ফেলিলেন। নানারূপ সন্দেহ-দোলায় তাঁহার চিত্ত আলোড়িত হইল। কিন্তু অত সহজেই তিনি বুদ্ধিভ্রষ্ট হইলেন না। প্রথম আকস্মিকতার ধাক্কা সামলাইয়া তিনি যখন সমস্ত ব্যাপার সম্বন্ধে পুনরায় চিন্তা করিতে লাগিলেন তখন যেন আশার আলোক দেখিতে পাইলেন।

যবন-সৈন্য পুনরায় চিতোর প্রবেশ করিলে ভীমসিংহ অত্যন্ত দুশ্চিন্তায় পড়িলেন। পূর্ব্ব যুদ্ধে তাঁহার বড় বড় সব যোদ্ধা হত হইয়াছিলেন—ভীমসিংহ যুদ্ধ চালাইবেন কাহাদের লইয়া। এমন সময় তিনি দৈবাদেশে শুনিলেন, তাঁহার একাদশ পুত্রকে পর পর রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া যুদ্ধে পাঠাইয়া বলি দিলে তাঁহার রাজ্যের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ থাকিবে। এখানে একটু অতি-প্রাকৃতের অবতারণা দেখা যায়। রাজা দেশের স্বাধীনতার নিমিত্ত নিজের বাৎসল্য-স্নেহ অবদমিত করিয়া দশটি পুত্রকে বলি দিলেন। কিন্তু কনিষ্ঠ পুত্রের ক্ষেত্রে তাঁহার বীর-হৃদয়ও টলিল। তিনি তাহাকে নিবৃত্ত করিয়া নিজেই যুদ্ধসাজে সজ্জিত হইলেন এবং পদ্মিনীর নিকটেও স্ব-ইচ্ছার অনুমোদন পাইয়া সুখী হইলেন। শৌর্য্যবীর্য্য তাঁহার হৃদয়কে নির্ম্মম করিতে পারে নাই। পত্নীপ্রেমও তাঁহার হৃদয়ে যেমন গভীর পুত্রস্নেহও সেরূপ ছিল। তিনি সকলকে যুদ্ধক্ষেত্রে আহ্বান জানাইলেন—

স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে,
কে বাঁচিতে চায়?
দাসত্ব শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে,
কে পরিবে পায়? —(১০০ পৃঃ)

এই ছত্র কয়টির উপর টমাস মুরের কবিতার প্রভাব দৃষ্ট হয়। দেশের লোকের মনে পরাধীনতার দুঃখ লজ্জা গ্লানি জাগাইয়া স্বাধীনতা রক্ষার নিমিত্ত আহ্বান—বাংলা সাহিত্যে ইহাই প্রথম রচনা। জাতীয়তার ক্ষেত্রে তাই ছত্র কয়টি অত্যন্ত মূল্যবান্। পত্নীর নিকট হইতে বিদায় লইয়া অম্লান-বদনে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে তিনি অগ্রসর হইলেন।

তারপর শেষ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে তিনি পদ্মিনী প্রভৃতি রমণীগণের চিতাগ্নি-শিখা ও ধূম্রজাল দেখিয়া বুঝিলেন সব শেষ হইয়া গিয়াছে। সংসারের সমস্ত মায়া কাটাইয়া নিজ প্রাণকে বিসর্জ্জন দিবার জন্য তিনি প্রচণ্ড-তেজে যুদ্ধ করিলেন এবং বংশের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিলেন। একটি বীর-চরিত্র অঙ্কিত করিতে গিয়া কবি সর্ব্বত্র তাঁহার গৌরব-সমুন্নতি রক্ষা করিতে পারেন নাই। স্থানে স্থানে তাঁহার অসহায় ভাব এবং কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়তা চরিত্রটিকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলিয়াছে।

এই কাব্যে পদ্মিনী ও ভীমসিংহের চরিত্রে আদর্শ রাজপুতের চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। দুই-এক স্থান ব্যতীত ইতিহাসের আবেষ্টনীর বাহিরে সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখের রাজ্যে যেন তাঁহাদের দেখা যায় না। তাঁহারা আদর্শ চরিত্রের ব্যক্তি। কিন্তু দিল্লীপতি আলাউদ্দীনের চরিত্র, সে দিক্ হইতে বিচার করিলে, অনেক জীবন্ত বলিয়া মনে হয়। তিনি কেবল ঐতিহাসিকের হাতে গড়া যন্ত্র মাত্র নহেন,—তিনি আকাঙ্ক্ষায় উন্মত্ত, দুর্ব্বলতায় আচ্ছন্ন, পাপে আসক্ত, ক্ষমতার গর্ব্বে দর্পী মানুষ। পদ্মিনীর রূপের কথা শুনিয়াই তিনি আকৃষ্ট হইলেন এবং চিতোর আক্রমণ করিলেন।

তাঁহার পরস্ত্রীর প্রতি আসক্তিও যেমন প্রবল, দাম্ভিকতাও তেমনি অত্যন্ত প্রচণ্ড। নিজ প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার পথে তিনি কাহারও পরামর্শে কর্ণপাত করেন না। পূর্ব্বেও তিনি গুজরাট অধিপতির অপূর্ব্ব সুন্দরী মহিষী কমলাকে অন্যান্য সম্পত্তির সহিত লইয়া আসিয়াছিলেন এবং তাঁহার সেই পাপ-প্রবৃত্তিই তাঁহাকে পাপের প্রতি আকৃষ্ট করিয়াছিল।

কিন্তু এরূপ সম্রাটের হৃদয়েও স্নেহ ছিল। প্রথমবারের যুদ্ধে পুত্রের নিহত হইবার সংবাদে তিনি বিচলিত হইয়াছিলেন।

স্নেহের এই ক্ষুদ্র অভিব্যক্তি দ্বারা ঐতিহাসিক আলাউদ্দীনের চরিত্রের অপর একটি দিক্ উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। তাঁহার ভিতর চিন্তাশীলতা ও

প্রত্যুৎপন্নমতিত্বেরও অভাব ছিল না। যুদ্ধে সৈন্যগণের শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া তাঁহার ভিতর সুবুদ্ধির উদয় হইল। কামপ্রবৃত্তিকে তিনি সংযত করিলেন। কিন্তু দর্পণে পদ্মিনীকে দেখিয়া পুনরায় বুদ্ধিভ্রষ্ট হইয়া পড়িলেন।

আলাউদ্দীনের মনে পুনরায় নীচপ্রবৃত্তি জাগরিত হইল। তিনি অন্যায়ভাবে ভীমসিংহকে বন্দী করিলেন।

তারপর ভীমসিংহের নিকট হইতে বীরত্বব্যঞ্জক উত্তর শুনিয়া তাঁহার উপর নির্মম অত্যাচারের আদেশ দিলেন। কিন্তু একদিকে তিনি যেমন ক্রূর, নিষ্ঠুর, শঠ ও প্রবঞ্চক অপরদিকে তেমনি ধৈর্য্যহীন, বিশ্বাসপ্রবণ ও আশাবাদী। তাঁহার চরিত্রের এই ত্রুটিগুলিই তাঁহার ব্যর্থতার কারণ। পদ্মিনীর নিকট হইতে আত্মসমর্পণের পত্র পাইয়া তিনি অতি সহজেই আনন্দে আত্মহারা হইলেন এবং সংবাদের সম্ভাব্যতা বা অসম্ভাব্যতা সম্বন্ধে বিচারের বুদ্ধি হারাইয়া ফেলিলেন।

এক বৎসর পর চিতোর যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া পদ্মিনীকে লাভ করিবার আশায় পুলকিত মনে তিনি ভাবিলেন পদ্মিনীর নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া তাঁহাকে প্রধানা মহিষী করিবেন।

কিন্তু তাঁহার সমস্ত আশা, সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইল। পদ্মিনীকে না পাইয়া তাঁহার নিরাশ হৃদয়ে প্রতিহিংসা জাগিয়া উঠিল।

কহিল আমীরগণে, জান দেখি সযতনে,
কে আছে ভীমের বংশে আর।
হইয়াছে যা হবার, অন্বেষণ কর তার,
সমুচিত শেষ প্রতিকার॥ —(১১৭ পৃঃ)

তিনি যথেচ্ছভাবে চিতোরের উপর উৎপীড়ন চালাইলেন। কেবল পদ্মিনী যে স্থানে আত্মাহুতি দিয়াছিলেন সে স্থান অক্ষত রহিল। হয়তো তাঁহার হৃদয়ে শ্রদ্ধা জাগিয়াছিল কিংবা অনুশোচনা আসিয়াছিল। তাঁহার চরিত্রের ভিতর এইরূপ ছোটখাটো স্নেহশীলতা ও মানবতার প্রকাশ দ্বারা কবি আলাউদ্দীনকে একেবারে পাষণ্ড করিয়া গড়েন নাই। যত বড় ব্যভিচারী ও অত্যাচারী, শঠ ও প্রবঞ্চক, সংযমহীন ও পরদার-আসক্ত হউন না কেন তাঁহার ভিতর পুত্রস্নেহ ছিল, সময় সময় সুবুদ্ধির উদয় হইত এবং কখনো কখনো ইচ্ছার রাশ সংযত করিবার বাসনাও জাগিত। মাঝে মাঝে নিজ

উচ্ছৃঙ্খল স্বভাবকে পরিবর্ত্তন করিতে তিনি চেষ্টা করিয়াছেন এবং তাহা দ্বারা তাঁহার চরিত্র অনেকখানি বাস্তব ও জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে।

ভীমসিংহ ও পদ্মিনী ব্যতীত অন্যান্য রাজপুতগণের কার্য্যকলাপের ভিতর দিয়া কবি বীরজাতির বৈশিষ্ট্য চিত্রিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। যবন-সৈন্যগণ পদ্মিনীর দাসীগণের জাতি নষ্ট করিতে গেলে রাজপুতগণ প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিল ও তাহাদের ভানুমূর্ত্তি-অঙ্কিত পতাকা রক্ষা করিতে লাগিল।

দ্বিতীয়বারের যুদ্ধে চিতোরে রাজপুতগণ যথাসাধ্য যুদ্ধ করিয়াও জয় লাভ করিতে পারিল না। তাহার কারণ তাহাদের সংখ্যা অল্প। তাঁহাদের মধ্যে প্রধান সৈনিক গোরা অদ্ভুত বীরত্ব দেখাইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র দ্বাদশবর্ষীয় বালক বাদলও অদ্ভুত সাহসের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল।

বীরবর গোরার পত্নী বাদলের নিকট স্বামীর মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া অশ্রুসিক্ত হইলেন না বরং গর্ব্বে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন এবং চিতা-সজ্জা করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। কেবল রাজপরিবারের কুলরমণীগণই প্রাণত্যাগ করিয়া আত্মসম্মান বাঁচাইলেন না—সাধারণগৃহের বধূগণও ঐ পন্থা অবলম্বন করিলেন।

কবি রঙ্গলাল কাব্যটিতে জনশ্রুতিকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে গিয়া নিজের কল্পনার রাশকে সংযত-হস্তে পরিচালিত করিয়াছেন। ফলে যে স্থানে কল্পনার পক্ষ-বিস্তারের নিমিত্ত প্রশস্ত আকাশপট ছিল সেখানেও তাহা সঙ্কোচন কাটাইয়া উঠিতে পারে নাই। প্রায় সর্ব্বত্রই একটা কষ্ট-কল্পিত অগ্রগতি দেখা যায়—স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রাণগতি আত্মপ্রকাশ করে নাই। চরিত্র-চিত্রণে স্থানে স্থানে মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করিয়া কবি লিপিকুশলতার পরিচয় দিয়াছেন। ঘটনা-সংঘাতের ভিতর দিয়া চরিত্রগুলির বিভিন্ন দিক্ ব্যক্ত হইয়াছে। কিন্তু মূল কাহিনীর পরিপোষক অপর কোন ঘটনা বিবৃত না হওয়াতে কাব্যের অনেকখানি রসহানি ঘটিয়াছে। আবার স্থানে স্থানে কাব্য-রচনার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কবি এত বেশী সচেতন হইয়াছেন যে খেদ বা বিষাদ, আশা বা আনন্দের প্রকাশের ভিতর তাহা মাত্রা হারাইয়া ফেলিয়া কাব্যকে অনেকটা ক্ষুণ্ণ করিয়াছে। আলাউদ্দীনের চিতোর-জয়ের পর কাব্যের পরিসমাপ্তি হইলেই ভাল হইত। তাহার পরের অংশটুকু যেরূপ কাহিনী-অংশ হইতে সম্পর্কশূন্য সেরূপ রসহানিকর।

এই কাব্যে পয়ার, ত্রিপদী, মালঝাঁপ, ভুজঙ্গপ্রয়াত, একাবলী প্রভৃতি ছন্দ

ব্যবহৃত হইয়াছে। পয়ার ও ত্রিপদীকে বিলম্বন ও সঙ্কোচনে ছন্দে কিছুটা নূতনত্ব আসিয়াছে। স্থানে স্থানে অনুপ্রাসের ব্যবহারও দেখা যায়।

কাব্যটিতে কবিত্বশক্তির অভাব এবং চমৎকারিত্বের অভাব দৃষ্ট হয়। সর্ব্বত্রই একটা আড়ষ্ট ভাব—কি কাহিনীর ক্ষেত্রে কি ছন্দের ক্ষেত্রে কাব্যটির সুষমা নষ্ট করিয়াছে।

সর্ব্বশেষে কাব্যটি-সম্বন্ধে বলা চলে যে, নবীন ধারার প্রবর্ত্তক হিসাবে কাব্যটিতে অনেক দোষত্রুটি থাকা স্বাভাবিক এবং কাব্যটি এই-সকল দোষ-ত্রুটি হইতে মুক্ত নয়। তবে বাঙালীর জাতীয়তাবোধের উন্মেষকার্য্যেও ইহা যেমন অবিস্মরণীয় বাংলা কাব্যধারায় নূতন পথিকৃৎ হিসাবেও তেমনি ইহার মূল্য কম নয়।

কর্ম্মদেবী—কবি রঙ্গলালের দ্বিতীয় কাব্য 'কর্ম্মদেবী' ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ইহাও রাজপুত বীরগণের ইতিহাস-কাহিনী লইয়া রচিত এবং ইহার কাহিনী-অংশও টডের রাজস্থান-গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত।

পদ্মিনী-উপাখ্যানে কবি রাজপুত রমণীর আত্মসম্মানবোধ ও সতীত্ববোধের দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। 'কর্ম্মদেবী'-কাব্যে কবি রাজপুত রমণীহৃদয়ে বীরত্বের প্রতি অনুরাগ এবং তাহার নিমিত্ত অকুণ্ঠিতচিত্তে প্রাণবিসর্জ্জনের চিত্র অঙ্কিত করিয়া একদিকে বীরত্বকে মহিমান্বিত করিয়াছেন অপরদিকে প্রেমের বিকাশ ও তাহার নিমিত্ত নারীহৃদয়ের দৃঢ়তার চিত্র আঁকিয়া কাব্যের ভিতর মাধুর্য্য আনিয়াছেন।

ঔরিণ্টপুরের রাজা মাণিকদেব রায়ের কন্যা কর্ম্মদেবী রূপে-গুণে অতুলনীয়া ছিলেন। মন্দোর-ভূপতির পুত্র অরণ্যকমলের সহিত তাহার বিবাহের কথা স্থির হইয়াছিল। কিন্তু যশল্মীরের রাজপুত্র বীর সাধু অকস্মাৎ আসিয়া রাজগৃহে অতিথি হইলেন এবং রাজসভায় তাঁহার বীরত্ব কৌশল দেখাইয়া সকলকে মুগ্ধ করিলেন। রাজকন্যার মনেও তাহা প্রভাব বিস্তার করিল। তিনি মুগ্ধ হইয়া গেলেন। সাধুর বীরত্ব তাঁহার সমস্ত অতীতকে ভুলাইয়া দিল। তিনি মনে মনে সাধুকে পতিত্বে বরণ করিয়া বীরত্বের পদে হৃদয়ের ভক্তি-শ্রদ্ধা-প্রেম-ভালবাসা উজাড় করিয়া দিলেন।

সখীগণ তাঁহার মনোভাব জানিলে অনেক প্রকারে তাঁহাকে ঐ পথ হইতে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিল কিন্তু কৃতকার্য্য হইল না।

বালিকা-হৃদয়ের দৃঢ়তা রাজপুতরমণী-চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। তাঁহারা শত বাধাবিঘ্ন আসিলেও সঙ্কল্পচ্যুত হইত না। দুঃখকষ্ট স্বীকার করিত, এমন কি প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিত কিন্তু চরিত্রের দৃঢ়তা হারাইত না। কবি নায়ক-নায়িকা-চরিত্রের বিভিন্ন দিক্ এইভাবে অঙ্কিত করিয়া রাজপুত-বীরত্বের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

রমণী-হৃদয়ে অনুরাগের উন্মেষ ও প্রকাশও তিনি সুন্দরভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। সখীগণের বিরুদ্ধতায় রাজকন্যা মর্ম্মাহত হন এবং চেতনা হারাইয়া ফেলেন। সাধু ঐ পথে যাইবার কালে রমণী-কণ্ঠস্বর শুনিয়া প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া উদ্যানে প্রবেশ করিলে কর্ম্মদেবী চক্ষুরুন্মীলন করিয়া তাঁহাকে দেখিয়া ভাবিলেন যে নিজের মনের ভ্রম। আবার চক্ষু মুদ্রিত করিলে অজ্ঞাতে তাঁহার মুখ দিয়া সাধুর নাম উচ্চারিত হইল। সাধু সখীগণের নিকট হইতে আভাসে প্রকৃত তথ্য অবগত হইয়া নিজ মনোভাবও ব্যক্ত করিলেন। পরদিন নির্দ্দিষ্ট সময়ে শক্তিক্রীড়া আরম্ভ হইল এবং সাধু জয়লাভ করিলে কর্ম্মদেবী সখীর হস্তে মালা পাঠাইয়া দিলেন।

সরল বালিকা-হৃদয়ের সহজ অভিব্যক্তিই এখানে দৃষ্ট হয়। কোন ছলাকলা নাই, দ্বিধা-সঙ্কোচ নাই, সত্যের এরূপ প্রকাশ দ্বারা রাজকন্যার গভীর প্রণয় এবং সরলান্তঃকরণের পরিচয় পাওয়া যায়। বীরগণের শৌর্য্য-বীর্য্য পরীক্ষা এবং বিজয়ীর রমণীর নিকট হইতে জয়মাল্য-লাভ ইংরাজী সাহিত্যের নাইটগণের কথা স্মরণ করাইয়া দেয় এবং এস্থলে স্কটের 'আইভেনহো'র প্রভাব অনুভূত হয়।

রাজা অরণ্যকমলের সহিত পরিণয় প্রস্তাবের কথা উল্লেখ করিয়া কন্যাকে বুঝাইবার অনেক চেষ্টা করিলেন। কিন্তু কর্ম্মদেবীর সঙ্কল্প অটুট রহিল। কর্ম্মদেবীর নিষ্ঠা ও দৃঢ়তার নিকট পিতাকে নতিস্বীকার করিয়া তাহাদের বিবাহে সম্মতি দিতে হইল। বিবাহকালে কর্ম্মদেবীর আনন্দের সীমা রহিল না—তাহার ভাবভঙ্গির ভিতরে তাহা প্রকাশ পাইল।

পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়া স্বামীর সহিত যাইবার কালে তাঁহার মন প্রথমে বিচলিত হইয়াছিল। কিন্তু কিছুদূরে যাইবার পর মনের সেই বিমর্ষতা কাটিয়া গেল। কিন্তু

চলিল রমণী রঙ্গে, প্রাণপ্রিয় পতি সঙ্গে,
কত রস সরস সম্ভাষ। —(পৃঃ ৭৪)

এই আনন্দ বেশীক্ষণ স্থায়ী হইল না—পথিমধ্যে বিপদের কাল মেঘ দেখা দিল। অরণ্যকমল সাধুকে যুদ্ধে আহ্বান করিয়া পত্র দিলেন। কর্ম্মদেবীর প্রফুল্ল মুখ বিষাদে ম্লান হইল। ঐ দিন রাত্রে সকলে নিদ্রিত হইলেও পাছে শত্রুগণ অতর্কিত আক্রমণ করিয়া স্বামীর অমঙ্গল করে এই চিন্তায় কর্ম্মদেবী সমস্ত রাত্রি জাগিয়া রহিলেন। কখনও জয়ের কল্পনা করিয়া আশায় আনন্দে তাঁহার বুক ভরিয়া উঠিতেছে,—আবার কখন অমঙ্গল-চিন্তা আসিতেছে। কখনও পতির এই বিপদের জন্য নিজেকেই দায়ী মনে করিতেছেন। বরমাল্য না পাঠাইয়া তিনি যদি নির্জ্জনে পরমেশ্বরের চরণে প্রিয়তমের মঙ্গল কামনা করিয়া জীবন কাটাইতেন তবে তো এ বিপদ আসিত না। তিনি সমস্ত রাত্রি অনিদ্রায় স্বামীর মঙ্গল চিন্তায় কাটাইলেন। যুদ্ধে যাইবার প্রাক্কালেও স্বামীকে মঙ্গল-চিহ্নগুলি দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই-সকল মঙ্গলকামনার ভিতর দিয়া কর্ম্মদেবীর প্রেমবিহ্বল, মঙ্গলময়ী মূর্ত্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে। আকস্মিক বিপদের হাত হইতে স্বামীকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত তিনি রাত্রি জাগরণ করিরাছেন। পথে মঙ্গলের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির অভাব হেতু নিজ অঙ্গের বিভিন্ন ভাব দ্বারা তাহা সাধন করিয়া স্বামীর জীবন হইতে সব অশুভকে দূরে রাখিবার এই যে একান্ত আকাঙ্ক্ষা ইহার ভিতর দিয়া তাঁহার মহিমময়ী পতিপরায়ণা মূর্ত্তি উজ্জ্বল হইয়া উঠে।

যুদ্ধে যাইবার পূর্ব্বে সাধু তাঁহার নিকটে বিদায় লইতে আসিলে তিনিও রণক্ষেত্রে যাইবার বাসনা প্রকাশ করিলেন। অমঙ্গল কিছু ঘটিলে কর্ম্মদেবীকে তাঁহার ভ্রাতার আশ্রয় লইবার উপদেশ যুবরাজ দিলেন। সতী রমণীর তাহা মনঃপূত হইল না। তিনি পতিকে নিজ হস্তে বীরবেশে সজ্জিত করিলেন কিন্তু অশ্রুজল রোধ করিতে পারিলেন না।

তাঁহার সমস্ত কার্য্যকলাপের ভিতর দিয়া সমস্ত ভাব-অভিব্যক্তির ভিতর দিয়া একটি স্নেহশীল স্পর্শকাতর মনের প্রকাশ দেখা যায়। সমস্ত বুদ্ধি-বিবেচনা যুক্তিতর্ক, বীরত্ব ও সাহস থাকা সত্ত্বেও তিনি মনকে শক্ত করিতে পারিতেছেন না। এক অমঙ্গলের আশঙ্কায় চক্ষে অশ্রু আসিয়া যাইতেছে। তারপর যখন সত্য-সত্যই অশুভ সংবাদ আসিল—আত্মবিসর্জ্জনের ভিতর দিয়াও তিনি নিজ মহিমা উজ্জ্বলতর করিয়া গেলেন। নিজের বামহস্ত কাটিয়া ভ্রাতাকে সমর্পণ করিবার সময় তিনি কহিলেন—

আমাদের কুল কবিবরে, দিও এই হস্ত রতন মণ্ডিত
সতীত্বের সঙ্গীত আখ্যানে ভাই, গান যেন দাসীর চরিত ॥
—(১০৮ পৃঃ)

তারপর ভ্রাতাকে কৃপাণ দিয়া নিজ দক্ষিণ হস্ত কাটিবার অনুরোধ করিলেন।

কাব্যের নায়ক যুবরাজ সাধুর পরিচয়—

যশল্মীর অন্তঃপাতি, দেশে ছিল ভট্টিজাতি,
অধিপ অনঙ্গদেব তাঁর।
পুগল দেশের নাম. তাঁর পুত্র গুণধাম,
সাধু নামা বিক্রম আধার ॥ —(৪ পৃঃ)

কবির দেশপ্রেমের আদর্শ যেন সাধু-চরিত্রের ভিতর দিয়া পরিস্ফুট হইয়াছে। তিনি যেমন বীর তেমনি নির্ভীক। যবনের প্রতি তাঁহার অত্যন্ত বিদ্বেষ। বিপাশার তীরে যবনগণের আগমন সংবাদ পাইয়া একদিন তথায় তিনি গেলে যবনেরা কেহ পলাইয়া গেল, কেহ যুদ্ধ করিল ও পরাজিত হইল।

সাধু তারপর ঔরিণ্টনগরে গিয়া রাজার প্রতি যথোপযুক্ত বিনয় ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। নানাবিধ শৌর্য্যের পরীক্ষা দিয়া সকলের প্রশংসাও অর্জ্জন করিলেন। একদিন সন্ধ্যাকালে রাজকন্যার উদ্যানে অচেতন কর্ম্মদেবীকে দেখিয়া এবং তাঁহার মনোভাব জানিয়া পুলকিত হইলেন। কিন্তু কোথাও তিনি অসৌজন্য বা অধীরতা প্রকাশ করিলেন না। এমন কি পরদিবস শক্তি-পরীক্ষায় বিজয়ী হইবার পর রাজকন্যার সখী তাঁহাকে রাজকন্যা-প্রদত্ত মালা দিয়া কর্ম্মদেবীর মনোভাব ব্যক্ত করিলে তিনি মাল্যের মর্য্যাদা রাখিবার নিমিত্ত তাহা মস্তকে ধারণ করিয়া দৃপ্তকণ্ঠে কহিলেন—

পিতা সত্ত্বে দুহিতার স্বতন্ত্রতা নাই।
যার ধন তার কৃত সম্প্রদান চাই ॥

রাজা যখন বিবাহের স্থির করিয়া তাঁহার নিকট টিকা পাঠাইলেন তখন—

টিকা পেয়ে বীরবর, প্রেমোৎফুল্ল কলেবর,
ঈষৎ হসিত বিম্বাধর। —(৬৯ পৃঃ)

বিবাহ করিয়া দেশে যাইবার কালে অরণ্যকমল তাঁহাকে যুদ্ধে আহ্বান করিলে তিনি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন। যুদ্ধের সংবাদে কর্ম্মদেবীর পিতা

সৈন্য পাঠাইলে তিনি অল্পসংখ্যক সৈন্য গ্রহণ করিয়া অধিকাংশ সৈন্যকে ফিরাইয়া দিলেন। আসন্ন যুদ্ধ দেখিয়াও তিনি বিচলিত হন নাই এবং রাত্রে নিশ্চিন্তমনে নিদ্রায় মগ্ন হইলেন। তিনি কেবল বড় যোদ্ধাই ছিলেন না। অন্য সব দিকেও তাঁহার দৃষ্টি ছিল। যুদ্ধে যাইবার পূর্ব্বে ভবিষ্যৎ কর্ম্মপন্থা সম্পর্কে কর্ম্মদেবীকে নানারূপ উপদেশ দিলেন। কিন্তু যুদ্ধে দুর্ভাগ্যক্রমে সাধু পরাজিত ও নিহত হইলেন।

কাব্যের তৃতীয় চরিত্র অরণ্যকমলের স্বল্প পরিচয়ের ভিতর দিয়া বীরত্ব ও মহত্ত্ব প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার সহিত কর্ম্মদেবীর বিবাহের স্থির হইলে তিনি আহ্লাদিত হইয়াছিলেন। কিন্তু মধ্যস্থল হইতে সাধু কর্ম্মদেবীকে বিবাহ করিয়া লইয়া যাইতেছেন শুনিয়া অপমান এবং ঈর্ষ্যায় উত্তেজিত হইয়া তিনি যুদ্ধে আহ্বান জানাইলেন। কিন্তু তিনি মহত্ত্ব-বর্জ্জিত নহেন। সাধুর পক্ষে সৈন্যসংখ্যা কম দেখিয়া তিনি দ্বন্দ্বযুদ্ধের আহ্বান জানাইয়াছিলেন। যোদ্ধা হইলেও তিনি হৃদয়হীন ছিলেন না। কর্ম্মদেবীর প্রাণত্যাগের কথা শুনিয়া তিনি কেবল দুঃখিতই হন নাই, অনুতাপেও দগ্ধ হইতে লাগিলেন এবং নিজেকে ধিক্কার দিয়াছিলেন। কর্ম্মদেবীর শোকে তিনি অত্যন্ত মুহ্যমান হইয়া পড়িয়া-ছিলেন এবং চার মাসের মধ্যে ইহধাম ত্যাগ করেন।

এই কাব্যের নানাস্থানে কবি রাজপুত-চরিত্রের নিষ্ঠা ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করিয়াছেন—বীরত্ব তাঁহাদের মজ্জাগত—

দিবা নিশি এক সাজ, অভিপ্রেত এক কায,
অস্ত্রশস্ত্র তিলেক না ছাড়ে।
বীর রসে বিচক্ষণ, তাই মাত্র আলাপন,
উগ্রতা অনল হাড়ে হাড়ে ॥ —(৪ পৃঃ)

কিন্তু তাহারা হৃদয়হীন নয়, রমণীর প্রতি তাহাদের অনুরাগও যেমন সম্মানবোধও তদ্রূপ, ইহা যেন কাশ্মীরী কুসুমের ন্যায় তাহাদের হৃদয়ে সৌরভ বিতরণ করে—

যথা শিলা সন্নিধান, বিতরে মধুর ঘ্রাণ,
বিকশিয়ে কাশ্মীরী কুসুম।
কঠোর শিলার ধর্ম্ম, কঠোর তাহার মর্ম্ম,
কিন্তু তাহে জনমে কুসুম ॥ —(৪ পৃঃ)

রাজপুতগণ ভ্রাতা অন্যায় করিলেও ক্ষমা করে না—

কারু প্রতি ক্ষমা নাই, হউক আপন ভাই,
সমুচিত শিক্ষা দিবে তারে।
অন্যায় না সহ্য হয়, মিথ্যাবাদ নাহি সয়,
সত্যের পরীক্ষা তরবারে ॥ —(৪ পৃঃ)

সে সময়ে রাজস্থানে প্রায় সকলেই শিবভক্ত ছিলেন। প্রভাত-সমীরে তাই—

হর হর বম্ বম্ শব্দ সুগভীর। —(৭ পৃঃ)

সকলেই অতিথি-পরায়ণ ছিলেন—

মধ্যাহ্নের উপযোগ আতিথ্য নির্ভর।
গৃহস্থ পরম যত্নে করে সমাদর ॥ —(৭ পৃঃ)

রাজবাটীতে অতিথির আগমনে রাজা স্বয়ং তাঁহাকে সম্বর্ধনা জানাইতেন এবং সে সময় নানাবিধ মঙ্গলাচরণ অনুষ্ঠিত হইত। রাজপ্রাসাদে মাঝে মাঝে শক্তি-পরীক্ষা হইত। তাহাতে দেশের বীরবৃন্দ যোগদান করিয়া বিজয়ীর গৌরব লাভ করিতেন।

অরণ্যকমল ও সাধুর পক্ষের দুই বীর সৈনিকের মদ্যপানের ভিতর দিয়া কবি রাজপুতগণের সৌজন্যের পরিচয় দিয়াছেন। পাহু সাধুর পক্ষের সৈনিক এবং মিহিরজ অরণ্যকমলের পক্ষে। নিদ্রিত পাহুকে জাগাইয়া মিহিরজ যুদ্ধে আহ্বান জানাইলেন। পাহু মদ্যপানের নিমিত্ত সময় চাহিল। মিহিরজ তখন নিজে মদ্য আনিয়া তাহাকেও দিল এবং নিজেও পান করিল। তাহাদের সৌজন্যবোধ ও শিষ্টতা শত্রুকেও সাহায্যদানে কৃপণতা করে নাই। যখন যুদ্ধ করিয়াছে তখনও সমকক্ষকে বাছিয়া লইয়াছে এবং যুদ্ধের পূর্ব্বে বা পরেও শত্রুপক্ষের প্রতি অশিষ্টাচরণ করে নাই। রাজপুত-চরিত্রের ইহাও একটি বৈশিষ্ট্য ছিল।

কবি সৌন্দর্য্য-বর্ণনায়ও স্থানে স্থানে দক্ষতা দেখাইয়াছেন। কর্ম্মদেবীর নিদ্রিত সখীগণের বর্ণনা—

নিশায় মুদিত যেন দিবসের ফুল।
কারু চারু কবরী লোটায় ধরাতলে ॥
নামিল নিবিড় মেঘ বুঝি ভূমণ্ডলে ॥ —(২৮ পৃঃ)

সখীগণের নিদ্রা ভাঙ্গিল—

যেন ভানুকর পরশনে পদ্মফুল।
জাগিল সঙ্গিনীগণ হাস্য সমাকুল॥ —(২৮ পৃঃ)

তাহারা স্নানের নিমিত্ত নদীতে নামিল—

হেমলতা ভাসে যেন জলের উপর॥ —(২৮ পৃঃ)

উপমাগুলির নির্ব্বাচনে কবি শিল্পী মনের পরিচয় দিয়াছেন। প্রাকৃতিক শোভার বর্ণনাও দেখা যায়—

দিবা অবসান হয়, নভোলোক তমময়,
ধূসরবরণা দিগঙ্গনা।
স্থির নেত্রে দেখা যায়, শোভা পায় দীপ প্রায়,
দুই এক তারা খভূষণা॥
যেন নায়িকার আশে, প্রেমিকের হৃদাকাশে,
দুই এক ভরসার ভাতি। —(২৫ পৃঃ)

বাঙালীর সাহসহীনতার প্রতি ইঙ্গিত করিয়া কবি লিখিয়াছেন—

যথা বাঙ্গালার লোক নহেক সাহসী।
নারীপ্রিয় কেলিকলা কৌতুক বিলাসী॥
শিশুর পুতুলে দেখ আভাস তাহার।
কামকলা ছলা তাতে প্রত্যক্ষ প্রচার॥
পুতুলে পুতুলে বিয়া বহু বহু কেলি।
নিতান্ত কৈশোরের যত বাল বালা মেলি॥
কিরূপে পৌরুষ পথে যাইবে বালক।
তামাক খাকুয়া বুড়া প্রিয় খেলনক॥
পশ্চিমের প্রজাপুঞ্জ পুরুষার্থ চায়।
সেইমত দেখহ শিশুর খেলনায়॥ —(১৬ পৃঃ)

এই কাব্যের দুইটি বিরোধী পক্ষই রাজপুত। এক পক্ষ শৌর্য্যে, বীর্য্যে, শালীনতায় কর্ম্মদেবীর মন হরণ করিয়া তাঁহাকে লাভ করিয়াছে। অপর পক্ষ স্থিরীকৃত ভাগ্যের আকস্মিক বিপর্য্যয়ে অপমানিত ও ঈর্ষ্যান্বিত। উভয়ের শক্তি-পরীক্ষার ফলে কর্ম্মদেবী নিজ প্রণয়নিষ্ঠা ও দৃঢ়তা লইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। এই বীরত্বব্যঞ্জক কাহিনীর ভিতর দিয়া কবি যেন রাজপুতগণের পতনের

কারণও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অতি তুচ্ছ ব্যাপার লইয়াও তাহারা নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ করিয়া শক্তিক্ষয় করিত ও একে অপরের শত্রু হইয়া দাঁড়াইত।

কাব্যটিতে মূল আখ্যানভাগের পরিপুষ্টি ও শ্রীসাধনের নিমিত্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনাবলীর সমাবেশ দেখা যায়। বাণিজ্য করিতে আগত যবনগণের প্রতি সাধুর ব্যবহার তাহার চরিত্রে স্বদেশপ্রেমকে এবং দূরদৃষ্টিকে সূচিত করিয়াছে। আবার উদ্যানে কর্ম্মদেবীর সহিত সাধুর সাক্ষাৎ—নব অনুরাগের প্রকাশ—কাব্যটিতে রসবৈচিত্র্য আনিয়া মাধুর্য্য দান করিয়াছে। দুই সৈনিকের মদ্যপান ব্যাপারটিও যুদ্ধক্ষেত্রের নির্ম্মমতার ভিতর যেন মানবতার স্পর্শ দিয়া যায়। এই-সকল ঘটনা দ্বারা কাব্য-সৌন্দর্য্য অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। পদ্মিনী-উপাখ্যানে যাহার অভাব অনুভূত হইয়াছিল এই কাব্যে কবি তাহা সংশোধনের চেষ্টা করিয়া অনেক-পরিমাণে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। অনেক স্থলেই বর্ণনার দীর্ঘতা কাব্য-রসকে ব্যাহত করিলেও স্থানে স্থানে বর্ণনা-মাধুর্য্য পাঠককে মুগ্ধ করে। এই কাব্য-রচনায় কবি পদ্মিনী-উপাখ্যান হইতে অধিকতর কাব্য-কুশলতার পরিচয় দিয়াছেন। ইহাতে ইংরাজ সাহিত্যিক স্কট ও বাইরনের প্রভাব অনুভূত হয়। কাব্যটি চারিটি সর্গে সমাপ্ত। পয়ার, ত্রিপদী, একাবলী, মালঝাঁপ প্রভৃতি ছন্দে ইহা রচিত। স্থানে স্থানে সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়।

শূরসুন্দরী—'শূরসুন্দরী' কবি রঙ্গলালের রচিত তৃতীয় ইতিহাসাশ্রিত কাব্য। ইহার প্রকাশকাল ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দ। ইহার আখ্যানভাগও টডের রাজস্থান-গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত। ইহাতেও রাজপুত রমণীর বীরত্ব ও দৃঢ়তার কাহিনী লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

কাব্যের প্রথমে কবি কবিতা-শক্তির আবাহন করিয়াছেন—

কোথা গো কবিতা সতি সুধাস্বরূপিনী।
কেন গো আমার প্রতি এরূপ কোপিনী॥
... ...
তুমি মম কিশোরকালের সহচরী।
তব সঙ্গে যেত রঙ্গে দিবা বিভাবরী॥
বিজনে তটিনীতটে শষ্পশয্যা করি।
তরুচ্ছায়ে মৃদুবায়ে সুখে শ্রম হরি॥

তুমি গো আমার কাছে বসি হাসি হাসি।
দেখাইতে নিসর্গের যত রূপরাশি ॥ —(৩৮ পৃঃ)

সে যুগে এই বর্ণনার ভিতর অনেকখানি অভিনবত্ব প্রকাশ পাইয়াছে। যে কল্পনাদেবীকে রবীন্দ্রনাথ মানসসুন্দরী নাম দিয়া প্রেয়সীরূপে অঙ্কিত করিয়াছেন, রবীন্দ্রপূর্ব্বযুগে তাঁহাকেই কবি সহচরীরূপে রূপদান করিয়া নব ভাবের সৃষ্টি করিয়াছেন।

তারপর কবিত্বশক্তির নিকট কবির অনুগ্রহ-প্রার্থনার ভিতর দিয়া তাঁহার এই কাব্য-রচনার উদ্দেশ্য প্রকাশিত হইয়াছে।

আমাদের দেশের অসহায়া রমণীকুলের দুর্ব্বৃত্তের হস্তে লাঞ্ছনা কবিকে বিচলিত করিয়াছিল তাহারই প্রতিকারার্থে রমণীকুলকে স্বাবলম্বনের পথে আহ্বান জানাইয়া কবি এই কাব্য রচনা করেন। মানুষের আত্মশক্তিই বড় অস্ত্র। সেই শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিয়া প্রয়োজন-অনুসারে কাজে লাগাইলে কোন দুর্ব্বৃত্তেরই নিকটে আসিবার সাহস থাকে না। আকবরের ন্যায় প্রতাপশালী সম্রাট্ও অনেক কলা-কৌশল বিস্তার করিয়াও একজন কবি-পত্নীর নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, সেই সতী রমণীর দৃঢ়তায় ও তেজস্বিতায় কাব্যটি উজ্জ্বল। একদিকে তিনি গৃহবধূ, অপরদিকে খড়্গ-ধারিণী। তাঁহার সতীত্বের নিকট সম্রাটের সমস্ত মণি-মাণিক্য, শৌর্য্য-বীর্য্য ম্লান হইয়া গেল।

কাব্যের প্রথমে কবি একটি ঐতিহাসিক পটভূমিকা তৈয়ারী করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। আকবরের রাজত্বকালে যখন হিন্দু-মুসলমানের ভিতর সৌহার্দ্দ্য স্থাপিত হইয়াছিল সে সময় মানসিংহ সম্রাটের সহিত ভগ্নীর বিবাহ দিয়া প্রভূত সম্মানের অধিকারী হইয়াছিলেন। কিন্তু চিতোরের রাণা প্রতাপ তাঁহার সহিত আহার না করিলে তিনি সমাজে সম্মান পাইতেছিলেন না। তাই দাক্ষিণাত্য জয় করিয়া প্রত্যাবর্ত্তনকালে তিনি প্রতাপসিংহের আতিথ্য গ্রহণ করেন। কিন্তু ভোজনকালে অসুস্থতার ভান করিয়া প্রতাপ উপস্থিত না থাকাতে তিনি ক্ষুণ্ণ হন এবং প্রতাপের পুত্রকে কহেন—

রাণার প্রসাদ ভিন্ন এবে গতি নাই।
তিনি যদি জাতি দেন তবে জাতি পাই ॥ —(৪১ পৃঃ)

এই কথা শুনিয়া রাণা আসিয়া প্রকাশ্যভাবে জানাইলেন যে মোগলের সহিত যে বংশের বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে তাঁহাদের তিনি পূর্ব্বের মর্য্যাদা দিতে পারিবেন না। তখন মানসিংহ অপমানিত হইয়া ক্রোধে কহিলেন—

তবে জেন মম নাম মানসিংহ নয়।
যদি তব সর্ব্বনাশ অচিরে না হয়॥ —(৪১ পৃঃ)

প্রতাপসিংহের তেজও কম নয়। তিনি উত্তর দিলেন—

আহবে আমায় কভু বিমুখ না পাবে॥ —(৪১ পৃঃ)

শ্যালকের অপমানে আকবরও ক্রুদ্ধ হইলেন। তারপর হলদীঘাটের যুদ্ধের অবতারণা হইল। এই যুদ্ধে আকবরের সভাসদ্ শক্তিসিংহ তাঁহার ভ্রাতা প্রতাপসিংহকে সাহায্য করিলেন—ইহাও সম্রাটের কর্ণগোচর হইল। আকবর ক্রোধে জ্বলিতে লাগিলেন এবং প্রতিশোধের পথ খুঁজিতে লাগিলেন। এমন সময় তিনি শুনিলেন যে তাঁহার সভাকবি পৃথ্বীসিংহের পত্নী সতী শক্তিসিংহের কন্যা। সম্রাট্ তাঁহার সতীত্ব হরণ করিয়া প্রতাপসিংহ ও শক্তিসিংহের কুলে কলঙ্ক অর্পণ করিবার নিমিত্ত নৌরজা হাটের ব্যবস্থা করিলেন।

আকবর কৌশলে অতি অল্পদিনের ভিতর ভিকানীর রাণী প্রমদাকে বশীভূত করিলেন এব' আপন প্রয়োজনে নিযুক্ত করিলেন।

সতী সরলা ও বিশ্বাসপ্রবণা। তিনি প্রমদাকে বিশ্বাস করিয়া স্বামীর অনুমতি লইয়া একদিন প্রমদার সহিত নৌরজা হাটে গেলেন। সে স্থানে রূপবতী রমণীগণের সমাবেশ হইয়াছে। কিন্তু রমণীগণের সৌন্দর্য্য সতীর আগমনে ম্লান হইয়া গেল—

লাবণ্য বরষি যেন যাইছে রূপসী।
যত রূপ-গর্ব্বিতার মুখে দিয়ে মসী॥ —(৫১ পৃঃ)

সতী কিন্তু অত্যন্ত বুদ্ধিমতী। নৌরজা হাটের অবস্থা দেখিয়া তাঁহার বুদ্ধিদীপ্ত মনে সন্দেহের মেঘ পুঞ্জীভূত হইল এবং প্রমদা তাঁহাকে একাকী ত্যাগ করিয়া গেলে তাহা আশঙ্কায় পরিণত হইল।

প্রাসাদের ভিতর পথ খুঁজিবার কালে তিনি একটি সঙ্গীত শুনিতে পাইলেন এবং তাহার মর্ম্ম অনুধাবন কবিয়া ভীত হইলেন। কিন্তু তিনি বুদ্ধি বা ধৈর্য্য

হারাইলেন না। বিপত্তারিণী কালিকার স্তব করিয়া তিনি অদৃশ্য শক্তির নিকট হইতে তরবারি ও আশ্বাস লাভ করিলেন। উহা শুনিয়া তাঁহার বুঝিতে বিলম্ব হইল না—

যোগিনীর স্বর প্রায় অনুভূত হয়॥ —(৫৭ পৃঃ)

তারপর দিল্লীপতি আসিয়া তাঁহার পদে কোহিনূর অর্পণ করিয়া প্রেম নিবেদন করিলেন, সতী প্রথমে কম্পিত হইলেন, পরে তীব্র ভাষায় তিরস্কার করিলেন। কিন্তু আকবর তাঁহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া অগ্রসর হইলে তিনি ধাক্কা দিয়া আকবরকে ভূপাতিত করিলেন। দিল্লীর সম্রাট্‌ বলিয়া সতী বিন্দুমাত্র বিচলিত হইলেন না বা সম্মান দেখাইবার প্রয়োজন বোধ করিলেন না। দুর্ব্বৃত্তের উপযুক্ত তিরস্কার ও ভর্ৎসনা দ্বারা স্ব-মহিমা প্রকাশ করিলেন। অবশেষে দিল্লীপতি তাঁহাকে মাতৃ-সম্বোধন করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলে তিনি সমস্ত রাজপুত রমণীর সম্মানরক্ষার ব্যবস্থা করাইয়া লইলেন। আকবরকে দিয়া প্রতিজ্ঞা-পত্রে লিখাইয়া লইলেন—

সত্য কর কোরাণ শরীফ শিরে ধরি।
লিখে দেহ নিজ পঞ্জা দস্তখৎ করি॥
যদবধি তুমি কিংবা তব বংশধর।
ভারতের সিংহাসনে থাকিবা ঈশ্বর॥
ছলে বলে কি কৌশলে দিল্লী অধিকারী।
না আনিবে নিজপুরে রাজপুৎ নারী॥ —(৫৮ পৃঃ)

বিপদের মধ্যে পতিত হইয়াও তিনি দেশ ও জাতির কথা বিস্মৃত হন নাই এবং সুযোগ পাইয়া নিজের জন্য কোন কিছু না চাহিয়া জাতির মঙ্গলসাধনের ব্যবস্থা করাইয়া লইলেন। স্বদেশভক্ত রাজপুত রমণীগণের চরিত্রের এই একটি নূতন দিক্‌ আমাদের সমক্ষে উদ্‌ঘাটিত হইল।

সতীর চরিত্রে হাস্যরসিকতার পরিচয়ও পাওয়া যায়। গৃহে ফিরিয়া চিন্তিত স্বামীর প্রশ্নের উত্তরে তিনি কৌতুক করিয়া কহিলেন—

যে রতন তোমার আদৃত অতিশয়।
আজ নিশি হরিল তস্কর দুরাশয়॥
কি কাজ এ দেহে আর বল প্রাণ ধরি।
দেহ খর করবাল প্রাণ পরিহরি॥ —(৬০ পৃঃ)

পরে প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গের জন্য পৃথ্বীসিংহ তাঁহাকে ভৎর্সনা করিলে—

সতী কহে কিসে সত্য লঙ্ঘিলাম আমি।
বেদে বলে এক তনু পত্নী আর স্বামী॥ —(৬০ পৃঃ)

সতীর পতি-পরায়ণতার চূড়ান্ত নিদর্শন প্রকাশিত হইল।

কাব্যটিতে আকবরের ঐতিহাসিক চরিত্র কোথাও ক্ষুন্ন হয় নাই। এই কাব্যের ভিতর তাঁহার রাজনৈতিক কুটিলতা প্রকাশিত হইয়াছে। প্রতাপ-সিংহ ও শক্তিসিংহের উপর প্রতিশোধ-স্পৃহাই তাঁহাকে সতীর সতীত্ব হরণে প্রেরণা যোগাইয়াছিল। তাহা ছাড়া রমণীগণ-সম্বন্ধে আকবরের ধারণাও উচ্চ ছিল না। তাঁহার মতে—

ধনের পিপাসা আর প্রভুত্বের আশা।
রমণী ধর্ম্ম কর্ম্ম শর্ম্ম মর্ম্ম নাশা॥
প্রলোভের দাসী তারা স্তবের কিঙ্করী।
ইথে বশীভূত নহে কে আছে সুন্দরী॥—(৪৬ পৃঃ)

রাজনৈতিক চাতুর্যের দ্বারা তিনি বিভিন্ন নারীর অবাধ মেলামেশার সুযোগ-দানের ক্ষেত্ররূপে নৌরজা হাটের ব্যাখ্যা করিয়া বাসনা-সিদ্ধির উপায় খুঁজিয়া-ছিলেন। এই কর্ম্মের নিমিত্ত ভিকানীর রাণীর সাহায্যও গ্রহণ করিয়াছিলেন। আত্মীয় রমণীর দ্বারা রমণীর সর্ব্বনাশ সাধন করা সহজ, তাঁহার ন্যায় বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি তাহা বুঝিয়াছিলেন। তারপর কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত তিনি একবার সন্ন্যাসী সাজিয়াছিলেন এবং নৌরজা হাটে রমণীগণের হস্তরেখা বিচার করিতে আরম্ভ করিলে সহজেই রমণীকুলের ভিড় জমিয়া গেল। কিন্তু সতীর ব্যাপারে সুবিধা করিতে পারিলেন না। তারপর সঙ্গীত আরম্ভ করিয়াও কৃতকার্য্য হইলেন না। অবশেষে নিজ রাজ-পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া সতীর পথরোধ করিয়া কোহিনূর দিলেন। স্ব-ইচ্ছা পূর্ণ করিতে কোন পথ অবলম্বন করিতেই তাঁহার দ্বিধা নাই। তিনি সতীর পদতলে বসিয়া অসঙ্কোচ-চিত্তে প্রেম নিবেদন করিলেন। কিন্তু সতীর হৃদয় জয় করিতে না পারিয়া তিনি প্রথম দৃঢ়চেতা রমণীর সাক্ষাৎ লাভ করিয়া মনে মনে ভাবিলেন—

ভুবনের ভামিনী ভাবিনীগণ যত।
আমার প্রণয় যাচে কাঙ্গালিনী মত॥

এ নারী কেমন নারী নারি চিনিবারে।
নারিলাম কোহিনূর রত্নে কিনিবারে ॥ —(৫৮ পৃঃ)

কিন্তু তিনি সঙ্কল্পচ্যুত হইলেন না। রমণীর উপর বলপ্রয়োগের নিমিত্ত অগ্রসর হইলে তাঁহার চরম পরাজয় ঘটিল। বার বার প্রতাপকে আক্রমণ করিয়া ব্যর্থ হইয়া আকবরের এক গৃহবধূর উপর প্রতিশোধ লইবার স্পৃহা ধূলিসাৎ হইয়া গেল। উপস্থিত-বুদ্ধির দ্বারা তিনি বুঝিলেন পরাজয় স্বীকার করাই শ্রেয়ঃ। তখন তিনি সতীকে মাতৃসম্বোধন করিয়া ক্ষমাভিক্ষা করিয়া নিজ মর্য্যাদা রক্ষা করিলেন। কিন্তু তাঁহার এই কার্য্যাবলীর পশ্চাতে একটি রাজনৈতিক হেতু আনিয়া কবি আকবর-চরিত্রকে অনেকখানি মর্য্যাদা দান করিয়াছেন এবং ঐতিহাসিক আকবরের চরিত্রে ঐরূপ রাজনৈতিক চালের অনেক দৃষ্টান্ত আছে বলিয়া এই ঘটনাটি বিসদৃশ হয় নাই।

আকবর-মহিষী যোধাবাই স্বল্প পরিচয়ের ভিতর দিয়াই সমুজ্জল। তিনি রাজপুত এবং মানসিংহের ভগ্নী। প্রমদার মুখে তাঁহার পরিচয় পাওয়া যায়—

অতি প্রিয়বাদিনী মহিষী যোধাবাই।
ভুবনে এমন বুঝি চারুশীলা নাই ॥ —(৪৭ পৃঃ)

আকবরের সহিত বিবাহ হইলেও তিনি রাজপুতগণের প্রতি মমতাবোধ ত্যাগ করিতে পারেন নাই এবং তাহাদের নিমিত্ত তাঁহার হৃদয়ে গর্ব্বেরও অভাব নাই। তিনি বুদ্ধিমতী। স্বামীর হৃদয়ের গূঢ় অভিসন্ধি বুঝিতে পারিলেন এবং রাজপুত রমণীর সতীত্ব রক্ষা করিয়া প্রতাপের কুলকে অকলঙ্ক রাখিবার উপায় চিন্তা করিলেন। নিজের ক্ষতি-বৃদ্ধির কথাও চিন্তা করিলেন। তাই আকবর যখন সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করিলেন তিনি যোগিনীর পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া যোগীকে সর্ব্ব স্থান হইতে পলাইতে বাধ্য করিয়া যখন দেখিলেন সতী পথের সন্ধানে ভয়ে কালিকার স্তব করিতেছেন তখন তিনিই খড়্গ রাখিয়া তাঁহাকে সাহসে ভর করিবার উপদেশ দিলেন। রমণীর সতীত্ব রমণীর সাহায্যেই রক্ষিত হইল।

পৃথ্বীসিংহ কবি ও প্রেমিক। রূপবতী স্ত্রীলাভ করিয়া তিনি গর্ব্বিত। তাঁহাকে কোথাও পাঠাইতে পৃথ্বীসিংহের মন চায় না। তথাপি বিকানীর রাণীর সহিত যাইতে তিনি পত্নীকে অনুমতি দিলেন। কিন্তু দুশ্চিন্তায় সময় কাটাইতে লাগিলেন। অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত সতী না আসাতে নিদ্রার মধ্যে

তিনি দুঃস্বপ্ন দেখিলেন—একটি নৌকা হইতে এক রমণী ঝড়ের ভিতর পড়িয়া জলে নিপতিতা হইলেন এবং তিনিই সতী। ঘুম ভাঙ্গিল। আবার নিদ্রাভিভূত হইয়া দেখিলেন—সতী অরণ্যে সর্পভয়ে ভীত হইয়া দৌড়াইতে দৌড়াইতে মাটীতে পড়িয়া গেলেন। তৃতীয়বার দেখিলেন সতী ব্যাঘ্রভয়ে ভীত হইয়া নদীতে পড়িয়া গেলেন। তখন—

জাগিয়া উঠিল কবি বলি সতি সতি।
দেখে গৃহে দাঁড়াইয়া জায়া গুণবতী॥ —(৫৯ পৃঃ)

পৃথ্বীসিংহের চরিত্রের ভিতর দৃঢ়তা ও সত্যের প্রতি নিষ্ঠাও দেখা যায়। আকবরের নিকট সতী প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে আকবরের আচরণ তিনি কাহারও নিকট প্রকাশ করিবেন না—কিন্তু স্বামীর নিকট সব বৃত্তান্তের সহিত সম্রাটের প্রসঙ্গ ও প্রতিজ্ঞার কথা বলিলে পৃথ্বীসিংহের সত্যনিষ্ঠ হৃদয় সে কার্য্য অনুমোদন করিল না। তিনি সতীকে ভৎর্সনা করিয়াছিলেন। কিন্তু সতী যখন বুঝাইয়া দিলেন যে স্বামিস্ত্রী একাত্মা, তাঁহাদের ভিতর কোন পার্থক্য নাই জানিয়াই তিনি স্বামীর নিকট আকবরের আচরণ বিবৃত করিয়াছেন এবং তাহা দ্বারা প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয় নাই, কবি খুসি হইলেন। এই ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করিয়াই নাকি তিনি রাণা প্রতাপসিংহকে লিখিয়াছিলেন—

কাহারও নিস্তার নাই নৌরজা সঙ্কটে। —(৬০ পৃঃ)

কাব্যে ঐতিহাসিকতার পটভূমিকাটি অত্যন্ত সুন্দর হইয়াছে। ইহার দৈর্ঘ্য আরও কিছু কম হইলে কাব্যরসকে ইহা সমৃদ্ধতর করিতে পারিত। হলদীঘাটের যুদ্ধে আকবরের আশ্রিত শক্তিসিংহ ভ্রাতা প্রতাপসিংহের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আসিয়াও বিরোধিতা করিতে পারিলেন না। সকলের অলক্ষ্যে প্রতাপসিংহকে সাহায্য করিয়া এবং যুদ্ধে উৎসাহ দিয়া ভ্রাতৃপ্রীতি ও স্বজাতি-প্রীতির যে পরিচয় দিয়াছেন তাহা সুন্দরভাবে কাব্যে স্থান পাইয়াছে। সমস্ত কাহিনীর পশ্চাতে প্রতাপসিংহের অনমনীয় তেজস্বিতা ও শক্তিসিংহের সাজাত্যবোধকে কারণস্বরূপ অঙ্কিত করিয়া কবি কাব্যটিকে ঐতিহাসিক মর্য্যাদা দান করিয়াছেন।

নানাবিধ বর্ণনার দ্বারাও কাব্যটিতে বৈচিত্র্য আসিয়াছে। নৌরজা হাটে বিভিন্ন দেশের রমণীগণের বর্ণনা—

বসিয়াছে বিলাতীয় বরাঙ্গনাগণ।
শিশির সময়ে যথা সরোজ কানন॥ —(৪৮ পৃঃ)

মোগল রমণীগণের বর্ণনা—

বসিয়াছে তার কাছে মোগল মোহিণী।
কামের কামিনী কিবা চাঁদের রোহিণী॥ —(৪৮ পৃঃ)

রাজপুত রমণীগণ—

এক ধারে যত সব রাজপুতদারা।
অমরী কিন্নরী পরী অপ্সরী আকারা॥ —(৫০ পৃঃ)

জাতি-বৈষম্য মানুষের দুঃখের কারণ। কবি লিখিয়াছেন—

কি কাণ্ড কুলের কাণ্ড জাতি অভিমান।
ধরা পরিহরি কবে হবে অন্তর্দ্ধান॥
কবে সবে এক জাতি করি স্বীকার।
একভাবে জাতীশ্বরে দিবে নমস্কার॥ —(৪১ পৃঃ)

কাব্যরস সম্বন্ধে কবি লিখিয়াছেন—

আদিরস বীররস পৌরুষ প্রধান।
এ জগতে এই দুই সুখের অধীন॥
প্রেম ছাড়া বীর কোথা, বীর্য্য ছাড়া প্রেমী।
ধুরা ছাড়া কভু স্থির নহে চক্রনেমি॥

কাব্যটিতে চারটি সঙ্গীত আছে ও চারটি সর্গে সম্পূর্ণ কাব্যটিই পয়ার ছন্দে রচিত। স্থানে স্থানে অনুপ্রাসের ব্যবহার রহিয়াছে। উপমা রূপক প্রভৃতি পুরাতন ভাব হইতে মুক্ত—

খুরের আঘাত শৈলে উঠিছে অনল।
জলধরে যেন ক্ষণপ্রভা ঝল্মল॥ —(৪৪ পৃঃ)

বা—

ঘনঘটা মোহ মেঘ হৃদয় আকাশে।

পূর্ব্বের দুইটি কাব্যে কবি-হৃদয়ের যে উদ্দীপনা অনুভূত হয় এ কাব্যে যেন তাহার হ্রাস দেখা যায়। বর্ণনার আতিশয্যে কাব্যটি যেন কিছু-পরিমাণে শ্রীহীন হইয়া পড়িয়াছে। পূর্ব্ববর্তী কাব্য দুইটিতে একটা সংঘাত ছিল যাহা কাব্য-কাহিনীকে গতি দান করিয়াছিল। এ কাব্যের সংঘাত সম্রাটের সহিত কবিপত্নীর, তাই তাহাতে কাহিনী কতকটা গতিহীন হইয়া পড়িয়াছে এবং কাব্য-মাধুর্য্য ক্ষুণ্ণ করিয়াছে। কাহিনীটি বিবৃতিমাত্র বোধ হয় এবং

সেইজন্য কাব্যরসও জমিতে পারে নাই। ইতিহাসের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেও আখ্যায়িকা-কাব্যের ক্ষেত্রে ইহার সার্থকতা খুবই অকিঞ্চিৎকর।

জয়সিংহপর্ব্ব—দুর্গাচন্দ্র সান্যাল প্রণীত 'মহামোগল কাব্য, তৃতীয়খণ্ড' 'জয়সিংহপর্ব্ব' নামে ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ইহাতে শিবাজীর স্বদেশনিষ্ঠা এবং তাঁহার যুক্তি-তর্ক-ব্যক্তিত্ব দ্বারা জয়সিংহের মনোভাবের পরিবর্ত্তন প্রদর্শন করা হইয়াছে।

ঔরংজেব শিবাজীকে দমনের জন্য জয়সিংহ ও দিলির খাঁকে মহারাষ্ট্রে প্রেরণ করিয়াছিলেন। কবি জয়সিংহ-সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

মহাবীর জয়সিংহ আম্বের অধিপ
কার্য্যদক্ষ বুদ্ধিমান কুলের প্রদীপ। —(৬ পৃঃ)

বার্দ্ধক্যেও জয়সিংহের কর্ম্মদক্ষতা কিছুমাত্র হ্রাস পায় নাই—তেজ, দৃঢ়তা ও সাহস সমভাবেই বর্ত্তমান এবং আকৃতির ভিতরেও বলিষ্ঠতা ও শক্তিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়।

বর্গীগণ প্রথমে শ্যেনপাত যুদ্ধ এবং পরে তাহাদের দুর্গ আক্রান্ত হইলে সম্মুখ যুদ্ধ করিয়া অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত যবন-সেনাগণের নিকট পরাজিত হইল। শিবাজী তখন ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশ ধরিয়া জয়সিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। জয়সিংহ কিন্তু তাঁহার ছদ্মবেশ বুঝিতে পারিলেন এবং নিজ সন্দেহ প্রকাশ করিলেন।

শিবাজী আপনার পরিচয় দিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন এবং তাঁহার উপযুক্ত সম্মান না পাইয়া ক্ষোভ প্রকাশ করিলেন।

জয়সিংহ তখন কহিলেন—

জয়সিংহ কহে তুমি কিসের ক্ষত্রিয়
দুরাচার দস্যু তুমি অতি নিন্দনীয়।
লোকতঃ ধর্ম্মতঃ মন্দ তব আচরণ
সর্ব্বত্র তোমাকে ঘৃণা করে সাধুজন। —(৬৪ পৃঃ)

ইহা শুনিয়া শিবাজী নিজ কর্ম্মের অনুমোদন করিয়া স্বদেশের সেবায় তাঁহার সমস্ত ধন, সম্পত্তি ও শক্তি নিয়োগের কথা কহিলেন এবং স্বদেশের মুক্তিই তাঁহার লক্ষ্য বলিয়া নিজকৃত কর্ম্ম সমর্থন করিলেন। ইহাতে জয়সিংহের

বীর-হৃদয় বিচলিত হইল। তিনি দস্যু বলিয়া যাঁহাকে বসিবার আসন দেন নাই, নিজে গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহাকেই সসম্মানে আসন প্রদান করিলেন।

তারপর তাঁহারা পরস্পর নিজ নিজ কর্ম্মকে সমর্থন করিয়া আলোচনা করিতে লাগিলেন। জয়সিংহ স্বাধীনচেতা এবং বীর, কিন্তু অদৃষ্টবাদী। মোগলের সহিত শিবাজীর দ্বন্দ্ব করা বৃথা কহিয়া তিনি যুক্তি দেখাইলেন—

পুরাণে আছে লিখিত কলিকালে সুনিশ্চিত
যবন পীড়িতা মহী হবে ;
অবশ্য সম্ভাব্য যাহা চেষ্টায় খণ্ডিতে তাহা
কে সমর্থ হইয়াছে কবে॥ —(৭৪ পৃঃ)

শিবাজীর মনে সাহস ও তেজস্বিতা অসামান্য। শত্রুশিবিরে শত্রুসেনাপতির সামনে বসিয়া তিনি জয়সিংহের কার্য্যের সমালোচনা করিয়া তাঁহাকে স্বমতে আনিবার চেষ্টা করিলেন।

জয়সিংহ শিবাজীর স্বদেশপ্রীতি ও নিষ্ঠা দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। শিবাজী তাঁহাকে মুসলমানের উন্নতির কারণ দেখাইলেন—

সাহস উৎসাহ ঐক্য উদ্যোগ দৃঢ়তা
পঞ্চগুণে মুসলমান লভিল শ্রেষ্ঠতা। —(৮৫ পৃঃ)

তারপর তিনি জয়সিংহকে উত্তেজিত করিবার চেষ্টা করিয়া কহিলেন—

ম্লেচ্ছ যাহা পারে তাহা ক্ষত্রিয় সন্তান
অপারগ যদি তবে বড় অপমান।
ভারত ঐশ্বর্য্য ভোগে বিলাসী যবন
পূর্ব্ব সম তেজোবীর্য্য নাহিক এখন।
এ সময়ে মোরা দৃঢ় চেষ্টা যদি করি
অনায়াসে স্ব স্ব রাজ্য উদ্ধারিতে পারি।
অতএব মহারাজ! প্রার্থনা আমার
ধর্ম্ম রক্ষা কর করি যবন সংহার। —(৮৫ পৃঃ)

এমন সময় দিলির খাঁ সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া জয়সিংহের নিষেধ সত্ত্বেও শিবাজীকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলে জয়সিংহ তাঁহাকে যথোপযুক্ত শাস্তি দেন। এস্থানেও জয়সিংহের কোমল হৃদয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। দিলির খাঁ অবস্থা খারাপ দেখিয়া প্রাণ বাঁচাইবার জন্য তাঁহাকে স্তুতি করিয়া চক্ষে

জল আনিলে তিনি তাঁহাকে বধ না করিয়া ছাড়িয়া দেন। দিলির খাঁর এই ঘটনা শিবাজীর প্রতি তাঁহার মনকে আরও বেশী আকৃষ্ট করিল এবং তিনি সন্ধির প্রস্তাব লইয়া দিল্লীশ্বরের নিকট যাইবার উপদেশ দিলেন।

বিদ্রোহী শিবাজী সন্ধির প্রস্তাবে প্রথমে সম্মত হইলেন না। তখন জয়সিংহ নিজ কর্ত্তব্যের কথা স্মরণ করাইয়া এবং ঐ সময়ে শিবাজীকে সাহায্য করিলে তাঁহার পক্ষে সম্রাটের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা করা হয় বলিয়া বুঝাইলে শিবাজী তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন।

এই কাব্যে শিবাজীর ও জয়সিংহের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য সুন্দরভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। উভয়েই বীর, স্বদেশবৎসল, নির্ভীক, যোদ্ধা। কিন্তু জয়সিংহ অদৃষ্টবাদী, সরল, বিশ্বাসপ্রবণ আর শিবাজী আত্মনির্ভরশীল, কৌশলী এবং তিনি পাত্রভেদে বিশ্বাস বা অবিশ্বাস করেন। তাঁহাদের ঐতিহাসিক চরিত্র কোথাও ক্ষুণ্ণ হয় নাই।

এই কাব্যে মালেশ্বর চরিত্রও আমাদের মুগ্ধ করে। তিনি যেমন নির্ভীক, তেমনি বীর এবং তেমনি প্রভুভক্ত। কোন সমস্যা সম্মুখে আসা মাত্রই তিনি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হন। তাঁহার বীর-হৃদয় বীরত্বের পথে সব সমস্যার সমাধান খোঁজে। যুদ্ধে পরাজিত হইয়া শিবাজী প্রভৃতি পলায়ন করিয়া চলিয়া আসিলে নিজ ক্ষেত্রে জয়লাভ করিয়াও তাঁহাকে পশ্চাৎ হটিতে হওয়াতে তিনি লজ্জায় অপমানে ও ক্ষোভে ব্যাকুল হইলেন। রাত্রে মন্ত্রণাকক্ষে তিনি মাথা নত করিয়া বসিয়া রহিলেন—কাহারও প্রতি চাহিতে পারিলেন না। তারপর শিবাজী জয়সিংহের শিবিরে নিজে যাইতে চাহিলে মালেশ্বর বাধা দিয়া তাঁহাকে যাইতে দিবার অনুমতি চাহিয়াছিলেন। কিন্তু শিবাজী যখন নিজেই যাওয়া স্থির করিলেন তখন মালেশ্বর আর দ্বিরুক্তি করেন নাই। প্রভুকে সমস্ত কর্ম্মে মান্য করিয়া তিনি শৃঙ্খলা বজায় রাখিয়াছিলেন। নেতার প্রতি অগাধ বিশ্বাস ও ভক্তি তাঁহার চরিত্রে মাধুর্য্য দান করিয়াছে।

যবন-সেনাগণের কথোপকথনের মধ্যে কবি তাহাদের চরিত্রের পরিচয় দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। জয়সিংহের পরিচালনায় বর্গীগণকে পরাজিত করিয়া তাহারা পরস্পরকে বলিতেছিল—

হারিল কাফের হিন্দু গোলামের জাতি
কি জানে সমর তারা, ব্যবসা ডাকাতি ;

সর্ব্বত্র বিজয়ী সদা রসুলের চেলা
যুদ্ধ কার্য্য আমাদের আমোদের খেলা ;
দেখে শুনে দাস হৈয়ে থাকে রাজপুত ;
... ...
ভাঙ্গিব এখন সব হিন্দুর মন্দির,
সতীত্ব হরিব সব হিন্দু রমণীর,
ভূত পূজা ছাড়াইব বসাব ইসলাম,
পোড়াব পুরাণ বেদ স্মৃতি ও আগম। —(৩৯-৪০ পৃঃ)

জয়সিংহের নিকট প্রাণভিক্ষা পাইয়া সেই কক্ষ হইতে বাহির হইয়া দিলির খাঁ রসুলের নিকট প্রার্থনা করিল—

প্রতিহিংসা জয়সিংহে না করিলে দান
ব্যর্থ জন্ম মম, আমি ব্যর্থ মুসলমান।
অনুকম্পা কর মোরে রহিম রসুল।
বংশ সহ জয়সিংহে করিব নির্ম্মূল।— (১১০ পৃঃ)

স্থানে স্থানে তত্ত্ব-কথাও ব্যক্ত হইয়াছে। যেমন—

পরমাণু সমষ্টি এ দেহ জড়ময়
স্বতঃ চেষ্টা শক্তিহীন যন্ত্রসমতুল,
জীবাত্মা মনের নাম, দেহ তার গৃহ,
যন্তারূপে দেহযন্ত্র সে করে চালন,
সুখ দুঃখ পাপ পুণ্য ভোগকর্ত্তা মন ; —(৪৫ পৃঃ)

অথবা,—

বুদ্ধিমান যথাকালে করে পলায়ন
অসাধ্য সাধিতে মূর্খ হারায় জীবন। —(৫৯ পৃঃ)

এই কাব্যে একাবলী, পয়ার, দীর্ঘ ত্রিপদী, লঘু ত্রিপদী, অমিতাক্ষরা, দীর্ঘ চতুষ্পদী প্রভৃতি ছন্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। কাব্যের স্থানে স্থানে অপ্রচলিত শব্দের প্রয়োগও দেখা যায়। যেমন—ভূবদ্ধ, আপাকৃত, অপরাং, অবোত্তরে, নিপচন প্রভৃতি।

নামধাতুর যোগে ক্রিয়াপদের ব্যবহার, সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার এবং 'আৎ' প্রত্যয়-যোগে পঞ্চমী বিভক্তির ব্যবহারও দৃষ্ট হয়।

এই কাব্যটিতেও গতির অভাব অনুভূত হয়। ছন্দপতনও কাব্যটির স্থানে স্থানে দৃষ্ট হয়। বর্ণনা-বাহুল্য কাব্যটির রসহানি ঘটাইয়াছে তবে কাব্যে কবি ঐতিহাসিক চরিত্রকে কোথাও ক্ষুণ্ণ না করিয়া রূপ দান করিতে সমর্থ হইয়াছেন —ইহাই এই কাব্যের বৈশিষ্ট্য। কবিত্ব-শক্তির স্ফুরণ কোথাও দেখা যায় না। কাব্য-হিসাবে ইহা একেবারেই ব্যর্থ।

পলাশির যুদ্ধ—কবি নবীনচন্দ্র সেন কর্ত্তৃক রচিত 'পলাশির যুদ্ধ' কাব্যটি ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ইহা রচনা করিয়া কবি যথেষ্ট খ্যাতি অর্জ্জন করেন।

এই কাব্যে বাংলার ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের ইতিহাস চিত্রিত হইয়াছে। বাংলার শেষ নবাব সিরাজুদ্দৌলার পতন ও ব্রিটিশ রাজ্যের অভ্যুত্থান বিচিত্র-বর্ণে রঞ্জিত হইয়া কাব্যটিকে মনোজ্ঞ করিয়াছে। যে উচ্ছ্বাস এবং আবেগের অভাবে কবি রঙ্গলালের কাব্য সার্থক হইয়া উঠিতে পারে নাই 'পলাশির যুদ্ধে' কবির সেই আবেগ ও উচ্ছ্বাস ছত্রে ছত্রে প্রাণসঞ্চারিত করিয়া কাব্যটিকে জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছে।

একটি রাজ্যে রাজনৈতিক পরিবর্ত্তন আসিবার পশ্চাতে গুরুতর পরিস্থিতির প্রয়োজন। সিরাজুদ্দৌলার চরিত্রে কবি তাহা সুন্দরভাবে রূপায়িত করিতে পারিয়াছেন। একদিকে মদ্যপ, দুশ্চরিত্র, প্রজার শুভাশুভের প্রতি উদাসীন, স্বার্থপর নবাবের আমোদ-আহ্লাদে আসক্তি অপরদিকে বীর, কর্ম্মঠ, উৎসাহী, স্বদেশনিষ্ঠ, দৃঢ়চেতা ক্লাইবের স্বদেশের উন্নতির নিমিত্ত সচেষ্ট কর্ম্মতৎপরতা—উভয়ের সঙ্ঘর্ষের ফলে যাহা অনিবার্য্য তাহাই সংঘটিত হইয়াছে—রাজলক্ষ্মী জয়মাল্য বীরের কণ্ঠদেশে অর্পণ করিয়াছেন। কাব্যটি পাঠ করিয়া একবারও মনে হয় না পরিণতিকে জোর করিয়া আনয়ন করা হইয়াছে। অবশ্য বাস্তব-ক্ষেত্রে পরিণতি এরূপ না হইলে ভাল হইত—মন্ত্রী, সেনাপতি প্রভৃতি গুপ্ত ষড় যন্ত্রে লিপ্ত না হইলে বাংলার ভাগ্য অন্যরূপ হইতে পারিত—এ-সকল কথা মনে জাগে। কিন্তু সিরাজুদ্দৌলার পতনের পশ্চাতের পরিস্থিতি কবি যেভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা পরিণতি-উপযোগী এবং সুসঙ্গত হইয়াছে।

ঘটনা-বিন্যাসও এই কাব্যে অতি সুন্দরভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে। কবি প্রথমেই সিরাজুদ্দৌলার পারিষদবর্গ, বিভিন্ন রাজন্যবৃন্দ এবং মন্ত্রী ও সেনাপতি প্রভৃতির গুপ্ত ষড় যন্ত্রের মধ্যে নবাব-চরিত্রের দোষত্রুটিগুলির এবং তাঁহার

প্রতি রাজ্যের প্রজাবৃন্দের ও ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিবৃন্দের বিরুদ্ধ মনোভাবের পরিচয় দিয়া কাব্যের ভিতর একটি অশুভ, অপ্রত্যাশিত পরিণতির ছায়াপাত করিয়াছেন। বাহিরের প্রকৃতির ভিতরেও একটা ভয়াবহতা ও দুর্য্যোগের করাল ছায়া। রজনী দ্বিতীয় প্রহর—সূচীভেদ্য অন্ধকারে চারিদিক্ আচ্ছন্ন—আকাশে নিবিড় কৃষ্ণ মেঘ—তাহার ভিতর দুষ্ট সর্পের ন্যায় বিজলীর প্রকাশ কুটিল সর্ব্বনাশা ষড়্যন্ত্রের প্রতি ইঙ্গিতপূর্ণ।

জগৎশেঠের মন্ত্রণা-ভবনে সকলে মিলিত হইয়াছেন। কারণ নবাবের প্রতি ক্রোধ ও বিদ্বেষ তাঁহারই বেশী। নবাব বেগমের ছদ্মবেশে তাঁহার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া রমণীগণকে কলঙ্কিত করিয়াছেন। তাই তাঁহার একমাত্র এবং শেষ কথা তিনি কহিলেন—

প্রতিহিংসা প্রতিহিংসা প্রতিহিংসা সার,
প্রতিহিংসা বিনে মম কিছু নাই আর। —(১৫ পৃঃ)

রাজা রাজবল্লভ জানাইলেন যে নবাবের অত্যাচারে তাঁহার পুত্র কৃষ্ণদাস প্রভৃতিকে দেশান্তরে ইংরাজ-আশ্রয়ে পাঠাইয়া তিনি তাঁহাদের প্রাণরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তাই তিনিও জগৎশেঠের বাক্য অনুমোদন করিলেন।

মন্ত্রী কিন্তু অপরপক্ষকে সাহায্য করিয়া রাজ্যে আনিবার ষড়্যন্ত্র অনুমোদন করিলেন না। বিচক্ষণ মন্ত্রী তাঁহার উপযুক্ত পরামর্শ দিলেন। রাণী ভবানীও তাহা অনুমোদন করিলেন। তাঁহার মতে, নবাবের অত্যাচারের সম্বন্ধে কাহারও দ্বিমত থাকিতে পারে না। কিন্তু ইংরাজের সহিত ষড়্যন্ত্রে লিপ্ত হইতে তিনি সম্মত নহেন। কারণ লক্ষ্মণসেনের কাপুরুষতায় একবার বাংলার স্বাধীনতা হারাইতে হইয়াছে। পুনরায় পাপ-মন্ত্রণা দ্বারা সেনাপতিকে সিংহাসনে বসাইলে তিনি যে অত্যাচারী হইবেন না তাহার সম্বন্ধে নিশ্চয়তা নাই। উপরন্তু ইংরাজগণ সুযোগ পাইয়া রাজ্য বিস্তার করিয়া ভারতকে পরাধীনতার নাগপাশে বাঁধিতে পারেন। তাহাতে মহারাষ্ট্র-দেশে শিবাজীর অভ্যুত্থানে সকলের মনে যে আশার সঞ্চার হইয়াছে তাহাও নির্ব্বাপিত হইতে বিলম্ব হইবে না। ভারতের ভবিষ্যৎ তিনি যেন দিব্যদৃষ্টিতে দেখিতে পাইলেন—

দেখিতেছি দিব্য চক্ষে, সিরাজদ্দৌলায়
করি রাজ্যচ্যুত, শান্ত হবে না ইংরাজ ;
বরঞ্চ হইবে মত্ত রাজ্য পিপাসায়। —(২৯ পৃঃ)

এই শিহরণ যেন প্রকৃতির ভিতর দিয়াও সূচিত হইল—ঠিক সেই সময় কড় কড় শব্দে অশনিপাত হইল—

'দুঃখিনী ভারত ভাগ্যে'—অভ্রান্ত ভাষায়—
'লিখেছেন বজ্রাঘাত ভবিতব্যতায়।' —(৩২ পৃঃ)

এই অশনিপাতের সহিত স্থান কাল ও পরিবেশের সুন্দর সমতা রক্ষা করিয়া ভবিষ্যতের প্রতি ইঙ্গিত কবির শিল্পী মনের পরিচায়ক। সিরাজুদ্দৌলার পারিষদবর্গের এই ষড়্‌যন্ত্র ঐতিহাসিক ব্যাপার। কিন্তু সেই রাত্রের বর্ণনা এবং রাণী ভবানীর ভবিষ্যতের নিমিত্ত আশঙ্কা ব্যক্ত করিবার সঙ্গে সঙ্গে অশনিপাতের পরিকল্পনা কবির দক্ষতা ও লিপিকুশলতার পরিচায়ক। পারিষদবর্গের গোপন ষড়্‌যন্ত্রের কালিমা যেন বাঙালার ভাগ্যাকাশে অন্ধকার দুর্য্যোগের সৃষ্টি করিয়া আতঙ্ক ও শিহরণ আনিতে লাগিল। এই মন্ত্রণার চিত্রটিতে মিল্‌টনের প্যারাডাইস লস্টের বিদ্রোহী এঞ্জেলদের মন্ত্রণার কথা স্মরণপথে উদিত হয়।

বাংলার বুকে যখন নিরাশার অন্ধকার ঘনীভূত সেই সময় ইংরাজ-শিবিরে বীর ক্লাইভের হৃদয় নবীন আশার আলোকে উদ্‌ভাসিত। সেই চিত্র অঙ্কিত করিবার নিমিত্ত দ্বিতীয় সর্গের প্রথমে কবি আশাদেবীর শরণ লইয়াছেন। ক্লাইভের পক্ষে বাংলাদেশ জয় করা যেমন দুরাশা কবির হৃদয়ে কাব্য-রচনা করিয়া যশোলাভ করাও সেরূপ। তথাপি আশাদেবী কৃপাদান করিয়া ক্লাইভকে যেমন দুঃসাহসের পথে প্রেরণা জোগাইতেছেন কবিকেও সেরূপ শক্তিদান করিলে তিনি কাব্য-রচনায় অগ্রসর হইতে পারেন।

......................কিম্বা অসম্ভব
নহে কিছু হে দুরাশে! তোমার মায়ায়;
কত ক্ষুদ্র নর ধরি পদছায়া তব
লভিয়াছে অমরতা এ মর ধরায়;
অতএব দয়া করি কহ, দয়াবতি!
কি চিত্রে রঞ্জিছ আজি শ্বেত-সেনাপতি? —(৪৪ পৃঃ)

এই অনুগ্রহ-ভিক্ষা দ্বিবিধ অর্থে সম্বদ্ধ। একটি কবির কাব্যক্ষেত্রে যশোলাভের আশা, অপরটি ক্লাইভের যুদ্ধজয়ের আশা। বিপক্ষ-শিবিরে ক্লাইভ যুদ্ধ-সম্বন্ধে চিন্তা করিতেছেন। তিনি যেমন কূটবুদ্ধিসম্পন্ন, তেমনি সাহসী ও স্বদেশবৎসল। তাঁহার আকৃতির ভিতর দিয়া স্বভাবের পরিচয় পাওয়া যায়।

বৃটিশের সৈন্যসংখ্যা স্বল্প—যুদ্ধবিদ্যায় তাহাদের বিশেষ পারদর্শিতাও নাই। একমাত্র ভরসা মিরজাফরের সাহায্য। কিন্তু মিরজাফর বিশ্বাসঘাতকতা করিলে ইংরাজের রাজ্যজয় তো দুরাশায় পরিণত হইবেই উপরন্তু বাণিজ্য করাও সম্ভব হইবে না—তাহাতে ইংলণ্ডের ক্ষতির সম্ভাবনা। ক্লাইভ বসিয়া এই-সকল সম্ভব ও অসম্ভব লাভ-ক্ষতির চিন্তা করিতেছেন। নিজের মৃত্যু সম্বন্ধে বা ক্ষয়-ক্ষতি সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া তিনি বিচলিত নহেন। কিন্তু তাঁহার কার্য্যের দ্বারা স্বদেশের যেন ক্ষতি না হয়—সেই চিন্তাই প্রবল।

ইহা দ্বারা ইংরাজ-চরিত্রের স্বদেশ ও স্বজাতি-প্রীতি ব্যক্ত হইয়াছে। তাঁহার মনে পুনরায় আশার আলোক উদিত হইতেছে। দুই-তিনবার মৃত্যুর হাত হইতে তিনি অপ্রত্যাশিতভাবে বাঁচিয়াছেন সুতরাং তাঁহার দ্বারা নিশ্চয়ই কোন বৃহৎ কর্ম্ম সংসাধিত হইবে। অন্তর হইতেও তিনি যুদ্ধে অগ্রসর হইবার নিমিত্ত যেন উৎসাহ-বাণী শুনিতে পাইতেছেন। এই চিন্তারই প্রতিচ্ছবিরূপে ইংলণ্ডেশ্বরীর জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি আসিয়া যেন তাঁহাকে প্রেরণা ও উৎসাহ দিয়া গেলেন এবং ভবিষ্যতের চিত্র দেখাইলেন। সেই দেবী-মূর্ত্তি শাসননীতি-সম্বন্ধেও তাঁহাকে উপদেশ দান করিলেন এবং ন্যায়পথ হইতে ভ্রষ্ট হইলে পতন অবশ্যম্ভাবী তাহাও জানাইয়া দিলেন।

খানিকক্ষণ মোহগ্রস্তভাবে কাটিল। এই মোহগ্রস্ত ভাব দ্বারা কবি যেন ইংলণ্ডেশ্বরীর আগমনের অলৌকিকতাকে ক্লাইভের চিন্তাশীল মনের শুভ আশা সঞ্জাত বলিয়া রূপ দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। অত্যধিক চিন্তার সময় মানুষ অনেক সময় এইভাবে কর্ম্মের পরিণতিকে সম্মুখে দেখিতে পায়—ইহা অবিসংবাদী। দৈব আশ্বাস পাইয়াও কিন্তু ক্লাইভের স্বাবলম্বী হৃদয় সম্পূর্ণ আশ্বস্ত হইল না। ইংরাজ-চরিত্রের ইহাই বিশেষত্ব। আত্মশক্তি তাহাদের নিকট সবচেয়ে বড় ভরসার স্থল। ক্লাইভের চোখে নিদ্রা নাই। তিনি পুনরায় চিন্তায় মগ্ন হইলেন এবং আশা সঞ্চয় করিলেন—

> আমরা বীরের পুত্র, যুদ্ধব্যবসায়ী ;
> আমাদের স্বাধীনত্ব বীরত্ব জীবন ;
> রণক্ষেত্রে এই দেহ হলে ধরাশায়ী,
> তথাপি ত্যজিব প্রাণ বীরের মতন,

করিব না করে অসি থাকিতে আমার,
জননীর শ্বেত অঙ্গে কলঙ্ক অর্পণ —(৯২ পৃঃ)

ক্লাইভের হৃদয়ে বীরত্বের সহিত কোমলতাও ছিল। পত্নীকে স্মরণ করিয়া সৈনিকের সঙ্গীত তাঁহাকে বিচলিত করিল,—

ঝরিল একটি অশ্রু, দ্রবিল হৃদয় ;
সুদীর্ঘ নিশ্বাস সহ হইল নির্গত—
প্রিয়তমে মেস্কিলিন্!—জনমের মত! —(৯৭ পৃঃ)

যুদ্ধক্ষেত্রে ক্লাইভের বীর্য্যবত্তা, সাহস ও নির্ভীকতার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথমবারের যুদ্ধে অনেক ব্রিটিশ সৈন্য প্রাণ হারাইলে তিনি ভগ্নোত্তম সৈন্য-গণকে সাহস ও উৎসাহ দিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছিলেন।

ক্লাইভের চরিত্রে এবং সৈনিকগণের গানের মধ্যে কবি ইংরাজ-চরিত্রের স্বরূপটি সুন্দরভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন। যুদ্ধের পূর্ব্বদিন রাত্রে এক ব্রিটিশ সৈনিকের গীতের মধ্যে এবং যুদ্ধের পূর্ব্বে ব্রিটিশ শিবির হইতে যে গান উত্থিত হইতেছিল তাহার ভাবে ও যুদ্ধে জয়লাভের পর তাহাদের আনন্দ-সঙ্গীতের মধ্যে ব্রিটিশ সঙ্গীতের সুর ও জাতিগত মনোভাবের বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হইয়াছে।

ব্রিটিশ সূর্য্যোদয়ের পশ্চাতে যে বাঙালীর ভাগ্যাকাশের অমানিশার অন্ধকার—তাহার মর্ম্মমূলে বসিয়া উচ্ছৃঙ্খলচরিত্রের শেষ নবাব সিরাজুদ্দৌলা প্রমোদের হিল্লোলে মগ্ন। যুদ্ধের পূর্ব্বদিন রাত্রে রমণীগণ দ্বারা পরিবৃত হইয়া তিনি নৃত্যগীত উপভোগ করিতেছেন। তিনি কিছু চিন্তাগ্রস্ত ও অন্যমনস্ক। কিন্তু বিষাদের কোন হেতু তিনি খুঁজিয়া পাইতেছেন না। ভবিষ্যৎ বিপদের ছায়া যেন অলক্ষ্যে তাঁহার মনকে আচ্ছন্ন করিতেছে। ব্রিটিশ-শিবির হইতে তোপধ্বনি শুনিয়া তিনি চমকিত হইতেছেন। দুঃখী প্রজাগণ সম্বন্ধে তাঁহার স্বার্থপর মন ভাবিত,—

দুঃখীর জীবন মৃত্যু একই সমান।
আমাদের ইচ্ছামত মরিতে বাঁচিতে,
হয়েছে তাদের সৃষ্টি এই পৃথিবীতে। —(৭৯ পৃঃ)

কিন্তু সেই ভোগবিলাসী, স্বার্থপূর্ণ নবাব-হৃদয়ে ঐ রাত্রে ভাবান্তর উপস্থিত হইল এবং তাঁহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত সেই রাত্রেই আরম্ভ হইল।

শত্রু-শিবিরের প্রতি তাকাইলে তাঁহার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিতেছে,—আকাশের তারাগণ যেন—

প্রত্যেক একটি পাপ চিত্রিয়া গগনে
দেখায় প্রত্যেক তারা বিধির বিধানে। —(৭৭ পৃঃ)

মিরজাফর প্রভৃতি তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়্‌যন্ত্র করিয়া ইংরাজদের আনিতে পারেন এ সন্দেহও তাঁহার মনে জাগিতেছে। এই-সকল চিন্তা তাঁহাকে এরূপ অভিভূত করিল যে পরিচারিকার ও অনুচরের পদধ্বনি শুনিয়া তিনি মিরজাফরের চর মনে করিলেন এবং ভীতচিত্তে লুকাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। মিরজাফর প্রভৃতির গোপন ষড়্‌যন্ত্র যেন তাঁহার অবচেতন মনে অনুভূত হইয়া তাঁহাকে কম্পিত করিতেছিল। তিনি ভাবিতেছেন যে তিনি নিজে তো যুদ্ধে যাইবেন না সুতরাং মৃত্যুকে তাঁহার ভয় পাইবার কিছু নাই। একদিকে ক্লাইভ যখন নিজ প্রাণের মায়া তুচ্ছ করিয়া স্বদেশের কল্যাণ-কামনায় চিন্তামগ্ন অপরদিকে দুর্ব্বলচেতা সিরাজুদ্দৌলা তখন প্রাণভয়ে গৃহকোণে লুকাইতে ব্যস্ত।

সেইদিন রাত্রে তন্দ্রার মধ্যেও তিনি যেন নিজকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে লাগিলেন। তাঁহার অত্যাচারে হত কেহ আসিয়া তাঁহাকে অভিশাপ দিলেন, কেহ ভবিষ্যৎ দুর্ভাগ্যের প্রতি ইঙ্গিত করিলেন, কেহ বা নানাবিধ ভয়ের দ্বারা তাঁহাকে আতঙ্কিত করিতে লাগিলেন। এইস্থানে জুলিয়াস সিজারের প্রভাব অনুভূত হয়। তিনি কারাগারে বন্দী অবস্থায় তাঁহার পাপের প্রয়েশ্চিত্তরূপে চরম যন্ত্রণা ভোগ করিলেন। নরকের ভয়াবহ দৃশ্যগুলি দেখিয়া তিনি প্রাণভয়ে চীৎকার করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। চৈতন্য ফিরিলে মহম্মদবেগের চরণে পতিত হইয়া প্রাণভিক্ষা তাঁহার পাপকর্ম্মের চূড়ান্ত পরিণতি। এত বড় অধঃপতন হয়তো অন্য কোন রাজার জীবনে ঘটে নাই। তারপর সিরাজের শোণিত-ধারার সহিত বঙ্গের স্বাধীনতাও লুপ্ত হইল।

সেই শোণিতের স্রোতে, হইল তখন
বঙ্গ স্বাধীনতা শেষ আশা বিসর্জ্জন। —(১৫৪ পৃঃ)

এই অত্যাচারী নিষ্ঠুর ভীরু নিন্দিত ভাগ্যবিড়ম্বিত নবাবের প্রতি কিন্তু কবির সহানুভূতি ছিল। তিনি নবাব-চরিত্রের কালিমালিপ্ত দিক্‌গুলি উদ্‌ঘাটিত করিয়া তাঁহার পতনের কারণ নির্ণয় করিয়াছেন সত্য কিন্তু তাঁহার

দুর্ভাগ্যের জন্য বেদনাবোধ না করিয়া পারেন নাই। তাই একটি রমণীহৃদয়ে নবাবের জন্য অশ্রু সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। সকল অবস্থায়, সকল সুখে-দুঃখে সেই রমণী নবাবকে আনন্দ দান করিতে, শান্তি দান করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার সমস্ত কর্ম্মের ভিতর দিয়া আন্তরিকতার দীপ্তি বিকীর্ণ হইয়াছে। সিরাজুদ্দৌলা যখন মিরজাফরের গৃহ অভিমুখে যাইতে গিয়া ভূপতিত হন এই রমণী তখনও তাঁহাকে অনুসরণ করিয়াছিলেন এবং পতিত নবাবকে ধরিয়া দাসীগণকে ডাকিয়া পালঙ্কে শায়িত করিয়াছিলেন, আবার যখন তন্দ্রার মধ্যে নবাব নিজপাপকৃত ভয়াবহ দৃশ্য দেখিয়া ঘর্ম্মাক্ত হইতেছিলেন তখন তিনি অঞ্চল দ্বারা তাঁহার বদন মুছাইয়া অশ্রুবর্ষণ করিতেছিলেন। তারপর নবাব কারাগারে বন্দী হইলে এই রমণী নিজ সতীত্বের শক্তিতে তাঁহার নিকট যাইবার জন্য চেষ্টা করিলেন, দ্বারে মাথা ঠুকিলেন। তাঁহার মস্তক হইতে শোণিত ঝরিতে লাগিল।

নবাবের জন্য একটি হৃদয়ে আন্তরিকতা, প্রেম ও কল্যাণকামনা ছিল এবং তাঁহার তিরোধানে একটি অন্তর বিয়োগব্যথা অনুভব করিয়া যেন বাঙালীর মর্ম্মব্যথার প্রতীক হইয়া রহিল।

ব্যথা বাজিল অপর একটি বুকেও। তিনি মোহনলাল। নবাবের পক্ষের সামান্য সৈনিক। কিন্তু তাঁহার স্বদেশপ্রীতি তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিয়াছে। যুদ্ধক্ষেত্রে ক্ষণিকের জন্য তাঁহাকে আমরা দেখিতে পাই—ক্ষণেকের মধ্যেই তিনি ইহধাম ত্যাগ করেন—তবু সেই স্বল্প সময়ের মধ্যে তাঁহার তেজ, সাহস ও স্বদেশপ্রীতি আমাদের মুগ্ধ করে। যুদ্ধক্ষেত্রে ব্রিটিশ সৈন্যের অস্ত্র-নিক্ষেপের মধ্যে স্বদলের সেনাপতিকে নীরব এবং সৈন্যগণকে নিশ্চল দেখিয়া তাঁহার বীর-হৃদয় বিচলিত হইয়াছে—তিনি সামান্য সৈনিক হইয়াও সেনাপতিকে ভৎর্সনা করিয়াছেন। তারপর তিনি সৈন্যদলকে উত্তেজিত করিয়া রণক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন এবং যুদ্ধে জয়লাভ করিলেন। কিন্তু সেনাপতি মিরজাফরের ইচ্ছা অন্যরূপ। ব্রিটিশপক্ষকে সুযোগ দান করিবার নিমিত্ত তিনি যুদ্ধ বন্ধের আদেশ দিলেন।

ব্রিটিশেরা এই সুযোগ গ্রহণ করিয়া যুদ্ধে জয়লাভ করিলেন। মোহনলাল মৃত্যুশয্যায় শায়িত হইয়া স্বদেশের ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন –

কোথা যাও, ফিরে চাও, সহস্রকিরণ!
বারেক ফিরিয়া চাও, ওহে দিনমণি!
তুমি অস্তাচলে দেব করিলে গমন,
আসিবে ভারতে চির বিষাদ রজনী! —(১১৪ পৃঃ)

মোহনলালের শোকোচ্ছ্বাসের মধ্যে যেন সমস্ত বাংলার মর্ম্মবেদনা ধ্বনিত হইয়া উঠিল।

কিন্তু বাংলার অজ্ঞ জনসাধারণ তাহাদের এই দুঃখের দিনকে সে দিন বুঝিতে পারে নাই। নবাবের প্রতি তাহাদের কোন সহানুভূতি বা দরদ ছিল না, তাঁহার পতনেও তাহারা দুঃখিত হইল না। মিরজাফরের সহিত আনন্দ-উৎসবে তাহারাও যোগদান করিল। বাংলার হতভাগ্য নর-নারী বুঝিল না তাহারা কি রত্ন হারাইল।

পলাশীর যুদ্ধকে মহাকাব্য বলা যায় না। ইহা একটি গাথা-কাব্য। ইহাতে পাঁচটি সর্গ আছে। দশ পঙ্‌ক্তির পয়ার ছন্দে কাব্যটি রচিত। যুদ্ধের বর্ণনায় চৌপদী ছন্দের ব্যবহার দেখা যায়। উপমা, রূপক প্রভৃতি অলঙ্কারের ব্যবহারে কবির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে। কাব্যের ভাষার মধ্যে প্রাণের আবেগ ও হৃদয়ের উচ্ছ্বাস স্পন্দিত হইয়া বঙ্গের পরাধীনতার বেদনাকে যেন মূর্ত্ত করিয়াছে।

সিংহল-বিজয়—শ্যামাচরণ শ্রীমাণী রচিত 'সিংহল-বিজয়' কাব্যটি ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। পালি 'মহাবংশ'-এ বর্ণিত কাহিনী অবলম্বনে ইহা লিখিত। গ্রন্থ-রচনার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কবি লিখিয়াছেন—"বঙ্গ রাজকুমার বিজয় ৫৪৩ খ্রীঃ পূঃ সাত শত মাত্র সহচর সমভিব্যাহারে লঙ্কাদ্বীপ অধিকার করেন—ইহা স্বদেশ গৌরবাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিদিগের পক্ষে অল্প গৌরবের বিষয় নহে। তদ্বিবরণ বর্ণনই আমার কাব্য রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য।"

এই কাব্যে মাইকেল মধুসূদনের প্রভাব সুস্পষ্ট। প্রথমে সরস্বতী বন্দনাতেও তাহা প্রকাশিত—

ওমা বাক্য প্রসবিনি, কল্যাণদায়িনি
বাণি, উর গো মা আজি এ মূঢ়ের চিত্ত
সিংহাসনে! শ্রীচরণ প্রসাদে এ দাস
গাইবে গো, বঙ্গরবি, হে ভারতি যবে

উজলিল লঙ্কাদ্বীপ—নবগীত মাতি
নব রসে।............ —(১ পৃঃ)

কবি মাইকেলকেও তাঁহার প্রণতি জানাইয়াছেন—

নমি পদে, শ্রীমধুসূদন! অবগাহি
সুখাত সলিলে তব, পরম নির্ভয়ে
হংস যথা, মানস সরসে। মোরে দেহ
বর; হাসিতে হাসিতে ভাসি যেন দেব,
মধু কবিতা সাগর তরঙ্গ মাঝারে! —(১-২ পৃঃ)

'সিংহল-বিজয়' কাব্যটি ইতিহাসাশ্রিত হইলেও নানাবিধ অলৌকিক ঘটনার সমাবেশে এবং দেব-দেবীর হস্তক্ষেপে ও পরিচালনায় অনেকখানি পৌরাণিক হইয়া উঠিয়াছে। এই সময়কার ইতিহাসাশ্রিত বা দেশপ্রেমমুখ্য কাব্যগুলিতে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই বাস্তবতাবিরোধী ঘটনার সমাবেশ বিশেষ দেখা যায় না। কিন্তু এই কাব্যে কবি যেন বাস্তবতা ও অবাস্তবতার সংমিশ্রণে পূর্ব্বের রোমাণ্টিক ও পৌরাণিক কাব্যকারগণকে অনুসরণ করিয়াছেন। ইহাতে দৈবী প্রভাব মেঘনাদবধ-কাব্যের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। কাব্যারম্ভেই আমরা দেখি ইন্দ্র শচীদেবীসহ বিষ্ণুপদ বন্দনা করিতেছেন। সর্ব্বজ্ঞ বিষ্ণু তাঁহাদের মনোভাব বুঝিয়া লঙ্কাদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হইবার আশ্বাস দান করিয়া সরস্বতী দেবীর নিকট তাঁহাদের যাইতে আদেশ দিলেন।

সরস্বতী দেবীর নিকট তাঁহারা পৌঁছিলে দেবী কহিলেন—

.........সাধিব এ কার্য্য অবিলম্বে
আমি। অনুষ্ঠিবে অত্যাচার সিংহবাহু
সুত,—বারে বারে নিষেধি নৃপমণি,
না শুনিবে বিজয় কেশরী মম মায়া
বলে,– ত্যজিবে ভূপতি কোপে প্রাণপুত্র
বরে। তারপর, লইবে তাহারে তুমি
সিন্ধুপারে, লঙ্কাধামে যক্ষ দল মাঝে। —(৪ পৃঃ)

এইভাবে বিজয়সিংহের সিংহল-গমন এবং রাজ্যজয় প্রভৃতি ঘটনাগুলি দেবগণ-কর্তৃক পূর্ব্ব হইতেই স্থিরীকৃত হইল।

সরস্বতীর ছলনা দ্বারা ভ্রান্ত হইয়া বিজয়সিংহ পিতা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া সমুদ্রপথে যাত্রা করিলে ইন্দ্র প্রভঞ্জনকে আদেশ দিলেন—

………যাও দেব
অনুচর দলে তব, রাখহ একত্রে
সাজাইয়ে, পরে উদীচী দিকেতে যবে,
হেরিবে আমারে নভো গজারূঢ় ঘন
ব্যোম ধূমাবৃত, বহিবে তুমুল ঝড়.
ঘোর রবে কাঁপাইয়ে দিক দশে, লঙ্কা
ধামে আমি লইব বিজয়ে। সঙ্গে লয়ে
তুমি যত যুবক সন্তানে নাগদ্বীপে
দিবে রাখি, রমণী যতেক, সুযতনে
লইবে মহীন্দ্রে।……… —(৫২ পৃঃ)

স্ত্রীপুত্রগণকে নিমজ্জিত দেখিয়া বিজয়সিংহ প্রভৃতি সকলে যখন সমুদ্রে আত্মবিসর্জ্জনের উদ্যোগ করিতেছিলেন সেই সময় ইন্দ্রের আদেশে দেবী দৈববাণী শুভ্র মেঘের আড়াল হইতে তাঁহাদের কহিলেন—

………নিবৃত্ত এ আত্ম-
নাশ পাপ হতে, অথবা দেবের ক্রোধে
পড়ি স্বর্গ হারাইবে, কহিনু নিশ্চয়। —(৬২ পৃঃ)

আবার লঙ্কাদ্বীপে ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর হইয়া সকলে লোকালয়ের সন্ধানে গমন করিলে শ্রীবিষ্ণু সন্ন্যাসীর বেশে তাঁহাদের গমন-পথে বসিলেন এবং লঙ্কাধাম-সম্বন্ধে সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় এবং তথায় তাঁহাদের ভবিষ্যৎ জানাইলেন।

………ধরিবে সিংহল নাম এই
লঙ্কাধাম, তোমা হতে বিজয় সিংহল। —(৬৫ পৃঃ)

তারপর যক্ষগণের হস্ত হইতে বাঁচিবার উপায়স্বরূপ তিনি সকলের হস্তে একটি করিয়া কবচ বাঁধিয়া দিলেন।

এই তো গেল দেবগণের অনুগ্রহ ও সহায়তার ইতিহাস। তারপর আরম্ভ হইল যক্ষ ও যক্ষিণীগণের নানারূপ অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ। রাজপুত্রগণকে আসিতে দেখিয়া যক্ষিণী কুবেণীর দাসী কালী কুক্কুরী-বেশ ধারণ করিল এবং একে একে সকলকে কুবেণীর মায়াজালে জড়িত করিল।

আবার বিজয়সিংহের সহিত কুবেণীর বিবাহের পর রাত্রে কুবেণীর মায়া-জালে অপূর্ব্ব শয্যা রচিত হইয়াছিল।

এই-সকল দেব-অনুগ্রহ ও অলৌকিক ঘটনাবলী যদিও বিজয়সিংহের মানবিক বীরত্বকে অনেকখানি ম্লান করিয়াছে তথাপি তাঁহার ভিতর মনুষ্য-জনোচিত গুণাবলী ও দোষত্রুটির সংঘাত সুন্দরভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। দৈব অনুগ্রহ বা নিগ্রহ বাদ দিলে আমরা তাঁহাকে প্রথমেই একটি বিধবা রমণীর প্রতি আকৃষ্ট হইতে দেখি। রমণীর নিকট হইতে আশার ইঙ্গিত পাইয়া রাত্রে তিনি রমণীর উদ্দেশ্যে ভার্গবের গৃহে গেলেন এবং ভার্গব-কর্ত্তৃক বাধা পাইয়া পলায়নকালে তাঁহার উষ্ণীষ পড়িয়া গেলে ভার্গব রাজার নিকট যুবরাজের বিরুদ্ধে নালিশ জানান। রাজা মন্ত্রীর অনুরোধে তাঁহাকে শাস্তি না দিয়া সাবধান করিয়া দিলেন। কিন্তু বিজয়সিংহ নিবৃত্ত হইলেন না। বন্ধুগণ-সহ বিধবাবিবাহ প্রচলিত করিবার জন্য ভার্গবের গৃহ আক্রমণ করিয়া বিধবা কন্যাকে বলপ্রয়োগে আনয়ন করিবার পরামর্শ করিলে রাজা সিংহবাহু তাঁহাকে নির্ব্বাসিত করেন।

বিজয়সিংহের সর্ব্বকার্য্যে সফলতার মূলে এই সঙ্কল্পনিষ্ঠাই কার্য্যকরী হইয়াছে। তাঁহার চরিত্রের দৃঢ়তার আরও পরিচয় পাওয়া যায়। সমুদ্র-যাত্রার পূর্ব্বে বিজয়সিংহের মাতা তাঁহাকে ফিরাইয়া লইবার জন্য আসিয়া কান্নাকাটি করিয়া, অনুনয়-বিনয় করিয়াও তাঁহাকে সঙ্কল্পচ্যুত করিতে পারেন নাই। মাতার মৃত্যুতে তিনি অত্যন্ত শোকগ্রস্ত হইলেন কিন্তু নিজ পথ পরিত্যাগ করিলেন না। আবার যখন বিদেশে মাত্র সাত শত সেনানী লইয়া যুদ্ধ করার দুঃসাহসিকতার কথা ভাবিয়া অনেকে যুদ্ধে অগ্রসর না হইবার জন্য পরামর্শ দিয়াছিলেন তখনও তিনি নিজ ব্যক্তিত্ব ও সঙ্কল্পের জোরে সকলকে স্বমতে আনিয়া অসাধ্যসাধন করিয়াছিলেন। তিনি একরোখা ছিলেন বটে কিন্তু তাঁহার সেই দৃঢ়তাই তাঁহাকে বিজয়ী করিয়া অশেষ যশের অধিকারী করিয়াছিল।

বিজয়সিংহ স্বেচ্ছাচারী ও তেজস্বী ছিলেন কিন্তু স্নেহ-দয়া-মায়া ও কর্ত্তব্য-বোধ তাঁহার কিছুমাত্র কম ছিল না। প্রথমেই আমরা দেখি তাঁহার সহোদরোপম বন্ধু অনুরাধ তাঁহাকে পাপকার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিলে তিনি ক্রুদ্ধকণ্ঠে কহিয়াছিলেন—

……… যাও যথা
ইচ্ছা তব, না আসিও সম্মুখে আমার
আর।……… —(১৫ পৃঃ)

কিন্তু দেশত্যাগকালে বন্ধুবৎসল অনুরাধ যখন প্রণাম করিয়া তাঁহার সঙ্গী হইতে চাহিল তিনি লজ্জায় ও অনুতাপে জর্জ্জরিত হইয়াছিলেন।

তাঁহার চরিত্রের এই কোমলতার পরিচয় আরও পাওয়া যায় তাঁহার মাতার মৃত্যু হইলে। তিনি শোকে উন্মত্তবৎ হইলেন। তারপর শান্তি পাইবার আশায় তিনি কখনও কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে আলিঙ্গন করিতেছেন কখনও মন্ত্রীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বিদায় চাহিতেছেন।

লঙ্কা যাইবার পথে শিশু ও রমণীগণ জলমগ্ন হইলে মাতার আকস্মিক মৃত্যু এবং জলনিমজ্জিতদের মৃত্যুর নিমিত্ত নিজেকেই দায়ী মনে করিয়া ধিক্কারে তাঁহার মন ভরিয়া উঠিল। তিনি প্রাণবিসর্জ্জনের জন্য উদ্যত হইলেন। বৃহৎ কর্ম্মের পথে দেবতা যাঁহাকে আহ্বান করেন বৃহৎ দুঃখ, বৃহৎ অনুতাপ দিয়া তাঁহাকে শক্ত ও বেপরোয়াও তিনিই করেন। বিজয়সিংহের জয়যাত্রা-পথে তাই বোধ হয় এই-সকল দুঃখময় স্মৃতি পাথেয় হইয়া রহিল।

লঙ্কায় অবতরণ করিবার পর বিজয়সিংহের যুদ্ধ-বিদ্যায় পারদর্শিতা এবং সাহসিকতার যথেষ্ট পরিচয় আমরা পাই। যক্ষিণী কুবেণীর মায়াজালে সঙ্গিগণ কারারুদ্ধ হইলে তিনি একাই সকলের অনুসন্ধানে বাহির হন এবং কুবেণীর মিষ্ট কথায় না ভুলিয়া তাহাকেই সর্ব্বনাশের কারণ মনে করিয়া অস্ত্র লইয়া অগ্রসর হন। তখন দুই বিরাটকায় যক্ষের আকস্মিক আগমনে বিজয়সিংহ বিন্দুমাত্রও ভীত হন নাই বরং যুদ্ধ করিয়া তাহাদের পরাস্ত করিয়াছেন। আবার লঙ্কার রাজার সহিত যুদ্ধ করিবার অভিপ্রায় জানিয়া কেহ কেহ যখন চিন্তিত হইতেছিল তখন বিজয়সিংহ নিজ সাহসের দ্বারা সকলকে উত্তেজিত করিবার জন্য কহিলেন—

……স্মরি বঙ্গমাতা
করি লক্ষ্য বীরলোক, চল আজ
গিয়া সবে প্রবেশিব রণে, এক প্রাণী
থাকিতে জীবিত, এই সত্য, রণরঙ্গে
ভঙ্গ নাহি দিব। বিস্তারি বিশাল বক্ষঃ

শক্র বিদ্যমানে, সহিবে সকল অস্ত্রা-
ঘাত, হাস্যমুখে, পৃষ্ঠদেশে বিরাজেন
দেবতা সমরে—সাবধান, সে পবিত্র
অঙ্গ যেন, নাহি স্পর্শে দুর্ম্মতি গুহ্যক। —(৯৬ পৃঃ)

ইহার মধ্যে বিজয়সিংহের স্বদেশপ্রীতি ও নিষ্ঠা প্রকাশিত হইয়াছে। তারপর সত্যই তাঁহারা যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর হইলেন। কালসেনের সহিত যুদ্ধে বিজয়-সিংহের বীরত্বও প্রশংসনীয়।

কালসেনের পত্নী পশুমিত্রার প্রতি বিজয়সিংহের সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহারও আমাদের মুগ্ধ করে। পশুমিত্রাকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া তিনি কহিলেন—

কহ সতি, কিবা অভিপ্রায়, ভয় ত্যজি,
কোন কার্য্য, অধম এ জন, সম্পাদন
করি পারে তুষিতে তোমারে ; এ প্রতিজ্ঞা
মম, দিব যা চাহিবে—যক্ষ পাটরাণি ! —(১১৪ পৃঃ)

বীর-হৃদয়ের এই বিনয়-নম্র সৌজন্যবোধ চরিত্রটিকে মহান্ করিয়াছে।

নায়িকা কুবেণীর চরিত্র রহস্যে ঘেরা। প্রথমে তাহাকে যক্ষিণীরূপে বিজয়-সিংহের সঙ্গিগণকে ছলনায় ভুলাইয়া বন্দী করিয়া রাখিতে দেখা যায়। কিন্তু বিজয়সিংহ-কর্ত্তৃক তাহার দুই ভৃত্য পরাজিত হইলে সে তৎক্ষণাৎ বিজয়ীর নিকট নতি স্বীকার করিল ও আত্মসমর্পণ করিল। সে কহিল—

...... · লঙ্কেশ্বর হবে তুমি
মম সুকৌশলে—পুনঃ এই সত্য আমি
করিনু তোমার স্থানে সিংহবাহু সুত। —(৭৩ পৃঃ)

ভবিষ্যৎ জানিবার ক্ষমতা তাহার ছিল কি না তাহা জানা যায় না। তবে এ-ক্ষেত্রে সে পূর্ব্বেই বিজয়সিংহের ভবিষ্যৎ কার্য্যকলাপের কথা ব্যক্ত করিল। কুবেণীর কার্য্যদক্ষতাও অদ্ভুত ছিল। সে স্বহস্তে রন্ধন করিয়া সকলকে খাওয়াইল এবং নিজে স্বামীর ভুক্তাবশিষ্ট গ্রহণ করিল। চিত্রাঙ্কন-বিদ্যায়ও সে পারদর্শী ছিল। লঙ্কাদ্বীপেব রাজার প্রাসাদ প্রভৃতি সম্বন্ধে বিজয়সিংহকে বিবরণ দিবার জন্য সে রাত্রেই লঙ্কাদ্বীপের একটি মানচিত্র আঁকিল।

সিংহল রাজদুর্গের সমস্ত সংবাদ দিয়া এবং নিজ অধীনস্থ যক্ষদিগকে সাহায্যের নিমিত্ত আদেশ দিয়া সে বিজয়সিংহকে যুদ্ধে প্ররোচিত করিল।

কবি কিন্তু কুবেণীর এই কর্ম্মকে সমর্থন করিতে পারেন নাই। তাই তাহার ভবিষ্যৎ দুঃখের ইঙ্গিত দিয়া এই স্বদেশদ্রোহিতাকেই তাহার কারণস্বরূপ বলিয়াছেন—

····· কিন্তু সতি! নহে মাতৃভূমি
দোষী তব কাছে, তবে কেন সমর্পিলা
তাঁরে পরপদে, তাঁর অনিচ্ছায়?··· (৭৪-৭৫ পৃঃ)

কুবেণীর সাহস ও বীরত্বও প্রশংসার যোগ্য। যুদ্ধক্ষেত্রেও সে সকলের সহিত বীরত্ব-সহকারে যুদ্ধ করিয়াছিল। কিন্তু যুদ্ধে জয়লাভের পর পশুমিত্রার প্রতি তাহার কটূক্তি সমর্থনযোগ্য নয়। পশুমিত্রা কোন অপরাধ করিয়াছিল কিনা আমরা জানি না—কবি ইঙ্গিতে কহিয়াছেন কালসেন প্রভৃতির দুরভিসন্ধির নিমিত্ত কুবেণীর ক্রোধ ছিল। কিন্তু সদ্য বিবাহের পরই তাহার স্বামীকে নিহত করিয়া তাহার দুর্ভাগ্য লইয়া ব্যঙ্গ করা ও কুৎসিত ইঙ্গিত করা উচ্চ মনের পরিচায়ক নহে। কুবেণী পশুমিত্রাকে কহিল—

পশুমিত্রে! কি হেতু এখানে আগমন
নব বিবাহিতা, নহ বড় রতা বুঝি
পতির প্রণয় পাশে! নতুবা কেমনে
বিসর্জ্জিয়া শোকে, নব লঙ্কেশ্বর পাশে
আইলা এখানে বঞ্চিয়া আমারে বুঝি
হইবে মহিষী রূপের গরব এত! —(১১৩ পৃঃ)

অবশ্য এই উক্তির দ্বারা কুবেণীর চরিত্র বেশী জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। রাগ-হিংসা-দ্বেষ-প্রেম-দয়া সমস্তই তাহার ভিতর আছে তাই সে নিষ্প্রাণ হইয়া উঠে নাই। আবার পশুমিত্রা যখন তাহাকে অভিশাপ দিল—

এই পাপে—যদি মম পতির চরণে
থাকে মন, যদি সতীর কথায়, দেবে
করে কর্ণপাত, তবে শোন্—এই পাপে
তোর পতি করিবে বর্জ্জন তোরে, মনো-
দুঃখে পুড়ে, কান্দিয়া মরিবি অভাগিনি! —(১১৩ পৃঃ)

তখন আপনার অলক্ষ্যে কুবেণীর চিত্ত কাঁপিয়া উঠিল। ভবিষ্যতের অমঙ্গল-বার্ত্তা তাহার বুদ্ধিদীপ্ত, বীরত্বপূর্ণ সাহসী হৃদয়কেও বিচলিত করিল। এই

সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনার উল্লেখ করিয়া কবি চরিত্রটিকে আবেগ ও অনুভূতিময় করিয়া তুলিয়াছেন।

পার্শ্বচরিত্র-হিসাবে সিংহবাহু ও অনুরাধ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সিংহবাহুর কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও ন্যায়বিচার চরিত্রটিকে বলিষ্ঠ ও তেজোদৃপ্ত করিয়াছে। পুত্রের অপরাধের সংবাদে ক্রুদ্ধ হইয়া তিনি মন্ত্রীকে কহিলেন—

·····এই দণ্ডে তার কাটহ মস্তক
কান্দুক জননী তার! নহে দ্বীপান্তরে
তারে করহ প্রেরণ—থাকিবে আমার
প্রজা নির্ব্বিঘ্নে সকলে। অরাজক, কেহ
যেন নাহি কহে, স্বর্গতুল্য পুণ্যক্ষেত্র
এই বঙ্গদেশ। কোথা রাজধর্ম্ম আর
প্রজাচিত্ত না রঞ্জিল যথা ধিক্ মোরে! —(২৬ পৃঃ)

পুত্রের প্রতিও তাঁহার স্নেহের অভাব ছিল না। তিনি পুত্রের প্রতি দণ্ডের ব্যবস্থা করিতেন বিচারের দিক্ ভাবিয়া। কিন্তু মন্ত্রী বা স্ত্রী যখন তাঁহাকে অনুরোধ করিতেন এবং অপর দিক্ সম্বন্ধেও সচেতন করিতেন তখন তিনি দণ্ডাদেশের পরিবর্ত্তন করিতেও কুণ্ঠা বোধ করিতেন না। তাই মন্ত্রী রাজপুত্রকে প্রথমবার ক্ষমা করিতে অনুরোধ করিলে তিনি কহিয়াছিলেন—

কিন্তু রাজধর্ম্ম দণ্ডিতে দোষীরে। তবে,
অভিযোক্তা যদি দয়া-পরবশে, নিজে
ক্ষমেন তাহারে, তুষ্ট মনে, তবে সাধ্য
মম, অন্যথা অধর্ম্ম হেতু ক্ষমিতে না
পারি।········ —(২৭ পৃঃ)

পরে পুনরায় কুকার্য্যের পথে অগ্রসর হইতে পুত্রের বাসনা জানিয়া তিনি মৃত্যু-দণ্ডাদেশ দেন কিন্তু পত্নীর অনুরোধে এবং অশ্রুজলে তাহা প্রত্যাহার করিয়া আদেশ দিলেন—

মন্ত্রি, সূর্য্যাস্ত হইলে কল্য, নাহি যেন
রহে কেহ এই নগরীতে, পত্নী-পুত্র-সহ
অন্যথা মরণ; নির্বাসন কর

সবে দ্বীপ দ্বীপান্তরে। আজি হতে মম
পবিত্র কুল-কলঙ্কে করিনু বর্জ্জন। —(৩৫ পৃঃ)

পিতার চরিত্রের এই বলিষ্ঠতা পুত্রের চরিত্রেও দেখা যায় এবং উহার জন্যই বিজয়সিংহ বিজয়ী হইতে পারিয়াছিলেন।

বন্ধুবৎসল অনুরাধের চরিত্রটিও কবি দুই-একটি রেখায় সুন্দরভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন। বন্ধুর প্রতি তাঁহার প্রীতি অনন্যসাধারণ ছিল। কবি তাঁহার বন্ধুত্বের কথা বলিয়াছেন—

······এক প্রাণ মন যার যুবরাজ
সহ, যথা শ্রীরাম লক্ষ্মণ, বা যথা
অশ্বিনীকুমারদ্বয়।······ —(১২ পৃঃ)

কিন্তু অন্যায়ের পথে সে সর্ব্বদা বিজয়সিংহকে বাধা দিয়াছে। তাহার নিমিত্ত সে বিজয়সিংহের তীব্র তিরস্কার সহ্য করিয়াছে এবং তাঁহার মর্ম্মান্তিক আদেশ শিরোধার্য্য করিয়াছে। তাহার বুদ্ধিরও প্রশংসা করিতে হয়। বিজয়সিংহ সন্ধ্যাকালে দৃষ্ট রমণীর কথা তাহাকে জানাইলে সে কহিল—

কেমন ঘটনা এ যে নারিনু বুঝিতে।
কেন বা সে কুলবালা আসিবে এ জন-
শূন্য স্থানে, একাকিনী, চন্দ্র সূর্য্য তারা,
না পায় হেরিতে যাঁর বরণীয় রূপ
কোন দেব, কোন ছলে, পাতি মায়াজাল
কি বিপদ, ঘটাইবে তাই ভাবি মনে। —(১৪ পৃঃ)

বিজয়সিংহ ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে তাড়াইয়া দিলে সে অত্যন্ত দুঃখের সহিত নম্রভাবে কহিল—

····· কিন্তু, যদি কোন
কালে—জানি অদূর নহেক সেই কাল
নাশি কাম পাশে, হও হে কাতর তুমি
মম অদর্শনে ; পুনঃ সেবিব চরণ ;
নতুবা আমার এই দেখা। বিধাতার
বরে তুমি থাক কুশলেতে। —(১৬ পৃঃ)

বন্ধুর নিকট হইতে অতি তীব্র আঘাত ও অপমান পাইয়াও সে ক্রুদ্ধ হয় নাই

বা বন্ধুর অমঙ্গল কামনা করে নাই। বন্ধুর দুর্দ্দিনেও সত্যই সে দূরে থাকিতে পারে নাই। বিজয়সিংহ সঙ্গিগণ-সহ সিংহল-যাত্রাকালে সে সব মান-অভিমান, রাগ-দুঃখ, বিসর্জ্জন দিয়া বন্ধুর পার্শ্বে আসিয়াছে এবং বিজয়সিংহ তাহাকে ফিরিয়া যাইতে কহিলে সে বলিয়াছে—

> ধিক্ মোর প্রাণে ; প্রিয়জনে! জীবনের
> জীবন আপনি, চলিলে কোথায়। —(৪৬ পৃঃ)

লঙ্কাদ্বীপ গিয়া সমরায়োজনের ব্যাপারে তাহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। সে বৃ্যহরচনা, কর্ম্মবিভাগ প্রভৃতি বিষয়ে পরামর্শ দিয়াছিল। স্নেহে ত্যাগে নিষ্ঠায় কর্ত্তব্যবোধে স্বল্প পরিচয়ের ভিতরেও অনুরাধ-চরিত্রটি বন্ধুত্বের আদর্শস্থানীয় হইয়া উঠিয়াছে।

বিজয়ের মাতার ক্রন্দনের মধ্যে বাংলাদেশের পুত্রবৎসলা মাতার ক্রন্দন শোনা যায়—

> কহিতে লাগিলা সতী—বাছা অঞ্চলের
> নিধি! কোথা যাবি বাপ, আমায় ডুবায়ে
> পাথারে—এ অভাগিনী দুঃখিনী মায়েরে ?
> ... ...
> ....বিজয়, বিজয়, কোথা
> প্রাণের বিজয়, আয় বাছা আয় কোলে
> করি ; মা বলিয়ে চাঁদ, জুড়ারে জীবন। —(৩৮-৩৯ পৃঃ)

স্বাভাবিক করিতে গিয়া এই ক্রন্দনের ভিতর কাব্যের গাম্ভীর্য্য যেন কিছুটা ব্যাহত হইয়াছে।

কাব্যে রূপ-বর্ণনাও গতানুগতিক উপমা-রূপকাদি হইতে মুক্ত। সন্ধ্যাকালে পুষ্প-চয়নে রত রমণীর বর্ণনা—

> অনুপম রূপে তার উজলিল
> কুঞ্জবন, উজ্জ্বল কিরণে, আঁখি দুটি
> ত্রস্তগতি, চঞ্চল খঞ্জনসম, দিক
> দশে চমকিলা ;......। —(৬ পৃঃ)

বাঙ্গালীর মনে বীরত্বের প্রতি স্পৃহা জাগাইবার উদ্দেশ্যে কবি বীরসাজে সজ্জিত বাঙালী বীরগণের বর্ণনা দিয়াছেন—

হেনকালে দেখ ওই, পর্ব্বতের তলে
কাতারে কাতারে মনোহর অশ্বপৃষ্ঠে,
রণসাজে বঙ্গীয় যুবকগণ আসি
দাঁড়াইলা, ভীষণ কৃপাণ শূল ধরি,
দুর্ভেদ্য কবচ ঢাকা অঙ্গ, স্বর্ণময়
আভা! শিরস্ত্রাণ সহ চূড়া, শোভিতেছে
অতি রমণীয়রূপে। বক্রগ্রীব, শ্বেত
সৈন্ধব তুরঙ্গ চয় কেশরী সমান,
বলে রূপে, ছাইল সে গিরিমূল যেন
শ্বেতাম্বরে!........ —(৯৫ পৃঃ)

বঙ্গের অধীনতার নিমিত্ত দুঃখ প্রকাশ করিয়া কবি লিখিয়াছেন—

... ... নাহি আর সে সকল
সৌভাগ্য নিশান, বঙ্গ স্বাধীনতা সহ
হায় হয়েছে বিলীন, এবে। শোভিবে কি
দুঃখিনী জননী আর, কভু সে শোভায়?
ভায়াদের একতা বন্ধনে বিদরিয়ে
যায় বুক! কোথায় সাজার মা লভে
গঙ্গায়—ভারত তাই দহিছে অনলে! —(৪৭ পৃঃ)

'ভায়াদের', 'সাজার মা' প্রভৃতি শব্দগুলির ব্যবহারে এই বর্ণনাটি কিছু-পরিমাণে শব্দ-মাধুর্য্য হারাইয়াছে। এইরূপ শব্দের প্রয়োগ আরও কয়েকস্থানে ব্যবহৃত হইয়া কাব্যশ্রীকে ক্ষুণ্ণ করিয়াছে; যেমন—

...অনুতাপচিত্তে যদি তিনি
শুধাবেন নিজে এর পর।... —(২৭ পৃঃ)

কাব্যের স্থানে স্থানে অনুপ্রাসের ব্যবহারও দৃষ্ট হয়—

আঁধারে আঁধারি, পরাগ পটলে। —(৯৯ পৃঃ)

অথবা,

ধিক্ এ বিধিতে! যুগ শাস্ত্রে আছে বিধি,
তবে বিধি, কেন এ অবিধি —(২৯ পৃঃ)

অথবা, ... নতুবা এ সপ্তশত

প্রাণ করাল কালের কোলে, এককালে

লভিবে বিশ্রাম।...... —(৩০ পৃঃ)

এই কাব্যটিতে চারিটি সর্গ আছে এবং সমস্ত কাব্যটিই অমিতাক্ষর ছন্দে রচিত। ছন্দের মধ্যে স্থানে স্থানে কবির অক্ষমতা পরিস্ফুট। কাহিনী-অংশেও স্বদেশপ্রীতি ও জাতীয় গৌরব চিত্রিত হইলেও ঐতিহাসিক অংশ একেবারেই ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। তাই কাব্যটিকে সার্থক বলা চলে না। আখ্যায়িকা-কাব্য হিসাবে ইহার রচনাভঙ্গিতে এবং চরিত্র-চিত্রণের দিকে একটি নূতন প্রয়াস দৃষ্ট হয়।

বঙ্গের বীরপুত্র—যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ 'বঙ্গের বীরপুত্র' নামক কাব্যটি প্রণয়ন করেন এবং ইহা ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত হয়। প্রতাপাদিত্যের কাহিনীকে অবলম্বন করিয়া একটি মহাকাব্য রচনা করিবার বাসনা কবির ছিল। তিনি প্রথম খণ্ডে মোগল সম্রাটের বিরুদ্ধে প্রতাপাদিত্যের সমরায়োজন পর্য্যন্ত সন্নিবেশিত করিয়াছেন। কিন্তু পরে দ্বিতীয় খণ্ড আর প্রকাশিত হয় নাই। এই কাব্য রচনা সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছিলেন—

"কিন্তু কিছুদিন অতীত হইল মহারাজ বসন্তরায়ের প্রধান মন্ত্রী মৃত মহাত্মা রামরূপ বসু প্রণীত একখানি হস্তলিখিত অতি পুরাতন গ্রন্থ আমার হস্তগত হয়। উহাতে মহারাজ প্রতাপাদিত্যের জীবন বৃত্তান্ত সম্বন্ধে অনেক নূতন বিষয় আছে দেখিয়া আমার কনিষ্ঠ সহোদর শ্রীমান দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ ঐ পুস্তক অবলম্বন পূর্ব্বক মহারাজ প্রতাপাদিত্যের জীবন বৃত্তান্ত লিখিতে আমাকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করেন, তাহাতেই আমি গুরুতর কার্য্যে প্রবৃত্ত হই।"

কাব্যের প্রারম্ভে কবি কল্পনাদেবীর বন্দনা করিয়াছেন—

কবিতা কাননে সতি! তুমি অধীশ্বরী,

মুহূর্ত্তে নূতন সৃষ্টি তোমার সুন্দরি!

লতা গুল্ম বৃক্ষচয়,

তব গুণে কথা কয়,

বানরে সঙ্গীত গায় বাজায় বাঁশরী,

প্রাচীনা যুবতী হয়; কুরূপা সুন্দরী।

... ...

তোমার প্রণয়ে সতি! মজেছে যে জন,
সে জানে তোমার রূপ মাধুরী কেমন,
কেমনেতে ধীরে ধীরে,
প্রণয় বারিধি নীরে,
মগন করিয়া কর চিত্ত প্রসাদন,
সন্তোষ দায়িনী তুমি মনের জীবন। —(৩-৫ পৃঃ)

এই বন্দনার মধ্যে বেশ নূতনত্ব আছে। ইহার পূর্ব্বে কবিগণ দেবদেবীর বন্দনা গাহিয়াছেন, কৃপাভিক্ষা করিয়াছেন কিন্তু কল্পনাদেবীর সহিত প্রণয়াবদ্ধ হইবার কথা ভাবিতে পারেন নাই। ইহা রবীন্দ্রকাব্যের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

কাহিনীর আরম্ভেও অভিনবত্ব দৃষ্ট হয়। কল্পনাদেবীর সহিত কবি ভারতের নানাস্থানে যখন ভ্রমণ করিতেছিলেন সেই সময় সুন্দরবনে ধূমঘাটের ভগ্নপ্রাসাদ তাঁহাকে প্রতাপাদিত্যের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়—

এই সেই ধূমঘাট রাজনিকেতন,
হেরিয়া কাঁদেরে প্রাণ মানে না বারণ! —(২৪ পৃঃ)

বাংলার শেষ হিন্দুরাজা প্রতাপাদিত্যের বীরত্বের কাহিনী কবির মনে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। কবি প্রতাপাদিত্যের পিতা বিক্রমাদিত্য ও খুল্লতাত বসন্তরায়ের ধনসম্পদ্ ও রাজ্যপ্রাপ্তির ঘটনা উল্লেখ করিয়া পুত্রেষ্টি যজ্ঞ দ্বারা প্রতাপাদিত্যকে লাভ করিবার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। এই কাব্যে শিশুকাল হইতে প্রতাপাদিত্যের জীবনের ঘটনাবলী বর্ণিত হইয়াছে। শৈশব হইতেই তিনি উগ্রতেজা, নির্ভীক ও কর্ম্মতৎপর ছিলেন। চারঘাটার হরি সুঁড়ি তাঁহাকে উপযুক্ত সম্মান্ প্রদর্শন না করাতে তিনি হরি সুঁড়ির পরিবারবর্গের প্রতি দুর্ব্যবহার করেন। ইহা শুনিয়া তাঁহার পিতা বিক্রমাদিত্য ভীত হইয়া পড়েন। দৈবজ্ঞের কথাও তাঁহার স্মরণপথে উদিত হয়। তিনি বসন্তরায়কে ডাকিয়া পুত্র-সম্বন্ধে কহিলেন—

এই বেলা কুলাঙ্গারে করহ নিধন। —(৪০ পৃঃ)

কিন্তু বসন্তরায় প্রতাপাদিত্যকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। তিনি রাজাকে সান্ত্বনা দিয়া কহিলেন—

না গণিয়া পরমাদ, কর তারে আশীর্ব্বাদ,
রাজ চক্রবর্ত্তী হোক পৃথ্বী বসুধায়। —(৪১ পৃঃ)

ইহার মধ্যে বসন্তরায়ের চরিত্রের স্নেহশীল দিকটি যেমন ফুটিয়া উঠে প্রতাপাদিত্যের চরিত্রেরও সেইরূপ শৌর্য-বীর্য্য-দয়া-দাক্ষিণ্যের পরিচয় মেলে। তিনি অন্যায় কখনও সহ্য করেন নাই। অন্যায়কারী কখনও বিনাশাস্তিতে তাঁহার নিকট হইতে রেহাই পায় নাই। এ-ক্ষেত্রে তিনি আত্মীয়-পরিজন, শত্রুমিত্র বলিয়া কোনরূপ চিন্তা করেন নাই। তাই তাঁহার চরিত্রকে অনেক সময়ে নির্ম্মম ও হৃদয়হীন বলিয়া মনে হয়। কিন্তু এরূপ তেজস্বিতা ও নিষ্ঠা না থাকিলে সে সময়ে তিনি বাংলাদেশকে গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিতেন না। অন্যায়কারীর প্রতি কঠোর দণ্ড বিধান তাঁহাকে যেমন কাঠিন্য দান করিয়া অনেক দুঃসাহসিক কার্য্যে সাফল্য আনিয়া দিয়াছিল সেরূপ শিশুকাল হইতে পিতার আশঙ্কা ও খুল্লতাতের স্নেহ তাঁহার মনে একটা সন্দেহের সঞ্চার করিয়াছিল। পরবর্ত্তী জীবনেও তাই দেখা যায় তিনি কোনদিন কাহাকেও বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। আত্মশক্তি ও আত্মবিশ্বাস ছাড়া পৃথিবীতে কেহই তাঁহার আপন হইয়া উঠিতে পারেন নাই। তাঁহার চরিত্রের এই বিশ্বাসহীনতা তাঁহার অনেক ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করিয়াছে। তিনি উন্নতির শিখরে যতখানি উঠিতে পারিতেন তাহা ব্যাহত হইয়াছে।

বসন্তরায়ের সহিত পরামর্শ করিয়া বিক্রমাদিত্য তাঁহাকে দিল্লীর সভায় প্রেরণ করিলে তিনি ভাবিলেন পিতৃব্য রাজ্য ভোগ করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহাকে দূরদেশে প্রেরণ করিতেছেন। ভবিষ্যতে ইহার প্রতিশোধ লইবার সঙ্কল্প তিনি গ্রহণ করিলেন। বিহিত উপায় করিবার জন্যই তিনি পিতা ও পিতৃব্য কর্ত্তৃক প্রেরিত কর সম্রাট্ দরবারে না দিয়া তাঁহাদের নামে নালিশ করিয়া সমস্ত রাজ্য নিজ নামে লিখাইয়া লন। কিন্তু প্রতাপাদিত্য ক্রোধের মাথায় যাহাই করুন না কেন, তিনি ঠিক হৃদয়হীন ছিলেন না। প্রতাপাদিত্য সৈন্যসামন্ত লইয়া পিতার রাজকোষ অবরুদ্ধ করিলে বিক্রমাদিত্য ও বসন্তরায় যখন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন, তখন তাঁহার মন পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল, তিনি—

করিলেন প্রণিপাত,
কুমারের অকস্মাৎ
ফিরিল মনের গতি, সিক্ত নেত্রজলে। —(৪৮ পৃঃ)

নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া তিনি উভয়ের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন,

এবং তারপর পূর্ব্বের ন্যায়ই রাজকার্য্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন। পিতার মৃত্যুর পর বসন্তরায় অনেক অর্থব্যয় করিয়া তাঁহাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করেন।

জামাতা রামচন্দ্রকে বধ করিবার অভিপ্রায়ে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিবার ব্যাপারটি রহস্যজনক। জামাতা পলায়ন করিলে পর প্রভাতে তিনি কন্যাকে কহিলেন—

রামচন্দ্র করিলেন কেন পলায়ন
কেমনে জেনেছে তার বধিব জীবন,
কে রটায়ে হেন কথা,
দিল তার মনে ব্যথা,
কিসে বা করিল ইথে বিশ্বাস স্থাপন,
ভেবেছে কি এত নীচাসক্ত মম মন॥ —(৭৯ পৃঃ)

রাজনীতি-ক্ষেত্রে জামাতাকে বধ করা তাঁহার মত চরিত্রের ব্যক্তির পক্ষে অসম্ভব নয়। তবে তাঁহার জামাতাকে বধ করার উদ্দেশ্য ছিল কি না—তাহা সঠিকভাবে কেহই বলিতে পারেন না। কিন্তু খুল্লতাত বসন্তরায়কে হত্যা সত্যই পীড়াদায়ক। স্নেহশীল বৃদ্ধ তাঁহাকে অনেক বিপদ্ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। শিশুকালে মাতৃহারা বালককে তিনি মানুষ করিয়াছিলেন—অবশেষে ভাগ্যের বিড়ম্বনায় সেই পুত্রতুল্য প্রতাপাদিত্যের অস্ত্রাঘাতে তাঁহার মৃত্যু এবং তাঁহার পুত্র ও পুত্রবধূর মৃত্যু সত্যই মর্ম্মান্তিক। অবশ্য এই হত্যার পশ্চাতে একটা ভুল বোঝার ব্যাপার ছিল। কবি দেখাইয়াছেন এই ভ্রান্তিবশতঃই আত্মরক্ষা করিবার জন্য প্রতাপাদিত্য বসন্তর'য়কে হত্যা করেন। কিন্তু ঐ কার্য্য করিয়া তাঁহার মনেও অনুশোচনা আসিয়াছিল। বসন্তরায়ের স্ত্রী যখন তাঁহাকে কহিলেন—

কারে পরাজয় আজ করিয়াছ রণে?
কাহারে বধেছ ভীম বাহু আস্ফালনে? —(৯০ পৃঃ)

তখন প্রতাপ তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া উত্তর দিয়াছিলেন—

স্বপ্নে যাহা ভাবি নাই,
ঘটনা হইল তাই,
যার স্নেহনীর পানে ধরেছি জীবন,
আজ কিনা করি তারে স্বকরে নিধন? —(৯৪ পৃঃ)

তারপর বসন্তরায়ের পত্নী সহমৃতা হইলে প্রতাপাদিত্য শোকাভিভূত হইয়া পড়েন।

সহমৃতা হইল রাণী
না শুনি কাহারো বাণী
প্রতাপাদিত্য শোকে হইল কাতর,
ফিরিলেন নিজালয়ে হইয়া সত্বর। —(৯৫ পৃঃ)

ইচ্ছা খাঁর সহিত যুদ্ধে প্রতাপাদিত্যের বীরত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। যুদ্ধের বর্ণনায় নবীন সেনের প্রভাব দৃষ্ট হয়।

আবার কামান ধ্বনি গর্জ্জিয়া উঠিল,
কাঁপাইল ধরাতল,
কাঁপিল নদীর জল,
প্রতিরবে দিগঙ্গনা দ্বিগুণ গর্জ্জিল। —(১০৭ পৃঃ)

যুদ্ধে ইচ্ছা খাঁর মৃত্যু হইলে প্রতাপাদিত্যের জয় ঘোষণায় চারিদিক্ মুখরিত হইয়া উঠিল—

জয় কালী, জয় কালী বাজিল বাজনা,
হিজলীর সৈন্যগণ,
ভয়ে ভঙ্গ দিল রণ,
করিল প্রতাপাদিত্য বিজয় ঘোষণা। —(১২০ পৃঃ)

এ স্থলে একটি যুবকের দ্বারা যে সঙ্গীতটি গীত হইয়াছে তাহা হেমচন্দ্রের 'ভারতসঙ্গীত'-এর কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

স্বপ্নে একদিন প্রতাপাদিত্য ভারতের রাজলক্ষ্মীর সাক্ষাৎ পাইলেন এবং প্রতিজ্ঞা করিলেন—

পশ্চিমে ভাস্কর উদয় সম্ভব,
তথাচ অটল আমার বাণী,
প্রতিজ্ঞা আমার শত্রুশির তব,
নিশ্চয় ছেদিব এ অসি হানি। —(১৪১ পৃঃ)

ইহার পর প্রতাপাদিত্য মোগল সম্রাটের সহিত যুদ্ধ করিবার সঙ্কল্প গ্রহণ করেন। মন্ত্রী ঐরূপ সঙ্কল্পে বাধা দিবার চেষ্টা করিলে প্রতাপাদিত্য তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—

মন্ত্রিবর, পৃথিবীতে সুখের জননী,
চির রুচি স্বাধীনতা স্বর্গীয় রতন ;
তুচ্ছ কোটী কোহিনূর সূর্য্যকান্ত মণি,
বিনিময়ে সমতুল্য কি আছে এমন !
ধনের মধ্যেতে সার অমূল্য জীবন,
কোটি প্রাণ বিনিময়ে মিলে কি সে ধন ?

এ-সকল বর্ণনার মধ্যে ও ঘটনা-সংঘাতের মধ্যে প্রতাপাদিত্য-চরিত্রের গাম্ভীর্য্য, বীরত্ব, তেজস্বিতা, স্বদেশপ্রীতি প্রভৃতি সুন্দরভাবে চিত্রিত হইয়াছে। ঐতিহাসিক প্রতাপাদিত্যের চরিত্র ইহার মধ্যে কোথাও ক্ষুণ্ণ হয় নাই।

পার্শ্বচরিত্র-হিসাবে বসন্তরায়ের স্নেহশীলতার চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। বলবন্তসিংহের কৌশল এবং ইচ্ছা খাঁর বীরত্বও চিত্রিত হইয়া কাব্যটিকে মাধুর্য্য দান করিয়াছে। ইহাতে দেখা যায়, ইচ্ছা খাঁর সেনাপতি একদিন পরামর্শ আছে বলিয়া নিভৃতে ডাকিয়া প্রতাপাদিত্যকে গলায় পেশকবস্ত্র দিয়া পুত্রগণকে তাঁহার নিকট অর্পণ করিবার জন্য প্রতিজ্ঞা করাইয়াছিলেন।

কাব্যটিতে প্রত্যেক সর্গের পর এক-একটি গান দিয়া বৈচিত্র্য আনিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। কবি কাব্যের সর্ব্বত্রই সুযোগ-মত স্বাধীনতা, পরাধীনতার কথা, দেশের অবনতির কারণ এবং উন্নতির পথ নির্দ্দেশ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

কল্পনাদেবীকে সম্বোধন করিয়া কবি বলিতেছেন—

সভ্যতা, সমর-বিদ্যা, সমাজ-বন্ধনে,
ছিল যেই জাতি শ্রেষ্ঠ বিশ্ব নিকেতনে,
সাহস সুহৃদ যার,
একতা গলার হার,
না ছিল কি সেই জাতি জীবিত জীবনে
ভারতের অধীনতা গ্রাসিল যখনে! —(৯ পৃঃ)

বাংলাদেশ-সম্বন্ধে কহিতেছেন—

ভারতের প্রিয়কন্যা বাঙ্গলা সুন্দরী
বিলাসে বিহ্বলা চারু বেশভূষা পরি,

সত্য কি নর্ত্তকী প্রায়
সেজে থাকে সদা হায়,
বিনায়ে চিকণ বেণী বাঁধিয়া কবরী,
কে নিল স্বাধীন চারু মনোবৃত্তি হরি। —(১৭ পৃঃ)

প্রকৃতির বর্ণনায়ও নূতনত্ব দেখা যায়। সুন্দরবনের বর্ণনা—

নিবিড় বিপিনে যেন মেদিনী ঘুমায়,
মনোহর সুকোমল শ্যাম গালিচায়,
ঘুমায় বিজন বন,
অচেতন বৃক্ষগণ,
বাড়াইতে ঘুম যেন সুমধুর গায়,
আনন্দে বসিয়া পাখী আপন কুলায়। —(২১ পৃঃ)

শ্বশুরালয় হইতে রামচন্দ্রের পলায়নের রাত্রির বর্ণনা—

নীরব নিখিল ধরা, গভীর নিশায়,
প্রকৃতি শান্তির কোলে মগন নিদ্রায়,
কেবল গগন ভালে
ছাইয়া চন্দ্রিকাজালে,
জাগেন রজনীনাথ নক্ষত্র সভায়,
স্থিরভাবে যেন ঘোর মগ্ন কি চিন্তায়। —(৫৮ পৃঃ)

ইহা অত্যন্ত ভাবব্যঞ্জনাময়। রাত্রি নীরব ও শান্তিময়, কিন্তু তবুও নিশানাথের ভিতর চিন্তার আবেশ একটি উত্তেজক ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করিতেছে।

কাব্যটিতে সাতটি সর্গ আছে। ছয় পঙ্‌ক্তির পয়ার, চৌপদী, অষ্টপদী, ত্রিপদী প্রভৃতি ছন্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। ভাষা ও ছন্দ জড়তামুক্ত, ঝরঝরে, সাবলীল। বর্ণনায় গতি আছে, প্রাণ আছে, উচ্ছ্বাস আছে। সহজ তালে অনায়াসে কাব্যটি অগ্রসর হইয়াছে। এক কথায় বলা চলে,—কাব্যটি সুখপাঠ্য। কাব্যটির মধ্যে স্থানে স্থানে একটা ব্যঞ্জনার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। আখ্যায়িকা-কাব্যের ক্ষেত্রে ইহার কিছুটা যে সার্থকতা রহিয়াছে তাহা অনস্বীকার্য্য।

শিবজী পর্ব্ব—দুর্গাচরণ সান্যাল রচিত 'মহামোগল-কাব্য'টির দ্বিতীয় খণ্ড 'শিবজী পর্ব্ব' নামে ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

এই খণ্ডে শিশুকাল হইতে সিংহাসনে অধিরোহণ পর্য্যন্ত শিবাজীর জীবনের

বিচিত্র ঘটনাবলী, সাহস, বীরত্ব ও নিষ্ঠা বর্ণিত হইয়াছে। প্রথমে শিবাজীর দেশ মহারাষ্ট্রের সহিত পাঠককে পরিচিত করিবার জন্য কবি বর্ণনা করিয়াছেন—

সর্ব্বাঙ্গ বন্ধুর, দুর্গম প্রচুর,
সমীর মধুর সে গিরিবরে।
জঙ্গলে বেষ্টিত, দুর্গ অগণিত,
আছে প্রতিষ্ঠিত প্রতি শিখরে॥ —(২ পৃঃ)

তারপর শিবাজীর দেশবাসীর আচার নিয়ম, দোষগুণ প্রভৃতি বর্ণনা করিয়া একটি পটভূমিকা স্বষ্টির চেষ্টা দেখা যায়। মহারাষ্ট্রবাসিগণ নির্ভীক, শৌর্য্যবীর্য্য-শালী ও দরিদ্র। অর্থের নিমিত্ত তাহারা মৃত্যুকে বরণ করিতেও দ্বিধা করিত না। কিন্তু অর্থ বৃথা কাজে ব্যয় করিত না। একমাত্র ব্রাহ্মণগণ লেখাপড়া শিখিতেন। অপর শ্রেণীভুক্ত লোকেরা অস্ত্র-শস্ত্র চালনা শিখিত এবং লুণ্ঠনে ও যুদ্ধে অগ্রণী ছিল। তাহারা ক্রমে নিজেদের মধ্যে একতা হারাইয়া ফেলিয়াছিল এবং পরের দাসত্ব স্বীকার করিয়া চাকুরী করিত ও প্রভুভক্ত ছিল। তাহারা কোন বিষয়েই নিজেরা চিন্তা করিত না—ধর্ম্ম বলিয়া যে যাহা চালাইত তাহাই মানিয়া লইত। এই রকম দেশের অবস্থায় শিবাজী তাঁহার অপ্রমিত পৌরুষ লইয়া আসিয়া তাহাদের সঙ্ঘবদ্ধ শক্তিকে দেশ উদ্ধারের কার্য্যে নিয়োজিত করিলেন। ইহাতে শিবাজীর বংশের ঐতিহাসিক দিক্ও কাব্যে বর্ণিত হইয়াছে এবং সে সময়ের রাষ্ট্রগত বৈশিষ্ট্য ও শাসন-প্রণালী কবি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই-সকল বর্ণনা দ্বারা যে পটভূমিকার স্বষ্টি হইয়াছে শিবাজীর জীবনালেখ্য তাহাতে উজ্জ্বলভাবে প্রতিভাত হইবার স্বযোগ পাইয়াছে। রমেশ-চন্দ্র দত্ত প্রণীত 'মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাতে' বর্ণিত তথ্যগুলির সহিত সামঞ্জস্য লক্ষিত হয়।

শিবাজীর বাল্যকালের শিক্ষা, দুরন্ত প্রকৃতি ও কর্ম্মনিষ্ঠার নানাবিধ ঘটনা চিত্রিত করিয়া কবি শিবাজীর পরবর্ত্তী জীবনের সাহসদৃপ্ত তেজস্বিতা ও কর্ম্ম-পটুতা এবং স্বদেশনিষ্ঠার দৃঢ়তার সন্ধান দিয়াছেন। লেখাপড়ায় তাঁহার কোন দিনই মন ছিল না। দাদাজী রামদাস স্বামী ও আত্মারাম স্বামী তাই তাঁহাকে মুখে মুখে কবিতার আকারে রামায়ণ ও মহাভারতের নানাবিধ কাহিনী মুখস্থ করাইয়াছিলেন এবং পরবর্ত্তী জীবনে এই শিক্ষা তাঁহাকে অনেক সাহায্য করিয়াছিল।

শিবাজী শিশুকাল হইতেই আত্মনির্ভরশীল। শিশুকালে একদিন একটি পুষ্প লইবার জন্য তিনি প্রাণান্ত চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য্য হন। আত্মারাম স্বামী তাঁহার ঐ চেষ্টা দেখিয়া তাঁহার ভবিষ্যৎ-সম্বন্ধে যে উক্তি করিয়াছিলেন তাহা সত্য হইয়াছিল এবং ভবিষ্যতে শিবাজী ভারতের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন।

রামায়ণে কপিসেনাগণ লইয়া রামচন্দ্র-কর্তৃক লঙ্কাবিজয়ের কাহিনী শুনিয়া শিবাজীর মনে একটি সৈন্যদল গঠন করিবার বাসনা জাগে এবং সকলের অলক্ষ্যে মাওলী-নামক পার্ব্বত্য জাতিকে লইয়া তিনি সৈন্যদল গড়িতে লাগিলেন। সেই মাওলী দলকে লইয়া তিনি মৃগয়া ও যুদ্ধ করিতেন।

তাঁহার দৌরাত্ম্যে অতিষ্ঠ হইয়া দাদাজী তাঁহাকে বিজাপুরে চাকুরী গ্রহণ করিতে উপদেশ দিলে শিবাজী তাঁহার পদধূলি লইয়া দৃঢ়তার সহিত উত্তর দিয়াছিলেন—

> নিশ্চয় প্রতিজ্ঞা মম না হবে খণ্ডন।
> এ জীবনে না করিব যবন সেবন॥
> বরঞ্চ বিনাশ করি যবন সকল।
> পুনশ্চ হিন্দুর নাম করিব উজ্জ্বল॥ —(৩৩ পৃঃ)

শাহজী পুত্রের দৌরাত্ম্যের কথা শুনিয়া পত্র লিখিলে শিবাজী পত্র পাঠ করিয়া উৎসাহিত হইয়া দাদাজী ও জীজাবাইকে কহিলেন যে পিতা তাঁহার কার্য্য অনুমোদন করিয়াছেন, শুধু কার্য্যটি শক্ত বলিয়া তাঁহার ভাবনা—তবে শিবাজী কার্য্য দ্বারা শীঘ্রই তাঁহার ভাবনা দূর করিবেন।

তাঁহার প্রতিজ্ঞা অটল রহিল। তিনি কাহাকেও অমান্য করেন নাই—নিজে যাহা শুভ ও কল্যাণকর বুঝিয়াছেন সেই দুঃসাহসের পথে উদ্দেশ্য স্থির রাখিয়া সব বাধা-নিষেধ তুচ্ছ করিয়া অমোঘ তেজে অগ্রসর হইয়াছেন।

শিবাজী অতিশয় কৌশলী ছিলেন। তাঁহার গাজী খাঁকে হত্যা, মোগলের সাহায্য প্রার্থনা করিয়া আদিলশাহকে বিপর্য্যস্ত করা, বাজী রাওকে হত্যা ও আদিলশাহের সহিত যুদ্ধ করিয়া সন্ধিস্থাপন প্রভৃতি কার্য্যের মধ্যে তাঁহার যে কর্ম্মতৎপরতা, সাহস, বুদ্ধি ও কৌশল প্রকাশিত হইয়াছে তাহা সত্যই প্রশংসা-যোগ্য। তাঁহার অপরাজিত ব্যক্তিত্ব ছিল বলিয়াই তিনি একটি মুমূর্ষু জাতির শক্তি সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া পাঠান ও মোগল শক্তির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া স্বদেশকে গৌরবান্বিত করিতে পারিয়াছিলেন।

মাতপিতার প্রতি তাঁহার ভক্তিও প্রশংসাযোগ্য। পিতা তাঁহার শিশু-কাল হইতে দূরে থাকিতেন এবং সব সময় কর্ত্তব্যও করিতেন না কিন্তু তিনি যখন সন্ধির প্রস্তাব লইয়া শিবাজীর নিকট আসিয়াছিলেন শিবাজী তাঁহাকে যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার প্রত্যাবর্ত্তনকালে তাঁহাকে কহিয়াছিলেন—

করুন আপনি এবে রাজত্ব গ্রহণ,
সেবিয়া চরণ তব অবশিষ্ট কাল,
শাস্ত্রমতে পিতৃসেবা সর্ব্বধর্ম্ম সার,
করি আমি আজ্ঞাধীন সার্থক জীবন। —(১২৩ পৃঃ)

পিতার মৃত্যুর পর তিনি পিতার যথাযোগ্য সংকার করিয়াছিলেন এবং তারপর রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। ইতিমধ্যে মোগলের বিরুদ্ধাচরণ করায় শায়েস্তা খাঁ ও মহাবৎ খাঁ প্রেরিত হইলে তিনি শায়েস্তা খাঁর দুইটি আঙ্গুল কর্ত্তিত করেন এবং যুদ্ধে মহাবৎ খাঁ ও দিলির খাঁকে পরাজিত করিয়া বধ করেন।

কাব্যে শিবাজীর ঐতিহাসিক চরিত্রকে কোথাও ক্ষুণ্ণ করা হয় নাই। অন্যান্য ঐতিহাসিক চরিত্রগুলিও যথাযথভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ঘটনা-বিন্যাসও সুন্দর। তবে কাব্যটি বর্ণনাত্মক হওয়ায় কোথাও জমিয়া ওঠে নাই এবং গতির অভাব অনুভূত হয়। তাহাতে কাব্যরস ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। ইহাতে পয়ার, ত্রিপদী, অমিত্রাক্ষর প্রভৃতি ছন্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

স্থানে স্থানে নামধাতুর প্রয়োগে ক্রিয়াপদের ব্যবহারও দেখা যায়; যেমন—নাশিলা, মন্দিয়া, একত্রিয়া, হিংসিতে প্রভৃতি।

কোথাও কোথাও সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার লক্ষণীয়; যেমন—

কিং কর্ত্তব্যং ভাবি দ্বিজ পড়িল সংকটে —(৭ পৃঃ)

বা, গ্রাহ্য করি মৎ প্রার্থনা বালকে কর মার্জ্জনা। —(৪৪ পৃঃ)

অথবা, কেবল ভেতব্য অরি —(১২৬ পৃঃ)।

আৎ প্রত্যয় যোগে পঞ্চমী বিভক্তির ব্যবহারও দ্রষ্টব্য; যেমন—

স্বস্থানাৎ অত্যন্ত দূরে (—৭৮ পৃঃ)

বা, দিগদেশাৎ নিমন্ত্রিত পণ্ডিত মণ্ডলী। —(১৩৭ পৃঃ)

বা, পূর্ব্বকৃত পাপাৎ মুক্ত হৈল শাহসুত, (পৃঃ ১৩৮)।

স্থানে স্থানে নূতন শব্দের প্রয়োগও দেখা যায় ; যেমন—

তাহার নিকট দরী কি ঘর্ঘট,
নির্ণয় দুর্ঘট, বিদেশী জনে ॥ —(১ পৃঃ)

বা, ক্রমে সেই বাল্য লীলা হৈল বিজৃম্ভিত। —২৫ পৃঃ)

অথবা, উদ্ধত প্রমাথী বীর একান্ত অভীত। —(৮৯ পৃঃ)

বা, দূঢ়ীভূত ঔরংজীব অভ্যাকৃষ্ট পদে। —(১৩০ পৃঃ)

তবে যাবনিক শব্দ ব্যবহৃত না হওয়াতে প্রথম খণ্ড অপেক্ষা ইহা অনেক সহজ ও সরল। কাহিনী-বিন্যাস এব' রচনাভঙ্গিও পূর্ব্ব খণ্ড হইতে উন্নততর। তথাপি কাব্যটিকে সার্থক বলা চলে না। ইহার ছন্দের মধ্যে অনেক ত্রুটি লক্ষিত হয়, গতিও আড়ষ্ট এবং কাহিনী-অংশও বিবৃতিমাত্র।

যামিনী-প্রভাত—ধীরেন্দ্রনাথ পাল 'যামিনী-প্রভাত'-নামক কাব্যটি রচনা করেন। ইহা ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। প্রকাশক গ্রন্থের প্রারম্ভে 'দুই একটি কথা' শিরোনামায় লিখিয়াছেন—

"এই গ্রন্থে মহাবীর মহারাষ্ট্র অধিপতি শিবজীর জীবনের দুই দিবসের ঘটনামাত্র লিখিত হইল। ঘটনা সত্য নহে, তবে বিবেচনা করিয়া দেখিলে মিথ্যাও নহে।

"শিবজীর সাময়িক কোন বিশেষ ঐতিহাসিক ঘটনা ইহাতে গৃহীত হয় নাই। কেবল সেই মহাবীরের জীবনী পাঠ করিলে হৃদয়ে তাঁহার যে আকৃতি উদয় হয়, গ্রন্থকার সেই মূর্ত্তি চিত্রিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

"…শিবজী কর্তৃক ভারত উদ্ধার ভারতের দুঃখের যামিনী প্রভাতেই এই ক্ষুদ্র 'যামিনী-প্রভাত' শেষ হইয়াছে।

"…উপসংহারে বক্তব্য যে, এই ক্ষুদ্র কাব্য একটি সপ্তদশবর্ষ বয়স্ক যুবকের রচিত, মন্দ হইলে অন্ততঃ বালক বলিয়া পাঠকগণ ক্ষমা করিবেন।"

কাব্যের প্রথমেই তিমির রাত্রির বর্ণনা দিয়া কবি ভারতবর্ষের দুঃখের রাত্রির চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন—

নিশার ভীষণ শান্তি গম্ভীরে ভেদিয়া,
উঠিতেছে বারিধির গভীর নিনাদ,
গম্ভীরে ভারতমাতা কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
কাঁদাইছে এ জগতে করিয়া বিষাদ। —(২ পৃঃ)

ঐরূপ ঘোর অন্ধকার রাত্রে শিবাজী তাঁহার অনুচরবর্গের সহিত ভবানী মন্দিরের অদূরে দাঁড়াইয়া চতুর্দ্দিক্ লক্ষ্য করিতেছিলেন। তাঁহার মনে হইল, মা ভবানী শিশুরক্ত চাহিতেছেন এবং তাহাতেই দেশের মঙ্গল হইবে বলিতেছেন। তিনি নিজের ভ্রম মনে করিয়া ঠিকভাবে দেখিবার চেষ্টা করিলে—

সভয়ে চমকি বীর দেখিলা ধরায়,
উঠিতেছে অট্টহাস্য কম্পিয়া গগন,
হাসিতেছে খল খল পিশাচী-নিচয়,
শাকিনী, পেতিনী, দৈত্য বিকট বদন !
লোল জটা, কেশপাশ, বিকট দশন,
চিবাইছে নর অস্থি নাচিয়ে নাচিয়ে ;
অট্ট হাস্য খল খল রাঙ্গা ত্রিনয়ন ;
পড়িছে রুধির গণ্ড শৃক্কণী বহিয়া। —(৪ পৃঃ)

তিনি তাঁহার সমস্ত সচেতনতা ও ব্যক্তিত্ব সম্মিলিত করিয়া যখন ঐ অন্ধকারের জীবগণকে ভর্ৎসনা করিলেন তখন দেখিলেন—

নাহিক পিশাচীগণ, নাহি কিছু আর। —(৫ পৃঃ)

এই বর্ণনাগুলি যেমন ব্যঞ্জনাময় তেমনি প্রাণময়। কল্পনা ও বাস্তবতা একত্রে মিশিয়া কিছুটা রহস্য, কিছুটা প্রকাশ, কিছুটা আঁধার, কিছুটা আলোর সমাবেশ করিয়া কাব্যের প্রথমেই বেশ একটি কৌতূহলজনক পরিবেশের সৃষ্টি করিয়াছে।

শিবাজী সঙ্গীদিগের নিকট দেবীর আদেশ জানাইয়া একটি পুত্র বলি দিবার জন্য আহ্বান জানাইলে সকলেই নিরুত্তরে রহিল। তখন তিনি নিজ প্রাণ উৎসর্গ করিবার জন্য উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। এমন সময় অকস্মাৎ তাঁহার ভগ্নীপতি আসিয়া তাঁহাকে নিবৃত্ত করিয়া নিজ পুত্র বলি দিয়া নিজেও আত্মহত্যা করিলেন। সেই সময়ে বাহিরের প্রকৃতিতে যেন একটা পৈশাচিক আনন্দের ভয়ঙ্করতা দৃষ্ট হইল—

উঠিল তুমুল ঝড় নাচিল সাগর,
ভীষণ অশনি ধ্বনি গর্জ্জিল গগনে ;
চপলা চপলভাবে উজলি অম্বর
প্রকাশিল ভীম ভাব ভীষণ শ্মশানে।

চমকি মার্হাট্টাকুল দেখিলা সভয়ে,
খল খল হাসিতেছে পিশাচী নিচয় ঃ
লোল জিহ্বা লক্ লক্ নাচিয়ে নাচিয়ে,
হাসিতেছে অট্টহাস্য কাঁপায়ে ধরায়। —(১৭ পৃঃ)

স্বর্গে মা ভবানীর আসন টলিল। তিনি জয়ার নিকট কারণ জ্ঞাত হইলেন। শিবাজীর ভগ্নীর নিকট জয়াকে দিয়া তিনি ভবিষ্যদ্বাণী জানাইলেন যে শিবাজীর ভগ্নীর দ্বারাই মোগল পরাজিত হইবে। শিবাজীর ভগ্নী যখন উন্মত্তের ন্যায় ভবানীর হস্তের খড়্গ লইয়া আত্মহত্যার চেষ্টা করেন তখন জয়া তাঁহাকে নিবৃত্ত করিয়া দেবীর বাণী প্রচার করিলেন।

ঔরংজেবের সেনাপতি মহাবৎ খাঁ যখন মারহাট্টাগণকে দমন করিতে আসেন তখন একদিন রাত্রে মারহাট্টাগণ তাঁহার শিবির আক্রমণ করে কিন্তু অন্ধকারের মধ্যে সঠিক কিছু নির্ণয় করিতে না পারিয়া যখন তাহারা পলায়ন করিতেছিল তখন শিবাজীর ভগ্নী তরবারি-হস্তে পর্ব্বতের উপর হইতে সকলকে তিরস্কার করিয়া উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। পলায়নপর সৈনিকগণ দেখিল—

ভীমা মূর্ত্তি অশ্ব পরে, সকলি ভীষণ,
পড়িয়াছে মুক্ত কেশ তরঙ্গের ন্যায়,
ভীম বেশ, দেখি সেই উজ্জ্বল বদন,
সভয়ে দাঁড়ায়ে যেন তরঙ্গ নিচয়। —(৬২ পৃঃ)

তিনি সকলকে তিরস্কার করিয়া কহিলেন—

এত রে মরণে ভয়, রে রে কুলাঙ্গার,
কেমনে মার্হাট্টা সুত তোদের বলিব ?
ভাসাইয়া স্বাধীনতা ভারত মাতার
পলাইছ নরাধম কত রে সহিব ? —(৬৭ পৃঃ)

মারহাট্টা সৈন্যগণ আবার যুদ্ধে গেল। যেখানে মহাবৎ খাঁ যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া সুরাপানে মত্ত ছিলেন শিবাজী মৃতের ভান করিয়া সেখানে প্রবেশ করিয়া মহাবৎ খাঁকে যখন নিধন করেন তখন তাঁহার ভগ্নী সৈন্য-চালনার ভার লইয়া অপরাপর অনন্দোন্মত্ত সৈন্যগণকে নিধন করেন। মারহাট্টাগণ বিজয়ী হইল। শিবাজীর ভগ্নী ফিরিয়া আসিয়া ভবানীকে পূজা করিয়া অগ্নিতে প্রাণ আহুতি দিলেন।

কতকগুলি অমূল্য প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়া মারহাট্টাগণের দুঃখ-নিশার অবসান হইল।

পঞ্চম সর্গে মহাবৎ খাঁর শিবিরের আভ্যন্তরীণ কার্য্যকলাপ বর্ণনায় নবীনচন্দ্র সেন মহাশয়ের 'পলাশির যুদ্ধে'র প্রভাব দৃষ্ট হয়। ক্লাইভের সৈন্যগণ যেমন শিবিরে বসিয়া পত্নীপুত্র, মাতাপিতার কথা চিন্তা করিতেছিল এই সৈন্যগণও সেরূপ করিতেছিল—

কোথায় সুরার পাত্র ধরিয়া যুবক,
ভাবিতেছে প্রিয়সীর রূপের মাধুরী,
সেই প্রেমময় আঁখি, যাহার আলোক,
সদাই জ্বলিছে সেই হৃদয় উপরি। —(৪৭ পৃঃ)

পলাশির সৈনিকের অনুকরণে কবি এই সৈন্য দ্বারাও গান করাইয়াছেন—

প্রিয়সি আমার!
যে দিন দেখিনু তব সুচারু বদন,
সেই দিন হতে প্রিয়ে জ্বলিছে জীবন; —(৫১ পৃঃ)

ক্লাইভের ন্যায় এস্থলেও সেনাপতি মহাবৎ খাঁ চিন্তায় মগ্ন ছিলেন, এমন সময় সৈনিকের সঙ্গীত তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করে। ব্রিটন ঈশ্বরীর পরিবর্ত্তে এ কাব্যে রাজ্যলক্ষ্মীর দুই সহচরী আসিয়া অপূর্ব্ব বীণাবাদনে তাঁহাকে মোহিত করিয়াছিলেন এবং কহিলেন—

যে কারণে আসিয়াছি কহি হে যবন,
আসিতেছে সিংহী এক দমিতে তোমারে,
সাবধান সেনাপতি, হও সাবধান,
যেন হে যবন শশী না ডুবে সাগরে। —(৫৫ পৃঃ)

এই বাণীর মধ্যে ম্যাকবেথের ডাইনীর ভবিষ্যদ্বাণীর প্রভাব দৃষ্ট হয়।

সপ্তম সর্গে শিবাজীপুত্র প্রতাপের পত্নী ইন্দুমতীর সরলতা ও প্রেমবিহ্বলতা অঙ্কিত হইয়াছে। ইহা কাব্যকে অনেকখানি মাধুর্য্য দান করিয়াছে। ইন্দুমতী নিদ্রাভিভূত। কবি তাঁহার বর্ণনা করিয়াছেন—

শান্তিময় পুষ্প দেহ বিভোর নিদ্রায়। —(৭৪ পৃঃ)

প্রতাপ যুদ্ধস্থান হইতে ফিরিয়া আসিলে তাঁহার নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল এবং প্রতাপ যখন বলিলেন যুদ্ধে তাঁহাদের পরাজয় হইয়াছে এবং পুনরায়

যুদ্ধযাত্রার পূর্ব্বে তিনি পত্নীকে দেখিতে আসিয়াছেন, তখন ইন্দুমতী লজ্জিত হইয়া কহিলেন—

আমার ক্রন্দন তরে যাইবে ভারত,
ধিক্ ধিক্ শত ধিক্ আমার জীবনে ;
যাও নাথ যাও রণে দেখুগ জগত,
মর্হাট্টা রমণী মন সক্ষম দমনে। —(৮১ পৃঃ)

এই কাব্যে রণ-ক্ষেত্রের বর্ণনার মধ্যে নবীনচন্দ্র সেনের রঙ্গমতীর প্রভাব অনুভূত হয়।

আবার ভীষণ স্বরে ধ্বনিল অম্বরে,
জয় মা ভবানী, জয় ভারত কি জয়,
তাহা সহ মিশাইয়ে উঠিলো প্রান্তরে,
ভীষণ ক্রন্দন ধ্বনি কাঁপায়ে ধরায়। —(৯৩ পৃঃ)

কাব্যটি দশটি স্বর্গে সমাপ্ত। ইহাতে আট পঙ্ক্তির স্তবক কখ কখ গঘ গঘ রূপে মিল রাখিয়া রচিত হইয়াছে।

কাব্যের কাহিনীভাগ সবটুকুই কবির কল্পনাপ্রসূত। কিন্তু কবি যাহা প্রকাশ করিতে চাহিয়াছেন তাহাতে তিনি কৃতকার্য্য হইয়াছেন। কতকগুলি ঘটনার ভিতর দিয়া শিবাজীর চরিত্রের দৃঢ়তা, বীরত্ব, ও স্বদেশপ্রেম সুন্দর-ভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। ভবানীর প্রতি ভক্তিতে তিনি একদিকে নিজ প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে কুণ্ঠিত নহেন, অপরদিকে ভগ্নীপতি-কর্ত্তৃক পুত্র বলি দেওয়া হইলে তিনি শিহরিয়া উঠেন। মহাঁবৎ খাঁকে হত্যা করিবার দৃশ্যে তাঁহার কৌশল ব্যক্ত হইয়াছে। দুটি রমণী-চরিত্রও বেশ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। একজন তাঁহার ভগ্নী—দেশের নিমিত্ত পতিপুত্র হারাইয়া যবনের প্রতি প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবার জন্য প্রাণধারণ করিয়াছেন এবং স্বকার্য্য সিদ্ধ হইলে অনায়াসে প্রাণ-ত্যাগ করিয়াছেন। তিনি যেন শিবাজীর উপযুক্ত ভগ্নী। অপরজন শিবাজীর পুত্রবধূ ইন্দুমতী—প্রেমবিহ্বলা, স্বামীকে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠাইয়া কাঁদিয়া আকুল, আবার যুদ্ধজয়ের জন্য স্বামীকে যুদ্ধে পাঠাইতে ব্যাকুল। তাঁহার মানসিক দ্বন্দ্বের চিত্রটি সুন্দর দুই-চারিটি কথায় ব্যক্ত হইয়াছে। কাব্যে দেবদেবীর যে সমাবেশ করা হইয়াছে তাহা কোথাও মাত্রা ছাড়াইয়া যায় নাই। কাহিনীর সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া হিন্দু-সংস্কারের বিশ্বাসের উপযোগী করিয়া

দেবীর যেটুকু প্রকাশ দেখান হইয়াছে তাহা কোথাও কাব্যরসকে ব্যাহত করে নাই বরং কাব্যকে অনেকখানি সরস ও মধুর করিয়াছে। মানুষের ভাগ্যের পশ্চাতে যে অদৃশ্য শক্তি অলক্ষ্যে মানুষকে নিয়তির দিকে আকর্ষণ করিতেছে তাহারই আভাস ঐ দৃশ্য হইতে প্রতিভাত হয়।

এই কাব্যের উপর নবীনচন্দ্র সেনের প্রভাব সুস্পষ্ট। তথাপি অনুভূতি, আবেগ ও কল্পনাপ্রবণতায় এবং কাহিনী-বিন্যাসে কবি নিজ প্রতিভা প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। বর্ণনার মধ্যে অনেক স্থলে প্রকৃতিদেবীও প্রাণময়ী হইয়া উঠিয়াছেন এবং অনেক স্থলে ভবানীদেবী ও প্রকৃতিদেবী এক হইয়া মিশিয়াছেন। সর্ব্বশেষ কথা বলা চলে, কাব্যটির মধ্যে প্রাণসঞ্চার হইয়াছে এবং ভাষা বা ছন্দের মধ্যেও কোথাও জড়তা বা গতিহীনতা নাই—ইহা সুখপাঠ্য। সর্ব্বত্রই যেন একটা লিরিক মূর্চ্ছনা অনুভব করা যায়। আখ্যায়িকা-কাব্যের গতি যে ক্রমশঃ গীতিকাব্য-মুখী হইতেছে তাহারই সূচনা এই-সকল কাব্যে লক্ষণীয়।

ক্লিওপেট্রা—'ক্লিওপেট্রা' কাব্যটি কবি নবীনচন্দ্র সেন কর্ত্তৃক রচিত হইয়া ১২৮৪ সালে (১৮৭৭ খ্রীঃ অঃ) প্রকাশিত হয়। এই কাব্য রচনার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কবি 'একটি কথা' শিরোনামায় লিখিয়াছেন—

"অভাগিনী ক্লিওপেট্রা সংসারের ঘোরতর ঝটিকায়, তাহার বিশালতম তরঙ্গে ভাসিয়া গিয়াছিল বলিয়া কেনই বা পাপিনী হইল ?…ক্লিওপেট্রার প্রেম পুরোহিতের মন্ত্রে পবিত্রীকৃত হইয়াছিল না বলিয়া যদি তাহাকে ঘৃণা করিতে হয়, করিও; কিন্তু ক্লিওপেট্রা অবস্থার দাসী বলিয়া দয়া করিও, ক্লিওপেট্রা অভাগিনী বলিয়া দুঃখ করিও।…

"…আমি তাহার রূপে মোহিত, প্রেমে দ্রবিত, তাহার অসাধারণ মানসিক শক্তিতে চমৎকৃত, এবং তাহার হতভাগ্যে দুঃখিত হইয়াছিলাম। ভাবিয়া দেখিলাম ভারতীয় সাহিত্য ভাণ্ডারে এরূপ একটি রত্ন নাই। নাই বলিয়াই, সেই সমুদ্রতটে বসিয়া এই কবিতাটি লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম এবং সেই দ্বীপে অবস্থান-কালেই ইহা সমাপ্ত হইয়াছিল।"

ক্লিওপেট্রা কাব্যটিতে সিজার, এণ্টনি ও অগস্তাস সিজার প্রভৃতি ব্যক্তি-বর্গের কার্য্যাবলীর কোন কোন অংশ চিত্রিত হইলেও ইহার ভিতর ইতিহাস স্থান পায় নাই। রূপসীশ্রেষ্ঠা ক্লিওপেট্রার নানাবিধ মনোভাবের রহস্যদ্বার

কবি একের পর এক উদ্‌ঘাটন করিয়া কাব্যটিকে সরস ও মাধুর্য্যমণ্ডিত করিয়াছেন, ক্লিওপেট্রার প্রণয়ের বিভিন্ন দিক্ চিত্রিত করিয়া কাব্যটিকে মনোজ্ঞ করিয়া তুলিয়াছেন। সমস্ত কাব্যটি ক্লিওপেট্রার মুখ দিয়া বর্ণিত হওয়াতে স্থানে স্থানে গীতিকাব্যের উপযোগী উচ্ছ্বাস ও ভাবাবেগ লক্ষণীয়।

ক্লিওপেট্রার রূপের বর্ণনা কবি দেন নাই শুধু আভাস দিয়াছেন—

মিশর বিহনে এই আফ্রিকা যেমন
মরুভূমি, এই রূপ বিহনে তেমন—
কেবল মিশর নহে—এই বসুন্ধরা
বিস্তীর্ণ অরণ্যসম।··· —(৪ পৃঃ)

এই রূপসীশ্রেষ্ঠার জীবন বিষাদের মধ্যে আরম্ভ হইয়াছিল—পুনরায় বিষাদের মাঝেই নির্ব্বাণ লাভ করিল। মধ্যবর্ত্তী দিনগুলি কেবল বাসনা-কামনা-আকাঙ্ক্ষা, ভোগ-সুখ-আনন্দ, বিরহ-দুঃখ-বেদনা প্রভৃতির রঙে রঞ্জিত হইয়া অক্ষয় হইয়া রহিল। তিনি প্রণয় পাইয়াছেন, ঐশ্বর্য্য পাইয়াছেন, সম্মান পাইয়াছেন কিন্তু কোথাও স্থিতিলাভ করিতে পারেন নাই—সংসার-সমুদ্রের ঘটনা-স্রোত এক তীর হইতে অন্য তীরে তাঁহাকে লইয়া গিয়াছে—বিচিত্র পরিবেশের মধ্যে বিচিত্রতর অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া তাঁহার জীবনতরী ভাসিয়া চলিয়াছে।

ক্লিওপেট্রার পিতা টলেমি লঘু আমোদে মত্ত থাকিতেন বলিয়া প্রজাগণ দ্বারা বিতাড়িত হন এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা সিংহাসনে আরোহণ করে। সেই জেষ্ঠা কন্যা স্বামীকে হত্যা করিয়াছিল—কিন্তু তাহার ভাগ্যেও সুখ সহিল না। পিতা জ্যেষ্ঠা কন্যাকে হত্যা করিয়া পুনরায় সিংহাসন অধিকার করেন। মৃত্যু-সময়ে পিতা ক্লিওপেট্রাকে তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা দশ বৎসরের বালকের সহিত বিবাহ দেন এবং এক ক্লীব মন্ত্রী তাহাদের অভিভাবক নিযুক্ত হয়। কিন্তু সেই মন্ত্রী এত বড় সুযোগ ছাড়িল না। ক্লিওপেট্রা-সহ তাহার ভ্রাতাকে বনবাসে পাঠাইয়া নিজে রাজা হইয়া বসিল। ক্লিওপেট্রার বাল্যকাল এক দুঃস্বপ্নের ভিতর দিয়া অতিবাহিত হয়। আফ্রিকার মরুভূমির ন্যায়ই তাহা যেন শুষ্ক ও নীরস হইয়া গিয়াছিল। সেই দিনগুলির কথা ক্লিওপেট্রা বর্ণনা করিয়াছেন—

······অনন্ত বালুকাময়ী
প্রাচী মরুভূমি—পান্থহীন বারিহীন,
পদতলে প্রজ্বলিত বালুকা অনল ;

তৃষ্ণাগ্নি হৃদয়ে, শিরে উল্‌কা রাশি রাশি
শত্রু শস্ত্র বিনির্গত, হতেছে বর্ষণ। —(৯ পৃঃ)

রোম সেনাপতি এণ্টনিকে দেখিয়া তাঁহার হৃদয়ে প্রথম প্রেমের উন্মেষ হয়। এক অচিন্তিতপূর্ব্ব ভাবে দেহমন আচ্ছন্ন হইল—

চিত্ত মুগ্ধকরী ভাব! চিত্ত উন্মাদিনী। —(১০ পৃঃ)

অগ্নি-তপ্ত বালিকা-হৃদয়ের সজল-কালো-মেঘের প্রতি তৃষাভরা চাহনি সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু সে মেঘ হইতে বর্ষণ নামিল না। এক প্রবল-ঝটিকা-তাড়নে তাহা অপসারিত হইয়া এক নব মেঘের আবির্ভাব হইল। রাজ্য পুনরুদ্ধার করিবার জন্য ক্লিওপেট্রা সৈন্যদের পরিচালনা করিয়া ক্লীব মন্ত্রীর রাজ্য আক্রমণ করিলেন। অপর দিক্ হইতে রোম অধিপতি সিজারও সেই রাজ্য আক্রমণ করেন। সিজারের শক্তির নিকট ক্লিওপেট্রার শক্তি ধূলিসাৎ হইয়া গেল। অবশেষে এক অনুচর পুরস্কারের লোভে ক্লিওপেট্রাকে সিজারের চরণে উপহার দিল। সিজার তাহাকে সস্নেহে রাজ্ঞীর সিংহাসনে বসাইলেন। ক্লিওপেট্রার তাপিত হৃদয় এই বারিবর্ষণে শীতল হইল। কিন্তু এই সম্মান লাভ করিয়াও তিনি সঙ্কোচ কাটাইতে পারিলেন না। সিজারের হাতে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রাণ হারাইয়াছে, তাঁহার আত্মীয়-পরিজন ধ্বংস হইয়াছে, তাঁহারই রাজ্ঞীর সিংহাসনে বসিয়া তিনি লজ্জা অনুভব করিতে লাগিলেন। কিন্তু সিজারের প্রেমের নিকট তিনি আত্মসমর্পণ করিলেন। প্রথমে সিজারের প্রতি কৃতজ্ঞতায় তাঁহার হৃদয় পূর্ণ থাকিত—পরে তাহাই প্রেমরূপে পরিণতি লাভ করিল।

একে প্রাণদাতা, তাহে পৃথিবী ঈশ্বর
ততোধিক ভুজবলে ভুবন বিজয়ী,
এত প্রলোভন! সখি! পড়িলাম আমি,
অজগর আকর্ষণে, সরলা হরিণী! —(১৬ পৃঃ)

সুন্দর বর্ণনা দ্বারা ক্লিওপেট্রা-হৃদয়ের ভাবগুলি অভিব্যক্ত হইয়াছে। সিজারের বীরত্ব, ব্যক্তিত্ব, বিরাটত্বের নিকট তিনি আপন সত্তা হারাইয়া ফেলিলেন। কিন্তু এ সৌভাগ্য তাঁহার ভাগ্যে বেশী দিন সহিল না। সিজার নিহত হইলেন। ক্লিওপেট্রা জীবনের এক অধ্যায় শেষ হইল।

সিজারের মৃত্যুর পর এণ্টনির নিকট হইতে আহ্বান আসিল। যাঁহার

প্রতি প্রথম প্রণয়ে তাঁহার হৃদয় অনুরঞ্জিত হইয়াছিল তাঁহার আহ্বান তিনি উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। মনে আনন্দের বন্যা বহিতে লাগিল। নৌকায় আরোহণ করিয়া এণ্টনির উদ্দেশ্যে ক্লিওপেট্রার যাত্রাকালের বর্ণনায় যেন তাঁহার উল্লাসের প্রতিচ্ছবি দেখা যায়—

চিদনস স্রোতে ওই প্রমোদ তরণী,
ভাসিতেছে, নাচিতেছে, বারিবিহারিণী।
হাসিতেছে, জ্বলিতেছে পশ্চিম তপনে,
প্রতিবিম্বে ঝলসিয়া তরল সলিল। —(২০ পৃঃ)

কিন্তু ক্লিওপেট্রার মনে শঙ্কা এবং সঙ্কোচও মাঝে মাঝে উদিত হইতেছিল। এণ্টনির মন তাঁহার জানা নাই—যদি তিনি তাঁহাকে অনাদর করেন ইত্যাদি ভাবনায় ক্লিওপেট্রার মন সময়ে সময়ে সঙ্কুচিত হইতেছিল।

তারপর এণ্টনির প্রণয় লাভ করিয়া—

······সেই সলিল প্রবাহে
ভেসে গেল মম কুল, শীল, লজ্জা, ভয়,
ভেসে গেল সেই বেগে ভূত, ভবিষ্যৎ,
বর্ত্তমান উভয়ের ; হইল চঞ্চল
বেগে, রোম, মিশরের রাজসিংহাসন। —(২৪ পৃঃ)

এণ্টনি একবার যুদ্ধে গেলে, বিরহ ক্লিওপেট্রার নিকট অসহ হইয়া উঠিল—

ধরাতল মরুভূমি, নাহি তাহে আর
সুশোভার চিহ্ন মাত্র। শব্দবহ হায়।
নিঃশব্দ আমার কাণে।······ —(২৯ পৃঃ)

সেই অবস্থায় অগস্তার সহিত এণ্টনির বিবাহ সংবাদে তাহার মনে ঈর্ষ্যানল জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু এণ্টনি আসিয়া যখন কহিলেন—

জীবন তোমার প্রেম, বিরহ, মরণ! —(৩৭ পৃঃ)

তখন ক্লিওপেট্রার সব অভিমান দূর হইল,—

দূরে গেল অভিমান, রমণীর প্রেম-
স্রোতে অভিমান সখি! বালির বন্ধন। —(৩৭ পৃঃ)

কিন্তু তারপর তাঁহারই ভুলে উভয়ের জীবন ধ্বংস হইল। এণ্টনি পুনরায় যুদ্ধে যাইবার কালে বিরহের আশঙ্কায় এবং অগস্তার প্রতি ঈর্ষ্যাবশতঃ

ক্লিওপেট্রাও সঙ্গে গেলেন। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রের ভয়াবহতা সহ্য করিতে পারিলেন না। ভয়ে ক্লিওপেট্রা দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। কিন্তু যখন দেখিলেন তাঁহার অদর্শনে ব্যাকুলচিত্তে এণ্টনি যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া আসিতেছেন তখন তাঁহার অনুশোচনার শেষ রহিল না। বীর এণ্টনির নিকট যুদ্ধে পশ্চাৎ-পদ হওয়া মৃত্যুর চেয়ে দুঃখদায়ক ও অপমানকর। এই পরিণতির কথা চিন্তা করিয়া ক্লিওপেট্রা লজ্জায় অভিভূত হইলেন। তিনি এণ্টনির নিকট মুখ দেখাইবেন না স্থির করিয়া সখীকে কহিলেন সে যেন এণ্টনিকে বলে,—

অনুতাপে ক্লিওপেট্রা ত্যজিল জীবন

... ...

মৈশরীর শেষ ভিক্ষা, ক্ষমিও এণ্টনি। —(৪৫ পৃঃ)

এণ্টনি আসিয়া সখীর মুখে ঐ সংবাদ পাইয়া আত্মহত্যা করিলেন—এবং শেষ মুহূর্ত্তে ক্লিওপেট্রাকে দেখিয়া কহিলেন—

আমি যাই অস্তাচলে। এই অস্ত্রলেখা
প্রিয়ে হৃদয়ে আমার, নহে শক্রদত্ত,
হেন সাধ্য কার নাহি এই ভূমণ্ডলে
এণ্টনি বিজয়ী,—বিনে ক্লিওপেট্রা, আজি
এণ্টনির করে প্রিয়ে! আহত এণ্টনি। —(৪৭ পৃঃ)

ক্লিওপেট্রা উন্মত্তের ন্যায় হইয়া গেলেন। অবশেষে কৌটা খুলিয়া সর্প-দংশন গ্রহণ করিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন।

এক-একটি যবনিকা অপসারিত করিয়া কবি ক্লিওপেট্রার হৃদয়ের এক-একটি ভাবের অভিব্যক্তি করিয়াছেন। কখনও তাঁহার হৃদয় সংসারের কৃতঘ্নতায় ও অবিচারে মরুভূমির ন্যায় তাপদগ্ধ, কখনও কৃতজ্ঞতায় আত্মহারা, কখনও প্রেমে বিগলিত, কখনও ঈর্ষ্যায় কাতর এবং বিরহে ব্যাকুল। তাঁহার জীবনে পাপ আছে, পুণ্য আছে, হৃদয়ের উদ্দামতা আছে, আকাঙ্ক্ষার উচ্ছৃঙ্খলতা রহিয়াছে—ভোগ আছে, ঐশ্বর্য্য আছে। এক কথায় পাপপুণ্য-ভরা, সুখদুঃখ-ভরা মানুষের জীবন আমরা তাঁহার চরিত্রে পাই। ঐতিহাসিক রোমান্সের নায়িকা হইবার উপযোগী করিয়াই কবি তাঁহার চিত্র ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। বুদ্বুদের মতই যেন তিনি আসিয়াছিলেন আবার বুদ্বুদের মতই লীন হইয়া গেলেন।

এই কাব্যে অপর চরিত্রগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য কোন বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট হয় নাই। কারণ কাহিনী-অংশ ক্লিওপেট্রা সখীর নিকট বিবৃত করিতেছেন। তাঁহার জীবনে যিনি যেমনভাবে আসিয়াছিলেন সেটুকুমাত্র পরিচয়ই তাঁহাদের পাই। সিজার ও এণ্টনির বীরত্বের দিক্, শৌর্য্যের দিক্ এবং প্রণয়ের দিকের কিছু কিছু পরিচয় ইহাতে রহিয়াছে।

কাব্যটি অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত। গতি-ছন্দ-ভাব-ভাষা মনোজ্ঞ ও সুখপাঠ্য। কাহিনী-কাব্যের দিক্ হইতে ইহাকে ত্রুটিপূর্ণই বলা চলে—চরিত্র-বিকাশের উপযোগী ঘটনা-সংস্থান নাই।

লুক্রেশিয়া—'লুক্রেশিয়া'-কাব্যটি কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক রচিত। ইহার মুদ্রণকাল ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দ। রোমের ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া কাব্যটি রচিত। ইহাতে কোলেটিনসের পত্নী অপূর্ব্ব সুন্দরী লুক্রেশিয়ার প্রতি যুবরাজ সেক্স্টসের আকর্ষণ এবং তাহার দুর্ব্যবহারে স্বামীকে প্রতিশোধ লইবার অনুরোধ জানাইয়া লুক্রেশিয়ার আত্মহত্যার কাহিনী, এবং অবশেষে ব্রুটস ও কোলেটিনস্ কর্ত্তৃক দেশবাসীকে প্রতিশোধের কার্য্যে উত্তেজনা দান ও সেক্স্টসের পলায়ন, বিবৃত হইয়াছে।

লুক্রেশিয়ার সৌন্দর্য্যের বর্ণনা—

> সুন্দর প্রাসাদ পরে কে তুমি সুন্দরি?
> কি লাবণ্য! কি মাধুরী!! আহা মরি মরি!!!
>
> —(৮ পৃঃ)

হঠাৎ অলিন্দের দ্বারদেশে এক পুরুষ-মূর্ত্তি দেখিয়া সে চমকিত হইল,—

> দেখে ভীম অজগর
> চমকে যেমতি নর
> হায়রে জানকী যেন দেখি দশাননে।
> কিম্বা বিম্বাধরা কৃষ্ণা দেখি দুঃশাসনে॥ —(৯ পৃঃ)

বর্ণনাটি উপমাগুলির সাহায্যে লুক্রেশিয়ার অবস্থাকে সুন্দরভাবে ব্যক্ত করিয়াছে।

সেক্স্টস্ লুক্রেশিয়ার নিকট কুপ্রস্তাব করিলে লুক্রেশিয়া নানাভাবে উপদেশ দিল এবং তিরস্কার ও অনুনয় করিয়া পাপপথ হইতে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিল। সেক্স্টস্ পরদিন আসিবার বাসনা জানাইয়া এবং শাসাইয়া চলিয়া গেল,—

যদি মোর মণি হও রাখিব মাথায়।
নতুবা দংশিব জেনো নিশ্চয় তোমায়। —(১৫ পৃঃ)

লুক্রেশিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে পতির উদ্দেশ্যে পত্র লিখিল।

পরদিন প্রভাতে সেক্‌স্‌টসের মানসিক দ্বন্দ্বের চিত্র সুন্দরভাবে চিত্রিত হইয়াছে। সে কখনও ভাবিতেছে পাপপথে যাইবে না, আবার ভাবিতেছে, মনের আকাঙ্ক্ষাই যদি অতৃপ্ত থাকে তবে জীবনধারণ করিয়া লাভ কি। তাহার মনে তখন নানারূপ দুষ্ট মতলব আসিল। একবার সে ভাবিতেছে—

মিত্র মম কোলেটিন, কোন অপকার
করে নাই কখন আমার।
পশিয়া তাহার গৃহে, করিব কেমনে
কামবশে হেন অত্যাচার? —(২৪ পৃঃ)

আবার পরমুহূর্ত্তেই ভাবিতেছে—

ভাসাব প্রেমের তরি যৌবন সাগরে
এ বাসনা নাবিক আমার,
অপবাদ তুফানেতে ডুবিবে না তরি
সে রতনে পাব পুরস্কার। —(২৫ পৃঃ)

মানসিক দ্বন্দ্বের অবসান ঘটাইয়া সে লুক্রেশিয়াকে একটি পত্র লিখিল এবং পত্রের উত্তরে লুক্রেশিয়ার নিকট হইতে তিরস্কার লাভ করিয়া ক্রুদ্ধ হইল। তার পর তাহার সর্ব্বনাশ করিবার সঙ্কল্প গ্রহণ করিল। দুর্ব্বৃত্তের নিকট অপমানিত হইয়া লুক্রেশিয়া প্রাণত্যাগ করিবার বাসনা করিয়া স্বামীকে পত্র লিখিল—

টাইবার স্রোত সহ মিশে রব অহরহ
প্রতিহিংসা প্রতিহিংসা ধ্বনিব কেবল!
জ্বলিব অনল বেশে মহাশব্দে দেশে দেশে
জ্বালাব ধরণী কুন্ডে প্রতিহিংসানল॥ —(৫০ পৃঃ)

রমণী-হৃদয়ের প্রতিহিংসা-স্পৃহা এই পত্রের ছত্রে ছত্রে প্রকাশিত হইয়াছে।

কিন্তু স্বামীকে শেষ দেখা না দেখিয়া সে মরিতে পারিল না। পরদিন প্রভাতে স্বামীর হাতে পত্রটি দিয়া সে ছুরিকাদ্বারা আত্মহত্যা করিয়া নিজ অপমানের লজ্জা নিবারণ করিল। ব্রুটস্ তাহার মৃতদেহ লইয়া কোলেটিন-সহ প্রকাশ্য বক্তৃতা-সভায় যুবরাজের নারীর প্রতি অত্যাচার করিবার কথা কহিয়া

উত্তেজিত করিলে জনগণ প্রতিশোধ লইবার জন্য সকলকে আহ্বান করিয়া অগ্রসর হইল—

জাগ বীরগণ জাগ সাধুজন
জাগ রোমবাসী জাগ রে এখন,
জগৎ কাঁপাই এস সব ভাই
রোমের কলঙ্ক দূরিবারে যাই
এক মন হয়ে করে অসি লয়ে
এস বীরদর্পে করিব গমন। —(৬১ পৃঃ)

জন-জাগরণের চিত্র বাংলা কাব্য-সাহিত্যে এই প্রথম চিত্রিত হইয়াছে। তারপর রোমবাসিগণের দ্বারা রাজপ্রাসাদ আক্রান্ত হইল—

কাঁপায়ে অম্বর কাঁপায়ে পাতাল
রোমবাসী সবে ছাড়িছে হুঙ্কার।
নৃপতি ভবন করি আক্রমণ
শত শরাসনে দিতেছে টঙ্কার
চরণ ধূলায়, তপনে, হেলায়
মেঘের মতন করে আবরণ। —(৬৫ পৃঃ)

জনশক্তির নিকট রাজশক্তি পরাজিত হইল। নারী-অত্যাচারী পলায়ন করিয়া প্রাণ রক্ষা করিল এবং তাহার প্রাসাদ প্রজাগণ দ্বারা প্রজ্বালিত অগ্নিতে জ্বলিতে লাগিল।

কাব্যটি এই স্থানে শেষ হইলে ভাল হইত। কবি ইহার পরেও ভৃত্যের সঙ্গীত ও পাপের ফল সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছেন। এই শেষাংশ একেবারেই ব্যর্থ হইয়াছে।

স্থানে স্থানে প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনা রহিয়াছে—

রোমের প্রাসাদচয়
হাসিতেছে শোভাময়
দেখিছে সূর্য্যের দশা গবাক্ষ নয়নে।
মৃদু সমীরণ সঙ্গে
টাইবার খেলে রঙ্গে
নাচিয়া নাচিয়া চলে আপনার মনে। —(১ পৃঃ)

কাব্যটি চারিটি সর্গে সমাপ্ত। ইহাতে পয়ার, ত্রিপদী, চৌপদী প্রভৃতি ভিন্নভাবে ও মিশ্রভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। ছন্দ-ব্যবহারে কোন নিয়ম ইহাতে মানা হয় নাই। কখন ছয় পঙ্‌ক্তি, কখনও দশ পঙ্‌ক্তি এইভাবে নানাবিধ ধরণে কাব্যটি রচিত। কাব্যে বর্ণনা বেশী, বর্ণনার মধ্যে স্থানে স্থানে কবিত্বের সুন্দর স্ফুরণ দেখা যায়। মনস্তত্ত্ব-ব্যাখ্যায় স্থানে স্থানে কবির কৃতিত্ব দেখা যায়। কাব্যটিকে সার্থক রচনা বলা যায় না। ইহা বর্ণনাত্মক রচনা—কাহিনী-কাব্যের ক্ষেত্রে ইহার প্রকাশভঙ্গি উপযুক্ত নয়।

বীরবাহু-কাব্য—'বীরবাহু-কাব্য'টি কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক রচিত হইয়া ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। কবি ভূমিকায় নিজেই বলিয়াছেন যে ইহার ভিতর ঐতিহাসিক সত্য কিছুই নাই, কাহিনী-অংশ সম্পূর্ণ কাল্পনিক। "পুরাকালে হিন্দুকুলতিলক বীরবৃন্দ স্বদেশ রক্ষার্থ কি প্রকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন কেবল তাহারই দৃষ্টান্তস্বরূপ এই গল্পটি রচনা করা হইয়াছে।"

কাব্যের প্রথমেই কবি ভারতের পূর্ব্ব গৌরবোজ্জ্বল দিনগুলি স্মরণ করিয়াছেন—

আর কি সে দিন হবে, জগৎ জুড়িয়ে যবে,
ভারতের জয়কেতু মহাতেজে উড়িত।
যবে কবি কালিদাস, শুনায়ে মধুর ভাষ,
ভারতবাসীর মন, নানা রসে তুষিত॥
যবে দেব অবতংস, রঘু কুরু পাণ্ডুবংশ,
যবনে করিয়া ধ্বংস, ধরাতল শাসিত।
ভারতের পুনর্ব্বার, সে শোভা হবে কি আর,
অযোধ্যা হস্তিনা পাটে হিন্দু যবে বসিত॥ —(ভূমিকা)

ভারতবর্ষের গৌরবের দিন তিরোহিত হইয়াছে। পরাধীনতার গ্লানিতে দেশ ভরিয়া উঠিয়াছে। নির্জীব প্রাণে স্বদেশপ্রেমের অগ্নি জ্বালাইবার নিমিত্ত কবি এই কাহিনীর অবতারণা করিয়াছেন। কনোজের যুবরাজ বীরবাহুর স্বদেশপ্রীতি ও বীরত্বের দ্বারা তিনি তাঁহাকে আদর্শ-চরিত্র-রূপে অঙ্কিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার আকৃতির ভিতরে একটা বীরত্বব্যঞ্জক প্রকাশ দেখা যায়।

তিনি পত্নীকে লইয়া গ্রীষ্ম-উপবনে যখন আমোদে মত্ত তখন এক সন্ন্যাসিনী আসিয়া তিরস্কার করিয়া তাঁহার মনে স্বদেশপ্রেমের অগ্নি প্রজ্বলিত করিলেন।

কবি যেন এই সন্ন্যাসিনীর মুখ দিয়া ভবিষ্যতের আভাস দিয়াছেন এবং বীরবাহুর মনে বীরত্বের অনুপ্রেরণা আনিয়াছেন। কিন্তু সন্ন্যাসিনীর হঠাৎ আগমন এবং আসিয়াই ভৎর্সনা ও নিজ জীবনের পূর্ব্ব ইতিহাস বিবৃতি কেমন যেন অবাস্তব হইয়া গিয়াছে—যেন জোর করিয়া তাঁহাকে আনিয়া তাঁহার মুখ দিয়া কতগুলি রাগ, দুঃখ, অনুশোচনার প্রকাশ করান হইয়াছে।

পাঠানগণ রাজ্য আক্রমণ করিলে বীরত্বের সহিত বীরবাহু যুদ্ধযাত্রার অনুমতি চাহিলেন। পত্নীর দুঃস্বপ্নও তাঁহাকে যুদ্ধযাত্রা হইতে নিবৃত্ত করিতে পারিল না। ক্ষত্রতেজে তিনি শত্রুর ভিতর প্রবেশ করিয়া প্রচণ্ড যুদ্ধ করিলেন। কিন্তু এক সময়ে চেতনা হারাইয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে দূরে পড়িয়া রহিলেন। পরে চৈতন্য লাভ করিয়া এবং সমস্ত বিষয় হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাঁহার মনে ক্রোধ ও দুঃখের উদয় হইল। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন শত্রুকে ধ্বংস করিয়া পত্নীকে উদ্ধার করিবেন।

স্বদেশ ছাড়িবার কালে বিদায়-প্রার্থনার ভিতর তাঁহার হৃদয়-বেদনা ব্যক্ত হইয়াছে—

> বিদায় জনমভূমি জনম মতন।
> বিদায় ভারতবাসী স্বজাতীয়গণ॥
> বিদায় জননী তাত পুরবাসীজন।
> বিদায় জনম শোধ প্রাণের রতন॥ —(৪৩ পৃঃ)

তারপর দৈব সাহায্যে দিল্লীতে পৌছিয়া রাজসভায় একাকী প্রবেশ করিয়া তিনি নির্ভীক-হৃদয়ে আলমগীরকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করিয়া নিহত করিলেন এবং পত্নীকে তো উদ্ধার করিলেনই, তাহার সহিত ভারতের লুপ্তগৌরব পুনরুদ্ধার করিয়া হিন্দুরাজ্য স্থাপন করিলেন।

বীরবাহুর হৃদয়ে পরোপচিকীর্ষাও ছিল। তিনি যখন দেখিলেন ছয়জন জলকন্যাকে দুইটি নাগ বেষ্টন করিয়াছে তখন তিনি স্থির থাকিতে পারেন নাই। তিনি তীর নিক্ষেপ করিয়া সর্পকুলকে নিধন করেন। সর্পের চিত্রটি সুন্দরভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে।

বীরবাহুর চরিত্রে পত্নীপ্রেমও মাধুর্য্যদান করিয়াছে। পত্নীকে উদ্ধার করিবার জন্য তিনি নানা দেশে নানা কষ্টের মধ্যে দিন অতিবাহিত করিয়াছেন। সমস্ত মন জুড়িয়া তাঁহার স্বদেশ-উদ্ধার ও পত্নী-উদ্ধারের সঙ্কল্প।

পত্নী যখন তাঁহাকে উদ্ধার করিবার পর বংশের সুনাম বৃদ্ধির জন্য চিতারোহণের সঙ্কল্প জানাইলেন তখনও বীরবাহু তাঁহাকে নিবৃত্ত করিতে অনেক চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার হৃদয়ে স্বদেশপ্রেম ও পত্নীপ্রেম সমানরূপে স্থান পাইয়াছে এবং তাঁহার কার্য্যকলাপের দ্বারা উভয়ই ধন্য হইয়াছে। কিন্তু চরিত্রটি কোথাও সজীব হইয়া উঠিতে পারে নাই। চরিত্রটি সম্বন্ধে কবির যতখানি কল্পনা ছিল ততখানি প্রকাশিত হয় নাই—তাই কবির বর্ণনার সহিত চরিত্রটির কর্ম্মের মধ্যে সামঞ্জস্য-বিধান ব্যাহত হইয়াছে। চরিত্রটি দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে।

নায়িকা হেমলতা প্রেম-বিহ্বলা। তিনি সুন্দরী এবং পতিপরায়ণা। যুদ্ধের পূর্ব্বে দুঃস্বপ্ন দেখিয়া স্বামীকে যুদ্ধে পাঠাইতে তাঁহার মন সায় দেয় নাই। কিন্তু তিনি ক্ষত্রিয় রমণী, স্বামীকে যুদ্ধে যাইতে নিষেধ করিতেও পারেন না। তারপর যুদ্ধে পরাজয় ঘটিলে তিনি সতীত্ব রক্ষার জন্য অগ্নিতে প্রাণ বিসর্জ্জনের চেষ্টা করেন। কিন্তু ভাগ্য তাঁহাকে অন্য পথে লইয়া চলিল। আলমগীরের প্রাসাদে নীত হইলে তিনি বিষপান করিতে গিয়াও অনাগত সন্তানের চিন্তায় তাহা করিতে পারিলেন না, শুধু শঙ্কায় ও অক্ষমতায় রোদন করিতে লাগিলেন। শেষে অপর এক অপহৃতা রাজপুত রমণী তাঁহাকে এক বৎসরের জন্য সম্রাটের নিকট হইতে দূরে থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দিল।

এই সময় তিনি রাজবাড়ীতে ফুল তুলিয়া মালা গাঁথিয়া দিতেন।

> সুল্‌তান আগারে ফুল যোগাবারে,
> আছিল আমার ভার। —(৭৫ পৃঃ)

পুত্রকে ক্রোড়ে পাইয়া স্বামীর কথা চিন্তা করিয়া তাঁহার সময় কাটিত। যখন বীরবাহুর সহিত সম্রাটের দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ বাধিল তখন তিনি চিন্তায় আকুল হইলেন। তারপর স্বামীর জয়লাভের পর তিনি পুত্রকে স্বামীর ক্রোড়ে দিয়া মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইলেন। তাঁহার সতীত্ব তিনি রক্ষা করিয়াছেন সত্য কিন্তু যবনগৃহে বাস-হেতু বীরবাহুর বংশে কালিমা লাগিতে পারে, তাই অগ্নির ভিতর আত্মাহুতি দিয়া তিনি তাহা অমলিন রাখিতে চাহিয়াছিলেন। বীরবাহু

তাঁহাকে নিবৃত্ত করিতে পারিলেন না। কিন্তু সম্রাট্-গৃহের সেই রাজপুত রমণী যখন তাঁহাকে কহিল—

তুমি কৈলে তনুত্যাগ, রাজপুত্র মহাভাগ,
সংসারে বিরাগ করি রাজ্যপদ ত্যজিবে।
পুনঃ হিন্দু রাজগণে, ম্লেচ্ছ পরাজিবে রণে,
পুনর্ব্বার এই রাজ্য করতল করিবে॥ —(৭৮ পৃঃ)

দেশের মঙ্গলের কথা ভাবিয়া হেমলতা তাঁহার সঙ্কল্প ত্যাগ করিলেন।

কাহিনীর মধ্যে কতগুলি অলৌকিক ঘটনার সমাবেশে কাব্যরসকে ক্ষুণ্ণ করা হইয়াছে। কাব্য-রচনার ভিতরেও সহজ গতি নাই। যেন একটা চেষ্টাকৃত বর্ণনা ও বিবৃতির দ্বারা কাহিনীর ভিতর অগ্রগতি আনা হইয়াছে। চরিত্র-চিত্রণেও একই দোষ লক্ষণীয়। স্বদেশপ্রেমমূলক কাহিনী-কাব্য রচনা কবির এই প্রথম। তাই হয়তো এ-সকল দোষত্রুটি রহিয়া গিয়াছে। নানারূপ প্রাকৃতিক বর্ণনা, মনোভাব বর্ণনা দ্বারা কাব্যকে সরস করিবার চেষ্টা দেখা যায়। কিন্তু সর্ব্বত্রই একটা বাধ বাধ ভাব লক্ষ্য হয়। তবে কাব্যের মধ্যে কবির আন্তরিকতা পরিস্ফুট। তথাপি কাহিনীর দিক্ দিয়া, চরিত্রচিত্রণের দিক্ দিয়া এবং ছন্দের দিক্ দিয়া বিচার করিলে কাব্যটিকে ব্যর্থই বলিতে হইবে।

জয়াবতী—'জয়াবতী'-কাব্যটি কবি বনোয়ারীলাল রায় কর্ত্তৃক রচিত ও ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত।

এই গ্রন্থ সম্বন্ধে কবি ভূমিকায় লিখিয়াছেন—"এই গ্রন্থ রোমান্‌স অব হিষ্টরি ও চিরাগত সুপ্রসিদ্ধ জনশ্রুতি অবলম্বন করিয়া লিখিত হইল।" ইহাতে ঐতিহাসিকতা কিছু নাই—দেশপ্রেমকে কেন্দ্র করিয়া রাজস্থানের একটি কল্পিত কাহিনী লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

কাহিনী-অংশ পদ্মিনী-উপাখ্যানের ন্যায়। পদ্মিনী-উপাখ্যানে পদ্মিনী বিবাহিতা—এ কাব্যে জয়া বাগ্‌দত্তা। ঐ কাব্যে পদ্মিনীর স্বামী অবরুদ্ধ হইয়া নানা ক্লেশ সহ্য করিয়াছিলেন, এই কাব্যে জয়ার পিতা অবরুদ্ধ হইয়াছিলেন এবং অবরোধের নিমিত্ত মুলতানের যুবরাজ জয়পালের সহিত তাহার বিবাহ শীঘ্রতর সংঘটিত হইয়াছিল। তারপর পদ্মিনীর ন্যায় জয়াও দিল্লীর সম্রাট্কে পত্র দ্বারা ছলনা করিয়া পিতাকে উদ্ধার করিয়াছিল—তাহার সঙ্গে জয়পাল অবশ্য ছিল। কাব্যের পরিণতিতে সম্রাটের অসুস্থ হইয়া মৃত্যু এবং চিতোর-

বাসীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বর্ণিত হইয়াছে। তবে এই কাহিনীতে নানাবিধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাহিনীর সমাবেশ থাকাতে কাব্যটির মধ্যে বৈচিত্র্য আসিয়াছে।

কাব্যের নায়িকা জয়াবতী চিতোরের রাজা রত্নসেনের কন্যা। তাঁহার রূপ-গুণের তুলনা নাই। জয়পালের সহিত তাঁহার বিবাহের কথা স্থির হইলে তিনি সুখী হন এবং মনে মনে তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করেন।

সেই সময় দিল্লীর সিংহাসনে আলাউদ্দিন সম্রাট্ ছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে কবি লিখিয়াছেন—

অত্যাচারী অতিশয়, নাহি লজ্জা ধর্ম্ম ভয়
ভারতের উন্নতি কপাট। —(৬ পৃঃ)

জয়ার রূপের কথা শুনিয়া তিনি তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য বিচলিত হইলেন—

হারাইয়া ধৈর্য্যজ্ঞান, জয়ারূপ করি ধ্যান,
তাঁহারে সঁপিল প্রাণমন। —(৮ পৃঃ)

তিনি চিতোর আক্রমণ করিলে উভয় দলের মধ্যে যুদ্ধের বর্ণনা—

ঝাঁকিল সেনাগণ, ছাড়িয়ে গরজন,
ভীষণ করে রণ
গর্ব্বে।
আননে বহে নীর, মানস নহে স্থির,
তেজিছে নানা তীর
সর্ব্বে॥ —(৪১ পৃঃ)

ছন্দটি সুন্দর।

মাতুলালয়ে যাইবার পথে জয়া শত্রুপক্ষের লুটের এবং অত্যাচারের দৃশ্য দেখিতে পাইলেন। তারপর ঝড়বৃষ্টি আসিলে একটি গুহায় আশ্রয় লইয়া যবন-সেনাপতির হস্তে পড়িয়া তাঁহার দুর্দ্দশার শেষ রহিল না—আত্মরক্ষার সব রকম চেষ্টা তাঁহার ব্যর্থ হইল এবং অবশেষে বিষভক্ষণ করিতে গিয়াও ব্যর্থকাম হইলেন। পায়ে হাঁটিয়া তাঁহাকে পথ চলিতে হইতেছিল। এমন সময় জয়পাল আসিয়া তাঁহাদের উদ্ধার করেন এবং নায়ক-নায়িকার প্রথম সাক্ষাৎ সেস্থানে হয়। সাক্ষাতের উপযুক্ত স্থান এবং কালের নির্ব্বাচন হইলেও কবি সে রকম নিপুণতা দেখাইতে পারেন নাই।

চিত্রপট তুল্য রূপ রূপ হেরি তাঁর।
জন্মিল তাঁহার মনে আনন্দ অপার ॥
চিনিয়ে সুহৃদে লাজে ফিরান বদন।
ভাবনা সাগরে সুধা উঠিল তখন ॥ —(১১৬ পৃঃ)

জয়পালও আনন্দিত মনে কহিলেন—

চিন্তা নাই তবাধীন জয়পাল আমি।
তব কৃপা আশে হই নানা পথ গামী ॥ —(১১৬ পৃঃ)

বণিকের ছদ্মবেশে জয়পালের রত্নসেনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইবার ঘটনাটি বেশ উপভোগ্য। আবার জয়পাল-কর্ত্তৃক অরণ্যে সম্রাটের তীরবিদ্ধ হইবার ঘটনাটির মধ্যেও নূতনত্ব দেখা যায়। ব্যাধ-কর্ত্তৃক সেবা ও যত্ন পাইয়া সম্রাট্ সুস্থ হইলেন এবং দিল্লীতে ফিরিয়া সিংহাসনে রুকনুকে দেখিয়া তাহার মাথা কাটিয়া ফেলিলেন। এই-সকল ঘটনা দ্বারা পাঠানদিগের চরিত্রকে ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা দেখা যায়।

জয়পালের সহিত জয়ার বিবাহের পর দেশের মধ্যে গোলযোগ দেখিয়া তাঁহার খুল্লতাত স্ত্রীর সহিত পরামর্শ করিয়া জয়ার প্রাণনাশের চেষ্টা করেন এবং দাসীর বুদ্ধি ও কৌশলে নিজেরাই হত হন। এই দুইটি চরিত্র কাব্যে অপ্রয়োজনীয় ও বাহুল্য বলিয়া মনে হয়। কারণ ইঁহাদের কার্য্যের দ্বারা কাহিনীর কোন অংশ পরিবর্ত্তিত হয় নাই বা প্রভাবান্বিত হয় নাই।

জয়া ও জয়পাল সম্রাট্কে ফাঁকি দিয়া পিতাকে উদ্ধার করিয়া আনিবার কালে পথিমধ্যে সম্রাট্সৈন্যগণ-কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে জয়পাল তাহাদের যুদ্ধে পরাস্ত করেন। চিতোরে কন্যাসহ রাজা ফিরিলে সবাই আনন্দে মগ্ন হইল। সম্রাট্ ক্রোধে কাহারও পরামর্শ না শুনিয়া যুদ্ধের নিমিত্ত অগ্রসর হইলে জয়পুরে ঝড়বৃষ্টি ও মহামারীতে অনেক সৈন্য হারাইয়া দিল্লীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তাঁহার মনে সুখ রহিল না এবং অবশেষে তিনি পাগল হইলেন।

তারপর একদিন তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। ইহার পর কবি পাপের পতন অনিবার্য্য এবং মৃত্যুর নিকটে সকলেরই তুল্য অবস্থা প্রভৃতি তত্ত্বালোচনা করিয়াছেন।

এই-সকল তত্ত্বব্যাখ্যা এবং সুযোগ পাইলেই উপদেশের অবতারণা

কাব্যরসকে অনেকখানি ব্যাহত করিয়াছে। কাব্যের যে বড় গুণ সংযম তাহাও ইহা দ্বারা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে।

ভারতের দুরবস্থার কারণ কবি বলিয়াছেন—

হয়ে দিন দিন, একতা বিহীন,
ভারতের পুত্রগণ।
নিজ নিজ দ্বেষ, করি অবশেষ,
হারাইল রাজ্যধন॥ —(১৭ পৃঃ)

বন্দী রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া জয়পাল প্রহরীকে স্বাধীনতার আনন্দের কথা কহিতেছেন—

আর দেখ শ্রমকুল কৃষক নিকরে।
কিরূপ আনন্দে তারা দিনপাত করে॥
জীর্ণবাস ভগ্নবাস না আছে ভূষণ।
তবু স্বাধীনতা সুখে মহাসুখী মন॥ —(১২৮ পৃঃ)

এই কাব্যে পয়ার, ত্রিপদী, তোটক, উৎসাহিনী, দীর্ঘপয়ার, একাবলী, অন্ত্যযমক, ইন্দ্রবজ্রা, মালঝাঁপ, ভুজঙ্গপ্রয়াত, নবকুসুম, লঘু ত্রিপদী, তূণক প্রভৃতি ছন্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। উপমা রূপক উৎপ্রেক্ষা প্রভৃতি প্রাচীনপন্থী।

কাব্যে কবি ভাষা ও ছন্দের অনেক পারিপাট্য দেখাইয়াছেন। কাহিনীর মধ্যেও অনেক ঘটনার সমাবেশ করিয়া রসবৈচিত্র্য এবং বিস্তৃতি আনিয়াছেন, এবং দেশপ্রেমের নিদর্শনস্বরূপ অনেক স্থলে স্বদেশের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন এবং স্বদেশবাসীর গুণাবলীর ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়াছে। কারণ কাব্যরস কোথাও দানা বাঁধে নাই। সর্ব্বত্রই যেন বর্ণনার দ্বারা কবি কাব্য-সৃষ্টির প্রয়াস পাইয়াছেন—কোথাও অনুভূতির ভাবাবেগে তাহা প্রাণবন্ত হইয়া উঠে নাই। কাব্যশাস্ত্রের নিয়ম মানিয়া, মাপিয়া মাপিয়া কবি পদক্ষেপ করিয়াছেন তাই নিয়মতান্ত্রিকতার দিক্ হইতে দোষ-ত্রুটি ধরিবার উপায় নাই। কিন্তু কাব্য তো শুধু ব্যাখ্যা বা বর্ণনা বা প্রতিচ্ছবি নয়। কাব্য প্রাণরসকে বহন করিয়া এক প্রাণ হইতে অন্যপ্রাণে সঞ্চারিত করে—এই কাব্যে তাহা একেবারে ব্যর্থ হইয়াছে। এক কথায় ইহার মধ্যে ভাব, ভাষা, ছন্দ, কাহিনী সবই আছে কিন্তু কাব্য কিছুই নাই।

অচলবাসিনী—'অচলবাসিনী' কাব্যটি ললিতমোহন ঘোষ কর্ত্তৃক রচিত ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত হয়। কাব্যরচনার কারণ সম্বন্ধে কবি গ্রন্থের প্রথমে 'বিজ্ঞাপন' শিরোনামায় লিখিয়াছেন—

"বাল্যকাল হইতে পদ্যময় রচনা করিতে আমার বড়ই ইচ্ছা। পারি আর নাই পারি কিন্তু ঐরূপ উদ্যমে প্রবৃত্ত হইলেও মন যৎপরোনাস্তি তৃপ্তিলাভ করে। কোন কারণবশতঃ মন বিচলিত বা ক্লেশ-সন্তপ্ত হইলে, উক্তরূপ উদ্যম দ্বারা তাহার প্রফুল্লতা সংসাধন করিয়া থাকি। প্রায় তিন বৎসর হইল আমি এই উদ্যমের বশীভূত হইয়া এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি প্রণয়ন করিয়াছি।"

প্রথমে মঙ্গলাচরণে সরস্বতী-বন্দনায় একটু নূতনত্ব দেখা যায়—

... ...

শ্বেত শতদল পরে কোকনদ প্রায়
শোভিছে ভূগোল পদ, বৃত্ত আদিরেখা
মানব নির্ম্মিত ভূষা শোভিতেছে তায়।

... ...

মৃণাল ভুজেতে কিবা শোভিতেছে বীণা,
কণ্ঠে ছয় রাগ আর ছত্রিশরাগিণী,
ব্যাকরণ জিহ্বা, রসায়ন ঘ্রাণেন্দ্রিয়,
জ্যোতিষ নয়ন, শ্রুতি শ্রুতি আহা মরি,
ফুটিল নিবিড় কেশ সুশীলতা শিরে। —(১০-৵০ পৃঃ)

কাব্যটি ইতিহাসের পটভূমিকায় রোমান্সকে রূপ দিতে চেষ্টা করিয়াছে। কাব্যের প্রারম্ভে বেশ একটু রোমান্টিক আমেজ রহিয়াছে। বিন্ধ্যপর্ব্বতের অরণ্যে সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিয়াছে এমন সময় এক রাজবেশী পুরুষকে দেখা গেল—

প্রশস্ত ললাট তাঁর বদনেতে শ্মশ্রুভার,
করে বর্ম্ম চর্ম্ম প্রখর কৃপাণ॥ —(৩ পৃঃ)

তিনি রুদ্র-মন্দিরে পূজা সমাপন করিয়া বাহিরে আসিয়া একটি আলোক দেখিয়া চমকিত হইলেন। ইহার পরেও কবি রহস্য উদ্ঘাটন করেন নাই। পাঠকের কৌতূহল উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিল। রাজবেশী সেই আলোক অনুসরণ করিয়া চলিলেন এবং দেখিলেন—

কুসুম কাননে শোভা, রমণীর মনোলোভা,
ফুটিয়াছে নানাবিধ ফুল।
তাহার মাঝাতে বসি, জিনি শরতের শশী,
কেলি করে কামিনীর কুল॥ —(৪ পৃঃ)

রমণীগণ গান করিতেছিল রাজবেশী গীতধ্বনি অনুসরণ করিয়া নিকটবর্ত্তী হইলে তাহারা আলো নিভাইয়া দিয়া দৌড়াইয়া চলিয়া গেল। রাজবেশীর সহিত আমাদেরও এস্থলে মনে হয়—

হইল কি স্বপ্নযোগ, অথবা বিভ্রমরোগ,
অথবা হইবে ভোজবাজি॥ —(৫ পৃঃ)

প্রভাতে অন্বেষণ করিতে করিতে রাজবেশী একটি প্রাসাদ দেখিয়া তাহাতে প্রবেশ করিলেন এবং কতগুলি রমণীকে দেখিতে পাইলেন। রমণীগণ তাঁহাকে দেখিয়া ভীত হইলে তিনি নিজ পরিচয় দেন যে তিনি রোটাস-অধিপতি বীরকেশ। তখন তাঁহার প্রকৃত পরিচয় পাইয়া আমরাও আশ্বস্ত হই। রমণীকুলের পরিচয় এখনও পাওয়া যায় নাই। তবে শূরবালা রাজকন্যা—পিতার নিকট অপরাধ করিয়া অরণ্যে সখীগণ-সহ পরিত্যক্ত হইয়াছে, এই সংবাদ পাওয়া যায়। কিন্তু অধিকতর বিস্ময় অপেক্ষা করিয়া রহিল।

বীরকেশ অবিবেচক নহেন। তিনি রমণীগণকে অরণ্যে রাখিয়া যাইতে পারিলেন না এবং রাজকন্যা ও সখীদের মনোভাব বুঝিয়া গান্ধর্ব্বমতে রাজকন্যাকে বিবাহ করিলেন। তাঁহাদের বিবাহে—

বরকর্ত্তা মার, রতি ললনার
বরযাত্রি তরবারি।
উষ্ণীষ টোপর, বর্ম্ম দেহ পর
বরসজ্জা হলো ভারি॥ —(১৯ পৃঃ)

দূত তাঁহার সন্ধানে আসিলে মন্ত্রীর নিকট সংবাদ পাঠাইয়া সৈন্য আনাইয়া তিনি রমণীগণকে স্বরাজ্যে লইয়া গেলেন। আনন্দে তাঁহাদের দিন কাটিতে লাগিল। একদিন শেরসাহ তাঁহার নিকট আশ্রয় ভিক্ষা করিয়া শূরবালাকে নিজ কন্যা বলিয়া পরিচয় দিলে মন্ত্রীর উপদেশে রাজার মনে শূরবালার প্রতি বিদ্বেষভাব জাগরিত হইল। তিনি ভাবিলেন শূরবালা কোন দুরভিসন্ধি লইয়া তাঁহার নিকট রহিয়াছে। তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া শূরবালাকে কহিলেন—

অচলবাসিনী—'অচলবাসিনী' কাব্যটি ললিতমোহন ঘোষ কর্তৃক রচিত ও ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত হয়। কাব্যরচনার কারণ সম্বন্ধে কবি গ্রন্থের প্রথমে 'বিজ্ঞাপন' শিরোনামায় লিখিয়াছেন—

"বাল্যকাল হইতে পদ্যময় রচনা করিতে আমার বড়ই ইচ্ছা। পারি আর নাই পারি কিন্তু ঐরূপ উদ্যমে প্রবৃত্ত হইলেও মন যৎপরোনাস্তি তৃপ্তিলাভ করে। কোন কারণবশতঃ মন বিচলিত বা ক্লেশ-সন্তপ্ত হইলে, উক্তরূপ উদ্যম দ্বারা তাহার প্রফুল্লতা সংসাধন করিয়া থাকি। প্রায় তিন বৎসর হইল আমি এই উদ্যমের বশীভূত হইয়া এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি প্রণয়ন করিয়াছি।"

প্রথমে মঙ্গলাচরণে সরস্বতী-বন্দনায় একটু নূতনত্ব দেখা যায়—

... ...

শ্বেত শতদল পরে কোকনদ প্রায়
শোভিছে ভূগোল পদ, বৃত্ত আদিরেখা
মানব নির্ম্মিত ভূষা শোভিতেছে তায়।

... ...

মৃণাল ভুজেতে কিবা শোভিতেছে বীণা,
কণ্ঠে ছয় রাগ আর ছত্রিশরাগিণী,
ব্যাকরণ জিহ্বা, রসায়ন ঘ্রাণেন্দ্রিয়,
জ্যোতিষ নয়ন, শ্রুতি শ্রুতি আহা মরি,
ফুটিল নিবিড় কেশ সুশীলতা শিরে। —(/০-৵০ পৃঃ)

কাব্যটি ইতিহাসের পটভূমিকায় রোমান্সকে রূপ দিতে চেষ্টা করিয়াছে। কাব্যের প্রারম্ভে বেশ একটু রোমান্টিক আমেজ রহিয়াছে। বিন্ধ্যপর্ব্বতের অরণ্যে সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিয়াছে এমন সময় এক রাজবেশী পুরুষকে দেখা গেল—

প্রশস্ত ললাট তাঁর বদনেতে শ্মশ্রুভার,
করে বর্ম্ম চর্ম্ম প্রখর কৃপাণ॥ —(৩ পৃঃ)

তিনি রুদ্র-মন্দিরে পূজা সমাপন করিয়া বাহিরে আসিয়া একটি আলোক দেখিয়া চমকিত হইলেন। ইহার পরেও কবি রহস্য উদ্‌ঘাটন করেন নাই। পাঠকের কৌতূহল উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিল। রাজবেশী সেই আলোক অনুসরণ করিয়া চলিলেন এবং দেখিলেন—

কুসুম কাননে শোভা, রমণীর মনোলোভা,
ফুটিয়াছে নানাবিধ ফুল।
তাহার মাঝাতে বসি, জিনি শরতের শশী,
কেলি করে কামিনীর কুল ॥ —(৪ পৃঃ)

রমণীগণ গান করিতেছিল রাজবেশী গীতধ্বনি অনুসরণ করিয়া নিকটবর্ত্তী হইলে তাহারা আলো নিভাইয়া দিয়া দৌড়াইয়া চলিয়া গেল। রাজবেশীর সহিত আমাদেরও এস্থলে মনে হয়—

হইল কি স্বপ্নযোগ, অথবা বিভ্রমরোগ,
অথবা হইবে ভোজবাজি ॥ —(৫ পৃঃ)

প্রভাতে অন্বেষণ করিতে করিতে রাজবেশী একটি প্রাসাদ দেখিয়া তাহাতে প্রবেশ করিলেন এবং কতগুলি রমণীকে দেখিতে পাইলেন। রমণীগণ তাঁহাকে দেখিয়া ভীত হইলে তিনি নিজ পরিচয় দেন যে তিনি রোটাস-অধিপতি বীরকেশ। তখন তাঁহার প্রকৃত পরিচয় পাইয়া আমরাও আশ্বস্ত হই। রমণীকুলের পরিচয় এখনও পাওয়া যায় নাই। তবে শূরবালা রাজকন্যা—পিতার নিকট অপরাধ করিয়া অরণ্যে সখীগণ-সহ পরিত্যক্ত হইয়াছে, এই সংবাদ পাওয়া যায়। কিন্তু অধিকতর বিস্ময় অপেক্ষা করিয়া রহিল।

বীরকেশ অবিবেচক নহেন। তিনি রমণীগণকে অরণ্যে রাখিয়া যাইতে পারিলেন না এবং রাজকন্যা ও সখীদের মনোভাব বুঝিয়া গান্ধর্ব্বমতে রাজকন্যাকে বিবাহ করিলেন। তাঁহাদের বিবাহে—

বরকর্ত্তা মার, রতি ললনার
বরযাত্রি তরবারি।
উষ্ণীষ টোপর, বর্ম্ম দেহ পর
বরসজ্জা হলো ভারি ॥ —(১৯ পৃঃ)

দূত তাঁহার সন্ধানে আসিলে মন্ত্রীর নিকট সংবাদ পাঠাইয়া সৈন্য আনাইয়া তিনি রমণীগণকে স্বরাজ্যে লইয়া গেলেন। আনন্দে তাঁহাদের দিন কাটিতে লাগিল। একদিন শেরসাহ তাঁহার নিকট আশ্রয় ভিক্ষা করিয়া শূরবালাকে নিজ কন্যা বলিয়া পরিচয় দিলে মন্ত্রীর উপদেশে রাজার মনে শূরবালার প্রতি বিদ্বেষভাব জাগরিত হইল। তিনি ভাবিলেন শূরবালা কোন দুরভিসন্ধি লইয়া তাঁহার নিকট রহিয়াছে। তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া শূরবালাকে কহিলেন—

তুই যবন কুমারী, তুই যবন কুমারী,
হিন্দুনাম ধরিলি হইতে হিন্দুনারী
তোর বুকে নাই ডর তোর বুকে নাই ডর,
পাপীয়সী পিশাচী রাক্ষসী ভয়ঙ্কর ॥ —(৪৮ পৃঃ)

কিন্তু পরে নিজ ভ্রম বুঝিতে পারিয়া তিনি অনুতপ্ত মনে শূরবালার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করেন ও নিজেকে ধিক্কার দেন।

রাজা বীরকেশ অতিথিবৎসল এবং প্রকৃত ক্ষত্রিয়ের গুণে বিভূষিত ছিলেন। তিনি মন্ত্রীর সতর্কতা-বাণী উপেক্ষা করিয়া নিজের সর্ব্বনাশের আশঙ্কা থাকা সত্ত্বেও শেরসাহকে আশ্রয় দিতে সম্মত হইলেন। তিনি মন্ত্রীকে কহিলেন—

ন্যায় পথ রাখি মনে, সদা নিরাশ্রয় জনে,
আশ্রয় নির্ভয় দিতে হয় ॥ —(৪২ পৃঃ)

বীরকেশ যোদ্ধা ও সাহসী ছিলেন। কুস্বপ্ন দেখিবার পর তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইলে গোলমালের কারণ অনুমান করিয়া তিনি তরবারি-হস্তে শত্রুসৈন্যের মধ্যে গেলেন। কিন্তু আঘাতে আঘাতে শরীর হইতে রক্ত ক্ষরিত হইয়া তাঁহাকে নিস্তেজ করিয়া দিল—তিনি রাজ্য রক্ষা করিতে পারিলেন না—

বীর পড়িল ধরণীপরে ছিন্ন তরুসম।
ভূমে পড়ে খসি দীর্ঘ অসি ঝঞ্চনা বিষম ॥ —(৭০ পৃঃ)

কাব্যের নায়িকা শূরবালা অত্যন্ত সুন্দরী—

মাঝারে মহিলা এক রূপ নিরুপমা,
কিবা রতি কি উর্ব্বশী শচী তিলোত্তমা। —(১০ পৃঃ)

বীরকেশের প্রতি তাহার অনুরাগ শৈশবকাল হইতেই ছিল। তাই সে হিন্দু নাম লইয়া হিন্দুভাবে থাকিত। তাহার সম্বন্ধে শেরসাহ লিখিয়াছিলেন—

মম বালা নিরুপমা, গুল্‌জিহান গুলসমা,
আছিল হে আমার সহিতে।
শুনি তব রূপ নাম, সদা তার মনস্কাম,
তব সহ বিবাহ করিতে ॥
হিন্দু হইবার তরে, হিন্দী ভাষা পাঠ করে,
সখীগণ সনে হিন্দী কয়।

হয়ে শূর বংশে বালা, বুদ্ধিমতী শূরবালা,
শূরবালা নাম তবে লয়॥ —(৩৭ পৃঃ)

তাই বীরকেশের পরিচয় পাইয়া সে ও তাহার সখীগণও আনন্দে অভিভূত হইয়াছিল—

শুনিয়া ললনাচয় হয়ে লজ্জাবতী।
মৌনী রয় যেমন লতিকা লজ্জাবতী॥ —(১৩ পৃঃ)

রাজা পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে পাছে মুসলমান শুনিয়া তিনি ঘৃণা করেন তাই ঘুরাইয়া নিজ পরিচয় দিয়াছিল—

জনকের পদে হয়ে দোষী অতিশয়।
সহচরী সহচরী গোপন আলয়॥ —(১৪ পৃঃ)

আনন্দের সহিত সে বীরকেশকে বিবাহ করিয়াছিল। তাহার প্রেমের ভিতর কোথাও খাদ নাই। তাই রাজা তাহার উপর সন্দেহ প্রকাশ করিলে সে তাহা সহ্য করিতে পারে নাই। পতির বিশ্বাস হারান অপেক্ষা মৃত্যুকে সে শ্রেয়ঃ মনে করিল এবং—

তড়িৎ ছুটিল যেন প্রাচীরের পাশে,
উড়িল নিবিড় কেশ পবন উপর,
ঝটিকায় নীলমেঘ যেমন আকাশে,
স্বর্ণভুজে ভুজালি ধরিল ভয়ঙ্কর। —(৫৩-৫৪ পৃঃ)

সে অত্যন্ত বুদ্ধিমতী। শেরসাহকে আশ্রয় দেওয়া উচিত কিনা রাজা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে সে উত্তর দিল—

আমার জনক এবে তোমার শ্বশুর,
কি জানিব শ্বশুর জামায়ে কতদূর।
তোমার বিচারে যাহা উচিত তা কর,
কিছুই না জানি আমি হৃদয় ঈশ্বর।—(৫৮ পৃঃ)

সে অন্যায়কে ভর্ৎসনা করিতেও পশ্চাৎপদ হয় না। বীরকেশের মৃত্যু হইলে সে আত্মবিসর্জ্জনের চেষ্টা করিতেছে দেখিয়া তাহার পিতা বাধা দিবার চেষ্টা করিলে সে কহিল—

ওগো পিতঃ! দুহিতায় পড়িল কি মনে
ধিক্ ধিক্ রাজ্যলোভ ধিক্ ধিক্ ধনে!

দুহিতার প্রাণ বধি রাজ্যলাভ হলো,
এর চেয়ে পিতার কি সুখ আছে বলো? —(৭৩ পৃঃ)

তারপর বীরবালা আপন হস্তে নিজ মস্তক ছেদন করিয়া স্বামীর অনুগামী হইল।

শূরবালার চরিত্রে নায়িকার উপযুক্ত গুণাবলী দেখা যায়। নিষ্ঠায়, প্রেমে, ত্যাগে সে প্রাণময়ী। বীরকেশের প্রতি অনুরক্ত হইয়া সে শিশুকাল হইতে সকলের বিরাগভাজন হইয়াও নিজ সঙ্কল্প অটুট রাখিয়াছিল। অবশেষে প্রাণত্যাগ দ্বারা তাহার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিল।

মন্ত্রীর চরিত্রে বিচক্ষণতা, সতর্কতা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। আপন ক্ষেত্রে সে উজ্জ্বল। কিন্তু তাহার সমস্ত সতর্কতাকে ব্যর্থ করিয়া শত্রু একদিন তাহাদের রাজ্য জয় করিল।

শেরসাহ ঐতিহাসিক চরিত্র হইতে বিচ্যুত হন নাই। তাঁহার ধূর্ত্ততা অতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। তিনি নিষ্ঠুর ও ক্রুর প্রকৃতির। কিন্তু কন্যার আত্মবিসর্জ্জন দেখিয়া তাঁহার চক্ষেও জল আসিয়াছিল—

দেখি তাহা যবনের হৃদয় বিকল,
শিহরিল কলেবর নেত্রে পড়ে জল।

কবি শেরসাহকে একেবারে হৃদয়হীন করেন নাই।

কাব্যে পাঁচটি সর্গ আছে। শেষাংশ খণ্ডিত। প্রত্যেক সর্গের প্রথমে বঙ্কিমের অনুকরণে সর্গের বর্ণিত বিষয় সম্বন্ধে দুই-এক পঙক্তি লেখা দেখা যায়; যেমন—

প্রথম সর্গে— ও কি জলে
দ্বিতীয় সর্গে—করিলেন সমর্পণ পাণিসহ প্রাণ।
এই কুসুমের হার তার অভিজ্ঞান॥
তৃতীয় সর্গে—প্রসন্ন দিক্ পাংশু বিবিক্তবাতং শঙ্খং
স্বনানন্তর পুষ্পবৃষ্টিঃ
চতুর্থ সর্গে— গুলজিহান
পঞ্চম সর্গে— দেখাশুনা।

কাব্যে ত্রিপদী, কুসুমমালিকা, পয়ার, চৌপদী, দীর্ঘ চৌপদী, দীর্ঘ পয়ার প্রভৃতি ছন্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

অনুপ্রাসের ব্যবহার স্থানে স্থানে দেখা যায়,—

তপনের তাপনে তাতিল ক্ষিতিতল।
পূর্ব্বভাব তীরোভাব, হইল সকল। —(৬ পৃঃ)

যমকের ব্যবহার,—

দুটি পদ কিবা রাঙ্গা কোকনদ প্রায়
দুচরণে দুচরণ বর্ণন না যায়। —(১২ পৃঃ)

কাব্যটিকে সহজ, সরল, গতিশীল ও সুখপাঠ্য বলা চলে। কবির উদ্দেশ্যও ইহাতে অনেকাংশে সাধিত হইয়াছে।

সিন্ধুনন্দিনী-কাব্য—'সিন্ধুনন্দিনী-কাব্য' কালীকান্ত শিরোমণি রচনা করেন। কিন্তু পুস্তকটিতে রচনা কাল পাওয়া যায় না। কবি পূর্ব্বে শুম্ভনিশুম্ভ-বধ নামক একটি মহাকাব্য সংস্কৃতে প্রণয়ন করিয়াছিলেন তাহা ভূমিকা হইতে জানা যায়। কাব্যটির প্রকাশকাল-সম্বন্ধে সঠিক কোন তারিখ নির্দ্ধারিত করিতে না পারিলেও ইহা যে মাইকেল এবং রঙ্গলালের পরে রচিত তাহা বেশ স্পষ্টভাবে বুঝা যায়। প্রথমতঃ কাব্যটি অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত। দ্বিতীয়তঃ, কাব্যের স্থানে স্থানে ভাব ও ভাষায় তাঁহাদের প্রভাব সুস্পষ্ট। তৃতীয়তঃ, বাংলাদেশে যখন দেশাত্মবোধ জাগাইবার জন্য কবিগণ লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন ইহা সে যুগের রচনা। তাই এই কাব্যের রচনাকাল উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে হইতে পারে বলিয়া অনুমান হয়।

এই কাব্যে কবি ৭১২ খ্রীষ্টাব্দে বসোরাধিপতি খলিফীয়রাজ ওয়ালীদ কর্ত্তৃক সিন্ধু-বিজয়ের কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সিন্ধুরাজ-কন্যা কমলার দুর্ভাগ্যের বৃত্তান্ত এবং চাতুর্য্য ও বুদ্ধিমত্তার দ্বারা শত্রুনাশের কাহিনী এই কাব্যে স্থান পাইয়াছে।

পরাধীনতার নাগপাশে বদ্ধ দেশে স্বাধীন কালের গৌরব-কাহিনী লিখিতে লেখনী ধারণ করিয়া কবির মনে আত্মশক্তির উপর সন্দেহ আসিতেছে। তিনি বিনয় করিয়া বলিয়াছেন—

সুষুপ্ত ভারতে লুপ্ত বীর্য্য স্বাধীনতা,
অজানিত যাহা এবে অক্ষি-অগোচর,
কিঞ্চিত চিত্রিত মাত্র ইতিহাস পটে
অতীত অস্পষ্টে, নিশার স্বপন যথা

জাগ্রত অন্তরে। এ মূঢ় মানব চিত্ত
সে চিত্র লিখিতে হায় অতীব চঞ্চল,
ভয়েতে স্থগিত হস্ত না চায় লিখিতে
অসম্ভব ভাবি, স্বরের সঞ্চার নাই,
নাহি তাল মান যার, পারে কি গাইতে
কভু সে জন সঙ্গীত ?······ —(২ পৃঃ)

তবে বাণীদেবীর কৃপালাভ করিলে অসম্ভব কার্য্যেও সফলতা পাওয়া যায়। তাই তিনি তাঁহার নিকট কৃপাভিক্ষাও করিয়াছেন।

কাব্যের নায়িকা রাজনন্দিনী কমলার পরিচয় আমরা তৃতীয় সর্গের পূর্ব্বে জানিতে পারি না। তৃতীয় সর্গে মন্ত্রিপুত্র ভবানন্দের কথায় জানিতে পারি, সে অপূর্ব্ব সুন্দরী—

···কমলা নামেতে আছে সিন্ধুপুরে
রাজেন্দ্র দুহিতা, ইন্দিরা সমান রূপে
গুণে সরস্বতী, ইন্দীবরনিন্দিতাক্ষী। —(৩৭ পৃঃ)

শৈশবে মন্ত্রিপুত্রের সহিত সে এক বিদ্যালয়ে পড়িত এবং ক্রমে উভয়ের ভিতর প্রণয় জন্মে। রাজা দাহির এই প্রণয়ের কথা জানিয়া বাদ সাধিলেন। তিনি কন্যাকে স্বয়ংবরা হইতে দিলেন না এবং উভয়ের দেখা-সাক্ষাতের পথও বন্ধ করিলেন। একদিন উভয়ে গোপনে দেব-মন্দিরে সাক্ষাৎ করিলে রাজা তাহা জানিতে পারিয়া ভবানন্দকে রাজ্যের বাহিরে পাঠাইয়া দেন। মন্ত্রিপুত্র এই প্রণয়-প্রসঙ্গে কহিতেছে, রাজ্যের বাহিরে গিয়াও—

·········হল না বিলুপ্ত
প্রণয়ের রেখা, জাগ্রত রহিলা হৃদে। —(৩৮ পৃঃ)

সিন্ধুরাজ যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হইলে এবং রাজমহিষীও প্রাণত্যাগ করিলে কমলা কনিষ্ঠা ভগ্নীর সহিত অগ্নিকুণ্ডে প্রাণ বিসর্জ্জনের উদ্যোগ করিতে-ছিল এমন সময় ভবানন্দের ইঙ্গিতে যবন সেনাপতি কাসিম তাহাকে ধরিল—

কাঁপিলা সুন্দরী অঙ্গ থর থর করি,
অশ্বত্থের পত্র যথা।··· ·· — (৬৭ পৃঃ)

কমলাকে যবনরাজের নিকট ভেট পাঠাইবার উদ্দেশ্যে বিশ্বাসঘাতী কাসিম ভবানন্দের নিকট সমস্ত গূঢ় সংবাদ জানিয়াও যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া তাহার

প্রতি ন্যায় বিচার করিল না। ভবানন্দকে সে বন্দী করিয়া রাখিল—কমলার পরিবর্ত্তে কারাগার তাহার কপালে জুটিল।

যবনরাজের গৃহে কমলা প্রেরিত হইলে দাসী তাহাকে যবনরাজের নিকট লইয়া যাইতে আসিলে বালিকা-হৃদয়ে সুপ্ত তেজ জাগিয়া উঠিল। সে ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল—

বিপদে পড়িনু সত্য, অনাথিনী এবে,
বান্ধব নাহি যে কেহ, তেই কি পূজিব
এ ছার যবন পদে পাদ্য অর্ঘ দিয়া ?
……………আয়রে অভাগী শিশু
অনুজা আমার, জীবন ত্যজিয়া দোঁহে
ঘুচাই এ জ্বালা এবে।… ·· —(৮৮-৮৯ পৃঃ)

দাসী ভীত হইয়া তাহাকে রাজমহিষীর নিকট লইয়া গেলে তাঁহার দরদ-পূর্ণ স্নেহের কথায় কমলা সান্ত্বনা ও ভরসা লাভ করিল। এস্থলে উভয়ের কথোপকথনের ভিতর মেঘনাদবধ-কাব্যের সীতা ও সরমার কথোপকথনের প্রভাব অনুভূত হয়। রাজমহিষী কমলাকে কহিলেন—

·· শুন ওগো রাজেন্দ্র দুহিতে !
দেখিয়া এ হেন দশা, (হায় লো বাছনি)।
বিদরে হৃদয় মোর না পারি কহিতে ; —(৯৩ পৃঃ)

… … …

…হায়রে হরিলা কেমনে দুরন্তে
নিদয় অন্তরে, মাতৃ অঙ্ক অলঙ্কারে। —(৯৫ পৃঃ)

তাঁহার কথায় পূর্ব্বস্মৃতি জাগরিত হইল এবং কমলা রোদন করিতে লাগিলে সরমার ন্যায় তিনিও কহিলেন—

ক্ষম গো রোদন বাছা, চাহি না শুনিতে,
স্মরিতে সে সব কথা দুঃখোদয় যদি ; —(৯৬ পৃঃ)

কমলা কহিল—

… কার কাছে কহি এ দুঃখ কাহিনী,
কে শুনিবে মন দিয়া, দ্রবিবে অন্তর

কার, ও তব হৃদয় বিনা দয়াবতি
অভাগার চক্ষুজলে। · ··· —(পৃঃ ৯৭)

মহিষীর নিকট সান্ত্বনা ও ভরসা পাইয়া এবং তাঁহার উপদেশ লাভ করিয়া কমলা রাজাকে কাসেমের অত্যাচারের কথা কহিল।

রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ কাসেমকে বধ করিবার আদেশ দিলেন। কমলা বুদ্ধির চাতুর্য্যে কাসেমের নিধন না হওয়া পর্য্যন্ত রাজমহিষীর নিকট থাকিবার অনুমতি লাভ করিল। অবশেষে কাসেমের মৃতদেহ রাজার নিকট আসিলে সে নিজ পাপদেহ শুদ্ধ করিবার জন্য রাজার নিকট অনুমতি লইয়া অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত করিল এবং ভগ্নীসহ তাহাতে প্রাণ-বিসর্জ্জন করিয়া নিজ মর্য্যাদা ও সতীত্ব রক্ষা করিল। অগ্নি-প্রবেশের পূর্ব্বে সে রাজাকে কহিল—

······কাসিম সতীত্ব রাখি
পাঠাইলা মোরে, ছলিয়া নাশিনু এবে
পিতৃহন্তা বৈরী, আনন্দে অনল পথে
চলিনু অমরপুরে সতীত্ব রাখিয়া। —(১২৫ পৃঃ)

অন্যান্য কাব্যে রাজপুতরমণীগণের সতীত্ব রক্ষার নিমিত্ত জহরব্রত করার অনেক কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে—কিন্তু যবনগৃহে থাকিয়া তাহাদের দ্বারাই তাহাদের পিতৃশত্রুকে নিধন করা ও তারপর আত্মসম্মান রক্ষার জন্য প্রাণবিসর্জ্জন করিবার ভিতর কমলা-চরিত্রের যে বুদ্ধি ও কৌশল প্রকাশিত হইয়াছে তাহা প্রশংসাযোগ্য।

কমলার প্রণয়ী মন্ত্রিপুত্র ভবানন্দকে আমরা যবন-শিবিরে প্রথম প্রবেশ করিতে দেখি। রাত্রির অন্ধকারে সে ছদ্মবেশে আসিল—

আসিলা শিবির প্রান্তে এক আগন্তুক,
ভূতাকৃতি, নর বলি অনুমানি তারে
আবৃত সকল অঙ্গ লোহিত কম্বলে। —(৩৩ পৃঃ)

সে নিজের পরিচয় দিল—

বৈর নির্য্যাতন মন্ত্রে দীক্ষিত এ যোগী
এবে, দেবমন্ত্রে নহে ;······। —(পৃঃ ৩৬)

রাজা দাহির রাজকন্যার প্রতি তাহার প্রণয়কে অপমানিত করিয়াছেন। সেই প্রতিহিংসানল তাহার হৃদয়ে প্রজ্বলিত হইয়া তাহাকে অপর সমস্ত চিন্তা

ভুলাইয়া দিয়াছে। রাজকন্যার সহিত একটু সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত সে কত প্রকারে কত কষ্ট সহ্য করিয়াও চেষ্টা করিয়াছে, দেবতার আরাধনা করিয়াছে, কিন্তু রাজার কর্ণে এই সংবাদ পৌছিলে তিনি ভবানন্দকে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। পুত্রশোকে মন্ত্রী দেহত্যাগ করেন। এইসব নানা কারণে—

..... জ্বলিছে ভীষণ
অনল এ চিতে, রাবণ চিতায় যথা ; —(৪০ পৃঃ)

তাই সে দেশের শত্রুর শিবিরে আসিয়া রাজপ্রাসাদের ও রাজমহিষীর দৈব শক্তি সম্বন্ধে গুপ্ত তথ্য কহিয়া দিয়া কমলাকে লাভ করিবার আশা করিয়াছিল। শত্রুগণ তাহার সর্ত্তে সম্মত হইয়া সিন্ধুদেশ জয় করিল কিন্তু নিজেদের প্রতিজ্ঞা রাখিল না। ভবানন্দকে কারাগারে বন্দী করিয়া কহিল—

আত্মহা পিতৃহা পাপী পাপমুক্ত হতে
পারে প্রায়শ্চিত্তে যদি, নৃপতিঘাতীর
কিন্তু নাহি যে, নিষ্কৃতি। .... —(৭৭ পৃঃ)

ভবানন্দ স্বার্থপরতা এবং স্বদেশদ্রোহিতার নিমিত্ত কাসেমের কারাগারে দুঃখের দিন গুণিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে লাগিল।

যবন-সেনাপতি কাসেমও বিশ্বাসঘাতকতার ও নারীগণের উপর অত্যাচারের নিমিত্ত বিবেকের দংশনে নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিল। রাত্রে নিদ্রিত হইয়া সে দেখিল, কয়েকটি রমণী তাহাকে তিরস্কার করিয়া বলিতেছে—

............দুরাচার
পাইবি রে প্রতিফল রাতি প্রতিভাতে ; —(১১২ পৃঃ)

তাহার নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। আবার নিদ্রাভিভূত হইলে দেখিল, নারীগণ আসিয়া অভিশাপ দিতেছে। নিদ্রাভঙ্গে গৃহের বাহিরে গিয়া দেখিল—

নক্ষত্র একটি (জলন্ত পাবক যেন)
স্বকক্ষ হইতে বেগে, ছুটিল উজলি
অন্তরীক্ষ পথ, দেখিলা সে দৃশ্য
যুবা, (শমন ভীষণ রোষে) বিনাশিতে
ব্রহ্মাস্ত্র হানিলা শিরে।...... —(১১৭ পৃঃ)

তারপর সে নরকের দৃশ্য দেখিল।

এই-সকল স্বপ্ন-দর্শন ব্যাপারে নবীনচন্দ্র সেনের 'পলাশির যুদ্ধে' বর্ণিত

সিরাজুদ্দৌলার কুস্বপ্ন-দর্শন প্রভৃতির প্রভাব দৃষ্ট হয়। কাসেমের ঐ-সকল স্বপ্ন সত্যে পরিণত হইল যখন সে চোখ খুলিয়া করিম খাঁর নিকট যবনরাজের নিষ্ঠুর আদেশের কথা শুনিল এবং অসির আঘাতে তাহার মস্তক ভূতলশায়ী হইল।

কাসেমের চরিত্রের স্বল্পই চিত্রিত হইয়াছে। সে যবনরাজের সেনাপতি। সিন্ধুদেশ আক্রমণ করিয়া রাজাকে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করে কিন্তু রাজ-মহিষীর সহিত যুদ্ধে পরাজিত হয়। সেই রাত্রে অযাচিতভাবে ভবানন্দের সহায়তা লাভ করিয়া সে সিন্ধুদেশ জয় করে এবং ভবানন্দের প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতা করিয়া সুন্দরীশ্রেষ্ঠা কমলাকে যবনরাজের নিকট পাঠায়। ইহা ছাড়া তাহার আর কোন পরিচয় আমরা পাই না। কবি তাহাকে বিবেক-দ্বারা দংশন করাইয়া ও নরকযন্ত্রণা ভোগ করাইয়া যেন একটু অতিরিক্ত শাস্তি দান করিয়াছেন। সে রাজভক্ত ছিল। রাজার আদেশ সে বিনা প্রতিবাদে গ্রহণ করিয়া মৃত্যুকে বরণ করিয়াছে।

বীরত্বের দিক্ দিয়া সিন্ধুরাজমহিষী আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। রাজা যুদ্ধে গেলে তাঁহাকে চিন্তিতভাবে আমরা দেখিতে পাই—

> ....বৈজয়ন্তে
> সুরেন্দ্র সুন্দরী যেন, পুরন্দর গেলা
> যবে অসুর সংগ্রামে।...—(১৬ পৃঃ)

রাজার মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া প্রথমে তিনি শোকাভিভূত হন কিন্তু পরমুহূর্তে সখীগণকে যুদ্ধে আহ্বান জানাইয়া তিনি যুদ্ধসাজে সজ্জিত হইলেন—

> পাপিষ্ঠ যবন দুষ্টে নাশিব সমূলে।
> ... ...
> .... · জ্বলিল সিন্দূর বিন্দু
> ললাটে সীমন্তিনীর মহারাগ তেজে,
> অনল নয়ন যেন কালীর কপালে।
> সাজিলা সঙ্গিনীগণে রণরঙ্গে মাতি
> রাণী বীরাঙ্গনা,—অসুর নাশিতে দেবী
> চণ্ডিকা যেমতি ভীমা দানব দলনী। —(২৬ পৃঃ)

তাঁহাদের সহিত যুদ্ধে যবনগণ পরাজিত হইয়া পলায়ন করিল।

রাণীর এই অজেয় শক্তির সম্বন্ধে ভবানন্দ কাসেমকে কহিয়াছে—

আছেন দক্ষিণাকালী পুরীর দক্ষিণে,
অলক্ষ্য অরাতি অস্ত্রে সে দেবী প্রসাদে
রাজ্ঞী অতি বীর্য্যবতী ; আগামী নিশাতে
তিনি যে কালী পূজিয়া লভেন অক্ষয়
বর বিপক্ষ দলিতে……। —(৪৩ পৃঃ)

তাঁহার প্রতি দেবদেবীর প্রীতির আরও নিদর্শন পাওয়া যায়। কালিকার ঘটে শত্রুদল অলক্ষ্যে গোরক্ত দিয়া গেলে তিনি পূজা করিয়া দেবীর সাড়া না পাইয়া যখন ব্যাকুল তখন একজন যোগিবেশী সেখানে আসিলেন—

বাম করে কমণ্ডলু, ত্রিশূল দক্ষিণে,
শুভ্রকেশ, শুভ্রকায়, শুভ্র শ্মশ্রুদল
দোলে বক্ষোপরি,—ধুমকেতু পুচ্ছ যেন
সুদীর্ঘ আকৃতি।…… —(৫৫ পৃঃ)

তিনি রমণীর কর্ণে দেবীর ঘট অপবিত্র হইবার সংবাদ দিয়া ভবিতব্যের অলঙ্ঘনীয়তার কথা কহিয়া গেলেন। পরাজয় ও মৃত্যু সুনিশ্চিত জানিয়া রাণীর সৈন্যগণ যুদ্ধ করিল। রাণী অগ্নিতে প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন।

এই কাব্যে যবনরাজ্ঞীকে মূর্ত্তিমতী দয়ারূপে চিত্রিত করা হইয়াছে। কমলা তাঁহাকে দেখিল—

…………………… হেরিলা কমলা
তারে দয়াবতী, শান্তমূর্ত্তি, দয়াজ্যোতি
যেন পবিত্র হৃদয় হতে বাহিরিছে
সদা ;………। —(৯২ পৃঃ)

এই চিত্র অঙ্কনে কবির নিজস্ব ভাবধারা পাওয়া যায়। যবনকুলের সকলেই খারাপ, সকলেই শত্রু, সকলেই নিষ্ঠুর, কবি তাহা মনে করিতে পারেন নাই। তাই রাণীর ভিতর দিয়া তিনি রমণী-হৃদয়ের স্নেহ-প্রেম-দয়া-দাক্ষিণ্য প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে দেবীর আসনে উন্নীত করিয়াছেন।

কমলার মুখ দিয়া কবি দেশের দুর্দ্দশার কারণ বর্ণনা করিয়াছেন—

একতা বিহনে কিন্তু একের আপদে
আকুল না হয় অপর কেহ, তেইত
সে সর্ব্বমঙ্গলা ভূমে অমঙ্গল এত। —(১০০ পৃঃ)

প্রকৃতির বর্ণনার ভিতর মানুষের মনোভাবের আরোপ করা হইয়াছে। যে রাত্রে ভবানন্দ শত্রুশিবিরে গেল সেই রাত্রির বর্ণনা কবি করিয়াছেন—

সুগভীর তমস্বিনী, বসুধা বধির,
জীবজন্তু মৃতপ্রায়। শৈত্য ভারাক্রান্ত
বায়ু অলস, নিশ্চল, গাঢ় অন্ধকার
রুষি আক্রমিলা বসুন্ধরা, দাঁড়াইলা
প্রকৃতিদেবী ভয়ঙ্করবেশে।… —(৩০ পৃঃ)

কাব্যটিতে আটটি সর্গ আছে। ইহাতে অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু ভাষাও আড়ষ্ট এবং ছন্দও সাবলীল নয়। অনেক স্থলেই ছন্দপতন মর্ম্মান্তিকরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

নামধাতুর প্রয়োগ দেখা যায় ; যথা—শোষিলা, সম্ভবে, আরম্ভিলা, নীরবিলা, আবরি প্রভৃতি।

অনুপ্রাসও ব্যবহৃত হইয়াছে ; যেমন—

করতলে করবাল নিষ্কোষিত করি —(২৭ পৃঃ)।
নব জলস্রোতে ভাসি যায় নব স্থানে
নিদাঘান্তে। —(৩৩ পৃঃ)

অথবা,— স্রোতস্বতী স্রোত যথা বান-সমাগমে —(১ পৃঃ)।

কতকগুলি শব্দের নূতনরূপে ব্যবহার দেখা যায় ; যেমন—হইনুম সারা।

বা— পড়িলা সকল সৈন্য সৈন্যপতি বিনে।

বা— সমুষ্ণ নিশ্বাস তার দহিছে শরীর।

অথবা— অমনি বিরোষানল উগারিল যোগী

অথবা— প্রপূর্ণ করিল ডালা।

কাব্যটিকে সার্থক রচনা বলা যায় না। কাহিনী-বিন্যাসে অনেক ত্রুটি দৃষ্টিগোচর হয়। কাব্যের নায়িকাকে তৃতীয় সর্গের পূর্ব্বে দেখা যায় না। প্রথমে কাহিনী একেবারে জমে নাই। চরিত্রগুলিও যেন সম্পূর্ণ চিত্রিত হয় নাই। বিভিন্ন চরিত্রের বিভিন্ন দিক্ প্রকাশিত হইয়াছে—কেহই যেন সম্পূর্ণ নয়। কাব্যের নায়ক যে কে তাহা বুঝিবার উপায় নাই। কারণ কমলার সহিত ভবানন্দের সাক্ষাৎ একবারও প্রদর্শন করা হয় নাই বা কমলার হৃদয়ে তাহার সম্বন্ধে কিরূপ ভাব বা অনুভূতি রহিয়াছে তাহারও প্রকাশ কোথাও

হয় নাই। কেবল ভবানন্দের বিবৃতির ভিতর দিয়া তাহার প্রণয়-কাহিনীর স্বল্প আভাস পাওয়া যায়। কাহিনী-কাব্য-হিসাবে ইহাকে সার্থক রচনা বলা চলে না।

রঙ্গমতী—কবি নবীনচন্দ্র সেন রচিত 'রঙ্গমতী' কাব্যটি ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই কাব্যটি রচনাকালে কবির ব্যক্তিগত জীবনে অনেকগুলি অঘটন ঘটিয়াছিল। উৎসর্গ-পত্রে তিনি তাহার প্রতি ইঙ্গিত করিয়া লিখিয়াছেন—"ইহার প্রত্যেক সর্গে, প্রত্যেক পৃষ্ঠায়, প্রত্যেক অক্ষরে, আমার বিপদের স্মৃতি, রোগের যন্ত্রণা, বিষাদের ছায়া এবং শোকের অশ্রু জড়িত রহিয়াছে।"

এই কাব্যটিতে শিবাজী, সায়েস্তা খাঁ প্রভৃতি ঐতিহাসিক ব্যক্তিগণকে আনিয়া একটি গাম্ভীর্য্যপূর্ণ বীরত্বব্যঞ্জক পরিস্থিতি সৃষ্টির চেষ্টা করা হইয়াছে কিন্তু ইহাতে ঐতিহাসিক সত্য কোথাও নাই। একদিকে রাজনৈতিক উত্থান-পতনের সংশয়সঙ্কুল দোলা, অপরদিকে প্রণয়ী হৃদয়ের আশা-নিরাশার বিচিত্র অনুভূতির স্পন্দন, কাব্যটিকে বীরত্বব্যঞ্জক রোমান্‌সে পরিণত করিয়াছে। ইহাকে দেশপ্রেমমুখ্য রোমান্‌সও বলা চলে। রাজনৈতিক পটভূমিকার উপর একটি যুবকের প্রণয়ী হৃদয়ের অভিব্যক্তি কাব্যটিকে বিচিত্র রূপে রসে মণ্ডিত করিয়াছে। এইরূপ ভাবের অভিব্যক্তি সে যুগের অপর কোন কাব্যে আমরা দেখিতে পাই না। সমস্ত কাব্যের মধ্যে যেন একটা জীবন-স্পন্দন, কখনও বীরত্বের পথে, কখনও স্বদেশপ্রীতির দুর্দ্দমনীয়তায়, কখনও বেদনার ঝঙ্কারে, কখনও ত্যাগের মহিমায় এবং প্রণয়ের সংশয়-দোলায় অনুভূত হয়। 'পলাশির যুদ্ধ' অপেক্ষা এই কাব্যে কবির লিপিকুশলতা অনেকখানি নিকৃষ্টতর, হৃদয়ের উচ্ছ্বাস অনেকক্ষেত্রেই কাব্যরসকে ব্যাহত করিয়াছে—বর্ণনার বাহুল্য কাব্যশ্রীকে ক্ষুণ্ণ করিয়াছে—তথাপি কবি যে কাহিনীর অবতারণা করিয়া কাব্যটির মধ্যে নূতন একটি ধারা প্রবর্ত্তনের চেষ্টা করিয়াছেন তাহা সত্যই প্রশংসাযোগ্য। কবি রঙ্গলাল তাঁহার 'কর্ম্মদেবী' কাব্যে ইতিহাসের পটভূমিকায় প্রণয়মূলক কাহিনীকে রূপ দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু তাহা ক্ষুদ্র গণ্ডির ভিতর থাকিয়া রোমান্টিক বর্ণবিন্যাসের অবকাশ পায় নাই। 'রঙ্গমতী' কাব্যটিতে রোমান্‌সের প্রাচুর্য্য কাব্যটিকে এক অভিনব রূপ দান করিয়াছে।

কাব্যের নায়ক ভাগ্যবিড়ম্বিত বীরেন্দ্র ভৃত্য শঙ্করের স্নেহে বর্দ্ধিত। পিতা মুকুটরায় চট্টগ্রামে মোগলসম্রাটের প্রতিনিধি। কিন্তু বীরেন্দ্রের খুল্লতাতের ষড়্‌যন্ত্রে মাতা গৃহত্যাগিনী। এই মাতার অভাব বালক-বয়সে বীরেন্দ্রকে অনেক বেদনা দিয়াছে। সে কত সময়ে তাঁহাকে খুঁজিয়াছে—কত সময়ে স্বপ্নে দেখিয়াছে—কত সময়ে তিনি যে প্রস্তরে বসিতেন তাহা অশ্রুজলে সিক্ত করিয়াছে। অপর বালকেরা যখন মায়ের গল্প করিয়াছে সে মাতার সন্ধান করিয়া আকুল হইয়াছে। আবার যেদিন শুনিয়াছে তাহার মাতা মৃত সেদিন তাহার জীবনে অপর একটি স্মরণীয় দিন—সেদিনটির বেদনা সে ভুলিতে পারে না। তাই মায়ের শেষ কার্য্য করিবার নিমিত্ত শঙ্করকে সঙ্গে লইয়া সে কাশীধামে যায়। সেখান হইতে নানা স্থানে ভ্রমণ করিতে করিতে সে বৃহত্তর আহ্বান শুনিতে পায়—

ভারত বীরত্ব বিনা হবে না উদ্ধার ॥ —(৬৫ পৃঃ)

তাহা স্বদেশের আহ্বান। কিন্তু তখনও প্রকৃত পথ বুঝিবার মত ক্ষমতা তাহার হয় নাই। সে দিল্লীশ্বরের সৈন্যদলে যোগ দিয়া যুদ্ধবিদ্যা আয়ত্ত করিল এবং একদিন রাত্রে সেনাপতি সায়েস্তা খাঁকে শিবাজীর অতর্কিত আক্রমণ হইতে বাঁচাইতে গিয়া আহত হইয়া শিবাজীর নিকট বন্দী হইল। বিরাট আঘাতের ভিতর দিয়া বিরাট ব্যক্তির সান্নিধ্য সে লাভ করিল। তাঁহার নিকটেই স্বদেশ-প্রেমের প্রকৃত মন্ত্র সে পাইল। শিবাজীর আকৃতিতে তাঁহার বিরাট ব্যক্তিত্ব, অদম্য তেজ ও দীপ্ত স্বদেশপ্রেম স্ফুরিত হইতেছিল—

তীব্র জ্যোতি পরিপূর্ণ উজ্জ্বল নয়ন,
তাড়িতাগ্নি ঝলসিত জলধর আভা,
... ...। —(৬৮ পৃঃ)

মোগলের দাসত্ব গ্রহণ করিবার জন্য তিনি বীরেন্দ্রকে তিরস্কার করিলেন—

·· ·· ···চল যাই সবে
ওই নীলাচল শিলা বাঁধিয়া গলায়,
ঝাঁপ দিয়া সিন্ধুজলে, হায়রে ! ডুবাই
এই আর্য্যনাম, এই তীব্র পরিতাপ !
অন্যথা কৃপাণ করে চল যাই রণে,

স্বজাতির, স্বদেশের, স্বধর্ম্মের তরে,
নিবাই কৃপাণ তৃষা যবন শোণিতে। —(৬৯ পৃঃ)

বীরেন্দ্র সেদিন তাঁহার স্বপক্ষে যোগদান করিয়া শপথ করিল, যদি তাহার অস্ত্র কোনদিন যুদ্ধবিমুখ হয় তবে—

এই কাপুরুষ ভুজ কাটি সকৃপাণ,
প্রদানিও উপহার শৃগাল কুক্কুরে। —(৭৩ পৃঃ)

শিবাজীর স্বদেশপ্রেমের জলন্ত আগুনের সংস্পর্শে যাহা আসে তাহাই প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। বীরেন্দ্রের ভাবাবেগপূর্ণ বাঙালী হৃদয়ে শিবাজীর আদর্শের আবেগ ব্যর্থ হইল না। মাতার স্মৃতিকে অন্তরের মণিকোঠায় স্থাপিত করিয়া বীরেন্দ্র স্বদেশপ্রেমের জলন্ত অগ্নিতে আত্মসমর্পণ করিল।

সকলের অলক্ষ্যে তাহার হৃদয়ে অপর একটি মূর্ত্তি বিরাজিত ছিল তাহা তাহার প্রণয়িনী কুসুমিকার। সন্ন্যাসিনীর প্রশ্নের উত্তরে সে বলিয়াছিল—

বাল-সহচরী মম, কৈশোর-সঙ্গিনী ;
যৌবনের সুখস্বপ্ন,—অশ্রান্ত বাসনা,
মরুময় জীবনের সরসী শীতল। —(৭৭ পৃঃ)

এই কুসুমিকার সহিত সে বাল্যকালে কত খেলিয়াছে, কত হাসিয়াছে, কত কাঁদিয়াছে, মারামারি করিয়াছে। শিবাজীর আদেশে দেশে প্রত্যাবর্ত্তনের সময় কালীঘাটে স্বদেশবাসীর নিকট যখন শুনিল যবনের দাসত্ব করিবার জন্য তাহার জাতি নষ্ট হওয়াতে কুসুমিকার মাতুল বীরেন্দ্রের সহিত তাহার বিবাহ দিবেন না—তখন তাহার সমস্ত হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িল। দুঃখিত-মনে শঙ্করের সমভিব্যহারে দেশে ফিরিবার কালে প্রচণ্ড ঝড়ে নৌকা ডুবিয়া গেলে সে শঙ্করকেও হারাইল। তাহার জীবনে দুঃখের অন্ত রহিল না। শঙ্করকেও সে প্রাণের অধিক ভালবাসিত—সে-ই একাধারে তাহার মাতাপিতার অভাব পূর্ণ করিত। নদীর প্রচণ্ড তরঙ্গাঘাতে ভাসিতে ভাসিতে তীরে আসিয়া চৈতন্য লাভ করিয়া সে ঐ-সকল কথাই চিন্তা করিতেছিল। চারিদিকে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনীভূত হইয়া আসিলে সম্মুখে ঝটিকাক্ষুব্ধ তরঙ্গ এবং পশ্চাতে নিবিড় অরণ্যানী দেখিয়া সে চিন্তা করিতেছিল, রাত্রিতে থাকিবার মত উপযুক্ত স্থান কোথায় পাইবে। এমন সময় এক কোমল স্পর্শ লাভ করিয়া পশ্চাতে ফিরিয়া সে দেখিল—এক বৃদ্ধা তপস্বিনী। তপস্বিনীর সাহায্যে এক কালীমন্দিরে

আশ্রয় লাভ করিয়া সে নিদ্রিত হইল ও স্বপ্ন দেখিল, কুসুমিকা যেন জলে নিমজ্জিত হইতেছে এবং তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য বীরেন্দ্র জলে নামিতে গেলে তাহার মাতা অভয়দান করিয়া তাহাকে নামিতে নিষেধ করিতেছেন। নিদ্রাভঙ্গে তপস্বিনীর নিকট সে অকপটে নিজ পরিচয় ও সকল অনুভূতির কথা ব্যক্ত করিল। তপস্বিনী কিছুই কহিলেন না। কেবল তাঁহার চক্ষু হইতে একবিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। এই তপস্বিনীই বীরেন্দ্রের মাতা—কিন্তু তিনি পুত্রের নিকট আত্মপরিচয় দেন নাই। আর কবিও তাঁহার পরিচয় গোপন রাখিয়া কাহিনীর মধ্যে বেশ একটি কৌতূহল সৃষ্টি করিয়াছেন।

পুনরায় নানা তীর্থস্থানে সন্ন্যাসিবেশে ভ্রমণ করিতে করিতে চন্দ্রশেখরে দুষ্টপ্রকৃতির মোহন্ত ও তাহার সঙ্গিগণের হস্ত হইতে বীরেন্দ্র একটি রমণীকে উদ্ধার করে। সেই রমণী কুসুমিকা। উভয়ে উভয়ের পরিচয় পাইয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল—

আনন্দ মূরতি দুই! যুগল বদনে
ভাসিছে আনন্দ রাশি পশ্চিম তপনে,
ঝরিছে নয়ন পথে সলিল ধারায়। —(১২৩ পৃঃ)

বীরেন্দ্রের জীবনে আকস্মিকতার শেষ নাই। রঙ্গমতীর বনে বসিয়া একদিন সে যখন কুসুমিকার সহিত বাল্যক্রীড়ার কথা ভাবিতেছিল এমন সময় 'বাঘ' 'বাঘ' চীৎকারে নিকটে গিয়া দেখিল চন্দ্রশেখরের সেই দুশ্চরিত্র ব্রাহ্মণকে বাঘ নিহত করিয়া লইয়া গিয়াছে। এমন সময়ে পর্ত্তুগীস দস্যুগণের দলপতি বেঞ্জামিন তাহার পিতৃব্য মরকত রায় কর্ত্তৃক প্ররোচিত হইয়া নরহত্যার দায়ে অভিযুক্ত করিয়া বীরেন্দ্রকে আক্রমণ করিল। উভয়ের মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ হইল। বীরেন্দ্র শুধু সাহসী এবং বীর ছিল না—কৌশলীও ছিল। বেঞ্জামিন যখন তাহার বক্ষের উপর বসিয়া ছুরিকাঘাত করিতে গেল তখন শত্রুর অলক্ষ্যে তাহার কটিবন্ধ হইতে অপর একটি ছুরিকা লইয়া বীরেন্দ্র তাহাকে আহত করিল। তাহার বক্ষের উপর বসিয়া এবং পিতৃশত্রুকে করতলে পাইয়াও বীরেন্দ্র কিন্তু মহত্ত্ব প্রদর্শন করিল। সে শত্রুকে ছাড়িয়া দিল।

বীরেন্দ্রের চতুর্দ্দিকে পুনরায় ষড়্‌যন্ত্রের জাল বিস্তৃত হইয়াছে। মরকত রায় তাহাকে হত্যার পথ খুঁজিতে লাগিল, তাহাতে রাজ্যও তাহার হস্তগত হইবে, কুসুমিকাও করতলগত হইতে পারে। তাই বীরেন্দ্রকে নিধনের কার্য্যে

বেঞ্জামিনের সাহায্য সে গ্রহণ করিয়াছে। আবার কুসুমিকার প্রতি বেঞ্জামিনেরও দৃষ্টি পড়িয়াছে। সুতরাং কি প্রণয়ের পথে, কি রাজ্যের পথে তাহার প্রতিদ্বন্দ্বিদ্বয় ষড়্‌যন্ত্রে লিপ্ত হইয়া তাহাকে অপসারণের চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু বীরেন্দ্র যেমন নির্ভীক ও বীর, সেইরূপ বিশ্বাসপ্রবণ। মরকত রায় বেঞ্জামিনের চেষ্টা ব্যর্থ হইতে দেখিয়া শুভানুধ্যায়ীর ছদ্ম-আবরণে তাহার নিকটে আসিয়া দিল্লীপতির সৈন্যবলের সহিত একযোগে পিতৃশত্রু পর্ত্তুগীসগণকে অপসারণ করিবার জন্য উত্তেজিত করিতে থাকিলে সে তাঁহাকে বিশ্বাস করিল। কিন্তু মোগলের সহায়তা করিতে প্রথমে স্বীকৃত হইতে পারিল না। কিন্তু অবশেষে মরকত রায়ের যুক্তিকে শুভ মনে করিয়া দিল্লী-পতির সাহায্যে যাত্রা করিল। দিল্লীর সৈন্যদলের সেনাপতি সায়েস্তা খাঁকে সে নিজের পরিচয় দিয়া একদল সৈন্য লইয়া যুদ্ধে গিয়া কৌশলে যুদ্ধে জয়লাভ করিল।

যুদ্ধের বর্ণনা—

হলো ধূমময়, বিরাট গর্জ্জনে
কাঁপিল সমুদ্র, কম্পিতাচল;
ঘোর আর্ত্তনাদে, নিবিড় আঁধারে,
পরিপূর্ণ হলো ফেণীর জল।
ওকি দিকদাহ?—উঠিল জ্বলিয়া,
নিবিড় তিমির ফেণীর নীরে,
গর্জ্জিল গম্ভীরে বন্দুক হাজার,
শিলাবৃষ্টি হলো দক্ষিণ তীরে।—(১৯৬-৯৭ পৃঃ)

সায়েস্তা খাঁ নিজে তাঁহাকে পুরস্কার দিবার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়া অনেক অনুসন্ধান করিলেন কিন্তু যুদ্ধের পর বীরেন্দ্র কোথায় গিয়াছে কেহই বলিতে পারিল না। শিবাজীর নিকট যে প্রতিজ্ঞা সে করিয়াছিল, মোগলের স্বপক্ষে অস্ত্রধারণ করিবে না, তাহাই অটুট রাখিবার জন্য পিতৃশত্রু পর্ত্তুগীসগণকে পরাজিত করিয়া এবং আহত হইয়া সে যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়াছিল। সে সময় পুরাতন স্নেহশীল ভৃত্য শঙ্করের সহিত তাহার সাক্ষাৎলাভ ঘটে। শঙ্কর তাহাকে শুশ্রূষা করিতে লাগিল।

দেশের ডাককেও সে যেমন কোনদিন উপেক্ষা করিতে পারে নাই, প্রণয়ের

পথেও যখন আহ্বান আসিল সে নিজের শরীরের অক্ষমতা ও অসুস্থতা সত্ত্বেও কুসুমিকার উদ্দেশ্যে যাত্রা করিল। কুসুমিকা লিখিয়াছে—

> ……………অষ্টমী নিশিতে
> নাহি দেখা দাও যদি, দেখিবে না আর
> অভাগিনী কুসুমেরে।………… —(২২০ পৃঃ)

আহত অবস্থায় পথ চলিতে বীরেন্দ্রের অত্যন্ত কষ্ট হইতে লাগিল। পথও যেন শেষ হয় না। প্রভুবৎসল শঙ্কর তাহার কষ্ট দেখিয়া একটি বালিকার নিমিত্ত উন্মত্ততা ত্যাগ করিয়া শরীরের প্রতি যত্ন লইতে কহিলে, সে উত্তর দিল—

> জনক জননী—আর বালিকা কুসুম।
> ধরাতলে এই তিন দেবতা আমার। —(২২৩ পৃঃ)

প্রেমের ক্ষেত্রে তাহার নিষ্ঠা তাহার চরিত্রকে মাধুর্য্যে মণ্ডিত করিয়াছে। দুর্ব্বল মস্তিষ্কে নানারূপ চিন্তা করিতে করিতে সে আকাশপটে একবার শিবাজীর ত্রিশূল দেখিতে পাইল, একবার কালিকা-মূর্ত্তি দেখিতে পাইল—আবার সব মিলাইয়া গেল। এই স্থানে কপালকুণ্ডলার প্রভাব পড়িয়াছে বলিয়া মনে হয়। অবশেষে একটা ক্রন্দন-ধ্বনিতে বিচলিত হইয়া ছুটিয়া গৃহে প্রবেশ করিয়া বরবেশে ঢেঁকী পঞ্চাননকে বসিয়া থাকিতে দেখিতে পাইল এবং অচেতন অবস্থায় কুসুমিকাকে শায়িত দেখিল। বীরেন্দ্র বিহ্বলভাবে কুসুমিকাকে বক্ষে লইয়া কহিল—

> ………কুসুম!
> জীবনের এত আশা, এত ভালবাসা,
> ফুরাল কি এইরূপে এইরূপে হায়!
> বনে উঠি, বনে ফুটি, ঝরিল কি বনে? —(২৪২ পৃঃ)

আহত শরীরের উপর মানসিক উত্তেজনা সে সহ্য করিতে পারিল না। তাহার মস্তকের আহত স্থান হইতে রক্ত ক্ষরিত হইতে লাগিল। সন্ন্যাসিনী আসিয়া বীরেন্দ্রের মস্তক ধারণ করিলেন। কুসুমিকা চেতনা লাভ করিয়া তাহাকে ডাকিলে সে চক্ষু খুলিল—তাহার গণ্ডদেশ বহিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল। কুসুমিকা সন্ন্যাসিনীকে তাহার মাতা বলিয়া পরিচয় দিলে সে একবার 'মা' বলিয়া ডাকিল—তারপর সব শেষ হইল। শেষ দৃশ্যটি যেন নাটকীয় হইয়া গিয়াছে।

বীর, নির্ভীক, সাহসী, কর্ত্তব্যে কঠোর, প্রেমে কোমল বীরেন্দ্রের চরিত্র কবি আদর্শরূপে অঙ্কিত করিয়াছেন। অনেক দুঃখকষ্ট আসিয়াছে তাহার জীবনে, অনেক ষড়্‌যন্ত্র ও লাঞ্ছনা তাহাকে ধ্বংসের পথে লইবার জন্ত চেষ্টা করিয়াছে কিন্তু তাহার অমল দীপ্তি কোথাও ম্লান হয় নাই। আবার আদর্শ চরিত্র করিতে গিয়া কবি চরিত্রটিকে নির্জ্জীব করেন নাই। মানবোচিত অনুভূতি ও আবেগের স্ফুরণ তাহার চরিত্রকে জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছে—এ স্থানেই কবির কৃতিত্ব সবচেয়ে বেশী।

নায়িকা কুসুমিকা সরলমতি বালিকা। বাল্যকাল হইতে সে বীরেন্দ্রের সহিত প্রণয়ে আবদ্ধ। শৈশব-ক্রীড়ায় যে সৌহার্দ্দ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহাই প্রেমে পরিণত হইল। বীরেন্দ্রের কথায় প্রথম আমরা তাহার পরিচয় লাভ করি। তাহাদের শৈশবের ক্রীড়ামধুর দিনগুলির সংবাদ পাই। একদিন দুইজনে মাটী দিয়া পুতুল তৈয়ারী করিয়াছিল। বীরেন্দ্র নিজের পুতুলকে সুন্দর বলাতে কুসুমিকা পদাঘাতে বীরেন্দ্রের পুতুল ভাঙ্গিয়া দিল আর বীরেন্দ্রও কুসুমিকার পুতুলকে পর্ব্বতগহ্বরে নিক্ষেপ করিল। উভয়ের ভিতর তখন মারামারি বাধিয়া গেল। আবার একদিন জলের মধ্যে একটি কুসুম দেখিয়া কুসুমিকা তাহা লইবার বাসনা প্রকাশ করিলে বীরেন্দ্র জলে নামিয়া কুসুম তুলিয়া রহস্য করিয়া যখন কহিল যে তাহার পা ধরিয়া কেহ টানিতেছে এবং জলের ভিতর মস্তক নিমজ্জিত করিয়াছিল, ব্যাকুল-হৃদয়ে বালিকা তখন জলে ঝাঁপ দিয়া প্রাণ-বিসর্জ্জনের চেষ্টা করিয়াছিল। এই-সকল দিনের কথা বীরেন্দ্রের হৃদয়ে সর্ব্বক্ষণ জাগিয়া রহিয়াছে আর তাহারই অনুরাগ-আলোকে আমাদের সামনে প্রতিভাত হইয়াছে। এই কুসুমিকাকে চন্দ্রশেখর-পর্ব্বতে মোহন্তের গৃহে অচৈতন্য অবস্থায় প্রথম দেখি—

> শোভিছে বদন যথা সুধাসিক্ত শশী,
> শারদ শিশিরে সিক্ত কিম্বা সরোজিনী। —(১১১ পৃঃ)

তাহার চেতনা ফিরিলে প্রথমেই 'প্রাণনাথ' বলিয়া ডাকিল ও সন্ন্যাসীকে দেখিয়া অপ্রস্তুত হইল। তারপর সন্ন্যাসীর নিকট বীরেন্দ্রের সহিত মৃত্যুর পূর্ব্বে তাহার সাক্ষাৎ হইবে কি না জিজ্ঞাসা করিয়া যখন শুনিল সন্ন্যাসীই বীরেন্দ্র তখন তাহার মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। দেশের লোক বীরেন্দ্রকে জাতিভ্রষ্ট বলিয়াছে—আত্মীয়-পরিজন বীরেন্দ্রের সহিত কুসুমিকার বিবাহ দিবে

না স্থির করিয়াছে কিন্তু বালিকা-হৃদয়ের গভীর প্রণয়কে মুছিতে পারে নাই। সে শয়নে স্বপনে বীরেন্দ্রকেই ধ্যান করিয়াছে। সন্ন্যাসিনীর নিকট কুসুমিকা একদিন কহিয়াছিল যে বীরেন্দ্র মাতার শেষকৃত্য করিবার জন্য কাশীধামে যাত্রা করিলে—

> ....সেই দিন হতে
> তপস্বিনী আমি এই সংসার আশ্রমে,
> কুসুম স্তবকে যেন বিশুষ্ক কুসুম—
> বীরেন্দ্রের ভালবাসা তপস্যা আমার। —(১৮৫ পৃঃ)

সে প্রত্যহ পুষ্প চয়ন করিয়া, মালা গাঁথিয়া দেবীর পূজা করিয়াছে। অবশেষে চন্দ্রশেখরে সে জীবনের শেষ কামনা জানাইবার জন্য গিয়া সাধনার সিদ্ধিরূপে বীরেন্দ্রের সাক্ষাৎ পাইয়াছিল। তারপর পুনরায় আরম্ভ হইল তাহার দুঃখের দিন। কুসুমিকার বিবাহের নিমিত্ত তাহার পিতা কিছু অর্থ রাখিয়া গিয়াছিলেন—মাতুল তাহাই আত্মসাৎ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন এবং সেইজন্য কোন অপদার্থ পাত্রের সহিত কুসুমিকার বিবাহের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এই চেষ্টায় কুসুমিকা মর্মান্তিক বেদনায় মুহ্যমান হইয়া পড়িল। অর্থের প্রতি তাহার কোন আকর্ষণ নাই। কিন্তু বীরেন্দ্রকে লাভ করিবার পথে মাতুলের সেই অর্থলোভই বাধা হইয়া দাঁড়াইল—

> নাহি হইতাম যদি ঐশ্বর্য্য আকর,
> বিদীর্ণ হতো না আজি হৃদয় আমার। —(১৮২ পৃঃ)

সীতার ন্যায় স্বামীর সহিত বনে বনে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে তাহার বাসনা হয়। ভোগ-ঐশ্বর্য্য বীরেন্দ্র ব্যতীত তাহার ভাল লাগে না। সীতার পঞ্চবটী বনে ভ্রমণ-বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া সে কহিল—

> আমার একই ঈর্ষ্যা একই বাসনা—
> সেই বনবাসিনী, সেই বনবাস!
> সেইরূপে ভগবতি, ভ্রমি বনে বনে
> প্রাণেশের ছায়ারূপ,............। —(১৮৩ পৃঃ)

কিন্তু তাহার আশেপাশে মক্ষিকার দল জুটিয়া গেল। মরকত রায়ের দৃষ্টি পড়িল, বেঞ্জামিনের মনে বাসনা জাগিল, মোহন্তেরও চেষ্টা চলিল। মাতুল অবশেষে ঢেঁকি পঞ্চাননের সহিত তাহার বিবাহের ব্যবস্থা করিলেন—মরকত

রায়ের চক্রান্তেই ইহা সম্ভব হইল—মরকত রায় পঞ্চাননকে অর্থ দিয়া কুসুমিকাকে লাভ করিবার উপায় স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন। অষ্টমীর রাত্রে তাহার বিবাহের লগ্ন স্থির হইল। কুসুমিকা মন্দিরের পুরোহিতের সাহায্যে বীরেন্দ্রকে তাই আহ্বান জানাইয়াছে। তারপর যুদ্ধক্ষেত্রের সংবাদ পাইবার পর হইতে কুসুমিকা সন্ন্যাসিনীরূপে জীবন কাটাইতে লাগিল। কখনও ফুলে ফুলে সাজিত, কখনও নিরাভরণা তপস্বিনী। অষ্টমীর নিশিতে বীরেন্দ্রকে অনাগত দেখিয়া বিবাহ স্থগিত রাখিবার উদ্দেশ্যে সন্ন্যাসিনী-প্রদত্ত ঔষধ দ্বারা সে চৈতন্য হারাইয়া মৃতবৎ পড়িয়া ছিল। এই স্থানে 'রোমিও এণ্ড জুলিয়েট'-এর প্রভাব অনুভূত হয়। বীরেন্দ্র গৃহে ঢুকিয়া তাহাকে দেখিল—

> পড়ে আছে কক্ষতলে সুষমার ছবি—
> অচেতন কুসুমিকা, কৌমুদী-প্রতিমা।
> একটী বীণার তান নিশীথ বিপিনে
> মূর্ত্তিমতী যেন! এক খণ্ড চন্দ্ররশ্মি
> পড়ে আছে যেন কোনো আঁধার কুটীরে। —(৯৬ পৃঃ)

এই স্থানে বর্ণনাটী এক অপার্থিব সুষমায় পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। কুসুমিকার চেতনা ফিরিলে আহত বীরেন্দ্রকে অচৈতন্যবৎ দেখিয়া সে ব্যাকুলপ্রাণে অনেক কথা কহিল, অবশেষে বীরেন্দ্রের প্রাণবিয়োগের সহিত নিজের প্রাণও বিসর্জ্জন দিল।

কুসুমিকা-চরিত্রে বিবিধ গুণাবলী বা অনেক ঘটনার সংঘাত নাই। সে প্রেমিকা এবং প্রেমের প্রতি নিষ্ঠার জন্য কখনও হাসিয়াছে, কখনও কাঁদিয়াছে, কখনও আশায় উৎফুল্ল হইয়াছে, কখনও নিরাশায় ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। তাহার প্রেমের গভীরতা এবং তাহারই অভিব্যক্তিতে চরিত্রটি উজ্জ্বল ও প্রাণময়।

এই কাব্যে সন্ন্যাসিনীর চরিত্রটি রহস্যময়। শঙ্করের মুখে বীরেন্দ্র শুনিয়াছে তাহার জন্মের পূর্ব্বে মাতা সপত্নীর গঞ্জনায় গৃহত্যাগ করিতে বাধ্য হন এবং অরণ্যের মধ্যে পুত্র প্রসব করিয়া অবস্থান করিতে থাকিলে শিশু বীরেন্দ্রকে বধ করিয়া নিজের রাজ্যপ্রাপ্তির পথ সুগম করিবার বাসনায় মরকত রায় পুনরায় তাহাকে গৃহে আনে এবং পুত্রকে রাখিয়া তাহার সহিত বীরেন্দ্রের মাতাকে কাশী-ধামে তীর্থ করাইতে লইয়া যায়। সে স্থান হইতে ফিরিয়া মরকত রায় বীরেন্দ্রের মাতার মৃত্যু সংবাদ রটনা করে। তারপর তাহার সংবাদ কেহই জানে না।

বীরেন্দ্র তরঙ্গাঘাতে অপরিচিত তটে পৌছিলে আশ্রয়ের জন্য যখন চিন্তা করিতেছিল তখন একটি সন্ন্যাসিনী-মূর্ত্তি আসিয়া তাহাকে সস্নেহে আহ্বান জানাইয়া মন্দিরে আশ্রয় দিল। তাঁহার স্নেহোজ্জ্বল তাপস মূর্ত্তির মধ্যেও বিষাদের অশ্রুসজল একটি মূর্ত্তি মাঝে মাঝে ভাসিয়া উঠিয়াছে কিন্তু তিনি সে সম্বন্ধে কাহাকেও কিছু জানান নাই। বীরেন্দ্রের নিকট তাহার মাতার জন্য তাহার হৃদয়ের ব্যাকুলতার কথা শুনিয়াও তপস্বিনী আত্মপরিচয় দেন নাই। কবিও তাঁহার রহস্যের আবরণ উন্মোচন করেন নাই। তিনি যেন মূর্ত্তিমতী স্নেহ—কখনও বীরেন্দ্রকে ক্রোড়ে টানিয়া লইয়াছেন—কখনও কুসুমিকাকে সান্ত্বনা দিয়াছেন, কখনও আশা দিয়াছেন এবং সাহায্য করিয়াছেন। বীরেন্দ্র পর্ত্তুগীস দমনের জন্য মোগল সৈন্যে যোগদানের পর হইতে এই সন্ন্যাসিনীকে আমরা কুসুমিকার নিকটেই মন্দিরে অবস্থান করিতে দেখি এবং বালিকা কুসুমিকার সুখদুঃখের সঙ্গিরূপে তাঁহার স্নেহময়ী মূর্ত্তি দেখিতে পাই। অবশেষে কাব্যের সমাপ্তি দৃশ্যে বীরেন্দ্র চেতনা হারাইলে তিনি তাহার মস্তক ক্রোড়ে লইলেন। সেই সময় বীরেন্দ্র তাঁহার পরিচয় পাইল। কিন্তু তাহা মাধুর্য্যে পূর্ণ করিতে পারিল না। বীরেন্দ্র ও কুসুমিকা উভয়েই ইহধাম ত্যাগ করিলে সন্ন্যাসিনী উন্মাদিনীর ন্যায়—

> অকস্মাৎ অট্টহাসি উঠিলা হাসিয়া,
> এক লম্ফে সাপটিয়া কক্ষের মশাল,
> বসাইলা দৃঢ় করে মর্কটের বুকে,
> রাক্ষসীর মত তারে ফেলিয়া ভূতলে। —(২৪৫ পৃঃ)

মাতৃহৃদয়ের স্নেহের সম্পর্ক যখন শেষ হইল তখন তিনি পিশাচিনীরূপে তাঁহার পশ্চাতের দুষ্টগ্রহকে ধ্বংস করিলেন।

প্রভুবৎসল ভৃত্য শঙ্কর আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। সে তাহার সমস্ত প্রাণ দিয়া বীরেন্দ্রকে পালন করিয়াছে এবং সমস্ত বিপদ্-আপদ্, দুঃখ-কষ্ট নিজের বুক দিয়া দূরে রাখিবার চেষ্টা করিয়াছে। বীরেন্দ্রকে সে সকল অবস্থায় ছায়ার মতন অনুসরণ করিয়াছে। কিন্তু যখন জীবন-মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াইয়া সে অনুভব করিল বীরেন্দ্রের নিকট থাকিলে বীরেন্দ্রের ক্ষতি হইতে পারে তখন বীরেন্দ্রকে বাঁচাইবার জন্যই নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে নিজেকে সমর্পণ করিল। নৌকারোহণে যাইবার কালে ঝটিকা উঠিলে বীরেন্দ্র তাহার কাপড় দিয়া

বৃদ্ধকে বাঁধিয়া লইয়া জলে ঝাঁপ দিলে বৃদ্ধ বুঝিল তাহার ভার বহিতে গিয়া বীরেন্দ্র হয়ত তীরে উঠিতে সক্ষম হইবে না। তখন সে বীরেন্দ্রের অলক্ষ্যে বন্ধন খুলিয়া তরঙ্গের প্রবল আন্দোলনের ভিতর নিজেকে ভাসাইয়া দিল। কিন্তু সে মরিল না। ঢেউ-এর ধাক্কায় তীর পাইয়া এবং চৈতন্যলাভ করিয়া সে পুনরায় বীরেন্দ্রের সন্ধান করিতে লাগিল। অবশেষে মোগলের সহিত পর্ত্তুগীসের যুদ্ধস্থানে তাহার সাক্ষাৎ পাইবার আশায় গিয়া আহত বীরেন্দ্রকে নিজ কুটীরে আনয়ন করিয়া শুশ্রূষা কারতে লাগিল। কুসুমিকার আহ্বানে পথ চলিবার কালে সে বীরেন্দ্রকে অনেক উপদেশ দিল কিন্তু ব্যর্থ হইল। বীরেন্দ্রকে সে পুত্রের অধিক স্নেহ করিত। শিশুকালে বীরেন্দ্রের মাতা যে বিশ্বাস ও ভরসা লইয়া তাহার হস্তে শিশুকে সমর্পণ করিয়াছিলেন সেই বিশ্বাসের মর্য্যাদা সে রাখিয়াছিল। কর্ত্তব্য কার্য্য করিতে সে কখনও অবহেলা করে নাই। নিজ প্রাণ তুচ্ছ করিয়াও সে কর্ত্তব্যর পথে চলিয়াছে। প্রভুপুত্র বীরেন্দ্রের কল্যাণ-কামনা এবং কল্যাণ-সাধন করাই যেন তাহার সমস্ত অন্তরের একমাত্র সাধনা। এত বড় হৃদয়, এতখানি আন্তরিকতা, এত গভীর স্নেহ তাহার চরিত্রকে ভৃত্যের স্তর হইতে উর্দ্ধে তুলিয়াছে। বীরেন্দ্র সন্ন্যাসিনীর নিকট তাহার সম্বন্ধে বলিয়াছিল—

............কিন্তু হতভাগ্য
বীরেন্দ্রের জীবনের অর্দ্ধেক শঙ্কর। —(৩২ পৃঃ)

নিজ কার্য্যকলাপ দ্বারাই শঙ্কর বীরেন্দ্রের জীবনের অর্দ্ধেকরূপে গণ্য হইতে পারিয়াছিল।

কাব্যে পঞ্চাননের বর্ণনা দিয়া এবং তাহার সহিত বীরেন্দ্রের কথোপ-কথনের মধ্যে কবি একটু হাস্যরস আনিবার চেষ্টাও করিয়াছেন। পঞ্চাননের আকৃতি—

শ্যাম বর্ণ, খর্ব্বাকৃতি, নিতান্ত সংশয়
শরীরের দৈর্ঘ্য কিম্বা নেমি উদরের
দীর্ঘতর? শোভিতেছে স্ফীত মহোদর,
চর্ম্মাবৃত তানপুরার তুম্বি মনোহর।
চতুষ্কোণাকৃতি মুখে নয়ন যুগল
ভাসমান পূর্ণচক্র! হায় নাসিকার,

নয়নের সন্ধিস্থান নাই নিদর্শন
তদধে ভীষণ মূর্তি, জুড়িয়া বদন। —(৯৯ পৃঃ)

অপহৃতা রমণীর সন্ধান বীরেন্দ্রকে বলিয়া সে যখন ছুটিয়া পলাইল তখন—

মুহূর্ত্তে অদৃশ্য ! কিন্তু বহু দূর হতে
শুনা গেল ডক, ডক উদরের ধ্বনি। —(১০৮ পৃঃ)

একটি ক্ষুদ্র কথোপকথনের মধ্যে হাস্যরসের অবতারণা করিয়া কবি কাব্যে একটা বৈচিত্র্য আনিয়াছেন।

কাব্যটির মধ্যে অনেক ঘটনাস্রোত, অনেক চরিত্রের সমাবেশ, অনেক দেশভ্রমণের বর্ণনা স্থান পাইয়াছে। ইহাতে কাব্যে যেমন বিস্তৃতি ও বৈচিত্র্য আসিয়াছে তেমনি মানব-মনের বিভিন্ন বৃত্তির উন্মেষ ও অভিব্যক্তির দ্বারা প্রাণসঞ্চার হইয়াছে। প্রাকৃতিক দৃশ্যাদির বর্ণনাগুলি স্থানে স্থানে প্রাণময় হইয়া মানুষের ন্যায় সুখ-দুঃখ বোধ করিতেছে বলিয়া মনে হয়। তাহারা যেন মানবের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন। স্থানে স্থানে সঙ্গীতের সমাবেশে কাব্যটি সরস হইয়া উঠিয়াছে। প্রথম হইতেই কাব্যটির মধ্যে একটা কৌতূহল-উদ্দীপক পরিবেশ দেখা যায়। কিন্তু কবির উচ্ছ্বাস ও আবেগ মাঝে মাঝে অতি নাটকীয় ভাবের ও দৃশ্যের অবতারণা করিয়া কাব্যরস ক্ষুণ্ণ করিয়াছে। স্থানে স্থানে বর্ণনা-বাহুল্য কাব্যটির কাহিনী-অংশকে শ্রীভ্রষ্ট করিয়াছে। তবে শেষ কথা ইহাই বলা চলে যে কবি অপেক্ষাকৃত সংযতভাবে লেখনী চালনা করিলে কাব্যটি বাংলা-সাহিত্যে একটি উজ্জ্বল রত্ন হইয়া থাকিতে পারিত। সর্ব্বত্র সার্থকতা দেখাইতে না পারিলেও কাহিনীকাব্য-হিসাবে রঙ্গমতীকে ব্যর্থ বলা যায় না।

গানগুলি ছাড়া কাব্যটি সম্পূর্ণই অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত। ভাষার ক্ষেত্রে স্থানে স্থানে মাইকেলের ও হেমচন্দ্রের প্রভাব দৃষ্ট হয়। তবে মাইকেলের ভাষার ওজস্বিতা কবি আয়ত্ত করিতে পারেন নাই। ছন্দের ব্যবহারেও স্থানে স্থানে ত্রুটি চোখে পড়ে। কাহিনীতে শঙ্কর, বীরেন্দ্র প্রভৃতি চরিত্রে স্কটের প্রভাব অনুভূত হয়। ইহাতে ছয়টি সর্গ আছে। কাব্যে একই শব্দের বহুল ব্যবহারে স্থানে স্থানে রসহানি ঘটিয়াছে। 'হায়' শব্দটির উপর কবির অত্যন্ত ঝোঁক লক্ষণীয়; যথা—

······আজি কি বলিব হায় !
বিরাজে তথায় আজি, প্রাচীরের স্থলে,

উচ্চ মহীরুহচয়, প্রতিবিম্ব পত্রে
পত্রে শুধাংশুর কর। আজি তথা হায়!
বিবর শয্যায় সুপ্ত মৃগেন্দ্র কেশরী,
ভ্রমিতেছে ইতস্তত শার্দ্দূল প্রহরী! —(৪২ পৃঃ)

অথবা— ······ হায়! উন্মত্তের মত
ঝাঁপ দিতে চাহিলাম সমুদ্রের জলে,
তুলিতে সে রূপরত্ন, অকস্মাৎ হায়!
শুনিনু আকাশবাণী ······ —(৪৭-৪৮ পৃঃ)

একই শব্দের একাধিকবার ব্যবহার করিয়া কবি ভাবকে জোরালো করিতে চেষ্টা করিয়াছেন—

সেই দিন হতে মাতঃ হায়! কতদিন,
কতদিন? বোধ হয় প্রতিদিন,··· —(৫৯ পৃঃ)

অথবা— দস্যু আমি! আমি দস্যু মহারাষ্ট্রকুলে। —(৭০ পৃঃ)

মহামোগল কাব্য—দুর্গাচন্দ্র সান্ন্যাল 'মহামোগল-কাব্য' নাম দিয়া একটি কাব্য রচনা করেন। ইহা তিনটি খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে ঔরঙ্গজীবের চরিত্র (১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে) বর্ণিত হইয়াছে। দ্বিতীয় খণ্ডে 'শিবজী পর্ব্ব' (১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে) নাম দিয়া শিবাজীর শিশুকাল হইতে সিংহাসনে অধিরোহণ পর্য্যন্ত স্থান পাইয়াছে। তৃতীয় খণ্ড 'জয়সিংহ পর্ব্ব' (১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দ) নামে অভিহিত। ইহাতে জয়সিংহের শিবাজীর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা এবং শিবাজীর স্বদেশনিষ্ঠা ও স্বজাতিপ্রীতি দ্বারা তাঁহার মনোভাবের পরিবর্ত্তন চিত্রিত হইয়াছে।

কবি এই কাব্যটিকে মহাকাব্য-রূপে রচনা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু মহাকাব্যের লক্ষণ সম্বন্ধে প্রাচীন মতবাদ পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। ইংরাজী সাহিত্যের প্রভাব তখন কাব্যের সর্ব্ব ক্ষেত্রেই আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। এই কাব্যের উপর সেইরূপ প্রভাবই দৃষ্ট হয়। বিভিন্ন জাতির জীবনালেখ্য বর্ণনা করিয়া তাহারই পটভূমিকায় জাতীয় ইতিহাসকে অঙ্কিত করিবার চেষ্টা এই কাব্যে দেখা যায়। কিন্তু ইহাতে কবি সার্থকতা দেখাইতে পারেন নাই।

প্রথমে খণ্ডের বিজ্ঞাপনে কবি তাঁহার উপর মাইকেল মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র ও মিণ্টনের প্রভাব স্বীকার করিয়াছেন। বীররসাত্মক কাব্য রচনা

করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল এবং সেইজন্য পুরাণের কাহিনী না লইয়া তিনি ঐতিহাসিক ঘটনাকে তাঁহার বিষয়বস্তু করিয়াছেন। প্রথম খণ্ডে যে ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন সে সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন—

"দেশ কাল এবং ব্যক্তি বিবেচনা করিয়া এই সমস্ত গ্রন্থে অনেক যাবনিক শব্দ প্রয়োগ করিতে বাধ্য হইলাম। পরন্তু সেই সকল শব্দের বাঙ্গালা অর্থও তৎপার্শ্বে লিখিয়াছি সুতরাং অর্থবোধের কষ্ট হওয়া সম্ভাবিত নহে।"

বীররসকেই তিনি কাব্যে প্রাধান্য দিবার বাসনা করিয়াছিলেন—

সুমিষ্ট ভৈরব রাগে চড়াইয়া বীণা,
মম হিতে বীররসে গাও পদ্মাসীনা! —(।৵০ পৃঃ)

তারপর বাল্মীকি-বন্দনা, ব্যাস-বন্দনা, বঙ্গভাষা-বন্দনা সন্নিবেশিত হইয়াছে। অবশেষে কল্পনাদেবীর বন্দনায় গ্রন্থ-রচনার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কবি লিখিয়াছেন—

ইতিহাস কাব্য সুধা মথিয়া যতনে;
বিতরি মোহিনীরূপে তোষ বঙ্গজনে॥ —(॥৶০ পৃঃ)

এই কাব্যে কবি ঔরঙ্গজীবের ক্রূর চরিত্রের ছবি ফুটাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। কাব্যের মধ্যে কিন্তু চরিত্র-বিশ্লেষণ অপেক্ষা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বর্ণনা অধিক হওয়াতে কাব্যের ভারসাম্য নষ্ট হইয়াছে।

প্রথমেই হিমালয়ের বর্ণনা—

ভারত উদীচ্য প্রান্তে বিস্তৃত শাশ্বত
নিসর্গ-নির্ম্মিত উচ্চ অভেদ্য প্রাচীর!
শত কাব্যে গীয়মান মহিমা আকর
চির হিমাবৃত শীর্ষ খ্যাত হিমাচল। —(১ পৃঃ)

বর্ণনাতে যেন প্রাণ নাই—কতকগুলি কথার সমষ্টি। কাশ্মীরের বর্ণনায়ও এই ক্রটি দৃষ্ট হয়।

কাশ্মীরে কাশ্যপ-হ্রদে অবস্থিত শাঃজেহান নির্ম্মিত শাঃমীনার প্রাসাদে থাকিয়াও কিন্তু ভারতসম্রাট্ ঔরঙ্গজীবের মনে শান্তি নাই। তিনি অসুস্থও বটে। নিজ দুরদৃষ্টের কথা তিনি ভাবিতেছেন। তাঁহার সকলের প্রতিই অবিশ্বাস। যে আত্মীয়স্বজনকে বিশ্বাস করিয়া অপরে শত্রুকে দমন করে তিনি সেই আত্মীয়-পরিজনকে অবিশ্বাস করিয়া শত্রুতে পরিণত করিয়াছেন। তিনি নিজেই আত্মবিশ্লেষণ করিয়া চিন্তা করিতেছেন—

আত্মজন-বলে লোক পরে করে জয়
আমি করি পর-বলে আত্মজন ক্ষয়।
স্বজন বিপক্ষ মম, স্বপক্ষ নিস্পর
কালে হইতে পারে তারা অনিষ্ট আকর। —(২১ পৃঃ)

তাঁহার মনে হয় তাঁহার অসুস্থতার সংবাদ জানিয়া সকলেই তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়্‌যন্ত্র করিতেছে। তাই তিনি পরদিবস হইতে দরবারে যাইবার সংবাদ ঘোষণা করিলেন। আকবরের নির্ম্মিত আশ্‌মান-সানি গৃহে দরবার বসিত। সেখানে যাইবার পথে লোকে ঔরঙ্গজীবকে দেখিবার জন্য ভিড় করিয়া দাঁড়াইল। ঔরঙ্গজীব শুভ্র বস্ত্র পরিধান করিয়া চলিলেন—

পরিহিত শ্বেত বস্ত্র শ্বেতোষ্ণীষ শিরে,
ভূষণ-বিহীন দেহ স্বভাবে সুন্দর।—(৩৭-৩৮ পৃঃ)

তিনি দরবারে যে বক্তৃতা দিলেন তাহাতে প্রজাগণের প্রতি তাঁহার দরদ ব্যক্ত হইল। কিন্তু মনে মনে তিনি স্বার্থপর ও শঠ। তাঁহার বক্তৃতা—

বিষয়বিরাগী আমি অন্তরে ফকীর
কেবল রাজত্ব করি তোমাদের তরে,
ইচ্ছি আমি তোমাদের সর্ব্বথা মঙ্গল।

... ...

আনন্দাশ্রু সহ শাহ প্রণামি ঈশ্বরে
কপটের চূড়ামণি হইলা নীরব। —(৪৫-৪৬ পৃঃ)

কবি আলমগীরের চরিত্র বর্ণনা করিয়াছেন—

একবারো ঠকে নাই আলমগীর পাশে
দুষ্প্রাপ্য এমন লোক দ্বিসহস্র ক্রোশে। —(৪৭ পৃঃ)

মন্ত্রী নানাদেশে বিদ্রোহের ভাব ও গোলযোগের সম্ভাবনার কথা বলিলে তিনি মনে মনে চিন্তা করিলেন, কেবল হিন্দু বা কেবল মুসলমান পাঠাইলে শক্তির লোভে সে তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিতে পারে। তাই হিন্দুর সহিত মুসলমানকে সর্ব্বত্র বিদ্রোহ-দমনের নিমিত্ত পাঠাইবার আদেশ দিলেন। যশোবন্তের সহিত মহাবৎ খাঁকে কাবুলে এবং জয়সিংহের সহিত দিলির খাঁকে দাক্ষিণাত্যে শিবাজীকে দমনের জন্য প্রেরণ করিলেন।

এই কাব্যে পজ্ঝটিকা, লঘু ত্রিপদী, পয়ার, দীর্ঘ ত্রিপদী, অমিতাক্ষরা, বিদেশিনী প্রভৃতি ছন্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

কাব্যের অনেক স্থলে মুসলমানী শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়; যেমন—খতুবা, রসুল, বেশালা, মেজাজালি, পয়মাল, জনাব, আলি, মুলুক, হাল, বেহাল, ইর্শাল প্রভৃতি। কাব্যের স্থানে স্থানে অপ্রচলিত শব্দও ব্যবহৃত হইয়াছে; যেমন—সৌভ্রাত্য, অনূচান, মহোর্ব্বর, যৎশির, ঔচ্চ, পিত্রতয়ে প্রভৃতি। সংস্কৃত শব্দের ব্যবহারও লক্ষণীয়; যেমন—

গুণ গরিমায় তস্য গিরিরাজ খ্যাতি, —(২ পৃঃ)

বা, সৌর করে দ্রবীভূত তদ্ গাত্রস্থ হিম।— (২ পৃঃ)

বা, পরেদ্যু আসিতে প্রাতে দর্বার মহলে। —(২৫ পৃঃ)

অথবা, ত্বদ্‌গতি ব্যাহৃতি ভিন্ন অন্য কিছু নয়। —(পৃঃ ৩৫)

নামধাতুর যোগে ক্রিয়াপদের প্রয়োগও লক্ষণীয়; যেমন—উৎপাদয়ে, লংঘি, বিবর্ণনে, নির্ম্মেছিল প্রভৃতি। সংস্কৃতের ন্যায় 'আৎ'-প্রত্যয়-যোগে পঞ্চমী বিভক্তির ব্যবহার আছে; যেমন—

যে হিমাৎ উৎপন্ন হ্রদ। —(৩ পৃঃ)

বা, শব্দ বেগে শৃঙ্গাৎ ভেঙ্গে পড়ে হিমস্তর —(৯ পৃঃ)

অথবা, ভ্রাতৃ দ্বেষাৎ পিতৃ হিংসা উপজিল ক্রমে। —(১৮ পৃঃ)

কাব্যটিতে ঔরঙ্গজীবের চরিত্রের কপটতা, কুটিলতা ও বাহ্যিক একটা আবরণ রাখার চেষ্টা প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু সবই বর্ণনাত্মক হওয়াতে কাব্যটি কোথাও জমে নাই, ইহাতে কোথাও তেমন ঘটনা বা গতি নাই। ভাষার দুরূহতায় কাব্যের গতিও মন্থর। এক কথায় কাব্যটিকে সার্থক বলা চলে না।

কাঞ্চী-কাবেরী—কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'কাঞ্চী-কাবেরী' কাব্যটি ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই কাব্যের আখ্যানভাগ ষ্টার্লিং রচিত উড়িষ্যার বিবরণ হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। উৎকলদেশের মাদলাপঞ্জী-নামক গ্রন্থেও এই কাহিনীর উল্লেখ আছে। কবির মতে এ কাহিনীর ভিতর সত্য ইতিহাস রহিয়াছে। কাব্যটিকে কবি "উৎকল দেশীয় বীররসাত্মক আখ্যান-বিশেষ" বলিয়া চিহ্নিত করিয়াছেন। তাঁহার লিখিত ভূমিকা পাঠ করিয়া মনে হয়, সমকালীন উড়িষ্যাদেশবাসীর অবনতির দিনে তাহাদের দেশের

ঐতিহ্য ও গৌরবোজ্জ্বল কাহিনীর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার নিমিত্তই কবি এই কাব্য রচনা করিয়াছিলেন।

এই কাব্যে কবির অন্যান্য কাব্য হইতে ব্যতিক্রম লক্ষিত হয়। নায়িকা-চরিত্র ইহাতে প্রাধান্য লাভ করে নাই এবং তাঁহার গৌরব-কাহিনী লিখিতে কবি লেখনী ধারণ করেন নাই। তিনি উৎকল-অধিপতি পুরুষোত্তমের শৌর্য্য, বীর্য্য, তেজ, দৃঢ়তার চিত্র অঙ্কিত করিয়া উৎকলবাসীর হৃদয়ে পুরাতন ঐতিহ্যকে জাগরিত করিয়াছেন।

দেবতা যাঁহাকে শ্রেষ্ঠ করেন তাঁহার প্রতি দেবতার অনুগ্রহও যেমন থাকে নিগ্রহেরও তেমনি সীমা থাকে না। পুরুষোত্তমের জন্মেই একটা ত্রুটি লক্ষিত হয় এবং ইহার জন্য সিংহাসন-প্রাপ্তির পথে বাধার সৃষ্টি হয়। পুরুষোত্তম ব্যতীত রাজার বিশটি পুত্র ছিলেন এবং তাঁহারা হামীর নামে খ্যাত। এই পুত্রগণ সকলেই অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন কিন্তু ব্যসনে সময় অতিবাহিত করিতেন। তাই রাজার চিন্তার শেষ ছিল না। তাঁহার অবর্ত্তমানে কাহাকে রাজ্য দিবেন কপিলেন্দ্র তাহা স্থির করিতে পারেন না। একদিন স্বপ্নে তিনি আদেশ পাইলেন—

কালি সন্ধ্যা আরতির সময় যখন।
দর্শনার্থে মন্দিরে করিবে আগমন॥
বাইশ সোপান আরোহণের সময়।
পশ্চাতে থাকিয়া যেই তোমার তনয়॥
অংশুকের অধোভাগ করিয়া ধারণ।
ধীরে করিবেক তব পদানুসরণ॥
তাহারেই যৌবরাজ্যে করিবে বরণ।
তব অন্তে উড়িষ্যার রাজা সেইজন॥ —(১৫৬ পৃঃ)

পরদিন রাজা কপিলেন্দ্র পুরুষোত্তমকে ঐ অবস্থায় তাঁহার পশ্চাতে দেখিয়া, বিষণ্ণ হইলেন। কিন্তু দেবাদেশ তিনি মান্য করিলেন। রাজা সেইদিন হইতে পুরুষোত্তমকে রাজপুরে থাকিবার আদেশ দিলেন এবং তাঁহার সমাদর বাড়িল। কিন্তু অন্য রাজপুত্রগণ ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া তাঁহার প্রাণনাশের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। একদিন সন্ধ্যাকালে জ্যেষ্ঠ হামীর তাঁহার প্রতি অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া ব্যর্থমনোরথ হইয়া দেশত্যাগ করিলেন। অপর একদিন অন্যান্য রাজ-

পুত্রগণ পুরুষোত্তম ভাবিয়া কনিষ্ঠ রাজপুত্রকে সমুদ্রের জলে মারিয়া ফেলিয়া, দূরে পুরুষোত্তমকে জীবিত দেখিয়া রাজার দণ্ডের ভয়ে দেশত্যাগ করিল। কপিলেন্দ্রও পুত্রশোকে দেহত্যাগ করিলেন। মন্ত্রিগণ পুরুষোত্তমকে সিংহাসনে বসাইলেন। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াইয়া দেবতার কৃপায় তিনি রক্ষা পাইলেন এবং অবশেষে রাজ্যের অধীশ্বরও হইলেন। তাঁহার সুশাসনে দেশে শান্তি বিরাজ করিতে লাগিল এবং প্রজাকুলও সুখে ছিল।

পুনরায় গোলমাল বাধিল তাঁহার বিবাহ সংক্রান্ত ব্যাপারে। কাঞ্চীরাজ কন্যা পদ্মাবতীর নিমিত্ত পুরুষোত্তমকে মনোনীত করিয়া একদিন সকন্যা ভবিষ্যৎ জামাতাকে দেখিতে আসিলেন। পুরুষোত্তম তখন স্বর্ণমার্জ্জনী হস্তে দেবাঙ্গন পরিষ্কার করিতেছিলেন। দেবতার প্রতি তাঁহার ভক্তি অশেষ। স্বহস্তে দেবাঙ্গন পরিষ্কার করিতে তাঁহার লজ্জা নাই। কিন্তু কাঞ্চীরাজ এ দৃশ্য দেখিয়া তাঁহাকে বিদ্রূপ করেন এবং কন্যাকে লইয়া দেশে ফিরিয়া যান। তিনি জগন্নাথদেবের সম্বন্ধেও কটূক্তি করিয়াছিলেন। উৎকলরাজ দেবতার প্রতি অপমান সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন—

সংবৎসর তিন, ত্রিমাস ত্রিদিন,
ভিতরে সে দুরাচারে।
সমরে জিনিয়া, চণ্ডালে আনিয়া,
দিব তার তনয়ারে॥ —(১৬৩ পৃঃ)

কিন্তু কাঞ্চীরাজ্য আক্রমণ করিতে তিনি দেরী করিলে পরদিন প্রত্যূষে যুদ্ধ-যাত্রা করিবার নিমিত্ত দেবাদেশ পাইলেন এবং তাহা পালন করিলেন। ঐদিন চারিদিকে অশুভ চিহ্ন দেখিয়া তিনি নিবৃত্ত হইলেন না—

রাজা কন, প্রভুর আদেশ মাত্র সার।
এ শকুন অশকুন মানি সব ছার॥ —(১৬৯ পৃঃ)

পথিমধ্যে মাণিকা গোপিনীর নিকট জগন্নাথদেবের অঙ্গুরী প্রাপ্ত হইয়া পুরুষোত্তম উৎসাহিত-চিত্তে কাঞ্চীদেশে পৌছিলেন। যুদ্ধের প্রথমদিকে কিন্তু উৎকলের জয়ের সম্ভাবনা দেখা গেল না। পুরুষোত্তম দেবতার করুণাভিক্ষা করিলে জগন্নাথদেব পূর্ব্বদ্বারে এবং বলরাম পশ্চিমদ্বারে যুদ্ধ করিয়া ভক্তের মনস্কামনা পূর্ণ করিলেন।

এদিকে কাঞ্চীরাজ গণেশদেবের পূজা করিয়া শুনিতে পাইলেন—

রে দুরাত্মা! কি কারণে দেব নারায়ণে!
নিন্দিলে শ্রীক্ষেত্রে গিয়ে গর্ব্বিত বচনে?
না জান না জান দুষ্ট, ভেদজ্ঞানিখল।
সকল দেবতা মাত্র কল্পনার ফল॥
... ...
চণ্ডাল বলিয়া যারে নিন্দিলে দুর্ম্মতি!
সে চণ্ডাল হবে, তব পদ্মাবতী পতি॥ —(১৮১ পৃঃ)

কাঞ্চীরাজ মন্ত্রীকে দিয়া পদ্মাবতীকে পুরুষোত্তমের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। উৎকলের মন্ত্রিগণের উপর পদ্মাবতীর রক্ষণাবেক্ষণ এবং চণ্ডালের সহিত বিবাহ দিবার ভার অর্পিত হইল। তাঁহারা কন্যার ভাগ্যের কথা ভাবিয়া দুঃখিত-অন্তঃকরণে চিন্তা করিতে লাগিলেন।

একদিন কৌশল করিয়া মন্ত্রী রাজার দৃষ্টিপথে পদ্মাবতীকে স্থাপিত করিলে রাজা পদ্মাবতীকে দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন এবং তাঁহার হৃদয়ে প্রেমের উন্মেষ হইল। কিন্তু তিনি পরে কন্যাকে আর দেখিতেও পাইলেন না বা সংবাদও পাইলেন না। রাজা ভাবিতে লাগিলেন—।

কে এ নারী মনোহারী কিছুই বুঝিতে নারি
অকস্মাৎ এ কি বিসংবাদ
কলেবর শীহরিত, প্রেম-বীজ অঙ্কুরিত
পুলক পলকে পরিচয়।
এতদিনে মনোভব, করিল কি পরাভব
বীর বৃত্তি আমার হৃদয়? —(১৮৩ পৃঃ)

কোন প্রকারে কন্যা সম্বন্ধে কিছুই জানিতে না পারিয়া তাঁহার অবস্থা—

শুনি ক্ষুব্ধ নরপতি, দিন দিন ম্লান অতি,
চিত্তপটে চিত্রচারুরূপ। —(১৮৩ পৃঃ)

এদিকে পদ্মাবতীর অবস্থা—

পদ্মাবতী যথাক্রমে, নিরখি পুরুষোত্তমে,
বিরহে বিধুরা অতিশয়। —(১৮৩ পৃঃ)

পর বৎসর রাজা জগন্নাথদেবের অঙ্গন পরিষ্কার করিবার কালে মন্ত্রিগণ

উপযুক্ত সময় বুঝিয়া পদ্মাবতীকে রাজকরে সমর্পণ করিলে উভয়েই আনন্দিত হইলেন।

কবি রাজা পুরুষোত্তমের চরিত্রে শৌর্য্যবীর্য্যের সহিত বিনয়, নম্রতা, দেবভক্তি ও প্রণয় মিলাইয়া অপূর্ব্ব শ্রীমণ্ডিত করিয়াছেন। তিনি নানা বিপদের সম্মুখীন হইয়াছেন কিন্তু দেবতার কৃপালাভ করিয়া সকল ক্ষেত্রেই রক্ষা পাইয়াছেন এবং অবশেষে এক অভিনব উপায়ে নারীশ্রেষ্ঠা পদ্মাবতীকে লাভ করিয়া সফলকাম হইয়াছেন।

পদ্মাবতীর চরিত্রের আমরা স্বল্প পরিচয় পাই। তিনি রূপে-গুণে অতুলনীয়া—

কেতকী কুসুম, কেশর কুঙ্কুম,
লাবণ্য ফুলের ডালা॥ —(১৬০ পৃঃ)

কাহিনীর প্রথমভাগে আমরা শুনিতে পাই তিনি পিতার সহিত উৎকলদেশে গিয়াছিলেন এবং কাঞ্চীরাজ পুরুষোত্তমকে বিদ্রূপ করিয়া প্রত্যাবর্ত্তনের সময় তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া দেশে ফিরিয়াছিলেন। তারপর চলিল তাঁহার ভাগ্য লইয়া প্রতিজ্ঞা ও যুদ্ধ। পদ্মাবতীর নিজের কোন দোষ বা ত্রুটি নাই, তথাপি তাঁহাকে লইয়া অশান্তির ঝটিকা প্রবাহিত হইল। কত লোক প্রাণ হারাইল, রাজ্যের কত ক্ষতি হইল। অবশেষে গণপতি-দেবের আদেশে কাঞ্চীরাজ তাঁহাকে পুরুষোত্তমের নিকট পাঠাইলে আমরা দেখি সহচরীগণের সমভিব্যাহারে তিনি উৎকলদেশে যাইতেছেন।

এ পর্য্যন্ত পদ্মাবতীর মনোভাবের আমরা কোন পরিচয় পাই নাই। কিন্তু বন্দিনী অবস্থায় একদিন পুরুষোত্তমকে দেখিয়া তাঁহার হৃদয়ে প্রেমের সঞ্চার হইল। তিনি কাঁদিয়া দিন কাটাইতে লাগিলেন এবং ভাবিতে লাগিলেন—

কি কারণ গজপতি, বিমুখ আমার প্রতি,
না জানি কি দোষ শ্রীচরণে
সে চরণে প্রাণ মন, করিয়াছি সমর্পণ
সমভাবে জীবনে মরণে॥
পিতা সহ জাতি দ্বন্দ্ব, আমার কপাল মন্দ
অপরাধ-বিহনে বন্দিনী। —(১৮৪ পৃঃ)

মন্ত্রিগণ-কর্তৃক রাজহস্তে সমর্পিত হইলে পদ্মাবতী উৎফুল্ল-হৃদয়ে পুরুষোত্তমের চরণে প্রণিপাত করিয়া হৃদয়ের শ্রদ্ধা-অর্ঘ্য নিবেদন করিলেন। পিতৃ-বৈরীর প্রতি কোন বিদ্বেষভাব তাঁহার হৃদয়ে স্থান পায় নাই। তিনি সরলা ও প্রেমময়ী, প্রণয়ীকে লাভ করিয়া জীবনকে সার্থক মনে করিয়াছেন।

মাণিকা গোপিনীর কাহিনীটি মূল আখ্যানভাগকে অনেকখানি সমৃদ্ধ ও রসপুষ্ট করিয়াছে। একদিন সে দধিদুগ্ধ বিক্রয় করিতে গিয়া পথে শুভ্র অশ্বে আরোহী শুভ্রবর্ণের এক ব্যক্তি এবং কৃষ্ণ অশ্বে আরোহী কৃষ্ণ বর্ণের এক ব্যক্তিকে দেখিতে পাইল। সে তাঁহাদের দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেল এবং তাঁহাদের পরিচয় জানিতে ব্যগ্র হইল ও তাঁহাদের দধিদুগ্ধ খাইতে দিল। তাঁহারা যাইবার কালে গোপিনীকে অঙ্গুরী দিয়া পুরুষোত্তমের নিকট হইতে ঐ অঙ্গুরীর বিনিময়ে মূল্য লইতে কহিলেন। উভয়ে কৌশলে নিজেদের পরিচয় দিয়া চলিয়া গেলে গোপিনীর অবস্থা—

যদবধি হেরিল সে পুরুষ রতনে।
সকলেই তুচ্ছ বোধ হয় তার মনে॥ —(১৬৯ পৃঃ)

পুরুষোত্তম অঙ্গুরী পাইয়া দেবতার আশীর্ব্বাদ ও অনুগ্রহের নিদর্শন হৃদয়ঙ্গম করিলেন। তিনি মাণিকাকে পুরস্কার দিলেন—

যতদূর বেড়ি তুমি করিবে গমন।
ততদূর ভূমি আমি করিব অর্পণ॥ —(১৭০ পৃঃ)

এই ক্ষুদ্র আখ্যান-অংশটি মূল আখ্যানের সহিত অতি সুন্দরভাবে সংশ্লিষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং কাব্যের রসসমৃদ্ধি ঘটাইয়াছে।

নানাবিধ প্রাকৃতিক শোভার বর্ণনায়ও কাব্যটির শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে ; যেমন, সমুদ্রের বর্ণনা—

গরজ, গরজ, সিন্ধু! গরজ গভীর।
কোন কালে স্থির নহে তোমার শরীর॥
চিরকাল একভাব আর একতান।
তুমি মাত্র অনন্ত শক্তির অভিজ্ঞান॥ —(১৫৮ পৃঃ)

কাব্যের প্রথমে কপিলেন্দ্রদেবের পূর্ব্ব-পুরুষের পরিচয় দিয়া, দেশের পরিচয় দিয়া, দেব-দেবীর প্রতিষ্ঠার ইতিহাস দিয়া কবি পটভূমিকা সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু বর্ণনাবাহুল্যে স্থানে স্থানে কাব্যরস ক্ষুণ্ণ হইয়াছে।

কাব্যটি পয়ার, ত্রিপদী প্রভৃতি ছন্দে রচিত। ইহাতে সাতটি সর্গ আছে।

কাব্যে নানাবিধ অলৌকিক ঘটনার সমাবেশ করার জন্য কাব্যের ঐতিহাসিক মূল্য অনেকখানি ব্যাহত হইয়াছে। নায়ক পুরুষোত্তমের শিশুকাল হইতে দেব-অনুগ্রহ লাভ দ্বারা ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ অনেকখানি ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। তিনি ভক্ত, বীর, তেজস্বী ও সঙ্কল্পনিষ্ঠ তথাপি যেন দেবতার আকস্মিক আনা-গোনায় অনেকটা নিষ্প্রভ। দেশের ইতিহাস ইহাতে যতখানি ব্যক্ত হইয়াছে কাব্যরস ততখানি জমিয়া উঠিতে পারে নাই। ইহার ভিতরেও কাহিনীতে গতির অংশ কম থাকাতে কাব্যের গতি ব্যাহত হইয়াছে। দেশের প্রাচীন ইতিহাসকে পুনরুদ্ধার করাই এই কাব্যের ভিতর প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে। কবিত্বের স্ফুরণ কোথাও দৃষ্ট হয় না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

আদিরসাত্মক বা প্রণয়মূলক আ্যাখ্যায়িকা-কাব্য

১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে রচিত আদিরসাত্মক বা প্রণয়মূলক আখ্যায়িকা-কাব্যগুলিকে সাধারণতঃ চারিটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা চলে। যেমন (১) নিছক প্রণয়মূলক কাহিনী, (২) উদ্দেশ্যমূলক কাহিনী, (৩) রূপকথার অলৌকিক ঘটনাবলী বিজড়িত কাহিনী, (৪) মুসলমানী সাহিত্যের ভাব অবলম্বনে রচিত কাহিনী।

প্রথম বিভাগের মধ্যে আমরা মধুসূদন দাস ও কালীকৃষ্ণ দাস রচিত 'কামিনীকুমার' (১৮৫০), কালীকুমার মুখোপাধ্যায় রচিত 'অবল প্রবলা' (১৮৫৬), কালীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'জীবন যামিনী' (১৮৫৪) আশুতোষ মুখোপাধ্যায় রচিত 'প্রমোদকামিনী-কাব্য' (১৮৭১), যাদবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'জম্বালিনী' (১৮৭১), ঈশ্বরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত 'মোহিনী-মোহন কাব্য' (১৮৭৫) এবং গোবিন্দ চৌধুরী রচিত 'কল্পনা কামিনী' (১৮৭৭) পাই।

একমাত্র 'মোহিনী-মোহন' কাব্যটি ছাড়া অন্য সকল কাব্যের নায়ক-নায়িকাগণ রাজপুত্র ও রাজকন্যা কিংবা সদাগরপুত্র ও সদাগরকন্যা। ইহারা সাধারণ সমাজ হইতে দূরে অবস্থিত এবং সাধারণের অপরিচিত। কবির কল্পনা সেখানে মুক্তপক্ষে উড্ডীয়মান হইয়া নানা বর্ণচ্ছটা ও শব্দ-ঝঙ্কারে সৌন্দর্য্যের ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করিবার সুযোগ পায়। এইজন্য রোমাণ্টিক কাব্যের চরিত্র হিসাবে নায়ক-নায়িকা নির্ব্বাচনকে দোষহীন বলা চলে। কবিগণ এই নায়ক-নায়িকাকে কেন্দ্র করিয়া অনেকভাবে ও অনেকরূপে সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু অনুভূতির স্পর্শ এবং আবেগের স্পন্দন না থাকাতে কাব্যগুলি সার্থক হইয়া উঠিতে পারে নাই।

চরিত্র-সৃষ্টির ব্যাপারেও কাব্যগুলিতে নৈপুণ্য দেখা যায় না। চরিত্রগুলির রূপগুণের বর্ণনা রহিয়াছে—নানা ঘটনার সমাবেশ আছে—কিন্তু ঘটনার সংঘাতের ভিতর দিয়া চরিত্রগুলির বিভিন্ন দিক্ বিকাশ লাভ করে নাই। তাই

এই কাব্যগুলিতে বর্ণিত চরিত্রগুলি নিছক বর্ণনামাত্র হইয়া নির্জীব বা পুতুল নর-নারীতে পরিণত হইয়াছে।

এই কাব্যগুলির মধ্যে কাহিনী-অংশও নানা ত্রুটিতে পূর্ণ। 'প্রথম দর্শনেই প্রেম' কথার ভূরি ভূরি নিদর্শন ইহাদের মধ্যে পাওয়া যায়। কোথাও প্রাসাদের ছাদে ভ্রমণরতা নায়িকা ও পথে গমনরত নায়কের সাক্ষাৎ এবং পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ, কোথাও উদ্যানে ভ্রমণকালে সাক্ষাতের মধ্যে উভয়ের প্রণয়াসক্তি, কোন কোন ক্ষেত্রে মালিনী বা গোয়ালিনীর মুখে উভয়ে উভয়ের রূপের কথা শুনিয়াই মুগ্ধ ও অনঙ্গ-বাণবিদ্ধ, কোন কোন কাব্যে স্বপ্নে পরস্পর পরস্পরকে দেখিয়া আত্মহারা। তারপরেই মিলনের জন্য ব্যাকুলতা, ক্ষণিকের অদর্শনে অধীরতা, প্রণয়াসক্ত হৃদয়ের কাণ্ডজ্ঞানহীন কার্য্যাবলী এবং ধৈর্য্য ও সংযমহীনতা কাব্যগুলিকে শ্রীহীন করিয়াছে। কাব্য-গুলি কাহিনীর দিক্ দিয়াও যেমন বিশেষত্ববর্জ্জিত রচনার দিক্ দিয়াও সেরূপ গতানুগতিকতার ছাঁচে ঢালা। নায়ক-নায়িকার রূপ-বর্ণনার ও প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনার ভাব, ভাষা, ছন্দ, অলঙ্কার প্রায় সব কাব্যেই একরূপ। সর্ব্বত্র নায়কের রূপ দেখিয়া প্রতিবাসিনীগণের পতিনিন্দা, মিলন, বিরহ, বিদেশযাত্রা, অরণ্যে রাত্রিযাপন এবং পরে সৌভাগ্যলাভ করিয়া কাহিনীর পরিণতি চিত্রিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে কৌতূহল-উদ্দীপক কিছুই নাই। প্রথম কয়েক পৃষ্ঠা পড়িয়াই যেন বলিয়া দেওয়া যায় কোন্ কাহিনীর পরিসমাপ্তি কি ভাবে হইবে। রোমান্টিক কাব্যের যে একটি বিশেষ লক্ষণ—অপ্রত্যাশিত পরিণতির অবতারণা,—তাহার বিশেষ অভাব এই রচনাগুলিতে চোখে পড়ে। ইহাদের কাহিনীকে পরিচালিত করিতেছে আকস্মিকতা (accident)—কাহিনীর নিজস্ব কোন গতি নাই। সেইজন্য কাব্যগুলি সাধারণতঃ নীরস ও কৌতূহলবর্জ্জিত।

রসের দিক্ দিয়া বিচার করিলে বলা যায়, প্রায় সকই কাব্যেই আদিরসের অত্যন্ত আতিশয্য। কোন কোন কাব্যে অপরাপর রস সৃষ্টির চেষ্টাও দেখা যায়। কিন্তু যে নিপুণ তুলিকার স্পর্শে অপরাপর রসের সহিত সমতা রক্ষা করিলে কাব্য সার্থক হইয়া উঠে সেই নিপুণতার অভাবে প্রায় সকল কাব্যই অশ্লীলতাদোষে দুষ্ট হইয়াছে।

'মোহিনী-মোহন' কাব্যটি এগুলি হইতে স্বতন্ত্র। ইহার নায়ক-নায়িকা

সাধারণ গৃহস্থ ঘরের নর-নারী। তাহারা প্রথম হইতেই বিবাহিত। কিন্তু গোল বাধাইল বাহিরের ব্যক্তি আসিয়া। কাহিনীর দিক্ দিয়া, চরিত্রসৃষ্টির দিক্ দিয়া এবং রচনার দিক্ দিয়া বিচার করিলে বলা যায় যে ইহাতে আধুনিক যুগের পূর্ব্বাভাস লক্ষিত হয়। ভাব, ভাষা, ছন্দ সব দিক্ দিয়াই ইহা নবীনপন্থী—পুরাতন গতানুগতিকতার বন্ধন হইতে মুক্ত। ইহার বিস্তৃতর আলোচনা পরে দেওয়া হইল।

উদ্দেশ্য-মূলক প্রণয়-কাহিনীগুলিকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়—(ক) কালিকাদেবীর মাহাত্ম্য প্রচার উদ্দেশ্যে রচিত, (খ) নীতি-মূলক। পূর্ব্বযুগের সাহিত্যের দেব-দেবীর প্রাধান্য যখন প্রশমিত হইল এবং নর-নারীকে আশ্রয় করিয়া সাহিত্য রচিত হইতে লাগিল সেই সময় দেখা গেল কালিকাদেবীর স্তব-স্তুতি-পূজা সব কাব্যেই অল্পবিস্তর স্থান পাইয়াছে, ভারতচন্দ্রের বিদ্যা-সুন্দরের প্রভাবে হয়তো কালিকাদেবী সকল কাব্যে পূজিত হইয়াছেন। তিনি আপদে-বিপদে নায়ক-নায়িকাগণকে সাহায্য করিয়াছেন, অপুত্রক রাজা-রাণীকে পুত্র বা কন্যা দান করিয়াছেন, কখনও স্বপ্নে আদেশ জানাইয়াছেন, কখনও দৈববাণী দ্বারা অভয় প্রদান করিয়াছেন। সে যুগের কাহিনী-কাব্য-গুলির মধ্যে এইভাবে কালিকাদেবীর পূজা ও তাঁহার নিকট হইতে অনুগ্রহলাভ করা খুব একটা লক্ষণীয় ব্যাপার নয়। কিন্তু দেবীর মাহাত্ম্য প্রচার উদ্দেশ্যে যে-সকল প্রণয়মূলক কাহিনী রচিত হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে কালিকাদেবী একটি প্রধান স্থান অধিকার করিয়া কাহিনীভাগকে আচ্ছন্ন করিয়াছেন। এইরূপ দুইটি কাব্য আমরা পাই—চন্দ্রকান্ত শিকদার রচিত 'পতিত পার্ব্বতী' (১৮৬০) ও রসিকচন্দ্র রায় রচিত 'জীবনতারা' (১৮৬৯)।

পৌরাণিক কাহিনীর অনুকরণ ইহাদের মধ্যে নাই বা মঙ্গলকাব্যের ন্যায় বিভিন্ন দেব-দেবীর প্রাধান্য লাভের নিমিত্ত বিরোধের ইতিহাসও ইহাতে স্থান পায় নাই। কোন জটিলতর তত্ত্ব ব্যাখ্যাও ইহাতে লিপিবদ্ধ হয় নাই। তবে দেবীর মাহাত্ম্য প্রচারের উদ্দেশ্যে নায়ক-নায়িকাকে দেবীর হাতের ক্রীড়নকরূপে তৈয়ারী করা হইয়াছে। তাহাদের সমস্ত কর্ম্মের পশ্চাতে তাঁহার ইচ্ছাশক্তি কাজ করিতেছে, এবং সেইজন্য নায়ক-নায়িকাগণের সুখ-দুঃখ, বেদনা-অনুভূতি, ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ ও চরিত্রের বিকাশ—সবই ব্যাহত হইয়া পড়িয়াছে। এ-সকল কাব্যের মধ্যে দেবীও মূর্ত্তিমতী হইয়া উঠেন নাই। সর্ব্বত্রই প্রায় তিনি

অলক্ষ্যে থাকিয়া নায়ক-নায়িকাগণের উপর অনুগ্রহ বর্ষণ করিয়াছেন এবং স্বপ্নে আদেশ জানাইয়াছেন। 'জীবনতারা' কাব্যটি প্রথম অংশে অত্যন্ত সরস সুন্দর একটি প্রণয়-কাহিনী বিবৃত করিয়া শেষাংশে দেবীমাহাত্ম্য প্রচার করিতে গিয়া সমস্ত সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য হারাইয়াছে। এই-সকল কাহিনীর ভিতর উদ্দেশ্যটাই বড় হইয়া উঠিয়া কাহিনীকেও যেমন নীরস করিয়াছে চরিত্রগুলিকেও তেমনি প্রাণহীন করিয়াছে। ভাব-ভাষাও প্রায় গতানুগতিকতার পথেই চলিয়াছে।

নীতিমূলক কাহিনী-কাব্যগুলির মধ্যে ঐ সময়ে রচিত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'প্রেম নাটক' (১৮৬৫), আশুতোষ বিশ্বাস রচিত 'বীরজয়-উপাখ্যান' (১৮৬৯) এবং বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'সতিসত্তম-কাব্য' (১৮৭৬) পাই। ইহাদের রচনার পশ্চাতে কোন না কোন নৈতিক আদর্শ বর্ত্তমান এবং সেই আদর্শের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কবিগণ কাহিনীভাগকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন। কোনটিতে অবৈধ প্রণয়ের নিমিত্ত পশ্চাত্তাপ বর্ণনা করিয়া সকলকে সাবধান করিয়া দেওয়া হইয়াছে, কোনটিতে সতীত্বের মাহাত্ম্য প্রচারিত হইয়াছে, আবার কোনটিতে সংসারের অসারত্ব দেখাইয়া বৈরাগ্যের মাঝে শ্রেয়ঃ পথের ইঙ্গিত রহিয়াছে। ইহা দ্বারা কবিগণের উদ্দেশ্য হয়তো সিদ্ধ হইয়াছে কিন্তু কাব্য একেবারে ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। প্রথমতঃ আদর্শকে শ্রেষ্ঠ করিতে গিয়া চরিত্রগুলির মানবোচিত বিকাশ ব্যাহত হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, কাহিনী-অংশের মধ্যে সামঞ্জস্য বা সমতা রক্ষিত হয় নাই। তৃতীয়তঃ, অনেক ঘটনার পশ্চাতে কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধের প্রতি দৃষ্টি না দেওয়াতে ঘটনাগুলি অবাস্তব ও অস্বাভাবিক হইয়া পড়িয়াছে। ইহাদের ভিতর 'প্রেম নাটক' ও 'সতীসত্তম-কাব্য'-এর নায়ক-নায়িকা রাজপ্রাসাদের আবেষ্টনী হইতে মুক্ত সাধারণ ঘরের নর-নারী। কিন্তু ইহাদের কার্য্যকলাপ এবং আবেষ্টনীর সহিত সাধারণ লোকের পরিচয় নাই। তথাপি সাধারণ মানুষ কাব্যে স্থান পাওয়াতে ইহার মধ্যে পরবর্ত্তী যুগের কাব্যধারা সূচিত হইয়াছে। অনেক দোষক্রটি থাকা সত্ত্বেও ইহাদের ভিতর অনেক ক্ষেত্রে আধুনিক ভাবধারার পূর্ব্বাভাস পাওয়া যায়। সাধারণ মানব-জীবনের দ্বন্দ্ব-সমস্যা-জটিলতা ইহাদের স্থানে স্থানে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। 'বীরজয়-উপাখ্যান'টি রাজপুত্র ও রাজকন্যার কাহিনী হইলেও নায়কের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণের মধ্য দিয়া কবি নানাবিধ

ব্যক্তির ও গোষ্ঠীর বর্ণনা দ্বারা মানুষের নানাবিধ সমস্তার অবতারণা করিয়াছেন। ইহা দ্বারা কাব্যটি অন্যান্য কাব্য হইতে অনেকখানি স্বাতন্ত্র্য লাভ করিয়াছে। বর্ণনায় বা ভাষায়ও ইহারা পূর্ব্ববর্ত্তী রীতি ত্যাগ করিয়াছে —নবযুগের একটা পূর্ব্বাভাস ইহাদের মধ্যে অস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়।

এ যুগেও যে-সকল কাব্যের ভিতর রূপকথার অলৌকিক ঘটনাবলী সন্নিবেশিত হইয়া প্রণয়-কাহিনীগুলিকে এক কল্পনার রাজ্যের বিষয় করিয়া তুলিয়াছে তাহাদের ভিতর কালিদাস সরকার রচিত 'প্রেমোল্লাস' (১৮৫৫), বনওয়ারীলাল রায় রচিত 'যোজন-গন্ধা' (১৮৫৫), তারাশঙ্কর মৈত্রের 'কমলদন্তাহরণ' (১৮৬৩-১৮৬৬) নামক কাব্যগুলি পাই। ইহাদের নায়ক-নায়িকাগণ রাজপুত্র ও রাজকন্যা এবং বিষয়বস্তু তাহাদের প্রণয়-কাহিনী ; পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ এবং তাহার নিমিত্ত নানাপ্রকার দুঃখকষ্ট সহ্য করা এবং অবশেষে হতাশা বা নিরাশা কাহিনীর বর্ণিত বিষয়। কিন্তু দেবতা, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস-খোক্কস, ভূত-প্রেত, পরী ও নিশাচরগণ ইহাদের ভিতর স্থান করিয়া লইয়াছে এবং কাহিনী-অংশ তাহাদেরই অনুগ্রহ বা নিগ্রহের দ্বারা চালিত হইয়াছে। তাহাদের আকস্মিক আবির্ভাব ও তিরোভাব এবং ঘটনার অপ্রত্যাশিতরূপে পরিসমাপ্তি কাব্যকে অনেকখানি কৌতূহলজনক করিয়াছে। নায়ক-নায়িকার বিরহের বেদনা এবং মিলনের আনন্দ বর্ণনা ব্যতীত কাব্যের অন্য সকল স্থান এই-সকল অপার্থিব সত্তায় পূর্ণ এবং তাহাদের আনাগোনা, রাগ-বিদ্বেষ-হিংসা, দয়া-দাক্ষিণ্য-অনুকম্পায় কাহিনী নিয়ন্ত্রিত। ইহাদের ঠিক রূপকথা বলা চলে না। ইহারা রূপকথার প্রভাবযুক্ত প্রণয়মূলক কাহিনী-কাব্য। ইহাদের কোনটির ভাব, ভাষা, ছন্দ ইত্যাদি প্রাচীন রীতির, কোন কোনটায় স্থানে স্থানে নূতনত্ব আনিবার চেষ্টা রহিয়াছে।

এই সময়ে কিছু-সংখ্যক মুসলমানী কাহিনীর ভাব অবলম্বন করিয়া বাংলা-ভাষায় কাব্য রচিত হয়। তাহাদের মধ্যে দ্বারকানাথ কুণ্ডুর 'গোলবে সেনুয়ার' (১৮৫৯) ও মহেশচন্দ্র মিত্রের 'লয়লা মজনু' (১৮৫৩) পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যেও রূপকথাসুলভ অলৌকিক ঘটনাবলী, জিন-পরী, রাক্ষস-খোক্কস, ব্যাঘ্র-হস্তী প্রভৃতি স্থান পাইয়াছে কিন্তু কাহিনী-অংশ কোথাও সমতা হারায় নাই। তাই ঘটনাগুলি অলৌকিক হইয়াও অভিনব রস সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছে। ইহাদের নায়কগণ রাজপুত্র, নায়িকাগণ কেহ

পরীরাজকন্যা, কেহ রাজকন্যা। তাহাদের প্রণয়-কাহিনীর মধ্যে সহজ প্রাণের অদম্য আবেগ ও ভাবোচ্ছ্বাস রূপায়িত হইয়া কাব্যগুলিকে প্রাণরসে পূর্ণ করিয়াছে। চরিত্রগুলিও এই অনুভূতির স্পর্শে জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। ইহাদের মধ্যে কোথাও জড়তা নাই, কোন নীতিবাদের অনুশাসন নাই এবং আদিরসের বাহুল্য নাই। মানব-প্রাণের আবেগ-বন্যা আনিয়া ইহারা প্রাণহীন আদি-রসাত্মক কাহিনীকাব্যগুলির ভিতর একটা নূতন আলোড়ন সৃষ্টি করে। মানবের প্রতি মর্য্যাদাবোধে এবং মানব-মনের সহজ সুন্দর প্রকাশ দ্বারা ইহারা রোমান্টিক অনুভূতি আনিতে সমর্থ হইয়াছে এবং সে যুগে ইহারা যথেষ্ট সমাদর লাভ করিয়াছিল।

এক কথায় এই আদিরসাত্মক বা প্রণয়মূলক কাব্যগুলিকে সন্ধিযুগের রচনা বলিয়া ধরা যায়। পুরাতনের ছকবাঁধা পথ অবলম্বন করিয়া কিছু-সংখ্যক কাব্য সাহিত্য-গগনে আঁধার ঘনাইয়া আনিয়াছিল—অপরদিকে কিছু-সংখ্যক কাব্যের ভিতর নূতনের সুর ধ্বনিত হইয়া নব প্রভাতের সূচনা করিয়াছিল। কাব্য-জগতে ভারতচন্দ্রের তিরোধান ও রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবের মধ্যবর্ত্তী কালের অখণ্ড প্রবাহকে ইহারাই খানিকটা গতিশীল করিয়া রাখিয়াছিল।

কামিনীকুমার—'কামিনীকুমার' কাব্যটি দুইজন কবি কর্ত্তৃক রচিত। গ্রন্থের শেষে ভণিতায় আছে—

কালিকার দাস দ্বিজ বৈদ্যনাথ দীন।
শ্রীমধুসূদন কৃষ্ণদাস দীনহীন।
দুই নামে এক নাম কালীকৃষ্ণ দাস।
বিরচিয়া নবকাব্য করিল প্রকাশ॥

শ্রদ্ধেয় শ্রীসুকুমার সেন মহাশয়ের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থে ইহার মুদ্রণের সময় ১৮৫০ খ্রীঃ দৃষ্ট হয়। কিন্তু বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পাঠাগারে রক্ষিত পুস্তকের মুদ্রণ সময় ১৮৫৪। ইহা দ্বারা মনে হয়, কাব্যটি একাধিক-বার মুদ্রিত হইয়াছিল এবং জনপ্রিয় হইয়াছিল। পরেও কাব্যটির বহু সংস্করণ হইয়াছিল।

কাব্যটি গদ্যে-পদ্যে রচিত। উনবিংশ শতাব্দীর কিছু-সংখ্যক কাব্যে এই রীতির অনুবর্ত্তন দৃষ্ট হয়।

আদিরসাত্মক কাব্যগুলি দেব-দেবীর কবলমুক্ত হইলেও ধর্ম্মভীরু বাঙ্গালী তখনও দেবতাকে একেবারে বিস্মৃত হইতে পারে নাই। তাই বিভিন্ন দেব-দেবীর বন্দনা ও অনুগ্রহ প্রার্থনা করিয়া প্রায় প্রতিটি কাব্যের সূচনা দেখা যায়। 'কামিনীকুমার' কাব্যটিতেও গ্রন্থারম্ভে গণেশ-বন্দনা, সূর্য্য-বন্দনা, বিষ্ণু-বন্দনা ও শ্যামা-বন্দনা স্থান লাভ করিয়াছে। কাব্যটির পশ্চাতে আবার একটি অলৌকিক ঘটনার সমাবেশ করিয়া মর্য্যাদা বাড়াইবার চেষ্টাও রহিয়াছে।

বিক্রমাদিত্যের সভায় একদিন রমণীগণকে লইয়া আলাপ-আলোচনা চলিবার কালে মহারাজ মৌনবতী ও ভানুমতীর প্রশংসা করেন। কালিদাস সেই সময় 'কামিনীকুমারে'র কাহিনী কহিয়া রমণীর বুদ্ধি ও মাধুর্য্যের নিদর্শন দেন।

চিত্রাঙ্গদ গন্ধর্ব্বের পত্নী তারাবতী রাত্রে ভ্রমণকালে উদ্যানে এক দম্পতীকে দেখিয়া মুগ্ধ হয় এবং সখীদ্বারা তাহাদের নিদ্রাভিভূত করিয়া পুরুষটিকে লইয়া আসে। তাহার সহিত কথোপকথন হইতেছে এমন সময় গন্ধর্ব্ব গৃহে ফিরিয়া অপরিচিত মানুষের সহিত আলাপে রত দেখিয়া পত্নীকে প্রহার করিতে থাকে। ঐ পথে দুর্ব্বাসা মুনি যাইবার কালে স্ত্রীলোকের উপর অত্যাচার দেখিয়া উভয়কেই মর্ত্ত্যে জন্মগ্রহণ করিবার শাপ দিলেন।—

অভিশাপ দিনু দুষ্ট মর্ত্ত্যলোকে যাবে।
আপন নারীর ঠাঞি নানা শাস্তি পাবে॥ —(৯ পৃঃ)

তখনি,—

যুগল নক্ষত্র যেন খসিয়া পড়িল। —(৯ পৃঃ)

চিত্রাঙ্গদ গন্ধর্ব্ব মেদিনীপুরের কীর্ত্তিচন্দ্র সওদাগরের গৃহে কুমার নাম লইয়া এবং তারাবতী ঐ স্থানেই শ্রীনাথ সওদাগরের গৃহে কামিনী নাম লইয়া জন্মগ্রহণ করিল।

ভারতচন্দ্রের অনুকরণে রচিত হইলেও কাব্যটিতে একটি নিজস্ব রীতি রহিয়াছে। প্রণয়-কাহিনীর মধ্যে বেশ একটু নূতনত্ব দৃষ্ট হয়। নায়ক-নায়িকা প্রথম পরিচয়েই একেবারে প্রেম-বিহ্বল হইয়া পড়ে নাই বরং বিরোধিতাই করিয়াছে।

কামিনীর দাসী এক ব্যাধের নিকট হিরামন্ পক্ষীর মূল্য নির্দ্ধারণ করিবার কালে কুমার সে স্থানে উপস্থিত হইয়া লক্ষ মুদ্রায় তাহা ক্রয় করে।

দাসীর নিকট এ সংবাদ শ্রবণ করিয়া কামিনী ব্যঙ্গচ্ছলে দাসীকে দিয়া বলিয়া পাঠাইল—

উপযুক্ত বটে, বুদ্ধি আছে ঘটে,
তামাকু সাজিতে দিব।
যদি হয় সঙ্গ, কত হবে রঙ্গ,
বসে তামাসা দেখিব॥ —(১৭ পৃঃ)

সওদাগরপুত্রের মেজাজও কম নয়। সে বলিয়া পাঠাইল—

যদি তারে পাই, তবে ত শিখাই
কি বলিব মুখে সার।
উঠ্‌তে দশ যুত, বসতে দশ যুত
এই প্রতিজ্ঞা আমার॥ —(১৭ পৃঃ)

নায়ক-নায়িকার এইরূপ বিরুদ্ধাচরণের মধ্যে প্রেমের গতিপথ কৌতূহল-উদ্দীপক ও জটিলতর হইয়া উঠিয়াছে।

ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া কুমার কামিনীকে বিবাহ করিতে মনস্থ করিয়া হাটুদত্তের শরণাপন্ন হইল এবং তাহারই মধ্যস্থতায় উভয়ের বিবাহ হইয়া গেল। নববধূ মিলনের আনন্দে উৎফুল্ল না হইয়া প্রহারের ভয়ে কাঁদিয়া আকুল। এই চিত্রটি সে যুগের বাস্তবানুগ। কারণ, তখনকার দিনে কন্যা-গণের বালিকা-বয়সেই বিবাহ হইত এবং প্রহারের ভয় দেখাইলে তাহারা ক্রন্দন করিতে দ্বিধা করিত না।

অপর একটি লক্ষ্য করিবার বিষয়, দাসীগণ তুক্‌তাক্ করিলে সওদাগর-পুত্র তাহাদের প্রতি আকৃষ্ট হইতেছে—তাহাদের শাসন ও উপদেশ মানিতেছে—কিন্তু কামিনীকে প্রহারের প্রতিজ্ঞা ভুলিতেছে না বা তাহাকে দেখিয়া মনে কোনরূপ চাঞ্চল্যবোধ করিতেছে না। ইহাতে তাহাকে ঠিক হৃদয়হীন বলা চলে না; নিজের প্রতিজ্ঞার প্রতি তাহার নিষ্ঠাই প্রতিপন্ন হয়। বাণিজ্যে যাইবার কালেও সে প্রহার করিতে গিয়াছিল এবং বাধা পাইয়া বাণিজ্য হইতে ফিরিয়া প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিবার নিমিত্ত তাহাদের গৃহে বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। বাণিজ্য হইতে ফিরিয়াও নিজ প্রতিজ্ঞার কথা সে ভুলে নাই। স্ত্রীর প্রতি তাহার আসক্তি শুধু তখনই দেখা গেল যখন সে তাহার বুদ্ধির নিকট নিজ পরাজয়কে উপলব্ধি করিল। অথচ সেই স্ত্রী যখন

লক্ষহীরারূপে বা মুসলমানীর ছদ্মবেশে তাহার লক্ষ্যপথে পতিত হইল তখন তাহার আসক্তির শেষ নাই। এমন কি দিনে এক লক্ষ করিয়া মুদ্রা দিয়াও সে পাটনায় লক্ষহীরার অনুগ্রহ লাভ করিতে যত্নের ত্রুটি করে নাই।

তারপর কাশ্মীরে গিয়া কামিনী মুসলমানী পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া দাসী দ্বারা অঙ্গুরী ক্রয় করাইবার ছলে কুমারের মন জয় করিল। কুমার যখন মদন-বাণে ব্যাকুল তখন একদিন কামিনী দাসীকে দিয়া বলাইল—

হিন্দুশাস্ত্র ছাড়িয়া কোরাণ পড়ে যদি।
তবে তার বশ হয়ে রব নিরবধি ॥ —(১৩৪ পৃঃ)

কুমার তাহাতেই সম্মত হইল এবং একদিন কল্‌মাও পড়িল।—

তোবা করদম্ তোবা করদম্ ইয়া মহম্মদ রছুলেল্লা।
বাতো মস্তম বাতো মস্তম ইয়া মহম্মদ রছুলেল্লা ॥ —(১৩৭ পৃঃ)

এইরূপে স্ত্রীর স্বামীকে নানাভাবে ছলনা এবং স্বামীর পরকীয়া-প্রেমে মগ্ন হইবার ঘটনায় একদিকে প্রণয়ের ভিতর যেমন বৈচিত্র্য আসিয়াছে অপরদিকে একটা কৌতুকের হিল্লোল কাব্যটিকে উপভোগ্য করিয়াছে।

তারপর তাহাকে বিতাড়নের দৃশ্যটিও অত্যন্ত কৌতুককর। সোণাদাসী মণিলাল সাজিয়া কুমারকে বন্ধন করিয়া যখন গালাগালি করিতেছিল কামিনী তখন সওদাগর-বেশে তথায় উপস্থিত হইয়া তাহাকে ভয় দেখাইল—

যেছা কাম কিয়া এছনে শুন মোর বাত।
আপনাহি মারো করো রাজাকি হাওলাত ॥
যে হাতমে চোরি কিয়া আপনা ঘরকি মাল।
ছোহি হাত কাটকে রাজা করে গা বেহাল ॥ —(১৪১ পৃঃ)

সওদাগরবেশী কামিনী তাহাকে উদ্ধার করিয়া তামাক সাজিবার কর্ম্মে নিযুক্ত করিল। তাহার অবস্থা হইল—

······রাম বলিবামাত্র রামবল্লভ
তামাক সাজিয়া মজুত। ·· —(১৪৯ পৃঃ)

মনে হয় এ স্থানের প্রভাবই বঙ্কিমচন্দ্রকে সাগরবৌ-কর্ত্তৃক ব্রজেশ্বর দ্বারা তামাক সাজাইবার কল্পনা জোগাইয়াছিল।

এইভাবে নানা কৌতুকের ভিতর দিয়া কামিনী নিজ প্রয়োজন সিদ্ধ করিয়া ও প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিয়া দেশে ফিরিল।

কামিনীর এই পতি-অন্বেষণে যাত্রা এবং বিবিধ আকারে ও প্রকারে তাহার সহিত রঙ্গরস উপভোগ করিবার মধ্যে বেশ একটু রোমাণ্টিক ভাব বর্ত্তমান। প্রথমেই সখীগণের উপদেশক্রমে কামিনীর সওদাগরের বেশধারণ এবং সখীগণের সিপাহীর বেশে সজ্জিত হওয়া একটা অভিনব ব্যাপার। ইহার উপর সেক্সপীয়রের 'As you like it'-এর প্রভাবও অলক্ষ্যে কাজ করিয়া থাকিতে পারে। ছদ্মবেশে তিনটি রমণীর জানালায় কাষ্ঠনির্মিত সিঁড়ি লাগাইয়া গৃহের বাহিরে পদার্পণ করিবার মধ্যেও বেশ একটা দুঃসাহসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু তিনটি রমণীর প্রথম বাহিরে বৃহৎ জগতের মধ্যে পদার্পণ মনের ভিতরে যে ভীতি-আশঙ্কা, সংশয়-সঙ্কোচ ও দ্বিধা-দ্বন্দ্বের আলোড়ন আনে, তাহা কাব্যে স্থান পায় নাই। এখানে উদ্দেশ্যটাই প্রধান হইয়া উঠিয়াছে—তাই তাহারা পথে বাহির হইয়াই নৌকায় আরোহণ করিল। সে যুগে কবিগণের মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণের প্রতি দৃষ্টি ছিল না। তাই রোমান্স যেখানে দানা বাঁধিতে পারিত সেখানেও অনেকখানি ফাঁক থাকার দরুণ ফিকে হইয়া গিয়াছে। পাটনা ও কাশ্মীরে উভয়ের সাক্ষাৎ ও মিলনের ব্যাপারে অনেকখানি রোমান্সের অবকাশ ছিল কিন্তু উদ্দীপনা ও অনুভূতির অভাবে তাহা অসম্পূর্ণই রহিয়া গিয়াছে।

গৃহে ফিরিয়া সকলে ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া কুমারকে ঋণশোধের জন্য পীড়াপীড়ি করিলে সে যখন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিল সেই সময় কামিনী প্রভৃতি স্ব স্ব বেশ ধারণ করিয়া প্রকৃত রহস্য প্রকাশ করিলে একদিকে যেমন কুমারের মনের মেঘ কাটিয়া যায় অপরদিকে তেমনি নায়ক-নায়িকার প্রেমের পরিণতিতে আখ্যানভাগটিও পূর্ণ হইয়া উঠে।

এই কাব্যে কবি মাঝে মাঝে হাস্যরসের অবতারণা করিয়া কাব্যটিকে সরস ও সুখপাঠ্য করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছেন। যদিও স্থানে স্থানে গ্রাম্য শব্দের ব্যবহারে তাহাতে রসদুষ্টি ঘটিয়াছে তথাপি ঐ-সকল স্থান কাব্যে রসবৈচিত্র্য আনিতে সমর্থ হইয়াছে। কুমার যখন কিরূপে প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিবে এবং কামিনীকে বিবাহ করিবে ভাবিতেছিল সেই সময় তাহার পিতার খুল্লতাত হাটুদত্ত আসিয়া তাহার বিষাদের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া কহিতেছেন—

কেন নাতি ভেকো হয়ে আছ ভেকা প্রায়।
কোন্ বিধি বোবা করে দিল হে তোমায়॥ —(১৮ পৃঃ)

বাঙ্গালী ঘরের পৌত্র ও পিতামহের কৌতুকোজ্জ্বল সম্পর্কটি ইহার মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে। হাটুদত্ত আবার কামিনীর পিতা শ্রীনাথ সাধুর নিকট বিবাহের প্রস্তাব লইয়া গিয়া কহিতেছেন—

কন্যাটি করিয়া দান, বাঁচাও ধড়েতে প্রাণ,
হব তব দুহিতার দাস॥ —(২১ পৃঃ)

ইহাতে এক স্নেহশীল হাস্যরসিক পিতামহের চিত্র সুন্দর ফুটিয়া উঠিয়াছে এবং বাঙালী-সমাজের বিবাহ-রীতিও প্রকাশ পাইয়াছে। যেখানে নায়ক-নায়িকার ভিতর প্রেমের আকর্ষণ নাই সেখানে অপরের মাধ্যমে বিবাহ প্রস্তাব উত্থাপনের রীতি বর্ত্তমান।

কবির হাস্যরসিকতার আরও নিদর্শন পাওয়া যায়, যখন কুমার লক্ষহীরার নিকট নিজ পরিচয় দিতেছে,—

আমার যে কুলাচার্য্য, বিদ্যাশূন্য ভট্টাচার্য্য
অন্তজ নামেতে পুরোহিত।
পাজি গোত্র নষ্ট গাঞি, মোর সম কেহ নাই
ক্রিয়া যত সকলি কুচ্ছিত॥ —(৮৪ পৃঃ)

আর কামিনী নিজ পরিচয় দিল,—

জুতান্ত নগরে ছিল পতির নিবাস।
মুর্খানন্দ নাম তাঁর জগতে প্রকাশ॥
পরম পণ্ডিত তিনি ব্যাল্লিক তন্ত্রেতে।
উপদেশ হৈলেন ঝকমারি মন্ত্রেতে॥
বাঁদরামি কর্ম্মেতে হন বড়ই তৎপর।
কর্ম্মগুণে ধর্ম্ম খায়ে গেল দেশান্তর॥ —(৮৪-৮৫ পৃঃ)

এ-সকল বর্ণনা সেকালের নায়ক-নায়িকার ভিতর যে বুদ্ধির ক্রীড়া হইত তাহারই পরিচায়ক।

নায়ক-নায়িকার ভ্রমণের মধ্য দিয়া কাহিনীটির অধিকাংশ প্রকাশিত হইয়াছে। কুমারের বাণিজ্য-যাত্রার প্রাক্কালে যে-সকল মঙ্গল-অনুষ্ঠানাদির বর্ণনা রহিয়াছে তাহাতে বাঙালী-সমাজের রীতি-নীতিরও পরিচয় পাওয়া যায়। কুমার শুভ সময় দেখিয়া পূর্ব্বদিন যাত্রা করিয়াছিল। তারপর যাত্রার প্রাক্কালে—

আনি রম্ভা তরুবর, আরোপিল দ্বারোপর,
পূর্ণ ঘট রাখিল তথায়।
আম্র শাখা তার পরে, দিল ঘটের উপরে,
সিন্দূর লেপিয়া দিল তায়॥ —(৪২ পৃঃ)

তারপর কুমার পিতামাতাকে প্রণাম করিয়া যাত্রা করিল এবং সপ্তডিঙ্গা ছাড়িবার পূর্ব্বে গঙ্গাপূজা ও সপ্তডিঙ্গা পূজা করিয়া শ্রীহরিকে স্মরণ করিতে করিতে নৌকায় আরোহণ করিল। নৌকা ছাড়িয়া দিল। কুমার কর্ণধারকে জিজ্ঞাসা করাতে সে নানা স্থানের বিবরণ দিতে দিতে চলিল।

শুনি কর্ণধার কয়, শুন শুন মহাশয়,
তমলুক রহিল পশ্চাতে।
এই বড় পুণ্যস্থান, বর্গভীমা অধিষ্ঠান
শুনি প্রণমিলা যোড়হাতে॥ —(৪৩ পৃঃ)

কালীঘাটে পৌছিলে কর্ণধার ঐ স্থানের পৌরাণিক কাহিনী কহিল—

এই স্থানে পড়ে তাঁর বাম পদাঙ্গুল।
তাহে সতী কালী মূর্ত্তি ভৈরব নকুল॥ —(৪৩ পৃঃ)

এই-সকল বর্ণনার মধ্যে মঙ্গলকাব্যের সহিতও একটা সঙ্গতি রাখিবার চেষ্টা প্রকট হয়। ইহাতে ধনপতি সওদাগরের বাণিজ্য-যাত্রার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। ইহাদের মধ্যে কোথাও প্রাকৃতিক দৃশ্যের বা আকস্মিক ঘটনা সম্ভূত কোন বর্ণনা স্থান পায় নাই। কেবল স্থান-মাহাত্ম্য ও তীর্থাদির নাম উল্লিখিত হওয়াতে বর্ণনাগুলি কিছুটা ভারগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে।

চরিত্র-চিত্রণের দিক্ দিয়া কামিনীই বেশী জীবন্ত। তাহার রূপেরও শেষ নাই, গুণেরও অন্ত নাই। প্রথমেই কুমারকে দিয়া তামাক সাজাইবার পরিকল্পনায় তাহাকে সুরসিকাই মনে হয়। তারপর লক্ষহীরা-রূপে ও কাশ্মীরি মুসলমানীরূপেও তাহার এই গুণের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

সে পতিপরায়ণাও বটে। কুমার বাণিজ্যে যাইবার পর দশ দিনের মধ্যেই বিরহ তাহার অসহ্য হইয়া উঠিল। সে স্বামীর সহিত মিলনের পথ খুঁজিতে লাগিল এবং সখীগণের নিকট স্বামীর অন্বেষণে বাহির হইবার সঙ্কল্প প্রকাশ করিল। দেব-দেবীর প্রতিও সে ভক্তিমতী। গৃহের বাহিরে যাইবার

পূর্ব্বে সে কালিকার পূজা করিল এবং তাঁহার নিকট হইতে আশ্বাসবাণী পাইল—"মনবাঞ্ছা পূর্ণ হবে যাও শীঘ্রগতি।" তারপর নানা কৌশল করিয়া নিজ স্বামীর নিকটেই সে প্রেমাকাঙ্ক্ষা ও কামবৃত্তি চরিতার্থ করিয়াছে। স্বামীর প্রতি তাহার দরদও কম ছিল না। পাটনায় লক্ষহীরার নিকট সর্ব্বস্বান্ত হইয়া কুমার যখন কাশীতে আসিল কামিনী তখন ভৈরবীর রূপে তাহাকে ছলনা করিয়া মুদ্রা-প্রাপ্তির ব্যবস্থা করিয়া দিল।

কামিনীর বুদ্ধির দীপ্তিও প্রশংসার্হ। এই বুদ্ধির প্রাখর্য্যের দ্বারা সে তাহার ভাগ্যকে অনুকূলে আনিয়াছে এবং স্ব-অভিলাষ পূর্ণ করিয়াছে।

নায়কের চরিত্রে প্রথমেই লক্ষণীয় হইতেছে তাহার ক্রোধ ও প্রতিজ্ঞা। ইহা তাহাকে পুরুষোচিত কাঠিন্য দান করিয়াছে। বাণিজ্য-ব্যাপারেও তাহার উৎসাহ দেখা যায়। গৃহ হইতে বিদেশে যাইবার কালে তাহার মনে কোনরূপ চাঞ্চল্য আসে নাই। ছদ্মবেশী কামিনীর নৌকায় যখন শুনিল কাশ্মীরের ব্যবসায়ী জয়পাল অবস্থান করিতেছে তখন বুদ্ধি ও পরামর্শ লইবার আশায় নানারূপ উপহার লইয়া সে তাহার নিকট উপস্থিত হইয়াছে। তারপর জয়পালের নির্দ্দেশানুসারে বাণিজ্যের বিষয়ে তথ্য লাভের জন্য পাটনায়ও গিয়াছে। কিন্তু লক্ষহীরার মায়াজালে সে সর্ব্বস্বান্ত হইল এবং বাণিজ্যেরও কোন সুবিধা করিতে পারিল না। ছদ্মবেশী কামিনীর সহিত দেখা হইবার পর হইতে সে যেন তাহার হস্তের ক্রীড়নকের ন্যায় পরিচালিত হইয়াছে। কামিনী যদৃচ্ছভাবে তাহাকে লইয়া ক্রীড়া করিয়াছে। সে কামিনীর চক্রান্তকে কাটাইয়া উঠিতে পারে নাই। কবি চতুরতার সহিত প্রথমেই তাহার চরিত্রে নারীর প্রতি একটা দুর্ব্বলতার ইঙ্গিত দিয়াছিলেন—সোণামুখী প্রভৃতি তাই তাহাকে প্রহার হইতে নিবৃত্ত করিতে পারিয়াছিল। দেশে ফিরিয়া আসিয়া সে আপনাকে খুঁজিয়া পাইল এবং সমস্ত ঘটনার রহস্য তাহার নিকট ব্যক্ত হইলে সে আপনার পরাজয় স্বীকার করিয়া ও কামিনীর কার্য্যকলাপের প্রশংসা করিয়া নিজের মানসিক উদারতার পরিচয় দিয়াছে।

এই কাব্যে নায়ক-চরিত্রে অনেক গুণের সমাবেশ দেখা যায়—তাহার রসবোধ আছে—নিষ্ঠা আছে—বলিষ্ঠতা আছে এবং বুদ্ধিও আছে—তথাপি কবির অনুভূতির অভাবে চরিত্রটি সজীব নয়।

পার্শ্বচরিত্র-হিসাবে কামিনীর দুই দাসী সোণামুখী ও সোণামণি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাহারা একদিকে যেমন প্রভুকন্যার প্রতি ভক্তিপরায়ণা অপরদিকে সেইরূপ চতুরা। রমণীসুলভ ছলাকলাও তাহাদের জানা আছে। সোণামুখী-সম্বন্ধে কবি লিখিয়াছেন—

সোণামুখী স্বর্ণবর্ণা পূর্ণ ষোলকলা।
ঠারে ঠোরে কহে কথা করে নানা ছলা॥
অঙ্গভঙ্গ করে কভু মৃদুমন্দ হাসে। —(৩৫ পৃঃ)

সে যুগের দাসীদিগের ন্যায় নানারূপ মন্ত্রতন্ত্রও তাহাদের জানা আছে এবং প্রভু-পরিবারের প্রয়োজন-মত তাহারা তাহার প্রয়োগ করিয়াছে। কামিনীকে প্রহারের ভয় হইতে রক্ষা করিবার জন্য তাহারা বলিতেছে—

মোর মন্ত্রগুণে চন্দ্র আইসে ক্ষিতীতলে।
জালাইতে পারি অগ্নি মাঘমাসের জলে। —(৩৫ পৃঃ)

তারপর তাহারা সত্যসত্যই তাহাদের তুক্‌তাকের প্রয়োগে কুমারের প্রহারের হাত হইতে কামিনীকে রক্ষা করিয়াছে।

কামিনীর প্রতি তাহাদের সহানুভূতি ও হৃদয়ের যোগও লক্ষণীয়। কামিনী যখন স্বামীর অন্বেষণে বাহির হইয়াছে তখনও তাহারা কামিনীর সঙ্গ ছাড়ে নাই। ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া তাহারা পথের সকল দুঃখকষ্ট ও বিপদ্-আপদ্ বরণ করিয়া লইয়াছে এবং সর্ব্বদাই বুদ্ধি-পরামর্শ দিয়া কামিনীকে রক্ষা করিয়াছে ও তাহার অভিলাষ-সিদ্ধির সহায়তা করিয়াছে। তাহাদের উপস্থিত-বুদ্ধিরও অভাব নাই।

এক কথায় বলা যায় সখীসুলভ সব গুণাবলীই তাহাদের ভিতর বর্ত্তমান এবং তাহাদের কথাবার্ত্তা ও কার্য্যকলাপের বর্ণনা দ্বারা কবি তাঁহার কাব্য-খানিকে অনেকখানি সরস ও সুখপাঠ্য করিতে পারিয়াছেন।

স্থানে স্থানে দুই-চারিটি বর্ণনায় কবির বাস্তব দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। রমণীগণের ঈর্ষ্যাকাতর এবং কোন্দলপরায়ণ মনের চিত্রও কবি আঁকিয়াছেন। কামিনীর গাত্র-হরিদ্রার দিন কুলকামিনীগণের নিন্দা বাঙালী প্রতিবাসিনী-গণের ঈর্ষ্যাকাতর রূপটি প্রকাশ করিয়াছে—

তারমধ্যে কোন বামা, নাম তার সোণার মা,
পাড়া-কুন্দলীয়া সেই ধনী॥

পরের ঐশ্বর্য্য তায়, লাগে যেন শেল প্রায়,
পরনিন্দা বই কথা নাই।
তার কুন্দলের দায়, ভূত পলাইয়া যায়,
কেহ না রা কাড়ে তার ঠাঁই ॥ —(২৭ পৃঃ)

মেয়ে-মহলে নিন্দা একবার আরম্ভ করিলে তাহা সংক্রামিত হইতে দেরী লাগে না। তাই অপর এক নারীও তাহার সমর্থন করিল।

এই চিত্রগুলির মধ্যে কাব্য যেন কিছুটা বাস্তবতার স্পর্শ পাইয়াছে। আবার বিবাহকালে কুমারকে বরণ করিতে আসিলে—

ঝমর ঝমর করি যত আইওগণ।
লইয়া বরণডালি চলে ততক্ষণ ॥
করেতে জলের ঝারি থমকে থমকে।
বরে প্রদক্ষিণ করে ঠমকে ঠমকে ॥
হাবভাব কটাক্ষেতে সকলে নিপুণ।
ইঙ্গিতে করিতে পারে মদনেরে খুন ॥ —(৩০ পৃঃ)

এই ছন্দে একটা সুন্দর ঝঙ্কার রহিয়াছে। নারীর চলার ছন্দ যেন ইহার মধ্য দিয়া মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। তাহারা একবার চলে, একবার থামে, একবার হাসে, একবার কটাক্ষ-ক্ষেপণ করে—নারীর এই মন্থর গতির সর্পিল ছন্দ কবি সুন্দরভাবে প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ভাব, ভাষা ও ছন্দ পরস্পরের সহিত সমতা রক্ষা করিয়া অনবদ্য হইয়া উঠিয়াছে।

কাব্যের স্থানে স্থানে যে অবাস্তবতা রহিয়াছে কবি তাহার প্রতিও সচেতন। তাই কাহিনী-শেষে তিনি বিক্রমাদিত্য ও কালিদাসের কথোপকথনের মধ্যে কহিয়াছেন—সাধুপুত্র কামিনী ও দাসীগণকে যে কোনবারেই চিনিতে পারে নাই তাহার পশ্চাতে এবং কামিনীর সকল কর্ম্মে সার্থকতার পশ্চাতে কালিকাদেবীর কৃপা ছিল, তাই ঐ-সকল অসম্ভব ব্যাপারও সম্ভব হইয়াছিল।

এই কাব্যে পয়ার, দীর্ঘ ত্রিপদী, লঘু ত্রিপদী, ত্রিপদী, ভঙ্গত্রিপদী, ভুজঙ্গপ্রয়াত, দীর্ঘ চৌপদী, একাবলী, হ্রস্ব ত্রিপদী, তোটক, থর্ব্বত্রিপদী, রোবাই প্রভৃতি ছন্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

গদ্য ছন্দ নাম দিয়া গদ্যে রচিত অংশ একস্থানে পাওয়া যায়। গদ্যের নমুনা—

"আর বিশেষত আপনার অধিক ভৃত্য সঙ্গেতে নাই, অতএব অন্য কর্ম্ম উহা হৈতে যত হউক আর না হউক কিন্তু। এক আদ ছিলিম তামাক চাহিলে ওতো সাজিয়া দিতে পারিবেক। তাহার আর তো কোন সন্দেহ নাই তবু যে অনেক উপকার।" —(১৪৬ পৃঃ)

গদ্যাংশে ছেদ প্রভৃতি যথোপযুক্তভাবে ব্যবহৃত হয় নাই।

উপমা, রূপক, অনুপ্রাস প্রভৃতি অলঙ্কারের ব্যবহার প্রাচীনপন্থী।

যাহা হউক কাব্যটি-সম্বন্ধে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে ইহা পুরাতনপন্থী হইলেও অনেকক্ষেত্রে কবির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও রসগ্রাহিতার পরিচয় বহন করে। ইহা গদ্যে লিখিত হইলে উপন্যাস-সাহিত্যের প্রাথমিক সূচনা-রূপে গণ্য হইতে পারিত।

অবলা প্রবলা—'অবলা প্রবলা' কাব্যটি কালীকুমার মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক রচিত হয় এবং ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। কবি যে আত্মপরিচয় দিয়াছেন তাহা হইতে জানা যায় যে হুগলি জেলায় বলাগড়ি (অধুনা বলাগড়) নামে পরিচিত গ্রামে তাঁহার পৈতৃক নিবাস ছিল। পিতার নাম ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। কবি মাতুলালয়ে প্রতিপালিত হন এবং বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া অনেক দেশ পরিভ্রমণ করেন।

গ্রন্থের শেষে কাব্য লিখিবার সময় সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন—

> ইন্দু সিন্ধুদ্বয় বসু ক্রমতে রাখিবে।
> সেই শকে গ্রন্থ সারা বুঝিয়া দেখিবে॥ — (২৪৮ পৃঃ)

ইহা হইতে মনে হয় ১৭৭৮ শকে এই গ্রন্থ রচনা সমাপ্ত হইয়াছিল।

পুস্তক-রচনার কারণ সম্বন্ধেও কবি কহিয়াছেন—

> বন্ধুমনোরঞ্জনার্থে বন্ধুরহুজ্ঞায়।
> গ্রন্থকার শ্রীকালীকুমার গীত গায়॥ —(১৪ পৃঃ)

মঙ্গলকাব্যগুলিতে দেবাদেশে কবিগণকে কাব্য রচনা করিতে দেখা গিয়াছিল। কবি এখানে বন্ধুগণের মনোরঞ্জনার্থে কাব্য লিখিতেছেন—বাংলা কাব্যধারায় ইহা একটু নূতনত্বের সংবাদ বহন করিতেছে।

এই গ্রন্থটিই কবির প্রথম রচনা। তাই তিনি পাঠকবর্গকেও কহিয়াছেন—

রচনাতে থাকে দোষ করিবে মার্জ্জন।
সবে কহে ভ্রম মতি হয় মুনিগণ॥

গ্রন্থারম্ভে কবি স্বর্গবাসী তেত্রিশ কোটি দেব-দেবীর বন্দনা তো করিয়াছেনই, তার উপর ভারতের বিভিন্ন স্থানে যত দেব-মন্দির আছে তাহাদের বর্ণনা এবং সে-সব স্থানের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণেরও অনুগ্রহ ভিক্ষা করিয়াছেন। তারপরেও স্বস্তি না পাইয়া ডাকিনী, যোগিনী প্রভৃতিকে প্রণতি জানাইয়াছেন। অবশেষে বাল্মীকি, ব্যাসদেব, শ্রীচৈতন্য প্রভৃতিকে বন্দনা করিয়া গুরু ও মাতাপিতার নিকট কৃপা ভিক্ষা করিয়াছেন। এই সকল বন্দনা অত্যন্ত বিস্তৃত হওয়াতে কাব্যের ভারসাম্য অনেকখানি নষ্ট হইয়াছে।

'কামিনীকুমারে'র ন্যায় ইহার কাহিনীও কালিদাস-কর্ত্তৃক বিক্রমাদিত্যের সভায় কথিত হইয়াছিল। একদিন রাজা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"যুবক যুবতী মধ্যে কেবা বলবান।" কালিদাস উত্তর দিয়াছিলেন—"অবলা প্রবলা" এবং তাহার সমর্থনে এই কাহিনী বিবৃত করিয়াছিলেন।

এই কাব্যের নায়িকা দুইজন। একজন পিতামাতার মনোনীত রাজপুত্রকে বিবাহ করিয়া এবং স্বামীর প্রণয়লাভ করিয়াও স্বামীকে হারাইয়াছে—অপর জন বিবাহিত ব্যক্তির মন হরণ করিয়া অবৈধভাবে তাহার সহিত অবস্থান করিয়াছে।

কাব্যটির প্রথমাংশে কাঞ্চন নগরের রাজকন্যা শশীর সহিত অরুণপুরের রাজপুত্রের বিবাহের উদ্যোগ-আয়োজন বর্ণিত। এই বিবাহে প্রণয়ের কোন স্থান নাই। রাজা কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া ভাটগণ অরুণপুরে রাজপুত্রের সন্ধান পাইল।

মনোহর ও শশীর বিবাহের চিত্রে বাঙালীর রীতিনীতির প্রতিফলন হইয়াছে। বিবাহের পূর্ব্বে নরনারী উভয়ের গাত্রহরিদ্রার ব্যবস্থা দেখা যায়। বিবাহরাত্রে কন্যার সাজ-সজ্জায় বাঙালীর অলঙ্কারগুলিও আমরা দেখিতে পাই।

এই কাব্যেও কোন্দলপ্রিয়া রমণীর বর্ণনা রহিয়াছে—কিন্তু তাহা ব্যর্থ হইয়াছে। রাজবাটীতে বসিয়া রাজার নিন্দা করিবার মত সাহস কাহারও

থাকে না, তাহার উপর রাজবাটীতে কন্যার বিবাহ-উৎসবে জাঁকজমকের অভাব বা আদর-যত্নের অভাব কেহ অনুভব করিতেছে ইহাও চিন্তা করা যায় না। এই নিন্দুক চরিত্রটিকে এখানে জোর করিয়া আনা হইয়াছে এবং ইহা কাব্যের সহিত সঙ্গতি রাখিতে পারে নাই।

বিবাহ-বাসরে রাজপুত্রকে দেখিয়া রমণীগণের পতিনিন্দা সে যুগের প্রায় সব কাব্যেই দেখা যায়। মনে হয় কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক কাব্যে গোপীগণ কৃষ্ণকে দেখিয়া যে মুগ্ধ হইয়াছিল এই কাব্যগুলির উপর তাহারই প্রভাব পড়িয়াছে। এই কাব্যেও পতিনিন্দা করিয়া রমণীগণ বলিতেছে—

ভাবিলে স্বামীর ভাব চক্ষে বহে জল।
বাঞ্ছা করি তেজি প্রাণ ভখিয়া গরল॥
নতুবা হিয়ার মাঝে রাখি ও নাগরে।
গুরুজন গঞ্জনা হেলায় হেলা করে॥ —(৫৩ পৃঃ)

জামাতা বিবাহ করিতে আসিলে কন্যাগৃহের মঙ্গলাচরণ ও বরণের চিত্র—

আইল আপনি রাণী করিতে বরণ।
করে যত সখীগণে মঙ্গলাচরণ॥
কোন সখী অগোর চন্দন আনি থালে।
ফোঁটা করি দিল নব যুবকের ভালে॥
কেহ করে দিল তাপ দীপ লয়ে সাথে।
কেহ বাঁ নিছনি ডালা ছোঁয়াইল মাথে॥ —(৬৬-৬৭ পৃঃ)

তারপর—

বর বড় কন্যা বড় করে কোন জন।
হুলু হুলু শব্দে বাক্য না হয় শ্রবণ॥
সাত পাক দিয়া কন্যা রাখে বাম ভাগে।
দেখিতে সুন্দর শোভা রূপ অনুরাগে॥ —(৬৭ পৃঃ)

বিবাহ হইয়া গেল। উভয়ে সুখেই ছিল। কিন্তু বাসরে কন্যার মনে আশঙ্কা অলক্ষ্যে উঁকি মারিয়াছিল এবং সে কহিয়াছিল—

মনে মাত্র রেখ মোরে এই ভিক্ষা চাই।
ভুলিয়া থেকো না যেন থাকি কোন ঠাঁই॥ —(৮৮ পৃঃ)

মনোহর উত্তর দিয়াছিল—

কলেবর সম আমি তুমি সে জীবন।
কেমনে বিচ্ছেদ হবে নহিলে মরণ॥ —(৮৮ পৃঃ)

কিন্তু মনোহরের কথা ব্যর্থ করিয়া দিয়া শশীর আশঙ্কাই সত্যে পরিণত হইল। পত্নীকে বিস্মৃত হইয়া অপর রমণীর প্রেমে মনোহর অভিভূত হইয়া থাকিবে তাহারই ইঙ্গিত যেন কবি পূর্ব্বাহ্লেই দিয়াছেন।

মনোহরের সহিত মনোমোহিনীর সাক্ষাতের মধ্যে কাব্যে রোমান্সের সূচনা দেখা যায়। এক রোমান্টিক পরিবেশে মনোহর মনোমোহিনীকে প্রথম দেখিল। নিবিড় অরণ্য। বন্য পশু-পক্ষীর আনাগোনায় বিপৎসঙ্কুল। রাত্রির অন্ধকার চারিদিক্ আচ্ছন্ন করিয়াছে। মনোহর ভীতমনে বৃক্ষের উপর অবস্থান করিতেছে। এমন সময় হঠাৎ রুণুঝুনু শব্দ। প্রণয়িনীর প্রথম আবির্ভাব মধুর শব্দের ভিতর দিয়া আপন আগমন ব্যক্ত করিল। রাজপুত্র চতুর্দ্দিকে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিল—এক পরমা সুন্দরী রমণী। ঐ রমণী কে এবং গভীর রাত্রে ঐরূপ নিবিড় অরণ্যে কোথা হইতে আসিল রাজপুত্রের সহিত এই প্রশ্ন আমাদেরও মনে জাগে এবং স্তব্ধ বিস্ময়ে রাজপুত্রের সহিত ঐ রমণীর অনুসরণ করায়। তখন আর অরণ্যের ভয়ঙ্করতার কথা কাহারও মনে থাকে না।

মনোমোহিনীর আকর্ষণে মনোহর রমণীবেশে সজ্জিত হইল এবং সুন্দরী নাম গ্রহণ করিয়া কন্যার দাসীরূপে অবস্থান করিতে লাগিল। উভয়ের জীবনে আনন্দের বন্যা বহিল। কিন্তু প্রেমের পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়। বিদেশী এক সওদাগর আসিয়া তাঁহাকে বিবাহ করিবার বাসনা রাজার নিকট প্রকাশ করিলে তাহার প্রতিমুহূর্ত্ত ভয়ে ও দুশ্চিন্তায় কাটিতে লাগিল। একদিন কান্ত নামক সওদাগরের সহিত তাহার বিবাহও হইল। ধরা পড়িবার আশঙ্কায় তাহার বক্ষের দুরু দুরু শব্দ যেন আমরা শুনিতে পাই এবং এক কৌতুকাবহ পরিণতির জন্য আগ্রহান্বিত হইয়া উঠি। রাজপুত্র কিন্তু অন্যান্য নায়কগণের ন্যায় একেবারে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয় নাই এবং তাহার পক্ষ হইতে করণীয় শেষ চেষ্টা করিয়া প্রথম দিন নিজের মান বাঁচাইতে সমর্থ হইয়াছে। অবশ্য পরদিবস তাহাকে সমস্ত সত্য তথ্য ব্যক্ত করিয়া কান্ত সওদাগরের করুণা ভিক্ষা করিয়া দাসত্ব স্বীকার করিতে দেখা যায়। তারপর

কান্ত সওদাগরের পরিহাস ও বিদ্রূপ তাহাকে পীড়া দিয়াছে তথাপি সে কোন প্রতিকারের পথ পায় নাই, শুধু—

যত করে পরিহাস নাহি বুঝে তায়।
যুবরাজ ভেল ভেল চায় আর খায়॥ —(২১৬ পৃঃ)

কান্ত সওদাগরের সহায়তায় সে শ্বশুরালয়ে আসিয়া স্ত্রী প্রভৃতি লইয়া কাল কাটাইতে লাগিল। কিন্তু তাহার নিমিত্ত মনোমোহিনীর বিরহ প্রবল হইয়া উঠিল। তারপর সখীগণের পরামর্শে ও সাহায্যে একদিন মনোমোহিনীর সহিত মনোহরের বিবাহ হইল এবং দুই ভার্য্যা লইয়া মনোহর সুখে কাল কাটাইতে লাগিল।

চরিত্র-চিত্রণের দিক দিয়া মনোহরকে রোমান্টিক কাব্যের উপযোগী বলিয়া মনে হয়। সে যেমন সুন্দর তেমনি ভাবপ্রবণ। শশী(শি)মুখীকে বিবাহ করিয়া সে সুখী হইয়াছিল কিন্তু ভাগ্যবিপর্য্যয়ে মনোমোহিনীর সাক্ষাৎ পাইয়া তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। ইহার নিমিত্ত তাহার ভাবপ্রবণ মন যেমন দায়ী সেরূপ তাহার পরিবেশের প্রভাবও কম কার্যকরী নয়। সে শশীমুখীকে ভুলিয়া মনোমোহিনীর প্রেমে আত্মহারা হইল এবং শত আপদ্‌-বিপদ্‌ তুচ্ছ করিয়া রমণীবেশে দাসীরূপে অবস্থান করিতে লাগিল। তারপর নিজ বুদ্ধিমত্তা ও চতুরতার গুণে সমস্ত প্রতিকূল অবস্থাকে অতিক্রম করিয়া সে জীবনে সমতা আনিতে সমর্থ হইয়াছে।

নায়িকা শশীমুখী যদিও স্বামিপ্রেমে বঞ্চিতা হইয়া অসহ্য বিরহ-যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছে তথাপি সে আপনার বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। সে পতিপরায়ণা। বিবাহের পর স্বামীর প্রেম লাভ করিয়া সুখী। কিন্তু ভ্রমণে বাহির হইয়া স্বামী যখন ফিরিল না তখন নানা দুশ্চিন্তায় ও বিরহ-ব্যথায় দিন কাটাইতে লাগিল। একদিন সে দাসী-সমভিব্যাহারে সমস্ত বাধা তুচ্ছ করিয়া স্বামীর অন্বেষণে দুঃসাহসিকতার পথে বাহির হইল। তারপর নানাদেশে ভ্রমণ করিয়া কালিকাপ্রসাদে স্বামীর সন্ধান পাইলে বিচিত্র কৌশলে স্বামীকে উদ্ধার করিয়া আনিল। ইহাতে তাহার সরস রসিকতা ও বুদ্ধির প্রাখর্য্য মুগ্ধকর। সপত্নীর প্রতি তাহার ব্যবহারে উদারতা ও সহৃদয়তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

মনোমোহিনী কাব্যের দ্বিতীয় নায়িকা। সে সুন্দরী ও প্রেমবিধুরা। মনোমত স্বামী পাইবার নিমিত্ত সে প্রত্যহ শিবপূজা করিত। মনোহরকে

দেখিয়া সে মুগ্ধ হইয়াছিল এবং নিজ সুনাম-দুর্নামের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া মনোহরকে সখী সাজাইয়া রাখিয়াছিল। কান্ত সুন্দরীকে বিবাহ করিতে চায় শুনিয়া পিতার বিরাগের হেতু হইবে জানিয়াও সে পিতাকে বাধা দিবার চেষ্টা করে। তাহার যুক্তি—

শুন দাসি বল গিয়া পিতা মহারাজে।
তনয়ার ধনে ইচ্ছা তাঁরে নাহি সাজে॥ —(১৯৯ পৃঃ)

কিন্তু শেষপর্য্যন্ত সুন্দরীকে ছাড়িতেই হইল। গোপন প্রণয়ের পথে বিপদ্ অনেক। মনোমোহিনী ও মনোহর তাহা হইতে মুক্তি পাইল না। অবশেষে স্বয়ংবর সভায় সে মনোহরের কণ্ঠে বরমাল্য দিয়া সমস্ত গোপনীয়তার অবসান ঘটাইল এবং প্রেমের পথে চরিতার্থতা লাভ করিল। প্রেমের পথে তাহার নিষ্ঠাও যেমন প্রশংসনীয় তাহার সহজ সরল রসিক মনও তেমনি মুগ্ধকর।

পার্শ্ব-চরিত্র-হিসাবে কেহই বিশেষ উল্লেখযোগ্য নয়। দাসীগণ কর্ম্মে সুনিপুণা, প্রভুকন্যার প্রতি তাহাদের ভক্তি ও কর্ত্তব্যবোধ প্রশংসাযোগ্য। তাহারা রসজ্ঞ, হাস্যপরিহাসে চতুর এবং প্রয়োজন-বোধে দুঃসাহসের পথেও বাহির হইতে বিমুখ নয়। কেহই বিশেষরূপে চিত্রিত হয় নাই। তাহারা প্রয়োজন-অনুসারে কর্ম্ম করিয়া গিয়াছে। তবে মনোমোহিনীর দাসীগণের পরিচয় প্রদানের মধ্যে বেশ নূতনত্ব রহিয়াছে। ইহা দ্বারা সখীগণের বিভিন্ন গুণাবলীর পরিচয়ও যেমন পাওয়া যায় তেমনি রাজপুত্র বা রাজকন্যার বর্ণনা ব্যতিরেকেও সাধারণ রমণীগণের বর্ণনার ভিতর এক নূতন দৃষ্টিভঙ্গির আভাস মেলে।

এই কাব্যে ঘটনা-বিন্যাসের একটা স্বচ্ছন্দতা লক্ষ্য করা যায়। কাহিনী কোথাও আড়ষ্ট হইয়া যায় নাই—সর্ব্বত্রই একটা সহজ গতি বর্ত্তমান। বিভিন্ন ঘটনাবলীর মধ্যে চরিত্রগুলির বিভিন্ন দিক্ পরিস্ফুট হইয়াছে। প্রথম শশীমুখীর সহিত মনোহরের বিবাহ ও উভয়ের পরস্পরের প্রতি আসক্তি, বনমধ্যে মনোহরের পথ হারাইয়া ফেলা ও মনোমোহিনীর সহিত সাক্ষাৎ প্রভৃতি ঘটনা-গুলি অকস্মাৎ আসিয়া নূতন চরিত্রের সহিত সাক্ষাৎ ঘটাইয়া দিয়াছে এবং বিভিন্ন রসের পরিবেশে কাব্যটিতে বৈচিত্র্য আনিয়াছে। তবে স্থানে স্থানে বর্ণনার আতিশয্য কাব্যটিকে ভারাক্রান্ত করিয়াছে।

কাব্যটিতে দীর্ঘ ত্রিপদী, পয়ার, পদান্ত যমক, চৌপদী পয়ার, লঘু ত্রিপদী,

দীর্ঘ চতুষ্পদী, পয়ার ছন্দে অন্ত্যান্ত্য যমক, পয়ারে আন্ত যমক, একাবলী, ভুজঙ্গ-প্রয়াত, দীর্ঘ ভঙ্গ-ত্রিপদী, লঘু ভঙ্গ-ত্রিপদী, তোটক, মালঝাঁপ প্রভৃতি ছন্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

অনুপ্রাসের বাহুল্য লক্ষণীয়। স্থানে স্থানে যমকের ব্যবহারে বাড়াবাড়ি দেখা যায়। উপমা, রূপক প্রভৃতির ব্যবহার সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রানুযায়ী। স্থানে স্থানে অতিশয়োক্তি ও বর্ণনাবাহুল্য পীড়াদায়ক।

জীবন-যামিনী—'জীবন-যামিনী' কাব্যটি ১৭৭৮ শকাব্দে অর্থাৎ ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ইহা বলাগড়-নিবাসী কালীকুমার মুখোপাধ্যায় দ্বারা রচিত ও শ্রীবনয়ারিলাল রায় দ্বারা সংশোধিত। ভণিতায় পাওয়া যায়—

খ্যাত কবিবর, বহু গুণধর,
ভুবন মোহন কায়।
তাহার প্রসাদে মজিয়ে আহ্লাদে
শ্রীকালীকুমার গায়॥ —(২৬ পৃঃ)

আবার কোথাও দেখা যায়—

খ্যাত কবিবর, বহু গুণধর,
বনয়ারিলাল রায়।
তাহার প্রসাদে, মজিয়ে আহ্লাদে,
শ্রীকালীকুমার গায়॥ —(৪৩ পৃঃ)

দেব-বন্দনার পর কাহিনীর আরম্ভ। কর্ণাট নগরের রাজপুত্র জীবন নারী-বিদ্বেষী ছিল। তাহার ধারণা—

রমণী সরলা নহে খল পরবশ।
অন্তরে গরল রাশি স্থধু মুখে রস॥ —(৮ পৃঃ)

কিন্তু ভাটগণের মুখে রাজকন্যার নানাবিধ বিবরণ শুনিয়া চিন্তা করিতে করিতে সে একদিন রাত্রে স্বপ্নে এক অপূর্ব্ব রূপবতী কন্যার সাক্ষাৎলাভ করিল। হাস্যময়ী কন্যা যেন তাহার নিকটে আসিয়া মাল্য-বদল করিয়া চলিয়া গেল।

জীবনের মন অনুরাগরঞ্জিত হইয়া উঠিল। তাহার নিকট "ভুবনমোহিনী বিনে ভুবন আঁধার"। স্বপ্ন-দর্শনের পশ্চাতে কবি মনস্তাত্ত্বিক-বিশ্লেষণ দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। প্রথমে পিতামাতা বন্ধু ও ভাটগণের দ্বারা বিবাহের চেষ্টায় তাহার মনে রাজকন্যাগণের চিন্তা উদিত হইয়াছে এবং পরে সেইজন্যই সে স্বপ্ন

দেখিয়াছে। স্বপ্নে যখন সে মুগ্ধ হইয়াছে তখন সেই রাজকন্যাকে পাইবার আকাঙ্ক্ষা তাহার মনে প্রবল হইয়া উঠিল।

নায়কের মনে যখন প্রেমের বীজ প্রকাশের পথ খুঁজিয়া বেড়াইতেছে তখনও নায়িকার সন্ধান আমরা জানি না বা তাহার মনের সংবাদও আমাদের নিকট অজ্ঞাত। কেবল তাহার রূপের একটু ছটা যেন বিজলী-আলোকের ন্যায় ক্ষণিকের জন্য স্ফুরিত হইয়া মিলাইয়া গেল। তাহাকে ধরা যায় না, ছোঁয়া যায় না, কেবল আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া সে অদৃশ্য হইল। নায়িকার পরিচয় গোপন করিয়া কবি এ স্থানে সুন্দর কৌতূহল-উদ্দীপক অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছেন এবং রোমান্সকে ঘনীভূত করিয়াছেন।

রাজপুত্র একাকী ঘোড়ায় চড়িয়া রাজকন্যার সন্ধানে বাহির হইল। মানসীকে সে সর্ব্বত্র খুঁজিতেছে। একদিন এক বিরাটাকার অজগর সর্প দেখিয়া তাহার মনে হইল—

যদি সেই বিনোদিনী, হয়ে থাকে ভূজঙ্গিনী,
পুন মোরে ছলিবার আশে।
কে বুঝে নারীর ভাব, কত ভাবে আবির্ভাব,
ছলনায় জীবন বিনাশে॥ —(১৫ পৃঃ)

অবশেষে শুকপক্ষীর নিকট রাজপুত্র যামিনীর সন্ধান পাইল। কিন্তু তখনও "শুধু বাঁশী শুনিয়াছি চোখে দেখি নাই।" অপরিচয়ের আকর্ষণ মানব-মনের উপর যতখানি প্রভাব বিস্তার করে পরিচয়ের ঘনিষ্ঠতায় তাহা হয় না। সেই অপরিচয়ের আহ্বানে রাজপুত্র আবার চলিল।

রাজকন্যা যামিনীর মনে প্রেম সঞ্চারিত করিবার নিমিত্ত শুকপক্ষী তাহার নিকট গেল। শুকপক্ষী মনস্তত্ত্ব ভাল বুঝে—রাজকন্যার মনে আকাঙ্ক্ষা জাগরিত করিতে সে অল্পে অল্পে রাজপুত্রের কথা পাড়িল। রাজকন্যা শুকপক্ষীকে দেখিয়া মুগ্ধ হইলে পক্ষী তাহার কৌতূহল বৰ্দ্ধিত করিবার জন্য কহিল—

কি কায কথায়, যাই গো বাসায়,
মিছে থাকি তব কাছে। —(২৪ পৃঃ)

নারীর কৌতূহলী মনে অধীরতা জাগিল। "যামিনী মাথার কিরায় শুকেরে বসায়, মণিহারা যেন ফণী।" শুকপক্ষী রাজপুত্রের রূপের বর্ণনা করিলে যামিনীর মনে আকাঙ্ক্ষার উদ্রেক হইল। সে কহিল—

ছাড় ছাড় ছল, হয়েছি বিকল,
বল সে কেমন জন।
শুনে তব বাণী, আকুল পরাণী,
গৃহেতে না রহে মন ॥ —(২৪ পৃঃ)

এক অপূর্ব্ব রূপের ইঙ্গিতে নারী-মন বিচলিত হইল। শুকপক্ষী জানে কেবল রূপ-বর্ণনায় কন্যার মনে দানা বাঁধিবার সুযোগ পাইবে না—একটি পার্থিব বস্তুকে কেন্দ্র করিয়া কন্যার মনে প্রেম ও কল্পনা উদ্রিক্ত করিতে সে রাজপুত্রের পরিচয় দিল। "রাজকুমারী আকুল হইয়ে রহিল পুত্তলী প্রায়।" তারপর আরম্ভ হইল তাহার বিরহ এবং প্রতীক্ষার পালা। সে অসুস্থ হইয়া পড়িল। যখন কেহই তাহাকে আরোগ্য করিতে পারিল না তখন একদিন স্বপ্নে দেখিল—

আমি যার লাগি, আছি সর্ব্বত্যাগী,
ঠিক যেন সেই জন।
বৈদ্যের বেশেতে, আমার পাশেতে,
আসিয়ে হরিল মন ॥ —(৪১ পৃঃ)

এই স্বপ্ন অনেকখানি ইঙ্গিতপূর্ণ। কারণ ঐ দিনই বৈদ্যবেশে জীবন রাজ-সভায় উপস্থিত হইল এবং পূর্ব্ব হইতে তাহার আকৃতি সম্বন্ধে ধারণা না থাকিলে যামিনীর তাহাকে চিনিতে অসুবিধা হইত। সর্ব্বত্রই মনস্তত্ত্বের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কবি কাহিনীকে আগাইয়া লইয়া গিয়াছেন। ইহা কবির লিপি-কুশলতার পরিচায়ক। জীবন বৈদ্যবেশে যামিনীর নিকট আসিলে উভয়ের কথোপকথনের মধ্যে অনুরাগের সলাজ প্রকাশ উপভোগ্য। উভয়ের গোপন বিবাহের পর কিছুদিন আনন্দে অতিবাহিত হইল। কিন্তু বিরহ ছাড়া মিলন মধুর হয় না। তাই কবি একদিন রাজপুত্রকে মৃগয়ায় পাঠাইয়া সে রাত্রে গৃহে ফিরাইলেন না। এই ঘটনাটি যেন জোর করিয়া আনা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। যামিনীর অভিমান এবং তাহার অবসান বর্ণনা করিবার জন্যই যেন কবি ইহার অবতারণা করিয়াছেন।

প্রেমের পথে বিঘ্ন অনেক। আনন্দের মধ্যে বিপদের ছায়া পড়িল। রাজা কন্যার বিবাহ দিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ইহাতে উভয়ের মধ্যে প্রেম আরও নিবিড় হইল এবং একদিন নিশাযোগে উভয়ে রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করিল।

কিন্তু তাহাতেও স্বস্তি নাই। জীবন যামিনীর জন্য জল আনিতে গেলে এক ধনাঢ্য রাজা যামিনীকে স্বগৃহে লইয়া চলিল। তাহার হস্ত হইতে উদ্ধার লাভের পর তাহাদের মিলনের পথ নির্ব্বিঘ্ন হইল।

এই কাব্যে প্রেমের মধ্যে বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হয় নাই। কিন্তু তাহার পথে নানারূপ বাধাবিঘ্ন, মান-অভিমান, ভয়-শঙ্কা আসিয়া নানা রসের ভিতর দিয়া তাহার স্ফুরণ দেখাইয়াছে। ইহা দ্বারা কাব্য বৈচিত্র্যময় হইয়া উঠিয়াছে।

রোমান্স সৃষ্টির দিক্ দিয়াও কবি কিছু-পরিমাণে সার্থক হইয়াছেন। তিনি শুধু আদিরসের প্রাধান্য দেখান নাই—বিভিন্ন রসের সমাবেশে ইহার ভিতর রসবৈচিত্র্য আনিয়াছেন এবং অনেকক্ষেত্রেই আকস্মিকতায় ও অতিপ্রাকৃতের আবির্ভাবে তাহা রোমান্টিক হইয়া উঠিয়াছে।

প্রথমতঃ অপুত্রক রাজার মনে সুখ নাই। তিনি অরণ্যে যাইবার বাসনা করিলেন। এমন সময় মহামায়ার কৃপায় জীবনের জন্ম হইল। কাহিনীর গতি পরিবর্ত্তিত হইল।

রাজকন্যার অন্বেষণে বাহির হইয়া রাত্রে অজগর সর্পের সহিত সাক্ষাৎ ভয়ঙ্কর রসের সৃষ্টি করিয়া পাঠকের মনেও ভীতির সঞ্চার করে—

উঠিতেছে বৃক্ষোপর, কাল সম অজগর,
ভয়ানক বদন ব্যাদন। —(১৪ পৃঃ)

তারপরও আশঙ্কা জাগিয়া থাকে যখন দেখা যায় রাজপুত্র নিজের দিকে সর্পকে আসিতে দেখিয়াও নিহত করিতে দ্বিধা করিতেছে এবং ভাবিতেছে হয়তো তাহার প্রেয়সী সর্পের রূপ ধরিয়া তাহার নিকটে আসিতেছে। শেষ মুহূর্ত্তে সর্পকে মারিয়া ফেলিবার পরও কিন্তু আকস্মিকতার শেষ হইল না। মস্তকের উপর হইতে নিজ কার্য্যের সুখ্যাতি শুনিয়া এবং কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া রাজপুত্র ভয়ে এবং বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল—

দেবতা গন্ধর্ব্ব নর, কি কিন্নর কি বানর,
কিবা যক্ষ কিবা নিশাচর।
কিম্বা উপদেব হবে, সত্য প্রকাশিয়ে কবে,
ভয়ে তনু হতেছে কাতর ॥ —(১৬ পৃঃ)

রাজপুত্র শুক পক্ষীকে দেখিতে না পাইয়া যেমন বিস্মিত হন, তাহার মুখে

মনুষ্যের ন্যায় কথা শুনিয়া আমরাও সেরূপ বিস্ময় বোধ করি। অবশ্য ভারতবর্ষের নরনারীর লৌকিক সংস্কারের কাছে ইহা খুব অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয় না। মহামায়ার অনুগ্রহে পুত্রপ্রাপ্তিও আমাদের প্রায় স্বাভাবিক বলিয়াই মনে হয়। এই কাব্যে ইহাই লক্ষণীয় যে কবি যেখানে অতিপ্রাকৃতকে আনিয়াছেন সেখানে তাহাকে এ-দেশের সংস্কারগত বিশ্বাসের উপযোগী করিয়া চিত্রিত করিয়াছেন। অবাস্তবতার আতিশয্য তাই কোথাও খুব পীড়াদায়ক হয় নাই।

শুকপক্ষীর প্রতি রাজকন্যার আকর্ষণও ইঙ্গিতপূর্ণ। রাজকন্যা সখীকে কহিতেছে—

একি চমৎকার, ঘুচিল আঁধার,
দেখলো দেখলো সখী।
জনমে কখন, না দেখি এমন,
সোণার বরণ পাখি। —(২১ পৃঃ)

ঐ পক্ষীর নিকটেই সে তাহার প্রিয়জনের সন্ধান পাইবে বলিয়াই যেন এক অদৃশ্য আকর্ষণ তাহাকে অভিভূত করিয়াছে।

তারপর উভয়ের গোপন পরিণয় ও পলায়নের ভিতরেও রোমান্স কম নাই। ধনাঢ্য ব্যক্তি কর্তৃক যামিনীর প্রতি কুৎসিত উক্তি মনে যে আশঙ্কার উদ্রেক করে যুদ্ধের মধ্যে তাহা আরও বাড়িয়া যায়।

চরিত্রের দিক্ দিয়া রাজপুত্র জীবন নানা গুণের অধিকারী। বিভিন্ন কার্য্যের ভিতর দিয়া তাহার গুণাবলীর বিভিন্ন দিক্ প্রকাশিত হইয়াছে। শিক্ষায়-দীক্ষায় সে অতীব পণ্ডিত। তাহার রূপও যথেষ্ট। প্রথমে সে নারী-বিদ্বেষী ছিল। কিন্তু একবার তাহার মন নারীর প্রতি আকৃষ্ট হইলে সে গৃহের সুখ-ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করিয়া অরণ্যে অরণ্যে ভ্রমণ করিয়াছে এবং নানা দুঃখকষ্ট স্বীকার করিয়া প্রেয়সীকে লাভ করিয়াছে। প্রেমের পথে তাহার আন্তরিকতা প্রশংসাযোগ্য।

রাজপুত্র রসগ্রাহীও বটে। রাজভবনে সখীগণের সহিত আলাপ আলোচনায় এবং যামিনীর সহিত রসালাপের ভিতর দিয়া তাহার সুন্দর প্রকাশ হইয়াছে।

জীবনের বীরত্ব ও যুদ্ধনিপুণতাও দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বৃহৎ অজগর সর্প

দেখিয়া সে ভীত না হইয়া প্রেয়সীর কল্পনা করিয়াছে এবং তাহা নিকটে আসিলে অনায়াসে তাহাকে বধ করিয়াছে। ধনাঢ্য রাজার সহিত যুদ্ধেও সে জয়লাভ করিয়া যামিনীকে উদ্ধার করে।

নায়িকা যামিনী স্বন্দরী, কোমল-স্বভাবা ও প্রেম-বিহ্বলা। শুকের মুখে রাজপুত্রের রূপ বর্ণনা শুনিয়া তাহার কোমল মন অভিভূত হইয়া পড়ে। প্রেমের প্রতি তাহার নিষ্ঠাও কম নহে। পিতা বিবাহের ব্যবস্থা করিতেছেন শুনিয়া সে গৃহের সমস্ত মায়া-মমতা কাটাইয়া প্রিয়তমের সহিত অনিশ্চয়তার পথে বাহির হইয়াছে।

কিন্তু যামিনীর স্নেহশীল মন একদিকে শুকপক্ষীর প্রতি তাহার আকর্ষণ যেমন বাড়াইয়া দেয় তেমনি গৃহ ছাড়িবার প্রাক্কালে একটা দুঃখের অনুভূতিতে তাহাকে দ্বিধাগ্রস্ত করে। সেই সময় রাজপুত্র তাহাকে ধরিয়া অশ্বে আরোহণ করাইলে রাজকন্যা স্নেহের আবেষ্টনী ত্যাগ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। নানা বিদ্যার ন্যায় অশ্বচালনায়ও তাহার পারদর্শিতা দেখা যায়। সে পৃথক্ অশ্বে চড়িয়া রাজপুত্রের অনুগামী হইয়াছিল।

যামিনীর বুদ্ধিও প্রশংসাযোগ্য। ধনাঢ্য রাজা তাহার নিকট কুপ্রস্তাব করিলে এবং জীবনকে ব্যাঘ্রে হত্যা করিয়াছে কহিলে সে চিন্তা করিল—ঐ রাজার সহিত না গেলে সে বলপূর্ব্বক লইয়া যাইবেই, তাহার উপর অপমান ও হয়রাণির একশেষ। তাই সে স্বেচ্ছায় তাহার সহিত গেল। কিন্তু জীবনের নিহত হইবার সংবাদ সে বিশ্বাস করে নাই। তাই পথে কাঁদিতে কাঁদিতে ও জীবনকে ডাকিতে ডাকিতে সে চলিয়াছিল এবং সেই উপায়ের দ্বারাই জীবনের দেখা পাইয়াছিল।

অন্যান্য ভূমিকায় কেহই বিশেষ উল্লেখযোগ্য নয়। সকলেই প্রয়োজন-অনুসারে দু-একবার দেখা দিয়া অন্তর্হিত হইয়াছে—কেহই বিশেষভাবে মনে কোন রেখাপাত করে না।

বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন রকমের বর্ণনার ভিতর দিয়া কাব্যে রূপসৃষ্টি ও বিস্তৃতি আনিবার চেষ্টাও দেখা যায়।

জীবন মৃগয়ায় গেলে দুর্য্যোগপূর্ণ রাত্রির বর্ণনা—

দিবা অবসান হৈল আইল যামিনী।
অসিত পক্ষের নিশি ধ্বান্ত তমসিনী॥

ঘনগণ ঘটা করি করিছে গর্জ্জন।
মধ্যে মধ্যে সৌদামিনী দেয় দরশন॥
চারিদিগে ঘোরাকার অতি ভয়ঙ্কর।
ঝিঁ ঝিঁ রবে ঝিল্লিগণ ডাকে নিরন্তর॥ —(৬৪ পৃঃ)

বিভিন্ন রস ও বিভিন্ন দৃশ্যের অবতারণায় কাব্যটিতে বৈচিত্র্য আসিয়াছে। আদিরসের অত্যন্ত বাড়াবাড়ি নাই এবং অন্যান্য রসের সহিত সমতা রক্ষা করিয়াছে বলিয়া তাহা কাব্যরসকে বিশেষ ক্ষুণ্ণ করে নাই।

কাহিনীর দিক্ হইতে বিচার করিলে দেখা যায় বাস্তবতার প্রতি কবির দৃষ্টি রহিয়াছে। সমস্ত অবাস্তবতা ও অতিপ্রাকৃতের পশ্চাতে তিনি একটা না একটা যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন এবং সেগুলিও ভিত্তিহীন নয়। কাহিনীর গতি সহজভাবে আগাইয়া চলিয়াছে। কোথাও কষ্টসাধ্য উপায়ে কোন ঘটনার অবতারণা করা হয় নাই। মানব-মনের বিচিত্র গতির প্রতিও কবির লক্ষ্য রহিয়াছে—বিভিন্ন স্থানে তাহার ক্ষীণ প্রকাশ দেখা যায়। রসবৈচিত্র্য, বর্ণনা-চাতুর্য্য এবং ঘটনা-সংঘাতের ভিতর দিয়া চরিত্রের প্রকাশ এই কাব্যে অনেকটা সার্থক হইয়া উঠিয়াছে। উপন্যাসের উপাদান 'কামিনীকুমার' কাব্য হইতেও ইহাতে অধিক-পরিমাণে বর্ত্তমান। কিন্তু কাব্যের ক্ষেত্রে যাহা সব চেয়ে বেশী প্রয়োজনীয় সেই অনুভূতির স্পর্শ ইহাতে নাই এবং সেইজন্য কাব্যটি প্রাণবন্ত হইয়া উঠিতে পারে নাই।

পয়ার, ত্রিপদী, চৌপদী, মালঝাঁপ প্রভৃতি ছন্দ এই কাব্যে ব্যবহৃত হইয়াছে। উপমা, রূপক প্রভৃতি অলঙ্কার অন্যান্য কাব্যের ন্যায় সংস্কৃত-ঘেঁষা। তবে অনুপ্রাসের অত্যন্ত বাড়াবাড়ি নাই। যমকের প্রয়োগে কবি-মনের সাধারণ ঝোঁক লক্ষ্য করা যায়। তিনি সুযোগ পাইলেই ঐরূপ শব্দ-সকল ব্যবহার করিয়াছেন—

জয় জয় তমোহর, হৃদয়ের তমো হর,
বিভাকর বিভা কর দান। —(মঙ্গলাচরণ)

অথবা,

যদি ঘটে থাকে চিন্তে, তনয়ার রোগ চিন্তে
কারাগারে করিব বন্ধন॥ —(৫৪ পৃঃ)

মোহিনীমোহন-কাব্য—'মোহিনীমোহন' কাব্যটি ঈশ্বরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক লিখিত হইয়া ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। বিজ্ঞাপনে কবি 'বরন্স' ও 'বাইরণে'র নিকট ঋণ স্বীকার করিয়াছেন। ইহাদের কাব্য কবিকে এই গ্রন্থখানি রচনা করিবার প্রেরণা জোগায় এবং ইহাদের কাব্যের প্রভাবও স্থানে স্থানে লক্ষিত হয়।

দেব-দেবীর বন্দনায় কাব্যটির আরম্ভ হয় নাই। ইহা বিদ্যাসাগর মহাশয়কে উৎসর্গ করা হইয়াছে এবং কবি তাঁহারই বন্দনা করিয়াছেন—

কবি লতিকার, কে আছে আমার,
তোমা ভিন্ন গো সহায় ?
করি ভবাশ্রয়, কাব্যলতাচয়,
ব্যাপুক উদ্যান প্রায়।

এই বন্দনায় মানুষের প্রতি মানুষের মর্য্যাদাবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। দেবদেবীর স্থান মানুষ অধিকার করিয়াছেন এবং কাব্যে মানবতার আবির্ভাব সূচিত করিয়াছেন।

নায়ক-নায়িকার প্রণয়-কাহিনী এই কাব্যের বিষয়ীভূত নয়। বিবাহিত নারীর রূপে মুগ্ধ দুশ্চরিত্র লোক কিরূপে দুষ্প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার চেষ্টা করে এবং ব্যর্থ হইয়া অশান্তির সৃষ্টি করে তাহারই চিত্র ইহাতে অঙ্কিত হইয়াছে। ইহার নায়ক-নায়িকা রাজপুত্র বা রাজকন্যা নয়—তাহারা সাধারণ বাঙালী ঘরের নর-নারী, বিবাহিত জীবনে সুখী, প্রেমে নিষ্ঠাসম্পন্ন, আর্থিক অনটন নাই—সব দিক দিয়া একটা স্বাচ্ছন্দ্য বর্ত্তমান। কিন্তু নানাবিধ সামাজিক বিধি-ব্যবস্থা ও সমস্যার জটিলতা নায়ক মোহনের মনে সংসার-বিমুখতা আনে এবং ভ্রমণের উদ্দেশ্যে সে দূরদেশে গেলে তাহারই বন্ধু জীবন দুষ্টগ্রহের মত আসিয়া মোহনের স্ত্রী মোহিনীর জীবনকে দুর্ব্বিষহ করিয়া তুলে এবং দুর্দ্দশার চরম সীমায় আনিয়া ফেলে। কাহিনীর দিক্ দিয়া পূর্ব্ববর্ত্তী কাব্যগুলি হইতে ইহা সম্পূর্ণ নূতন। ঘটনাবিন্যাসও নিজ বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত। সম্পূর্ণ কাব্যটিই ইংরাজী সাহিত্যের প্রভাবপুষ্ট।

কাব্যের প্রথমে সংসার-সম্বন্ধে বর্ণনা করিতে গিয়া কবি লিখিয়াছেন—

কোন স্থানে দধীমুখী বসি শাখীপরে,
করিছে সংগীত কিবা সুমধুর স্বরে।

সে মুরলী ধ্বনি শুনি মন পুলকিত,
বেণু বীণা লজ্জা পায় শুনি সে সংগীত।
এমন সময় এক শিকারিয়া পাখী,
দেখিল সে দধীমুখী হতে এক শাখী।
কালান্তক কাল সম করি পরাক্রম,
করিল কবলস্থিত তাহারে অধম।

সমস্ত কাহিনীটির সারাংশ যেন এই চিত্রে পরিস্ফুট হইয়াছে। মোহন ও মোহিনীর সুন্দর সংসারে শিকারী পাখীর ন্যায় জীবন আসিয়া সব লণ্ডভণ্ড করিয়া দিয়া গেল।

কাব্যটিতে প্রথম হইতেই একটা বিষাদের সুর লক্ষ্য করা যায়। কবি গ্রন্থের আরম্ভেই লিখিয়াছেন—

সংসার সুখ আগার যেই জন কয়,
দয়াশূন্য তারি দেহ কি আছে সংশয়।
যে পার্শ্বে ফিরাই আঁখি দেখি জীবকষ্ট,
সুখ সুধু শব্দ জ্ঞান হয় স্পষ্ট।

কাব্যে মানব-জীবনের যে-সব জটিলতার সমস্যা, দ্বন্দ্ব ও দুঃখের চিত্র কবি অঙ্কিত করিয়াছেন—এই সুরের মধ্যে যেন তাহারই পূর্ব্বাভাস পাওয়া যায়।

কাব্যের নায়ক মোহন আদর্শ চরিত্রের ব্যক্তি। কবি তাহার পরিচয় দিয়াছেন—

বয়ঃ পঞ্চবিংশপ্রায় কান্তি মানোহর,
সুচিক্কণ কালো কেশ দেখিতে সুন্দর।
ললাট বিশাল হেরি মনে জ্ঞান হয়,
ধীশক্তি বসতি করি চির তথি রয়। —(৭ পৃঃ)

মোহন উচ্চশিক্ষিত এবং সমাজ-সংস্কারে আত্মনিয়োগ করিয়াছিল। কিন্তু সমাজ-সংস্কার করিতে গেলে যে ধৈর্য্য-ত্যাগ-সহিষ্ণুতার প্রয়োজন তাহার তাহা ছিল না। কেহ কেহ তাহার নামে দুর্নাম রটাইলে সে অত্যন্ত চিন্তিত ও বিষাদগ্রস্ত হয়।

সে সংসার ত্যাগ করিবার সঙ্কল্প করিল কিন্তু প্রাণসমা পত্নীর নিকট সে কথা ব্যক্ত করিতে দুঃখ ও দ্বিধা বোধ করিতে লাগিল। স্ত্রীর নিকট

মনোবাসনা প্রকাশ করিয়াও সে স্বস্তি পায় নাই—প্রায় সমস্ত রাত্রি জাগিয়া পত্নীর নিদ্রিত সৌন্দর্য্য দেখিয়া কাটাইয়াছে। তারপর ভোরবেলা এক ভৃত্যকে সঙ্গে লইয়া গৃহত্যাগ করিয়াছে। নায়ক-চরিত্রের মধ্যে সর্ব্বত্র যেন সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় নাই। উচ্চশিক্ষিত, দৃঢ়চেতা, আদর্শস্থানীয় মোহন মিথ্যা দুর্নামের নিমিত্ত মাতাপিতা, স্ত্রী, সকলকে ছাড়িয়া চলিয়া গেল। তাহাদের প্রতি সে নিজে যে অন্যায় আচরণ করিল তাহা অনুভব করিল না—ইহা যেন বিসদৃশ বলিয়া বোধ হয়। তারপর কত স্থানে ভ্রমণ করিল, কত দৃশ্য দেখিল, কোথাও আত্মীয়-স্বজনের কথা তাহার মনে পড়ে নাই। ভ্রমণ করিতে করিতে তাহার মনে কেবল দার্শনিক তত্ত্বই জাগরিত হইয়াছে। তাহার মনে হইয়াছে বৃক্ষগণ যেন তাহাকে কহিতেছে—

> দেখ হে সুহৃদ নর সৌভাগ্য গৌরবে,
> চাহে না মোদের পানে ব্যাপৃত বিভবে।
> যে তুচ্ছ বিষয় মধ্যে সুখ অন্বেষণ,
> করয়ে তাহারা তাহে বিষ সংমিশ্রণ। —(২৫ পৃঃ)

প্রায় বৎসরকাল নানাস্থানে ভ্রমণ করিতে করিতে রাজমহলে একটি তীরবিদ্ধ হরিণী তাহার দিকে কাতর-নয়নে চাহিলে মৃগনয়না স্ত্রীর কথা তাহার স্মরণ হইল। সে তখনই গৃহাভিমুখে যাত্রা করিল। পথিমধ্যে জীবনের উদ্যানে প্রবেশ করিলে জীবনের স্ত্রী ইন্দুমতী তাহাকে দেখিয়া মুগ্ধ হয় ও কুপ্রস্তাব করে। অতি কৌশলে সে তাহার কবল হইতে মুক্ত হইয়া চলিয়া আসে। তারপর নিজ গ্রামের ষ্টেশনে অবতরণ করিয়া একটি দোকানে বিশ্রাম লইবার কালে রমণীকণ্ঠের কাতরধ্বনি শুনিয়া নিকটে গিয়া নিজ পত্নীকে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত ও দুঃখিত হয়।

কবি মোহনের চরিত্রকে আদর্শরূপে অঙ্কিত করিতে গিয়া একেবারে প্রাণহীন করিয়া ফেলিয়াছেন। তাহার গুণাবলীর পরিচয় কবির বর্ণনার মধ্যে আমরা পাই,—কোন কার্য্যকলাপের ভিতর তাহা পরিস্ফুট হয় নাই। গৃহে ফিরিয়া পিতার মৃত্যু ও পত্নীর দুর্দ্দশার কথা শুনিয়া সে কেবল দুঃখ অনুভব করিয়াছে—প্রতিকার করিবার বা প্রতিশোধ লইবার কোন স্পৃহা তাহার ভিতর জাগে নাই। অথচ কাব্যের প্রথমেই দেখিতে পাই সে সমাজ-সংস্কারের চেষ্টা করিয়া নিন্দাভাজন হইয়া দেশত্যাগ করে। সমাজ-

সংস্কার করিবার মত বৃত্তি যাহার ভিতর থাকে সে নিজ পরিবারের প্রতি অপরের অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধে একটি প্রতিবাদও করিবে না ইহা যেন অচিন্তনীয়। কবি এই চরিত্র-সৃষ্টিতে একেবারে ব্যর্থ হইয়াছেন।

নায়িকা মোহিনী অত্যন্ত সুন্দরী। সে পতিপরায়ণা। স্বামীর বিষণ্ণ মুখ দেখিলে সে স্বস্তি পায় না। স্বামীর বিদেশে যাইবার বাসনা শুনিয়া সে কহিতেছে—

> এ জীবন এইক্ষণে পারি ত্যজিবারে,
> তবু হে বিদায় আমি দিব না তোমারে। —(১৪ পৃঃ)

প্রভাতে নিদ্রাভঙ্গে স্বামীকে না দেখিয়া—

> মোহিনী হৃদয়ে যেন বজ্র হেন বাজে। —(৫২ পৃঃ)

সখী মনোরমার সহিত উদ্যানে ভ্রমণ করিতে গিয়া সে নিজের বিষাদের ছায়া সর্ব্বত্র দেখিতেছে—

> আহা মরি মরি সই নাথের বিহনে
> শোভাভ্রষ্ট এ উদ্যান দেখ লো লোচনে। —(৫৯ পৃঃ)

সেখানে ভ্রমণ করিতে করিতে বিবাহিত-জীবনের নানারূপ স্মৃতি মনে উদিত হইয়া তাহাকে অধিকতর বিচলিত করিল। নায়ক যখন দেশভ্রমণে বাহির হইয়া বিচিত্র শোভা-সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতেছে এবং দিনান্তে একবার গৃহ-সংসার বা পত্নীর কথা ভাবিতেছে না পত্নী তখন কখনও কাঁদিতেছে, কখনও মূৰ্চ্ছিত হইতেছে, কখনও পূর্ব্বস্মৃতি-অবলম্বনে অভিভূত হইয়া আছে। উভয়ের মনের এই দ্বিবিধভাবকে কবি যুক্তি দ্বারা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। পুরুষেরা সব সময় স্ত্রীপুত্রপরিজনের চিন্তা করে না, কারণ—

> কভু অধ্যয়ন করি কভু বা শ্রবণ,
> কভু প্রিয়বন্ধু সনে করি আলাপন,
> কভু নানা দেশ করি সহর্ষে ভ্রমণ,
> অপূর্ব্ব প্রকৃতি শোভা করি সন্দর্শন, —(৬৯ পৃঃ)

তাহারা ভুলিয়া থাকে। আর রমণীগণ,—

> পীরিতি পথ ব্যতীত রমণীর মন,
> অন্য পথে কভু সেই করে না ভ্রমণ। —(৬৯ পৃঃ)

কবির সহিত এক্ষেত্রে আমরা একমত হইতে পারি না। প্রেম-ভালবাসা নর-নারী উভয়ের জীবনে জাগরিত না হইলে সংসার সুখের বা আনন্দের হইতে পারে না। প্রেমিক পুরুষ শত কার্য্যের ভিতর থাকিয়াও শত ক্রোশ দূরে থাকিয়াও পত্নীর কথা চিন্তা করিয়া বিষাদগ্রস্ত হইতেছে এবং বিরহ অনুভব করিতেছে সাহিত্যে ইহার দৃষ্টান্ত বিরল নয়। এই কাব্যের নায়কের ভিতর আমরা তাহার ব্যতিক্রম দেখি। সেইজন্য পত্নীর প্রতি তাহার প্রেম বা নিষ্ঠা কিছুরই পরিচয় পাই না। একমাত্র গ্রন্থারম্ভে দেখা যায় সে পত্নীর নিকটে বিদায় লইবার উপায় চিন্তা করিয়া ব্যাকুল। এক্ষেত্রে নায়ককে স্বার্থপরায়ণ ছাড়া আর কিছুই বলা চলে না। নায়কের তুলনায় নায়িকা অনেক জীবন্ত। সে প্রেমে ত্যাগে নিষ্ঠায় উজ্জ্বল।

মোহিনী লেখাপড়াও জানে। একদিন সে যখন রামায়ণ পাঠ করিতেছিল সেই সময় জীবনের নিয়োজিত নাপিতানী আসিয়া কুপ্রস্তাব জানাইলে সে ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে তিরস্কার করিয়াছিল।

সখী মনোরমার চাতুরীতে সে জীবনের কবলে পড়িল। মোহিনী তাহার কুপ্রস্তাব শুনিয়া প্রথমে অনুনয় দ্বারা তাহাকে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিল।—

> এ দীনার সতীত্বের পরীক্ষার তরে।
> বুঝি এ নিষ্ঠুর ভাব ধরেছ অন্তরে।
> নতুবা সম্ভব নয় এ বাক্য তোমার,
> বারি ধরে বিষধারা বিশ্বাস কাহার? —(১৬৫ পৃঃ)

এই বাক্যে নায়িকার তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। সে স্তুতি করিয়া নিজ সতীত্ব সম্বন্ধেও জীবনকে সজাগ করিয়াছে। তারপর জীবনকে তাহার ভৎর্সনার মধ্যে তাহার চরিত্রের দৃঢ়তা প্রকাশ পাইয়াছে। জীবনকে নিবৃত্ত করিতে না পারিয়া সে বলিতেছে—

> প্রাণের অধিক ভাবি সতীত্ব-রতন,
> রাখিব কি এই প্রাণ বিয়োগে সে ধন? —(১৬৯ পৃঃ)

মোহনের বন্ধু মাধব জীবনের হাত হইতে তাহাকে উদ্ধার করিল বটে, কিন্তু তাহার জীবনে দুঃখের শেষ রহিল না। সে যেখানে রহিয়াছে, দুষ্টগ্রহের মত জীবন সেখানকার সুখ-শান্তি সব নষ্ট করিয়াছে। জীবন মোহিনীকে পাইবার আশায় তাহাদের গৃহে ডাকাতি করাইয়া মোহনের পিতার মস্তক

ছিন্ন করাইয়াছে। মোহিনী পিতৃগৃহে গেলে মিথ্যা মামলায় তাহার পিতাকেও সর্ব্বস্বান্ত করিয়াছে। সতীত্ব রক্ষার জন্য মোহিনী সমস্ত দুঃখকষ্ট সহ্য করিয়াছে। অবশেষে মোহনের গ্রামে ফিরিবার কালে পণ্যশালার পার্শ্বে মুমূর্ষু অবস্থায় স্বামীকে ডাকিয়া বিলাপ করিতেছিল। তারপর স্বামী নিকটে আসিলে আনন্দে জ্ঞান হারাইল। চেতনা ফিরিয়া আসিলে তাহার গণ্ড বাহিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল। কিন্তু স্বামীর প্রতি সে কোনরূপ ক্রোধ বা অভিমান প্রকাশ করে নাই।

নায়িকা-চরিত্রে অনেক গুণাবলীই বর্ত্তমান। তাহার সতীত্ব ও স্বামিভক্তি কবি অতি সুন্দরভাবে আঁকিয়া শত দুঃখকষ্টের ভিতরেও তাহাকে বিজয়িনী করিয়াছেন। নারীর সতীত্ব নারীকে কিভাবে দুর্ব্বৃত্তের হাত হইতে রক্ষা করে, কি করিয়া সতীত্বের অজেয় শক্তিতে পার্থিব সুখ-ঐশ্বর্য্য, আরাম-বিরাম হারাইয়াও নারী শ্রেষ্ঠত্ব অর্জ্জন করিতে পারে মোহিনীর চরিত্রে কবি তাহাই প্রকাশ করিয়াছেন এবং অনেকাংশে কৃতকার্য্য হইয়াছেন।

কাব্যে ধনী লম্পট জীবনের চিত্রও মন্দ হয় নাই। তাহার আকৃতি—

> বয়স হইবে ত্রিংশ মোহন মূরতি,
> নিরখিলে বোধ হয় বহু ধনপতি। —(৭৪ পৃঃ)

চিন্তাপুর গ্রামে বাস করিবার কালে ভ্রমণ করিতে করিতে সে মোহিনীকে দেখিয়া মুগ্ধ হইল এবং গৃহে ফিরিয়া নিদ্রাহীন রাত্রি যাপন করিল।

বসন্তের সহিত কথোপকথনের মধ্যে কবি তাহার শঠতা ও দুষ্প্রবৃত্তির পরিচয় দিয়াছেন। মোহিনীর পতিপরায়ণতার কথা উল্লেখ করিয়া পাপপথ হইতে তাহাকে নিবৃত্ত করিবার জন্য বসন্ত যখন চেষ্টা করিতেছিল সে তখন ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল—

> যে যবতী নিজ পতি ভালবাসে বড়,
> তাহার হৃদয় জেনো শঠতায় দড়। —(১০৯ পৃঃ)

জীবনের ধারণা,—অর্থ দ্বারা পৃথিবীতে সকল অসম্ভব কার্য্যই সম্পাদিত হয়। তাই বসন্তকে কহিল—

> অসতী কি সতী সে যে সুস্পষ্ট সকল
> বাহির হইবে পরে, জানহ নিশ্চয়,
> অর্থের অসাধ্য কার্য্য কিবা সম্ভদয়। —(১০৯ পৃঃ)

বসন্ত যখন কহিল, সতীর সতীত্ব হরণ করা অধর্ম্মের কর্ম্ম তখন ধর্ম্মের মুখোসধারী জীবন নিজের কপট মনোভাব ব্যক্ত করিল—

বোকা ভুলাবার ফাঁদ ঈশ্বরে পূজন।
ঈশ্বরে যদি না পূজি যত মূর্খদল,
মোর অপযশ ঘুষি পূরিবে ভূতল। —(১১৪ পৃঃ)

মনোরমা-গৃহে মোহিনীকে একা পাইয়া জীবন কুপ্রস্তাব করিলে মোহিনীর অনুনয়-বিনয় ও ভৎর্সনায় তাহার হৃদয়ে সহানুভূতি বা শ্রদ্ধার উদ্রেক না হইয়া ক্রোধের সঞ্চার হইল এবং সে দুষ্প্রবৃত্তি-চরিতার্থতার নিমিত্ত পশুর পন্থা অবলম্বন করিবার চেষ্টা করিল।

কিন্তু পাপকর্ম্মের ব্যর্থতা তাহাকে অধিকতর পাপকর্ম্মে লিপ্ত করিল। সে একদল ডাকাত দ্বারা মোহিনীর শ্বশুরালয়ের সর্ব্বস্ব হরণ করাইয়া শ্বশুরের শিরশ্ছেদ করাইল। এই নিষ্ঠুরতা তাহার স্বভাবসিদ্ধ তাই ইহার জন্য তাহার মনে কোনরূপ দুঃখ বা অনুশোচনা জাগে নাই। তারপর সে মোহিনীর পিতাকেও সর্ব্বস্বান্ত করিয়া মোহিনীকে পথের ভিখারিণীর পর্য্যায়ে আনিয়া ফেলিল। কিন্তু পাপকর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত মানুষকে ইহজন্মেই করিতে হয়। অপরের গৃহের শান্তি সে যেমন হরণ করিত, সেইরূপ নিজের গৃহেও তাহার শান্তি ছিল না। তাহার পত্নী মোহনের নিকট প্রণয়-নিবেদন করিয়া কহিতেছে—

পতি মম পর নারী নিয়া সদা রত,
আমোদে কাটান কাল, আমি সবো কত ? —(২২০ পৃঃ)

তারপর মাধবের দ্বারা প্ররোচিত হইয়া তাহার স্ত্রীই নিদ্রিত অবস্থায় তাহাকে হত্যা করিল—

জীবনের দুই কর মাধব ধরিল,
মধুমতী গ্রীবাদেশে ছুরি বসাইল। —(২৪৫ পৃঃ)

কাব্যে তৃতীয় পুরুষ-চরিত্র মাধব। সে মোহনের বন্ধু। জীবন যখন মনোরমার গৃহে মোহিনীর উপর বলপ্রয়োগ করিবার উদ্যোগ করিতেছিল তখন দেবপ্রেরিত উদ্ধারকর্ত্তার রূপে অকস্মাৎ সে সেখানে আবির্ভূত হইল—

দীর্ঘকায় নর এক ভাঙ্গিয়া কবাট,
প্রবেশিল বাটী মধ্যে মারি মালসাট। —(১৭০ পৃঃ)

মাধব দামিনীর গৃহে থাকিয়া বসন্তের সহিত দামিনীর গুপ্ত পরামর্শ শুনিয়াছিল। বসন্তের আগমন এবং দামিনীকে পাপকার্য্যে প্রলোভিত করিবার সময় দামিনীর গৃহে কেহ ছিল ইহার ইঙ্গিত কবি পূর্ব্বেই দিয়াছিলেন। কিন্তু রহস্য উদ্‌ঘাটন করেন নাই। মোহিনীকে উদ্ধার করিবার পর কবি তাহার পরিচয় দিয়াছেন,—

দামিনীর গুপ্তপতি জেনো এইজন।
বসন্ত যখন গেল নাপিতিনী বাসে,
নাপিতিনী ছিলা মগ্ন হাস্য উপহাসে
এই পুরুষের সনে ; ......। —(১৭০ পৃঃ)

সে বিদ্যাবিমুখ ও মদ্যপায়ী। শিশুকালে মোহনের সহপাঠী ছিল। সেই বন্ধুত্ব সে চিরকাল রাখিয়াছিল এবং প্রয়োজনের সময় বিপদে আপদে বন্ধুর মঙ্গল সাধন করিতে পশ্চাৎপদ হয় নাই।

মোহন গৃহে ফিরিলে দ্বিতীয়বার মাধবের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হয়। মোহনের নিকটে জীবনের স্ত্রীর কাহিনী শুনিয়া জীবনের প্রতি প্রতিহিংসা তাহার মনে জাগিয়া উঠে—

উঠিল মাধব হৃদে জিঘাংসা ভয়াল,
সে বৃত্তি করিতে তৃপ্ত উপস্থিত কাল। —(২৪১ পৃঃ)

তারপর অমাবস্যার রাত্রে জীবনের গৃহে গিয়া পত্নীকে দিয়া সে স্বামীকে হত্যা করাইয়াছে। কিন্তু সে দৃশ্য সহ্য করিবার মত হৃদয়হীন সে নয়। তাই,—

মাধব সে দৃশ্য দেখি ছুটি পলাইল।

মাধব-চরিত্রের সৃষ্টি কবির ইংরাজী শিক্ষার ফল। যাহারা মদ্যপায়ী, দুশ্চরিত্র, ও লেখাপড়ায় উৎসাহহীন সমাজ চিরকাল তাহাদের ঘৃণ্য ও অবজ্ঞেয় করিয়া রাখিয়াছে। তাহাদের ভিতর যে কোন সদ্‌গুণ থাকিতে পারে বা তাহাদের দ্বারা সমাজ-সংসারের কোন উপকার সাধিত হইতে পারে —আমাদের দেশে সে যুগে এ ধারণা প্রায় ছিল না। কিন্তু প্রথম এই কাব্যে তাহার ব্যতিক্রম লক্ষ্য করি। অনেক দোষত্রুটি থাকা সত্ত্বেও মাধবের বন্ধু-প্রীতি ও মোহিনীকে উদ্ধার করা সত্যই প্রশংসাযোগ্য। স্ত্রী দ্বারা স্বামীকে হত্যা করান যদিও সমর্থনযোগ্য নয় কিন্তু মাধবের মত লোকের দ্বারা ঐরূপ

কার্য্য সাধিত করান বিসদৃশ হয় নাই। কারণ কবি তাহার চরিত্রের অসৎ গুণাবলীর পরিচয় দিয়াছেন। মাধব আদর্শ চরিত্রের লোক নয় কিন্তু তাহার ভিতর মানুষের চরিত্র অঙ্কিত হইয়াছে—দোষগুণ-সমন্বিত সে পৃথিবীর মানুষ। তাহার অনেক দোষ আছে, কিন্তু তাহা দ্বারা সে কাহারও অনিষ্ট সাধন করে নাই। যেখানে অন্যায় দেখিয়াছে, সেখানে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবার সাহস এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ লইবার মত শক্তি তাহার আছে। স্বল্প পরিচয়ের মধ্যে সে উজ্জ্বল।

নারী চরিত্রের মধ্যে মনোরমাকে আমরা মোহিনীর সখীরূপে দেখি। সে মোহিনীর বিরহ-ব্যথায় দুঃখী ও সহানুভূতিশীল এবং—

দিবানিশি মনোরমা মোহিনী সদন,
রহিত দুঃখে মগনা প্রবোধ কারণ। —(৫৮ পৃঃ)

একদিন মোহিনী তাহার সহিত উদ্যানে ভ্রমণকালে নিজ হৃদয়ের সুখ-দুঃখের স্মৃতি বিজড়িত স্বামীর স্নেহ ও কৌতুকের অনেক কাহিনী কহিল। ইহা হইতে মনে হয় উভয়ের সখীত্ব প্রগাঢ় ছিল। কিন্তু জীবনের ষড়্যন্ত্রে সে কেন যোগ দিল এবং বিরহবিধুরা সখীকে নিজ গৃহে আনিয়া ও একাকী রাখিয়া কেন জীবনের দুষ্কার্য্যের সহায়তা করিল তাহার সঠিক কারণ কিছু বোঝা যায় না। কবি লিখিয়াছেন,—

মনোরমা বাপে দিয়া টাকা দুই শত,
করিল তাহারে সুধি এ কার্য্যে সম্মত। —(১৬১ পৃঃ)

মনে হয়, পিতার আদেশে কন্যাকে ঐরূপ কুকার্য্যে লিপ্ত হইতে হইয়াছিল। এই ঘটনার পর মনোরমার সহিত আমাদের আর সাক্ষাৎ হয় নাই।

অপর রমণী চরিত্র মধুমতী। সে জীবনের স্ত্রী। তাহার আবির্ভাবও যেরূপ রোমাণ্টিক তাহার রূপও সেরূপ অলৌকিক। রাত্রে মোহন একাকী জীবনের উদ্যানে ভ্রমণ করিতেছিল এবং পত্নীর কথা ভাবিতেছিল। এমন সময় কোন রমণীর আগমন-শব্দ শুনা গেল।

তাহার রূপ বর্ণনার পূর্ব্বে কবি বীণাপাণির কৃপাভিক্ষা করিয়াছেন। মধুমতীর রূপ বর্ণনা কবি পাশ্চাত্য মহিলার রূপের অনুকরণে করিয়াছেন—

আয়ত লোচন দুটা সৌন্দর্য্য সাগর,
তারা দুটা মগ্নগিরি তদ্ অভ্যন্তর।

সে আঁখি হিল্লোলোপরি পড়িলে পাঠক,
বুদ্ধিতরী বান্‌চাল ঘুরায় মস্তক।
... ...
কি চারু চিবুকন্দানি কিবা তার ভাতি
যাহার সুষমা হেরে আড়ে রে অরাতি।
ফলে হে পাঠকজন সে নারী আনন,
ইউরোপী চিত্রকর ছবির মতন। —(২১৪-১৫ পৃঃ)

মধুমতী রসিকা এবং বাক্‌পটু। স্ত্রী-ভাবে বিভোর মোহন ভুল করিয়া মোহিনী মনে করিয়া তাহাকে নিকটে ডাকিলে সে কহিল,—

ওহে চিত্তচোর তব ভার্য্যা আমি নই,
হবো তব প্রাণজায়া হেন পুণ্য কই। —(২১৮ পৃঃ)

মোহন তাহাকে নানারূপে সতীত্বের উপদেশ দিয়া পাপপথ হইতে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিলে সে জীবনের নষ্ট চরিত্রের কথা উল্লেখ করিয়া কহিল,—

সতী নারী ভুঞ্জিবারে ইচ্ছা থাকে যার,
আগে প্রয়োজন করে শুদ্ধ হ'য়া তার। —(২২০ পৃঃ)

তাহার চরিত্রভ্রষ্ট হইবার পশ্চাতের যুক্তি তাহার স্বামীর নষ্টচরিত্র ও তাহার প্রতি নিষ্ঠাহীনতা। তাই নানাবিধ উপায়ে মোহনকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করিতে ব্যর্থ হইয়াও সে জোর করিয়া তাহাকে দিয়া প্রতিজ্ঞা করাইল—

বল মোরে ফাল্‌গুনের অমা নিশীথিনী
আসি দিবে দরশন রবো আকাঙ্ক্ষিনী।
উদ্যান দক্ষিণে আছে গবাক্ষের দ্বার,
খোলা রবে সেই নিশি আদেশে আমার। —(২২২ পৃঃ)

এইভাবে প্রতিজ্ঞা করাইবার জন্য সে লজ্জা বা সঙ্কোচও অনুভব করে নাই। স্বামী যখন পাপপথে নামিতেছে সেই বা নামিবে না কেন। রমণীসুলভ লজ্জা-দ্বিধা-সঙ্কোচ তাহার হৃদয়কে বিচলিত করে না।

নির্দ্দিষ্ট দিনে মোহনের পরিবর্ত্তে মাধব আসিয়া সঙ্কেতে নিজ আগমন জানাইলে ছলনাময়ী রমণী—

করি বেশ মনোহর শয়ন ভবনে
চলিলা কামিনী ত্বরা ভেটিতে জীবনে।

মিষ্ট মিষ্ট কথা কহি আপন স্বামীরে,
ভুলাইল তার মন কতই ফিকিরে। —(২৪২ পৃঃ)

স্বামী নিদ্রিত হইলে সে মাধবের নিকট আসিল। কিন্তু স্বামীকে হত্যা করিবার প্রস্তাবে সে শিহরিয়া উঠিল—

কেমনে বধিব আমি স্বামীরে আপন,
নারী হয়ে পুরুষেরে বধিব কেমন। —(২৪৪ পৃঃ)

কিন্তু স্বেচ্ছাচারিণী রমণীর নিকট প্রণয়ীকে লাভ করিবার জন্য কোন কর্ম্মই অসাধ্য থাকে না। তাই সে স্বামীকে হত্যা করিল। কিন্তু তারপর মাধবকে আর দেখিতে না পাইয়া—

মধুমতী একেবারে ঘোর উন্মাদিনী। —(২৪৫ পৃঃ)

তাহার জীবনে পাপের প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইল।

এই চরিত্রের উপর ইংরাজী সাহিত্যের প্রভাব অতি সুস্পষ্ট। ইহার পূর্ব্বে এদেশে যত সাহিত্য রচিত হইয়াছে তাহার ভিতর নষ্টচরিত্র স্ত্রীলোকের সাক্ষাৎ আমরা পাইয়াছি—তাহারা গোপনে প্রণয় করিয়াছে—প্রণয়ীর আগমনে উৎফুল্ল হইয়াছে এবং বিরহে কাতর হইয়াছে—স্বামীর প্রতি ছলনা করিয়া প্রেম-নিবেদনও করিয়াছে—কিন্তু প্রণয়ীকে লাভ করিবার জন্য স্বামীকে হত্যা করা, নারী-চরিত্রে এই মনোবৃত্তি বিদেশাগত। মধুমতীর রূপে কবি যেমন বিদেশের রূপ-মাধুর্য্য ফুটাইয়াছেন তাহার কার্য্যকলাপের মধ্যেও সেরূপ বিদেশীয় মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছেন। এরূপ নারী-চরিত্র বাংলা-সাহিত্যে একেবারে নূতন।

এই কাব্যে আর একটি রমণীর সাক্ষাৎ আমরা পাই। সে দামিনী। জাতিতে নাপিতানী। বসন্তের আহ্বানে সে যখন গৃহের বাহিরে আসিল তখন আমরা তাহাকে দেখিলাম,—

বাহিরিল নারী এক বয়স আন্দাজ
তিরিশের ন্যূন নহে অঙ্গে নানা সাজ।
যৌবন প্রসূন তার হয়ে বিকসিত,
নবরাগ ধনে সে গো যদিও বঞ্চিত
তথাপিও মাধুর্য্যের কিছু আছে গুঁড়া,

মাজা মাজা বর্ণটুকু উজ্জ্বল শ্যামল,
সে সৌন্দর্য্য কাছে কোথা গোউর উজ্জ্বল ? —(১১৬ ১৭ পৃঃ)

এস্থানে ভারতচন্দ্রের স্বল্প প্রভাব অনুভূত হয়। প্রথমে বসন্তের প্রস্তাব শুনিয়া মোহিনীর পতিপরায়ণতার কথা চিন্তা করিয়া বসন্তকে সাহায্য করিতে নিজের অক্ষমতার কথাই সে জানায়। কিন্তু অর্থের মূল্য সে বোঝে। বসন্ত তাহার হাতে টাকা দিলে—

হেরি রৌপ্যচন্দ্র মুখ নাপিতিনী মন,
হলো দ্রবীভূত ননী তপনে যেমন।

সে মোহিনীর বাড়ীর উদ্দেশ্যে চলিল—

ঘোমটা টানিয়া আধ ধরিয়া দশনে,
দর্শকে কটাক্ষবাণ হানিয়া সঘনে ;
ধৃষ্টতার পরাকাষ্ঠা করিয়া প্রকাশ,
চলিল দামিনী ত্বরা মোহন আবাস। —(১২৩ পৃঃ)

এই বর্ণনায় তাহার চরিত্রের অপর একটি দিক্ প্রকাশিত হয়। মোহিনীর নিকট তাহার প্রস্তাব ব্যর্থ হওয়াতে যদি বসন্ত অর্থ ফিরিয়া চায় এই আশঙ্কায় সে মিথ্যার আশ্রয় লইয়া কাঁদিতে লাগিল,—

পরের ইষ্ট সাধিতে সুমিষ্ট প্রহার,
হলো ভাল দেখ বাবু পৃষ্ঠেতে আমার। —(১২৭ পৃঃ)

নানাবিধ নিসর্গ-বর্ণনার দ্বারা কাব্যে বৈচিত্র্য আনিবার চেষ্টা দেখা যায়। স্থানে স্থানে বর্ণনাগুলি সুন্দর ও পুরাতন ভাব হইতে মুক্ত। কবির নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি কোন কোন স্থলে লক্ষণীয়।

সমুদ্র-দর্শনে ইন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়া যে অতীন্দ্রিয়ের স্পর্শ মোহন লাভ করিয়াছিল তাহা সুন্দরভাবে ব্যক্ত হইয়াছে—

সম্মুখে বিস্তৃত সিন্ধু সলিল নীলিমা
সন্দর্শনে সে সুষমা লজ্ঘি হৃদি সীমা
হৃদয় সাগর বেগে হলো উচ্ছলিত,
সমস্ত শরীরে সুধা হলো সঞ্চারিত। —(৪৭ পৃঃ)

গঙ্গার উপর তরীতে বসিয়া মোহন প্রকৃতির স্পর্শ অনুভব করিল—

অন্তর বীণার তারে যেন রে তাহার,
প্রকৃতি সুন্দরী কর করিল প্রহার।

স্থানে স্থানে প্রকৃতির উপর মানব-মনোভাবের ছায়াপাত বর্ণনাকে উপভোগ্য করিয়াছে। বসন্ত মোহিনীর সতীত্ব হরণের নিমিত্ত ষড়্‌যন্ত্রে লিপ্ত হইবার জন্য পথে বাহির হইলে,—

বসন্ত হৃদয়াকাশে দেখি পাপ রাহু,
দিনমণি সঙ্কোচিয়া শত রশ্মি বাহু
কাঁদিতে কাঁদিতে দিলা রত্নাকরে ঝাঁপ,
ধরিয়া রক্তিমা বর্ণ পেয়ে মনস্তাপ।
দিবস বিরস মুখে করিল প্রস্থান,
বায়ুচর পলাইল নিজ নিজ স্থান।
গগন তারকারূপ মেলিল লোচন,
নিরখিতে বসন্তের পাপারূঢ় মন। —(১২৯ পৃঃ)

লেডি ম্যাকবেথের রাজাকে হত্যা করিতে যাইবার পূর্ব্বে প্রকৃতির বর্ণনার প্রভাব ইহার উপর রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়।

বিভিন্ন জাতির পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষের কথা কবি লিখিয়াছেন—

গোউর বরণ জাতি শ্যামবর্ণ নরে,
মানব বলিয়া তায় জ্ঞান নাহি করে।
শ্যামবর্ণ নর পুনঃ গৌরবর্ণ নরে,
স্পর্শিলে অশুচি হয় ভাবয়ে অন্তরে। —(১৩৮ পৃঃ)

স্বদেশবাসীর দুর্দ্দশায় ও অজ্ঞতায় কবি-হৃদয় বিচলিত। তিনি বঙ্গবাসীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন,—

আলস্য ক্রোড়েতে নিদ্রা যাবে কত কাল,
অজ্ঞতা কূপেতে ডুবে যন্ত্রণা ভয়াল
সহিবে হে কতদিন নব্য বঙ্গজন,
তোমরা বঙ্গের আশা, ভরসা, ভূষণ।
কিন্তু বঙ্গ সতী দেখি তব ব্যবহার,
মনোদুখে ম্রিয়মাণ বদন তাহার। —(১৪৭ পৃঃ)

সে যুগে ইংরাজি শিক্ষার ফলে যে সাজাত্যবোধ বাঙালীর ভিতর আসিয়াছিল ইহা তাহারই অভিব্যক্তি।

এই পাপভরা পৃথিবীতে পুরাণে বর্ণিত কলিরাজ যে সকলের অগোচরে থাকিয়া নিজকার্য্য সাধন করিতেছেন কবি তাহার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া কলির বর্ণনা দিয়াছেন,—

সাত হাত দীর্ঘ দেহ বর্ণ আবলুস,
সকলে জানে পণ্ডিত কবি জানে তুষ।
শিরোদেশে ক্ষুদ্র কেশ শিরোরোগ চিহ্ন
কে তারে চিনিতে পারে কবি জন ভিন্ন।
আস্তখানা ভুষা পড়া যেন তোলো হাঁড়ী
সরু গোঁফ তাও ছাঁটা আঁখি লয় কাড়ি।
ড্যাবোর ড্যাবোর চোক দেখি হয় ভয়
বাদা বুনো কেঁদো বাগ্ চাহি যেন রয়। —(২২৫ পৃঃ)

এইরূপ নানাবিধ বর্ণনা ও তত্ত্বব্যাখ্যা কাব্যটির ভিতর স্থান পাইয়াছে, কিন্তু সর্ব্বত্র তাহা সার্থক হইয়া উঠে নাই। কাব্যটিতে দার্শনিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক তত্ত্ব এত বেশী স্থান পাইয়াছে যে আখ্যান-অংশ সব সময় খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, এক অংশের সহিত অপর অংশের সামঞ্জস্য হারাইয়া যায়। পুরাতনের নাগপাশ হইতে মুক্ত হইয়া অনেক নূতন রীতি ও ভাবধারা কাব্যে স্থান পাইয়াছে। তত্ত্বালোচনার ক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ করিলে সুখ-দুঃখের উত্থান-পতনের স্পন্দনে কাব্যটি অধিকতর মধুর হইতে পারিত। চরিত্র-সৃষ্টির ক্ষেত্রেও ঐ একই কথা বলা চলে—সর্ব্বত্র সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় নাই। যাহাকে আদর্শরূপে অঙ্কিত করিতে গিয়াছেন তাহাকে প্রাণহীন করিয়াছেন—নায়কের চরিত্র এইরূপে ব্যর্থ হইয়া সমস্ত কাব্যকেই যেন অনেকখানি প্রাণহীন বর্ণনায় পরিণত করিয়াছে। ঘটনা-সন্নিবেশের ক্ষেত্রে, নায়কের ভ্রমণ-কাহিনী একটি বিস্তৃততর স্থান অধিকার করিয়া থাকায় বৈচিত্র্যের পরিবর্ত্তে একটা একঘেয়ে ভাব আসিয়া কাব্যরসকে অনেকখানি ব্যাহত করিয়াছে।

সে যুগের ভাবধারার অনুকরণ করিয়া কবি প্রতি সর্গের প্রথমে ইংরাজী কাব্য হইতে দুই বা চারি পঙ্‌ক্তি করিয়া উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন।

সমস্ত কাব্যটি পয়ার ছন্দে রচিত হইলেও স্থানে স্থানে বিশেষত্ব লক্ষিত হয়।

পূর্ব্ব কাব্যগুলিতে পয়ার ছন্দে রচিত পঙ্‌ক্তিগুলির একটিতে একটি ভাব স্থান পাইয়াছে—কিন্তু এই কাব্যের মাঝে মাঝে একটি ভাব পর পঙ্‌ক্তির মধ্যস্থল পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়াছে দেখা যায়। যেমন,—

অল্পদিনে কৃতবিদ্য হইল মোহন,
বুদ্ধিজীবী বলি সমাদর সুধীজন
করিত তাহার অতি, অল্প বয়ঃক্রমে,
বিভা দিয়া পিতা তার রাখিল সম্ভ্রমে। —(৯ পৃঃ)

উপমা ও রূপকের মধ্যেও নূতনত্ব দেখা যায়—

দিন দিন তনু ক্ষীণ ভাবি ভাবি ধনী,
পূর্ণিমাতে শশধর ক্রমশঃ যেমনি।
কিম্বা মোমবাতী যথা রবি তীক্ষ্ণ করে
ক্রমে ক্রমে যায় গলি খর কর ভরে। —(৫৭-৫৮ পৃঃ)

ঝড়ের পূর্ব্বের প্রকৃতি বর্ণনায়,—

পবন রহে যেমন শিকারী শ্বাপদ,
তুষ্ণীভূত নিরখিয়া মৃগ প্রীতিপ্রদ।
প্রকৃতি-সুন্দরী-মুখ করি নিরীক্ষণ,
জ্ঞান হয় আছে ধনী উদ্বেগে মগন। —(৮৪ পৃঃ)

কাব্যটি-সম্বন্ধে এই কথাই প্রধানভাবে বলা চলে যে পুরাতন কাব্যধারার মধ্যে ইহা ভাবে ভাষায় ছন্দে নূতনের আবির্ভাবকে সূচিত করিয়াছে।

কল্পনা কামিনী—'কল্পনা কামিনী' কাব্যটি গোবিন্দ চৌধুরী কর্ত্তৃক রচিত হইয়া ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থারম্ভে দেব-বন্দনা নাই। কাব্যটির নামে একটি নূতন রীতি লক্ষণীয়। ইহার পূর্ব্ববর্তী কাব্যগুলির নামকরণ নায়ক ও নায়িকার নাম যুক্ত করিয়া হইয়াছে। এই কাব্যে তাহার ব্যত্যয় দৃষ্ট হয়। নায়ক কল্পনায় যে কামিনীকে দেখিয়াছিল তাহার সম্পর্কীয় কাহিনী বুঝাইবার জন্যই বোধ হয় এইরূপ নামকরণ করা হইয়াছে। কাব্যের নামের ভিতরও বেশ একটি কবিত্বপূর্ণ ব্যঞ্জনা রহিয়াছে।

এই কাব্যে স্বপ্নদর্শনের ভিতর দিয়া নায়ক ও নায়িকার মনে প্রেমের উন্মেষ হয় এবং তাহারই আবেগে উভয়েই রাজপ্রাসাদের সুখ-ঐশ্বর্য্য, আরাম-বিরাম ত্যাগ করিয়া দুঃখকষ্ট বিপদ্-আপদের মধ্যে বাহির হয়।

একটি বিহঙ্গের সঙ্গীতের মাধ্যমে তাহাদের প্রথম দর্শনও বেশ মনোরম। সুমধুর সঙ্গীতের ন্যায়ই তাহাদের সেই মিলন জীবনকে মধুরতায় ভরিয়া তুলিল। প্রথম সাক্ষাতে উভয়ের অবস্থা—

ঈষদ হাসির ভাব বদনে উদয়।
গোলাপের কলি যথা প্রভাত সময়॥ —(১৪ পৃঃ)

উপমাটিও স্থান ও কালের উপযোগী। প্রেমালোকের প্রথম স্পর্শে উভয়েই অভিভূত, তাই তাহার অভিব্যক্তির ভিতর আড়ম্বর নাই কিন্তু ঔজ্জ্বল্য আছে, চাঞ্চল্য নাই কিন্তু আনন্দ আছে। ঈষৎ হাসির রেখা তাই ব্যঞ্জনাময় হইয়া উঠিয়াছে।

এই স্থানে রাজকন্যার রূপ বর্ণনায়ও কবির লিপি-কুশলতার পরিচয় পাওয়া যায়। পাখীর সঙ্গীতে আকৃষ্ট হইয়া রাজপুত্র গিয়া দেখিল—

তথায় এক রমণী, নব প্রেম তাপসিনী,
রাহু গ্রাসে আচ্ছাদিত বিমান মোহিনী।
কিম্বা উষা কুয়াষায়, আবৃত কুসুম কায়,
অথবা তুহিনে মাখা সরসী কামিনী॥ —(১১ পৃঃ)

যেন তপস্বিনী গৌরী মহাদেবের তপস্যা করিয়া এক অপার্থিব দীপ্তি লইয়া প্রকাশিত হইলেন। এই বর্ণনায় ভাবের ভিতর যেমন গাম্ভীর্য্য-দ্যুতি রহিয়াছে ভাষার ভিতরেও সেরূপ নূতনের আভাস রহিয়াছে।

কিন্তু সুখের দিন চিরস্থায়ী হইল না। রাজপুত্রের অবর্ত্তমানে একদিন একদল ব্যাধ আসিয়া রাজকন্যাকে হরণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কন্যার দৃষ্ট দুঃস্বপ্ন যেন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া তাহার চারিদিকে ভীতির সঞ্চার করিতে লাগিল। এই ঘটনাটি যেন মূল অংশের সহিত সুরসাম্য রাখিতে পারে পাই। জীবনকে বিঘ্নসঙ্কুল করিবার জন্যই যেন এই ঘটনার অবতারণা। অবশেষে দুঃখ একদিন সত্যই আসিল। বিচ্ছেদের বেদনায় উভয়ে উভয়কে খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল। কিন্তু এই বিচ্ছেদের পশ্চাতে কবি যে কারণ প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা যেন পরিণতির অনুপাতে যথেষ্ট নয়। একদিন রাজকন্যা পুষ্পচয়ন করিতে করিতে দূরে চলিয়া গেলে রাজপুত্র গৃহে আসিয়া তাহাকে দেখিতে পাইল না। সে আশে-পাশে অন্বেষণ করিতে গেল। এমন সময় কন্যা ফিরিয়া রাজপুত্র আসে নাই দেখিয়া অন্বেষণে বাহির হইল।

এইভাবে পরস্পরকে খুঁজিতে খুঁজিতে তাহারা অনেক দূরে চলিয়া গেল। দিনের পর দিন কাটিতে লাগিল। কন্যার মনে চিন্তা ও দুঃখ—

কামিনী হৃদয়ে, চিন্তা স্রোত বয়,
গরল সম প্রবাহ।
কমল শিরিষ, অনল জ্বালায়,
দহিছে হয়ে দুঃসহ॥ —(৫০ পৃঃ)

আর যুবরাজের অবস্থা,—

ভ্রমে আন মনে, কভু বৈসে ভুলে,
সমুদ্র সমান মন।
নিরাশা উর্ম্মিতে, তরঙ্গনিচয়,
উঠিতেছে অগণন॥ —(৫১ পৃঃ)

সে অনলে প্রাণত্যাগের উদ্যোগ করিলে বন্ধুগণের আকস্মিক উপস্থিতিতে তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। পূর্ব্বের পাখীর সঙ্গীতের স্বরে পুনরায় উভয়ের মিলন হইল। সঙ্গীত শ্রবণে রাজকন্যা পাগলিনীর ন্যায় আসিয়া রাজপুত্রকে দেখিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। রাজপুত্র বলিল,—

যেই কেন নাহি হও কর না ছলনা।
মায়াবিনী উপছায়া অথবা কল্পনা॥
যখন এসেছ মম প্রেয়সী আকারে।
তুষিব বাঁধিব হৃদে প্রণয়ে আদরে॥ —(৭৩ পৃঃ)

এ স্থলে উদাসিনী কাব্যের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

নায়কের চরিত্রে কয়েকটি গুণের সমাবেশ দেখা যায়, প্রেমের নিষ্ঠায় তাহা প্রশংসনীয়। স্বপ্ন দেখিয়া সে মানসীর অনুসন্ধানে বাহির হইয়াছে এবং প্রথম সাক্ষাতেই রাজকন্যাকে চিনিতে পরিয়াছে। আবার গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া যেদিন রাজকন্যাকে দেখিতে পায় নাই নানা দুশ্চিন্তায় সেদিনও তাহার অন্বেষণে বাহির হইয়াছে এবং অবশেষে অগ্নিতে প্রাণ-বিসর্জ্জনের জন্যেও প্রস্তুত হইয়াছে।

মৃগয়ার প্রতিও তাহার আসক্তি ছিল। সারাদিন সে মৃগয়ায় কাটাইত। দুঃস্বপ্ন দেখিয়া রাজকন্যা একদিন মৃগয়ায় যাইতে নিষেধ করিলে সে কন্যাকে নানারূপ আশ্বাসবাক্য দ্বারা শান্ত করিয়া মৃগয়ায় গিয়াছিল। মৃগয়া যেন

তাহার নিকট নেশার পর্য্যায়ে উঠিয়াছিল। অবশ্য পূর্ব্বকালে রাজা ও রাজপুত্রদিগের এরূপ নেশা অনেক কাব্যে ও কাহিনীতে স্থান পাইয়াছে।

রাজপুত্র যুদ্ধবিদ্যায়ও পারদর্শী ছিল। নিষাদপতি সদলে রাজকন্যাকে হরণ করিতে আসিলে সে একা সকলের সহিত যুদ্ধ করিয়া পরাজিত করিয়াছিল।

নায়িকা প্রমোদকামিনী চারুদ্বীপের রাজকন্যা। রূপে অতুলনীয়া। শিশুকালে মাতাকে হারাইয়া বিমাতার স্নেহে মানুষ হয়। স্বপ্নে একদিন রাজকুমার শচীন্দ্রকে দেখিয়া পতিত্বে বরণ করে। পিতা তাহার বিবাহের ব্যবস্থা করিতেছেন দেখিয়া একটি পাখী সঙ্গে লইয়া একাকী গৃহত্যাগ করে এবং অপরিচিত পথে নানা দুঃখকষ্টের মধ্যে তাপস রমণীগণের নিকট আশ্রয় পায়। কিন্তু রাজকন্যা-সম্বন্ধে তাহাদের কৌতূহল দেখিয়া সকলের অলক্ষ্যে একদিন তাহাদেরও সে ত্যাগ করিয়া আসে এবং এক অরণ্যের মধ্যে কুটীরে বাস করিতে থাকে। সে একদিকে যেমন প্রেমবিধুরা অপরদিকে সেরূপ সাহসী। কিন্তু একদিন রাত্রে দুঃস্বপ্ন দেখিয়া বিচলিত হইল।

রাজপুত্র যখন মৃগয়ায় গমন করে সে তখন তাহার জন্য মালা গাঁথে, গান করে এবং রাজপুত্র ফিরিলে আনন্দে বিহ্বল হয়। কিন্তু রাজপুত্রের অদর্শনে তাহার চিন্তার শেষ থাকে না—গৃহে সে স্থির থাকিতে পারে না—অমঙ্গল-আশঙ্কায় অন্বেষণে বাহির হয়। নায়িকার চরিত্রে প্রেমনিষ্ঠাই মুখ্যভাবে চিত্রিত হইয়াছে।

এই কাব্যে কাহিনী-অংশের মধ্যে নূতনত্ব কিছু নাই—অনেক স্থলে দোষ-ত্রুটিও লক্ষণীয়। তবে কাব্যধারায় এবং বর্ণনানৈপুণ্যের ভিতর অনেকখানি নবীনতা আছে। রূপ-বর্ণনায় বা প্রাকৃতিক শোভা বর্ণনায় পূর্ব্ববর্ত্তী লেখক-গণের ন্যায় জড়তা বা আড়ষ্টতা নাই—নূতন ভাবের সমাবেশে তাহা সমুজ্জ্বল।

সন্ধ্যার বর্ণনা,—

রবির আরক্ত কর গোধূলি পাইয়ে।
বিবিধ বিচিত্র ছবি রেখেছে আঁকিয়ে॥
কচি কচি মেঘগুলি আকাশের গায়।
অপূর্ব্ব মোহন রূপে কল্পনা দেখায়॥ —(৭ পৃঃ)

নায়ক-নায়িকার প্রথম সাক্ষাতে মনের অবস্থা—

কিম্বা সর দরপণে দেখে আস্য ফুল্লমনে,
সর সোহাগিনী যবে রবি কর পায়,
সরমে রঞ্জিত কিন্তু বহে সে সময়।
যখন নাথের দেখা প্রথমে উষায়॥ —(:৪ পৃঃ)

মিলন-আনন্দে নায়ক-নায়িকা যখন বিভোর তাহাদের আনন্দচ্ছটা যেন প্রকৃতিতেও ছড়াইয়া পড়িয়াছে—

হাঁসিছে কানন মরি, ফুল্লময় সাজ পরি,
চিকণ শ্যামল পত্রে হইয়ে সজ্জিত। —(২৭ পৃঃ)

চোখ গেল পাখীর নিকট কন্যার উক্তিও উপভোগ্য—

নিদয় হৃদয় যারে, কি কায প্রণয়ে॥
রে চোখ গেল পাখি।
কুসুমেশু সম্মোহন, বানাঘাতে দুনয়ন,
দহিছে যাতনা বিষে বুঝি তব হিয়ে॥
দেখে অনঙ্গ না চেয়ে।
নিজে পোড়া যেই জন জানিবে কেমনে॥
রে চোক্ গেল পাখি? —(৪৬ পৃঃ)

স্থানে স্থানে বাক্যের অর্থ দুরূহ হইয়া উঠিয়াছে, যেমন—

শৃগাল আপন গর্ত্তে থাকে যতক্ষণ।
নিজ তুলনায় ধরা করে তুচ্ছজ্ঞান।
শশাঙ্ক জোনাকি কভু সমান॥—(৪০ পৃঃ)

শেষ পঙ্‌ক্তিটিতে কবির মনোগত অর্থ প্রকাশ পায় নাই। তিনি নিশ্চয়ই লিখিতে চাহিয়াছিলেন যে শশাঙ্ক এবং জোনাকি সমান নয়। প্রশ্নসূচক ইঙ্গিত থাকা উচিত ছিল।

অন্যত্র—

বৃথায় সময় যায়,
মিছে বাক্ বিতণ্ডায়,
অধৈর্য্য হইয়ে যুবা আরম্ভিতে রণ॥ —(৪১ পৃঃ)

'হইয়ে' স্থানে 'হইল' থাকিলে যেন অর্থ বোধগম্য হয়।

কাব্যে পয়ার, ত্রিপদী, চৌপদী প্রভৃতি ছন্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। মহাকাব্যের অনুকরণে ইহা দ্বাদশটি সর্গে সমাপ্ত। ভাষা, ছন্দ ও ভাবের ভিতর আধুনিকতার অনেকখানি প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

পতিত-পার্ব্বতী—চন্দ্রকান্ত শিকদার রচিত 'পতিত-পার্ব্বতী' কাব্যটি ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। উপক্রমণিকায় কবি গ্রন্থরচনার ইতিহাস ও উদ্দেশ্য গদ্যে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। স্বপ্নে কবি একদিন এক ব্রাহ্মণের আহ্বানে সুড়ঙ্গের ভিতর প্রবেশ করিয়া কালিকার স্বর্ণনির্ম্মিত মন্দির দর্শন করেন এবং ব্রাহ্মণের নিকট 'পতিত-পার্ব্বতীর' ইতিহাস শ্রবণ করেন। নিদ্রাভঙ্গে বন্ধুদের নিকট স্বপ্নবৃত্তান্ত কহিলে তাহারা কবিকে ঐ বিষয় লইয়া কাব্য লিখিতে অনুরোধ করেন। বন্ধুবর্গের অনুরোধ-ক্রমেই কবি এই কাব্য রচনা করিয়াছেন।

গ্রন্থারম্ভে মঙ্গলাচরণে বিশেষ কোন দেবতার স্তুতি নাই। কবি নিত্য নিরঞ্জনকে প্রণতি জানাইয়াছেন—

জয় জয় জগদীশ নিত্য নিরঞ্জন।
পরাৎপর সারাৎসার, সত্য সনাতন ॥
নিরাকার নিরাধার, নির্ব্বিকার হও।
সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বস্থানে রও ॥

এই কাব্যে কালিকাদেবী একটি প্রধান স্থান অধিকার করিয়া আছেন। হয়তো ইহা কবির স্বপ্নদর্শনের ফল। সে যুগের কাব্যে কালিকাদেবীর স্তব-স্তুতি স্থান পাইত, কিন্তু তাঁহার প্রভাব বেশী দৃষ্ট হয় না। মঙ্গল-কাব্যগুলিতে দেব-দেবীর চিত্রে যে কল্পনার বিন্যাস ও অনুভূতির প্রকাশ মূর্ত্ত হইয়াছে ইহাতে সেই বর্ণবিন্যাস বা অনুভূতির আবেগ নাই। তাই দেবীও এ-কাব্যে প্রাণবতী হইতে পারেন নাই এবং তাঁহার দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়া মানবগণও জীবন্ত হয় নাই। কালিকাদেবী সর্ব্বত্রই স্বপ্নে আদেশ জানাইয়াছেন। তাঁহার এই কৃপালাভ করিবার জন্য কাহারও ভিতর কোন সাধনা বা চেষ্টাও প্রকাশ পায় নাই। যন্ত্রচালিতের মত নায়ক দেবীর আদেশ পালন করিয়া গিয়াছে।

যুবরাজ পতিত রাজা হইবার পর একদিন কালিকার নিকট হইতে স্বপ্নাদেশে শুনিল যে সে যদি জলদে গিয়া কালিকার অর্চ্চনা করে তবে পার্ব্বতীকে বিবাহ করিতে পারিবে এবং তাহাতে সুখী হইবে।

ইহা দ্বারা প্রথমেই জানা যায় নায়ক পার্ব্বতীর নিমিত্ত জলদরাজ্যে যাইবে এবং তপস্যা করিবে। ইহাতে কাহিনী কৌতূহল-বর্জ্জিত হইয়া পড়িয়াছে। কবিও পথেঘাটে কোথাও নায়ককে কোন বিপদের সম্মুখীন করান নাই বা দেরী করান নাই, সরাসরি জলদরাজ্যে লইয়া গিয়াছেন। সেখানেও সে দেবীর আদেশে মন্ত্রীর নিকট গেল। তারপর গোপীর নিকট রাজকন্যা পার্ব্বতীর রূপ বর্ণনা শুনিয়া অধৈর্য্য হইয়া পড়িল এবং কহিল—

শুনিয়া সে রূপনিধি অন্তরে দ্বিগুণ।
প্রবল হইয়া দহে বিরহ আগুন॥
সচঞ্চল প্রাণপাখী ধৈর্য্য নাহি ধরে।
মদন সন্ধান করে থাকিয়া অন্তরে॥ —(৪৫ পৃঃ)

এই উক্তির ভিতর আতিশয্য ও অসম্ভাব্যতা থাকা সত্ত্বেও নায়কের হৃদয়ের একটু আভাস পাইয়া আমরা যেন আশ্বস্ত হই। কাব্যের অন্য সব স্থানে নায়ক দেবীর হাতের ক্রীড়নকের মত চালিত হইয়াছে—এই স্থানে যেন তাহার অনুভূতি, বাসনা, কামনা স্বল্প প্রকাশের ভিতরেও তাহাকে মানুষের রূপ দান করিয়াছে।

গোপীর দৌত্যে ও বর্ণনাগুণে পার্ব্বতীর মনেও প্রেম-বীজ অঙ্কুরিত হইল এবং উভয়ের সাক্ষাৎ হইলে পার্ব্বতী সখীকে বলিল—

কিবা রূপ হেরিলাম আ মরি আ মরি। —(৫২ পৃঃ)

পতিতপাবনের অবস্থাও সেইরূপ।

প্রভাতে চলিয়া আসিবার সময় পতিতপাবনের মনে দুঃখের ক্ষীণ অনুভূতি দেখা যায়। তারপর আবার সে কালিকাদেবীর পরিচালিত যন্ত্রে পরিণত হইয়া দেবীর আদেশে রাজার সিপাহী-কার্য্যে মনোনিবেশ করিয়াছে। সে পার্ব্বতীর সহিত আর সাক্ষাৎও করিল না, বা তাহার সংবাদও লইল না। পার্ব্বতী এদিকে বিরহে আকুল—কখনও কাঁদিতেছে, কখনও চেতনা হারাইতেছে—

স্বভাবের নেহারিয়া বহুবিধ ভাব।
অন্তরে উদয় হৈল পতিতের ভাব॥

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ি তবে অমনি সে ধনী।
কান্দিয়া উঠিল করি কান্ত কান্ত ধ্বনি॥ —(৭২ পৃঃ)

পার্ব্বতীর এইরূপ অবস্থার কথা শুনিয়াও পতিতপাবন নির্ব্বিবাদে দিন কাটাইতে লাগিল। তাহার বিরহের জ্বালার কোন প্রকাশ কোথাও নাই। যাহার রূপের কথা শুনিয়া সে অধীর হইয়াছিল এবং দর্শন না করা পর্য্যন্ত স্থির থাকিতে পারিতেছিল না ও দেখা হইলেও ছাড়িয়া আসিতে পারিতেছিল না সেই পার্ব্বতীর প্রতি তাহার হৃদয়ে যে কোনরূপ আকর্ষণ আছে ইহা অনুমান করিবার মত কোন অভিব্যক্তি কাব্যে নাই। কেবল রাজকন্যাই বিরহে অস্থির হইয়া দুঃখে দিন কাটাইতে লাগিল। অচৈতন্য অবস্থায় রাজকন্যা একদিন কালিকার আদেশ পাইল যে দেবীর পূজা করিলে তাহার মনস্কামনা পূর্ণ হইবে। এইরূপে প্রেমও এ-কাব্যে গতিহীন, বৈচিত্র্যহীন ঘটনামাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে।

তারপর মহিষের আবির্ভাব। ইহাতেও আমরা আতঙ্কিত হই না। কারণ পূর্ব্ব হইতেই পতিত কালিকার নিকট হইতে ইহাকে বধ করিয়া পার্ব্বতীকে বিবাহ করিবার নির্দ্দেশ পাইয়াছে। তাই এই মহিষের আগমনেও কোন আকস্মিকতা বা ভীতি-বিহ্বলতার স্থান নাই।

প্রেমের শেষ পরিণতি বিবাহের পর দেখা যায় নায়িকা মান করিয়া সমস্ত অলঙ্কার খুলিয়া নীরবে বসিয়া আছে। নায়ক মান ভাঙ্গাইবার চেষ্টা করিতেছে কিন্তু তাহার ভিতরেও প্রাণের অনুভূতি নাই।

কাব্যটির মধ্যে একমাত্র জীবন্ত চরিত্র পার্ব্বতী। সে হাসিতেছে, কাঁদিতেছে, মুগ্ধ হইতেছে, প্রেমে অভিভূত হইতেছে, বিরহে চেতনা হারাইতেছে এবং প্রিয়তমকে পাইবার নিমিত্ত দেবীর আরাধনাও করিতেছে। সে সুখে স্বামীর ঘরও করিতেছে এবং প্রয়োজন-অনুসারে স্বর্গারোহণেও যাইতেছে।

কিন্তু একটিমাত্র জীবন্ত চরিত্র লইয়া কোন কাব্য কোন দিক্ হইতেই সার্থক হইতে পারে না। নায়ক যেখানে দেবীর হাতের যন্ত্রমাত্র, নিজস্ব কোন কর্মপ্রচেষ্টার ভিতর দিয়া যাহার ব্যক্তি-মানসের কোন স্ফূরণ নাই, কোন প্রতিকূল ঘটনার সংঘাতে যাহার জীবনে বৈচিত্র্যের উন্মাদনা নাই—এমন কি প্রেমও যাহার হৃদয়কে বিচলিত করে নাই তাহাকে নায়করূপে লইয়া কোন কাব্য-রচনা চলিতে পারে না। দৈব অনুগ্রহ লাভ করাই যদি নায়ক হইবার

প্রধান গুণ রূপে বিচার করা যায় তবে সে ক্ষেত্রেও পতিতপাবনের চরিত্র ব্যর্থ। কারণ দেবীর অনুগ্রহ লাভ করিবার জন্যও সে কোন কষ্ট স্বীকার করে নাই বা অসাধ্যসাধন করে নাই। প্রথম হইতেই সে দেবীর প্রিয়পাত্র এবং দেবীর নির্দ্দেশে তাঁহার ইচ্ছাই সংসাধিত করিয়াছে। দেবীও জীবন্ত হইয়া উঠেন নাই—তিনি কেবল স্বপ্নে আদেশ জানাইয়াছেন—তাঁহার আবির্ভাব বা তিরোভাব যাহা পাঠক-হৃদয়ে আলোড়ন সৃষ্টি করিতে পারিত এ-কাব্যে তাহারও অবকাশ নাই।

কাব্যে নানাবিধ ঋতুর বর্ণনা দিয়া রসবৈচিত্র্য আনিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। কিন্তু নিসর্গ-বর্ণনার ক্ষেত্রেও তাহা সফল হয় নাই। কারণ তাহার ভিতর প্রাকৃতিক শোভা প্রকাশ পায় নাই, কেবল জীবকুলের উপর তাহাদের প্রভাব বর্ণিত হইয়াছে। যেমন শরৎকালের বর্ণনা—

শরদের সৈন্য যত, বরষা করিল হত,
তাহা হেরি প্রজাগণ শরদনুগত রে। —(৩২ পৃঃ)

অথবা হেমন্তের বর্ণনায়—

দিনকর ক্ষীণকর হইতে লাগিল।
আয়ুক্ষয় বায়ুচয় প্রদানে অনিল॥ —(৩৫ পৃঃ)

কাব্যের শেষাংশ গদ্যে রচিত। ইহাতে অলঙ্কার-বাহুল্য ও সংস্কৃতপ্রীতির নিদর্শন পাওয়া যায়। তবে ছেদ, কমা প্রভৃতি স্থানে স্থানে উপযুক্তভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু এই অংশও পদ্য ছন্দে রচিত হইলে ভাল হইত। একটা প্রাণবৈচিত্র্যহীন কাব্য আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াই পাঠকের মন ক্লান্ত হইয়া পড়ে, তারপর ঐরূপ গদ্য পাঠ করিতে কাহারও ধৈর্য্য থাকে না।

সর্ব্বশেষে কবি এক অলৌকিক ঘটনার অবতারণা করিয়া কাব্যের সমাপ্তি করিয়াছেন। পূর্ব্বরাত্রে স্বপ্ন দেখিয়া পতিত ও পার্ব্বতী কুমারকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া সকলের নিকট বিদায় লইয়া বাহিরে উপবেশন করিলে একটি স্বর্ণময় রথ নামিয়া আসিল। পতিত ও পার্ব্বতী উহাতে আরোহণ করিলে—

"সারথি অনুমতি শ্রুতিমাত্র স্যন্দন শূন্যপথে অতিশয় বেগে চালাইতে লাগিল। এবং তদুপরি তপনের তাপ স্পর্শে অনুমান হইল যেন কোন বৃহৎ বিহগ বহ্নিতে বেষ্টিত হইয়া প্রজ্জ্বলিত হইতে ২ উত্থিত হইতেছে।

এই মত শূন্যমার্গে কিয়ৎকাল গমনান্তরে পতিত পার্ব্বতী প্রহর্ষ্যে পার্ব্বতীর পুরী পৌছিলেন, এবং স্বর্গের সুখে সুখী হইয়া কাল যাপন করিতে লাগিলেন।" —(পৃঃ ১২৫)

গদ্যের ভিতরেও স্থানে স্থানে অনুপ্রাসের বাহুল্য দেখা যায়—

"বিভাবরী বিভাত হইল, বিভাসে বিহায়সে বিধু বিগত বিক্ষোভ প্রাপ্ত হইয়া অপ্রকাশ পাইলেন।" —(পৃঃ ১২১)

কবি সহজ ভাষায় গদ্য রচনা করিতে পারিতেন। তাহার প্রমাণ তাঁহার উপক্রমণিকায় পাওয়া যায়। কিন্তু সে যুগের ধারণা ছিল সাহিত্যের ভাষায় সংস্কৃত শব্দের বাহুল্য ও অলঙ্কারের আতিশয্য থাকিবে। এই কাব্যের গদ্য রচনায় সেই ধারা অনুসৃত হওয়ায় কাব্যের রসহানি ঘটিয়াছে।

পদ্যাংশে পয়ার, ত্রিপদী, চৌপদী, তোটক, একাবলী, মালঝাঁপ প্রভৃতি ছন্দ ব্যবহৃত হইয়া রচনার ভিতর বৈচিত্র্য আনিয়াছে।

স্থানে স্থানে একই শব্দ দুই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে—

মন্দ মন্দ বহিতেছে মলয়ার বাত।
নাথ বিনে সে পবনে অঙ্গে ধরে বাত॥
একে আমি হই সই কুলবালা নারী।
কান্ত বিনে কামজ্বালা সহিতে যে নারি॥ —(৭৪ পৃঃ)

কাব্যটি-সম্বন্ধে এই কথাই বলা চলে যে ইহা একেবারে ব্যর্থ রচনা।

জীবনতারা—কবি রসিকচন্দ্র রায় 'জীবনতারা' কাব্যটি রচনা করেন। ইহার প্রকাশকাল ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দ। কাব্যে কবি নিজ পরিচয় দিয়াছেন। শ্রীরামপুরের পশ্চিমে বড়া নামক গ্রামের জমিদারেরা চারি অংশে বিভক্ত। কবি জ্যেষ্ঠভ্রাতা শ্রীরামগোপালের দৌহিত্রের দ্বিতীয় পুত্র। কবিরা পাঁচ ভাই।

কাব্য-রচনার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তিনি গ্রন্থশেষে লিখিয়াছেন যে কালিকার কৃপায় এবং ইচ্ছায় তিনি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। কারণ জীবন ও তারাকে কালিকা দেবী কহিয়াছেন—

এই খেলা যাহা হৈতে হইবে প্রচার।
বলি আমি এক্ষণেতে সেই সমাচার॥
... ...

তার পুত্র হইবে রসিকচন্দ্র রায়।
সে রচিবে এই গান আমার কৃপায়॥ —(৯০ পৃঃ)

সরস্বতী-বন্দনার পর গ্রন্থ আরম্ভ হইয়াছে। কবি কেবল কালিকার নির্দ্দেশ লাভ করিয়াই তুষ্ট হইতে পারেন নাই। তাঁহার কাব্যের নায়ক-নায়িকাকে কালিকাদেবীর প্রিয় সেবক-সেবিকা রূপে অভিশাপগ্রস্ত হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে দেখা যায়। এই-সকল স্থানে বোঝা যায় কাব্যগুলি ঐ সময়েও মঙ্গলকাব্যের প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইতে পারে নাই। কাব্যটিকে অধিকতর মর্য্যাদা দিবার জন্য পুনরায় কবি কাহিনীটি নদীয়ায় কৃষ্ণচন্দ্র রাজার সভায় ভারতচন্দ্র-কর্ত্তৃক বিবৃত হইয়াছিল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

আদিরসাত্মক হইলেও কাব্যটিতে নূতনত্ব রহিয়াছে। সন্ন্যাসী স্বামী কালিকার অনুগ্রহে শ্বশুরের রাজ্যে আসিলে পতি-পত্নীর ভিতর যে না-চেনার আবরণ ছিল কবি তাহাকেই নায়ক-নায়িকার প্রেমের পথে কাজে লাগাইয়াছেন। এ কাব্যে স্বকীয়া প্রেমই পরকীয়ারূপে প্রকাশিত হইয়া কাব্যে আদিরসের ভিতর বেশ একটু চাতুর্য্যপূর্ণ বুদ্ধির দীপ্তি দান করিয়াছে।

সংসারকে মায়া ভাবিয়া রাজপুত্র জীবন বিবাহের পর সন্ন্যাস গ্রহণ করে। রাজকন্যা তারা তাহার বিরহে অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলে অন্নদা মহাদেবকে লইয়া শুক ও শারী সাজিয়া জীবনের মনে তারার স্মৃতি জাগরিত করিলেন। জীবনের তখন অবস্থা—

তারার কৃপায় তারা মনে পড়ে যায়।
তারা নামে বহে জল নয়ন তারায়॥ —(৬ পৃঃ)

কিন্তু পত্নীর সতীত্ব পরীক্ষা করিবার বাসনায় সে সন্ন্যাসিবেশেই পঞ্চহাটীর কালীমন্দিরে আশ্রয় লইল। রাজগৃহের রমণীকুল মন্দিরে সন্ন্যাসীকে দেখিতে পাইল।

সহজেই রমণীকুল সন্ন্যাসীর প্রতি আকৃষ্ট হইল এবং নিজেদের ভাগ্য গণনা ও আপদের শান্তির উপায় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। জীবন এই গণনার ছলনায় তারাকে দেখিল—

নয়ন হিল্লোলে হরে চন্দ্রের হিল্লোল।
বচনেতে হরে ধনী কোকিলের বোল॥

কটাক্ষ বাণেতে বধে পুরুষ কুরঙ্গ।
ঋষিরে ভুলাতে পারে ঘটাতে কুরঙ্গ ॥ —(১৫ পৃঃ)

জীবন ভাবিল—

ধিক্ মোরে কি করেছি এ ধনে ত্যজিয়ে। —(২০ পৃঃ)

তারপর তাহার দুষ্টগ্রহের শান্তির নিমিত্ত একটি শিকড় বাঁধিয়া দিয়া পতির শীঘ্র আসিবার সংবাদ দিয়া আশীর্ব্বাদ করিল,—

শীঘ্র আসি পুত্র হবু করিনু কল্যাণ। —(২১ পৃঃ)

মহারাণী জামাতার সংবাদ জানিতে চাহিলে সে কহিল—

কান্দ তোমরা সে বিনে। কান্দ তোমরা সে বিনে।
সে পায়েছে এত দিনে যোগিনী নবীনে ॥ —(২৭ পৃঃ)

এই সংবাদে তারা দুঃখিত হইয়া কালিকার পূজা করিল এবং জীবনের প্রকৃত পরিচয় জানিয়া যে কৌশল অবলম্বন করিল তাহা একদিকে নায়িকা-চরিত্রকে যেমন বুদ্ধিতে দীপ্ত করিয়াছে অপরদিকে কাব্যরসকেও তেমনি সরস করিয়াছে। সন্ন্যাসিনী সাজিয়া দাসীকে সে জীবনের নিকট তাহার সন্ন্যাস-জীবন সম্বন্ধে সব অলৌকিক ঘটনার পরিচয় দিতে নির্দ্দেশ দিল।

জীবন আসিলে তারা তাহার পূর্ব্ব জীবনের বৃত্তান্ত তাহাকে বলিয়া চমৎকৃত করিল। জীবন বলিল—

শ্রীপদের যোগ্য নয়, আমার কি ভাগ্যোদয়,
পাইলাম চরণ দর্শন ॥ —(৪৪ পৃঃ)

তারপর দাসখৎ সুদ্ধ লিখিয়া দিল—

"......ইহার অন্য মত করিয়া দণ্ডী হইলে শত শত বার নাকে খত দিবে এই করারে আপন খুসিতে দাস খত লিখিয়া দিলাম ইতি।" —(৪৫ পৃঃ)

তারপর সন্ন্যাসিনীর আদেশ অনুসারে সে পত্নীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া হাস্য-পরিহাসের ভিতর দিয়া দশ দিন অতিবাহিত করিলে সন্ন্যাসিনীর নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করিবার বাসনায় যখন বিদায় চাহিল তখন শ্যালিকার দ্বারা সব তথ্য ফাঁস হইল। কবি ধীরে ধীরে সমস্ত ঘটনার আবরণ মুক্ত করিয়া কাব্যটিকে রহস্যঘন করিয়া তুলিয়াছেন।

কাব্যটি এই স্থলে সমাপ্ত হইলে ভাল হইত। তাহা না করিয়া জীবনের

পত্নীসহ স্বদেশ-গমন—পুত্রের জন্ম—জীবনের মাতাপিতার কাশীবাস ও মৃত্যু এবং জীবনের অপর দুই পুত্রের জন্ম পর্য্যন্ত বিবৃত করিয়াও কবি কাব্য শেষ করেন নাই। কবি কালীমাহাত্ম্য প্রদর্শন করিবার মানসে কাব্যের কলেবর অযথা বর্দ্ধিত করিয়া কাব্যরস ক্ষুণ্ণ করিয়াছেন। কাব্যের দিক্ হইতে বিচার করিলে শেষাংশের কোন মূল্য নাই—পূর্ব্বাংশের সহিত তাহা না পারিয়াছে তাল রাখিতে, না হইয়াছে উভয়ের ভিতর একটা সহজ যোগসূত্রের যোজনা। জীবনের রাজ্য হারাইয়া বন-গমন ও মৃত্যু—দুই পুত্রের মৃত্যু, ব্যাধ-কর্ত্তৃক তারাকে দর্শন ও রাজাকে সংবাদ-জ্ঞাপন, কোটালগণ-কর্ত্তৃক তারার প্রতি কটূক্তি—বিজয়ের কালিকাস্তব ও আদেশপ্রাপ্তি—কালিকার খড়্গ লইয়া ঐ রাজাকে সবংশে নিধন করা—রাজ্যপ্রাপ্তি—জীবন প্রভৃতির পুনর্জ্জীবনলাভ—স্বরাজ্য উদ্ধার এবং একদিন কালিকার আদেশে প্যারিকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া স্বর্গারোহণ প্রভৃতি ঘটনাগুলির কালিকার মাহাত্ম্য জ্ঞাপন করা ব্যতীত অন্য কোনরূপ সার্থকতা দেখা যায় না।

শেষাংশ বাদ দিলে কাব্যটিকে সুখপাঠ্য বলা চলে। কাব্যের মধ্যে কালিকা-মাহাত্ম্য প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্য থাকিলেও কবি নায়ক এবং নায়িকাকে 'পতিত-পার্ব্বতী' কাব্যের ন্যায় একেবারে দেবীর হাতের ক্রীড়নক করেন নাই। জীবন স্বেচ্ছায় সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিল এবং শুকশারীরূপ কালিকা ও শিবের কথোপকথনের দ্বারা তারার প্রতি আকৃষ্ট হইলেও সে নিজে বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হইয়াছিল। সে সন্ন্যাসীর বেশেই পত্নীর দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিল এবং সেখানে তাহার কার্য্যকলাপ কালিকার আদেশে নিয়ন্ত্রিত হয় নাই। কাব্যের ভিতর নায়কের ব্যক্তিরূপ দেবীর ছায়া দ্বারা কোথাও আচ্ছন্ন হয় নাই। তাহার নিজ সত্তায় সে জীবন্ত। তাহার রসিকতা, তাহার বুদ্ধির পরিচালনা, তাহার ছলনা ও কৌশল সকলই তাহার নিজস্ব চরিত্রগত জিনিষ। অপরদিকে নায়িকা তারামণির ভিতরেও আমরা এই ব্যক্তি-চরিত্রের স্ফুরণ দেখিতে পাই। সন্ন্যাসীর নিকট ঔষধ-প্রাপ্তির পর কালিকা-পূজা করিয়া সে সন্ন্যাসীর চাতুরী জানিতে পারিয়াছিল সত্য কিন্তু তাহার পরে সে যে পন্থা অবলম্বন করিয়াছিল তাহা তাহার নিজস্ব পরিকল্পনার ফল। তারপর যে চাতুরীজাল বিস্তার করিয়া তারা স্বামীকে পাইল সে চাতুরীর পশ্চাতে তাহার যে নিষ্ঠা, আন্তরিকতা, প্রেম, বুদ্ধি, রসিকতা ও

কর্ম্মকুশলতার পরিচয় পাওয়া যায় তাহাতে তাহাকে প্রশংসার্হ করিয়া তুলে। ইহাতে অন্যান্য কাব্যের ন্যায় অবৈধ প্রণয় কোথাও নাই। কেবল বিবাহিত নায়ক-নায়িকার অনেকদিন পর দেখা-সাক্ষাতের সময় উভয় পক্ষের চাতুর্য্যের ক্রীড়া কাব্যটিকে নূতন রস দান করিয়াছে।

এই কাব্যে কবি দাসী বা সখীগণের সাহায্য না লইয়া শ্যালিকা, শ্যালক-পত্নী ও দিদিশাশুড়ী চরিত্রের অবতারণা করিয়া কাব্যের ভিতর হাস্যরসকে মধুর ও উপভোগ্য করিয়াছেন। সন্ন্যাসীর নিকট শ্যালিকা চন্দ্রাননী ঔষধ চাহিলে রসিকতা করিয়া সে কহিতেছে—

এমন সুন্দরী তুমি তুল্য নাহি যার।
কেন সে বাসে না ভাল মর্ম্ম বল তার॥
অনুমানি তুমি তারে পার না দেখিতে।
নতুবা বিবাদ কেন চাঁদ চকোরেতে॥ —(২৩ পৃঃ)

রাজার খুড়ী আসিয়া নাত-জামাই-এর সহিত রসকিতা করিয়া কহিলেন—

আমাদের তারামণি অপূর্ব্ব নলিনী।
সঁপেছিনু তোমারে রসিক ভৃঙ্গ জানি॥
তুমি হে গুবুরে পোকা বুঝেছি কারণ।
শুকাইল পদ্মমধু পদ্মেতে এখন॥
বানরের গলদেশে মুকুতার হার।
পেত্নীকে হীরের কণ্ঠী কি বুঝিবে তার॥ —(৫২ পৃঃ)

জীবনও ছাড়িবার পাত্র নয়। সে কহিল—

কখন গুবুরে পোকা গোবরে বেড়াই।
কখন ভ্রমর হয়্যা পদ্মেরে ভুলাই॥
আমি গুঞ্জরিলে শুষ্ক কাষ্ঠে রস হয়।
তারা ত নবীন পদ্ম মধুর সময়॥
পাবড়ি ভাঙ্গা পুরাতন পদ্ম যদি পাই।
গুণ গুণ মধুর স্বরে মধুতে ভরাই॥ —(৫২ পৃঃ)

এই-সকল বর্ণনার মধ্যে রাজান্তঃপুরেও একটা প্রীতির সম্বন্ধ ও একটা প্রাণের স্পন্দন অনুভূত হয়। অন্যান্য কাব্যে সখীগণ রাজকন্যার আদেশ মান্য করিয়াছে এবং রাজপুত্রের সহিত রহস্যালাপ করিয়াছে। কিন্তু সে-সকল

কাব্যে রহস্যালাপ জমে নাই। কারণ প্রভুকন্যার স্বামীর সহিত রসিকতা করিতে গিয়াও তাহারা নিজেদের সীমারেখা ভুলিতে পারে নাই। এই কাব্যে শ্যালিকা, শ্যালক-পত্নী ও দিদিশাশুড়ী প্রভৃতি সম্পর্কের ভিতর দিয়া যে হাস্যকৌতুকের সৃষ্টি হইয়াছে তাহা বেশ উপভোগ্য। বাঙালী পরিবারে জামাতাকে বেষ্টন করিয়া যে রসিকতা করিবার রীতি আছে ইহার ভিতর সেই চিত্রই যেন অঙ্কিত হইয়াছে।

কাব্যে অন্যান্য বর্ণনা দ্বারাও বিভিন্ন রসের সৃষ্টি করিবার চেষ্টা দেখা যায়। সন্ন্যাসি-বেশী জীবনের উক্তিতে কাশীর মাহাত্ম্য বর্ণনায় ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

তারা জীবনের নিকট নিজের বারমাসের বিরহ-দুঃখের বর্ণনা করিতেছে--

বৈশাখে প্রখর রবি, শুনিলে অসুখে রবি,
যে দুঃখ লো সে কহিব কারে।
একে ত বিরহ তাপ, ভাস্করের যে উত্তাপ,
বিরহিণী বাঁচি কি প্রকারে॥

... ...

শ্রাবণেতে আছে ধরা, বর্ষায় ভাসায় ধরা,
চাতকী মেঘের জল পিয়ে।
বিনে কান্ত নবঘন, আমি কান্তি ঘন ঘন,
সে জলদে জল দে বলিয়ে॥ —(৩০ পৃঃ)

বর্ণনাটি ফুল্লরার বারমাস্যার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

কালিকার অনুগ্রহ ব্যতীত অলৌকিক কিছু এ গ্রন্থে বর্ণিত হয় নাই। বিজয়কে বলি দিবার জন্য লইয়া যাইবার কালে সে যখন স্তব করিতে লাগিল—

বিজয়ের বিপদ জানিয়ে মহেশ্বরী।
শূন্য পথে অসি নৃত্য করেন শঙ্করী॥
অভয়া অভয় দিয়ে তারার তনয়ে।
দৈত্যকুল নাশা খড়্গ দিলেন বিজয়ে॥ —(৮৫ পৃঃ)

কালিকার কৃপায় জীবন প্রভৃতির পুনর্জ্জীবন লাভ করাও কম অলৌকিক নহে।

কাব্যটি ত্রিপদী, পয়ার, লঘু ত্রিপদী, বিপরীত পত্রী প্রভৃতি ছন্দে রচিত। প্রতি পরিচ্ছেদের পূর্ব্বে সুর ও তাল নির্দ্দেশ করিয়া ধুয়ার কয়েকটি পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহা কাব্যকে শুধু বৈচিত্র্য দান করে নাই, মাধুর্য্যও দান করিয়াছে। ঐগুলির ভাষা ও গতি অত্যন্ত সহজ ও স্বচ্ছন্দ। যেমন—

(রাগিনী হাম্বির তাল একতালা।)

চলে যায় রঙ্গে।
ভাসিতে সে প্রেমময়ী ধনীর প্রেমতরঙ্গে॥
নানা ফুলের গন্ধ ছুটে, সৌরভে রস উৎলে উঠে।
ঐ সময়ে রসময়ের অঙ্গ ঘেরে অনঙ্গে॥ —(৪৭ পৃঃ)

রচনায় অনুপ্রাসের আতিশয্য লক্ষণীয়। তবে বর্ণনায় ছন্দ-ভাব ও ভঙ্গি সুন্দর।

জীবন-তারার অনেক সংস্করণ বাহির হইয়াছিল। অশ্লীলতার জন্য সরকার ইহার প্রকাশ বন্ধ করিয়া দিলে নূতন সংস্করণে কতকটা ভদ্র রূপ দেওয়া হয়। এই কাহিনী লইয়া দুই-একখানি নাটক ও গীতাভিনয়ও লখিত হইয়াছিল।

প্রেম-নাটক—'প্রেম-নাটক' পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক রচিত হয়। ইহার প্রকাশের সময় ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দ। নামে নাটক শব্দের যোগ থাকিলেও এটিকে কোনক্রমেই নাট্য-রচনা বলা যায় না। সমাজের কদাচারের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য ইহা নর-নারীর অবৈধ প্রেম লইয়া গদ্যে-পদ্যে রচিত হইয়াছে। এই কাব্যের উপর ভবানীচরণের নববাবুবিলাস ও নববিবি-বিলাসের প্রভাব পড়িয়াছে।

গ্রন্থারম্ভে গণেশ-বন্দনা ও সরস্বতী-বন্দনা দৃষ্ট হয়। ভণিতায়—

কহে পঞ্চানন করি যোড়পাণি।
মম জিহ্বা যন্ত্রে হও মা যান্ত্রিনী॥ —(২ পৃঃ)

কাব্যটি উপদেশ-মূলক। অবৈধ প্রণয়ে আসক্ত হইলে পুরুষ মানুষের ভাগ্যে খেদ ছাড়া আর কিছুই লাভ হয় না—ইহাই যেন এই কাব্যের

প্রতিপাদ্য বিষয়। তাই ইহাতে গল্পাংশ অতি সামান্য কিন্তু নায়কের চতুর্ব্বিংশতি দিবসের খেদ বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে এবং সর্ব্বশেষে সকলকে সাবধান করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

কাব্যটির নায়ক-নায়িকা রাজপুত্র বা রাজকন্যা নয়। সওদাগর-পরিবারেরও কেহ ইহাতে স্থান পায় নাই। তাহারা সাধারণ বাঙালী গৃহস্থ ঘরের নর-নারী, ভ্রান্তিবশতঃ পাপকর্ম্মে লিপ্ত হইয়াছে, অবশেষে অনুতাপে জর্জ্জরিত হইয়াছে।

কাব্যের নায়ক দুই জন। প্রথম ব্যক্তি নায়িকার প্রতি আসক্ত হইয়া কয়েক দিবস আনন্দ ভোগ করে। পরে রমণী একদিন তাহাকে কুলের বাহিরে লইয়া যাইবার জন্য অনুরোধ জানাইলে ঐ ব্যক্তি তাহার নিকট কিছু অর্থ প্রার্থনা করে। রমণী অর্থ দিবার প্রতিশ্রুতি দেয় কিন্তু তাহা রক্ষা করে না। ব্যক্তিটি তাই ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার সংসর্গ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়।

দ্বিতীয় নায়ক একজন ব্রাহ্মণপুত্র। কিছুদিন পর ব্রাহ্মণপুত্র অত্যন্ত সুন্দরী বলিয়া রমণীর মাসতুতো ভগ্নীকে দর্শন করিবার বাসনা প্রকাশ করিলে নায়িকা ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার সহিত সকল সম্পর্ক ছেদ করে। তখন রমণীর বিরহে জর্জ্জরিত হইয়া ব্রাহ্মণপুত্রটি খেদ করিতে থাকে। নায়কের প্রথম দিবসের খেদ—

দেখিলে যাহার মুখ পরাণ জুড়ায়।
কোন প্রাণে মন্দ কথা কহিলাম তায়॥
এখন না দেখে তারে প্রাণ মোর যায়।
হায় রে দুঃখের কথা কব আর কায়॥
এমন রমণী যারে হইল বিমুখ।
ধনে বা কি ফল তার জীবনে কি সুখ॥ —(৯ পৃঃ)

চতুর্ব্বিংশ দিবসের খেদ—

কে জানে এমন বামা বিশ্বাসঘাতিনী।
পিরীতি করিয়ে শেষে বধয়ে পরানী॥
তাহার কারণে আমি হোয়েছি পাগল।
কাণ্ডজ্ঞান কিছু নাই যেমন পাগল॥ —(১৬ পৃঃ)

তারপর নায়ক সকলকে উপদেশ দিয়াছে—

> তাই করযোড়ে সকলেরে করি মানা।
> নারীর সহিত প্রেম করো না করো না॥
> যগুপি নারীর সঙ্গে করহ পিরীতি।
> আমার সমান তবে পাইবে দুর্গতি॥ —(১৬ পৃঃ)

এই কাব্যের কোন নায়ককেই আমরা দৃঢ়চেতা, সৎ বা আদর্শস্থানীয় বলিতে পারি না। ইহাদের কাহারও চরিত্রে ব্যক্তিসত্তার স্ফুরণ হয় নাই। রমণীর প্ররোচনায় তাহারা আসক্ত হইয়াছে এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনার মাধ্যমে তাহার সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াছে। উদ্দেশ্যের দিকে কবির দৃষ্টি থাকাতে কাহিনীও কোথাও দানা বাঁধে নাই, কোনও চরিত্রও সৃষ্ট হয় নাই, কেবল ঘটনার বিবৃতি রহিয়াছে।

নায়িকার প্রতিও পাঠকের মন আকৃষ্ট হয় না, বরং একটা বিরূপ ভাবই জাগরিত হয়। সে বালবিধবা। গোপন প্রণয়ের প্রতি তাহার আকর্ষণ। সে যাহাকে দেখিতেছে তাহার প্রতিই আসক্ত হইতেছে। তারপর প্রথম নায়কের সহিত সে প্রতারণা করিয়াছে। দ্বিতীয় নায়কের উপরেও সামান্য কারণে ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে ত্যাগ করিয়াছে। এই-সকল ঘটনা নায়িকার চরিত্রকে মসীলিপ্ত করিয়াছে। ইহাতে কবির উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে কিন্তু কাব্যরস একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

নায়কের চতুর্ব্বিংশতি দিবসের খেদের ভিতর তাহার প্রাণের স্পন্দন প্রকাশের সুযোগ ছিল। কিন্তু যে কারণে নায়কের অতখানি বিলাপের অবতারণা হইল সেই প্রেম কোথাও নিবিড় ও গভীররূপে আত্মপ্রকাশ করে নাই। সেইজন্য এই খেদ পড়িয়া কেবলই মনে হয়, ইহা অতিরিক্তরূপে আরোপ করা হইয়াছে—ইহার কোন প্রয়োজনও নাই, কোনও সার্থকতাও নাই। তাহা ছাড়া, চতুর্ব্বিংশতি দিবসের খেদ পৃথক্ পৃথক্ রূপে বর্ণিত হইলেও তাহাদের ভাব ও ভাষা প্রায় একইরূপ। সেইজন্য অত দীর্ঘদিনের খেদ পৃথক্ রূপে প্রকাশ করার ভিতরেও কোন তাৎপর্য্য খুঁজিয়া পাওয়া যায় না বরং এই খেদ শুনিয়া নায়কের বন্ধুবর্গের সহিত আমাদেরও তাহাকে পাগল বলিতেই ইচ্ছা হয়। নায়কের প্রতি আমাদেরও সহানুভূতি উদ্রিক্ত হয় না।

কাব্যে তূণক, ভুজঙ্গপ্রয়াত, ত্রিপদী, পয়ার, চতুষ্পদী, মালিনী, মালঝাঁপ, তোটক, একাবলী প্রভৃতি ছন্দের ব্যবহার হইয়াছে।

গদ্যাংশে সংস্কৃত-সাহিত্যের প্রভাব দৃষ্ট হয়। এক-একটি বাক্য অতি দীর্ঘ স্থান অধিকার করিয়াছে। ছেদ প্রভৃতির যথাযোগ্য ব্যবহার নাই। অলঙ্কার-বাহুল্যও লক্ষণীয়। গদ্যের একটু নমুনা,—

"কোন নগরস্থ এক গৃহস্থ বশিষ্ঠ কুলোদ্ভবা কামিনী ভামিনী অনঙ্গমোহিনী গজেন্দ্রগামিনী ভ্রুকুটিভঙ্গিনী পূর্ণেন্দু বদনা কামধনুগঞ্জনা গৃধিনী শ্রবণা তড়িত বরণা মৃগরাজ কটি তুলনা স্থির যৌবনা মৃদুহাসা চপলা প্রকাশা সুন্দর নাভি সরোবর অতি মনোহর······প্রত্যহ উষাকালে একজন ভৃত্য সমভিব্যাহারে প্রফুল্লান্তরে সুরনিমগ্নানীরে স্নান করিত।" —(২ পৃঃ)

কাব্যটি-সম্বন্ধে বলা চলে, ইহা একেবারেই ব্যর্থ রচনা।

বীরজয়-উপাখ্যান—আশুতোষ বিশ্বাস 'বীরজয়-উপাখ্যান'-নামক কাব্যটি রচনা করেন। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে ইহা প্রকাশিত হয়। গ্রন্থারম্ভে দেব-বন্দনা নাই।

কাব্যটিকে উদ্দেশ্যমূলক বলা চলে, তাপস জীবনের প্রতি কবির লক্ষ্য এবং তাহাকেই শ্রেষ্ঠত্ব দিবার জন্য তিনি একটি প্রেম-কাহিনীর অবতরণা করিয়াছেন। তাই কাব্যের এক অংশের সহিত অপর অংশের বাহ্যতঃ যোগ রহিলেও অন্তরে যোগাযোগ নাই—একটি ঘটনার সহিত অপর ঘটনার বিচ্ছিন্ন ভাবটাই চোখে পড়ে। কোথাও গতির স্বাচ্ছন্দ্য নাই এবং সেইজন্য কাব্যটি কোন দিক্ দিয়াই সার্থক হইয়া উঠিতে পারে নাই।

গান্ধারদেশের রাজপুত্র বীরজয় ভ্রমণে বাহির হইয়া প্রথমেই এক তপোবন দেখিয়া মুগ্ধ হইল। সেখানে এক তাপসের সহিত তাহার বন্ধুত্বও হইল। তারপর পুনরায় ভ্রমণ করিতে করিতে এক শঠ বণিকের সহিত সাক্ষাৎ হইল। "উক্ত বণিক অতি ধূর্ত্ত এবং চৌর্য্য ব্যবসায় বিলক্ষণ পরিপক্ক ছিল।"—(৪ পৃঃ)

বাণিজ্য করিবার জন্য উভয়ে একটি জাহাজে করিয়া যাইতেছিল। বণিকটি রাজপুত্রের ধনদৌলত আত্মসাৎ করিবার নিমিত্ত রাজপুত্রকে নদীতে নিক্ষেপ করে। রাজপুত্র বীরজয়কে স্রোতে ভাসিতে দেখিয়া এক মালিনী উদ্ধার করে এবং তাহার গৃহে বীরজয় অবস্থান করিতে থাকে।

উদ্যানে ভ্রমণ করিতে করিতে একদিন সেই দেশের রাজকন্যা কামিনীকে

দেখিয়া সে মুগ্ধ হইল কিন্তু উন্মত্ত হইল না। সে গৃহে ফিরিয়া কালিকার পূজা করিল।

রাজকন্যা কামিনীও দূর হইতে বীরজয়কে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিল এবং বিরহে কাতর হইল। কাহারও নিকট মনের কথা ব্যক্ত করিতে সে লজ্জাবোধ করে। অবশেষে সখীগণের অনেক অনুরোধের পর নিজ মনোভাব ব্যক্ত করিল—

হইয়া লজ্জিতা, তাহে ব্যাকুলিতা, রাজার দুহিতা,
বলে দাসীগণে।
কৈতে সে কথন, বুকবিদরণ, হতেছে এখন,
বলিব কেমনে॥
... ...
আছে এক বর, গঠন সুন্দর, রূপ মনোহর,
মালিনী সদনে।
যত্ন সহকারে, আনাইতে তারে, বল গো পিতারে
আপন ভবনে॥ —(১০-১১ পৃঃ)

রাজার কর্ণে এ সংবাদ গেলে তিনি যখন চিন্তান্বিত তখন একদিন স্বপ্নে কালিকাদেবী তাঁহাকে বীরজয়ের সহিত কন্যার বিবাহ দিতে আদেশ দিলেন।

রাজা সুবাহু মালিনীকে ডাকিয়া সমস্ত সংবাদ লইলেন। মন্ত্রী বীরজয়ের নিকট প্রস্তাব লইয়া গেলেন। বীরজয় কিন্তু নিজ মনোভাব গোপন করিয়া কন্যা-সম্বন্ধে মন্ত্রীর নিকট হইতে নানাবিধ তথ্য জানিয়া লইল। অবশেষে রাজসভায় গিয়া রাজার নিকট হইতে বিবাহের প্রস্তাব শুনিয়া—"রাজপুত্র কোন উত্তর না করিয়া আনন্দ চিত্তে মৌনভাবে রহিলেন।"

বিবাহের দিন খুব সমারোহ হইল।

কালিকার আদেশে সুবাহু নিজ রাজ্যে বীরজয়কে অভিষিক্ত করিলেন। তাহাদের এক পুত্র জন্মিল। কিন্তু তথাপি বীরজয় সুখ অন্বেষণের নিমিত্ত ভ্রমণে বাহির হইয়া দেখিল যে ধনে মানুষের সুখ হয় না। কারণ,—

কিন্তু তাঁহাদের সদা অন্তরে গরল।
পরের অহিত বাঞ্ছা করয়ে সকল॥

পরস্পর অর্থে তারা করে টানাটানি।
ভুলে কভু নাহি মুখে বলে সত্যবাণী॥ —(২৯ পৃঃ)

অপর একটি স্থানে গিয়া দেখিল—

সেই নগরেতে যত দীন বাস করে।
সবে করে হাহাকার উদরান্ন তরে॥ —(৩১ পৃঃ)

এই-সকল বর্ণনার ভিতর দিয়া কবির বাস্তব সমস্যার প্রতি দৃষ্টিপাত লক্ষণীয়। পূর্ব্ববর্ত্তী কাব্যগুলি হইতে এইস্থানে ইহার বিশেষত্ব দেখা যায়।

তারপর সংসারের অনিত্যতা সম্বন্ধে, তাঁহার জ্ঞানোদয় হইল।

সেই সময়েই কিন্তু মাতাপিতার কথা তাহার মনে পড়িল। যে সময় বৈরাগ্য আসিবার কথা সে সময় সে গৃহে ফিরিল এবং পত্নীর মৃত্যু সংবাদ পাইয়া দুঃখিত হইল।—

না হেরে তোমার, মুখশশী আর,
বিদরিছে মম প্রাণ।
কেমনে এ প্রাণ, ধরিব হে প্রাণ,
বিহীনে তোমার প্রাণ॥ —(৩৬ পৃঃ)

জীবিতকালে যাহাকে ছাড়িয়া যাইতে সে বিন্দুমাত্রও দুঃখ অনুভব করে নাই তাহার মৃত্যুতে সে কাঁদিয়া আকুল হইল এবং পুত্রকে রাজ্য দিয়া বৈরাগ্য গ্রহণ করিল।

ইহার পরে পাঁচটি সঙ্গীত আছে—সবগুলিই ধর্ম্মতত্ত্বমূলক—

ভাবরে ভাবরে মন সেই নিত্য নিরঞ্জন।
সংসার বাসনা করে একবারে নিরঞ্জন॥
যিনি আদি নিরাকার, সর্ব্বব্যাপী নির্ব্বিকার,
অখিল সংসার যার, কৃপাতে হল সৃজন॥ —(৪০ পৃঃ)

কাব্যটিতে কবি মানব-জীবনে প্রেমের পরে বৈরাগ্যের পথ নির্দ্দেশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু সে উদ্দেশ্য তো তাঁহার সফল হয়ই নাই উপরন্তু প্রেমও রূপে রসে রঙে কাব্যকে সরস করিতে পারে নাই। ইহার ভিতর কোন চরিত্রই স্পষ্ট হয় নাই। একমাত্র রাজপুত্র বীরজয়কে নানা ঘটনার ভিতর বর্ত্তমান দেখিতে পাই—কিন্তু কোনরূপ অবস্থাতেই সে নিজেকে

প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য চেষ্টা করে নাই। তাহার মধ্যে কোন সময়েই প্রাণ জাগে নাই। প্রেমও এই কাব্যে ব্যর্থ হইয়াছে—বৈরাগ্যও মনোজ্ঞ হইয়া উঠে নাই।

কাব্যটিতে গদ্য ও পদ্য ব্যবহার করিয়া নূতনত্ব আনিবার চেষ্টা দেখা যায়। কিন্তু পদ্যাংশ কোথাও রস সৃষ্টি করিতে পারে নাই আর গদ্যাংশও বিবৃতিমাত্র। পদ্যাংশ ত্রিপদী, পয়ার ও চৌপদী ছন্দে লেখা। ভাষা সহজ সরল। গদ্যাংশ পুরাতন পদ্ধতি অনুসরণ করে নাই। সংস্কৃত শব্দের বাহুল্য নাই—বর্ণনার আড়ম্বর নাই—অনুপ্রাসের ভার হইতে মুক্ত, সহজ সরল স্বচ্ছন্দ এবং ছেদ প্রভৃতির যথাস্থানে প্রয়োগ হইয়াছে। গদ্যাংশ ভাষার দিক্ হইতে অনেক উন্নত—কিন্তু কাব্যরস সৃষ্টি করিতে সমর্থ হয় নাই।

রজনীচন্দ্র-উপাখ্যান—নগেন্দ্রনাথ দত্ত 'রজনীচন্দ্র উপাখ্যান' নামক কাব্যটি রচনা করেন। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে ইহা প্রকাশিত হয়। গ্রন্থারম্ভে কবির লিখিত বিজ্ঞাপন পড়িয়া বোঝা যায়, গুরুজনদিগের অসন্তোষের আশঙ্কায় তিনি গ্রন্থমুদ্রণের সময় পর্য্যন্ত কাহাকেও এই গ্রন্থ রচনার সংবাদ জ্ঞাত করান নাই। পাঠক-সমাজের নিকটেও কাব্যটি সমাদর পাইবে কি না সে-সম্বন্ধে তাঁহার মনে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল।

কাব্যটি গদ্যে ও পদ্যে লিখিত। উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব কিছু নাই। কাহিনী মামুলী ধরণের—রাজপুত্র ও রাজকন্যার প্রেম-কাহিনী। তাহার মধ্যেও প্রশংসনীয় বর্ণসমাবেশ বা বিচিত্রগতির জটিলতা কিংবা মানব মনের সুন্দর অভিব্যক্তি নাই। রাজপুত্র চন্দ্রসেন নগরভ্রমণ-কালে রাজকন্যা রজনীকে প্রাসাদের উপরে দেখিল ও মুগ্ধ হইল। রাজকন্যাও তাহাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইল। তখন উভয়েই—

> মনে মনে মনমালা বদল করিয়া।
> চলি গেল নৃপসুত চিন্তিত হইয়া॥ —(৯ পৃঃ)

উভয়ের মনে বিরহ জাগিল। রজনী সখীর হস্তে পত্র পাঠাইল—

"গুণনিধান! আপনি যে অবধি চিত্ত হরণ করিয়াছেন, সেই অবধি এ অধিনী আপনার বিরহানলে একান্ত সন্তপ্ত হইতেছে। আমি লজ্জা-ভয় জলাঞ্জলি দিয়া আপনার শরণাগত হইলাম।....." —(১৯ পৃঃ)

গদ্য-রচনার মধ্যে আধুনিক রীতির প্রকাশ লক্ষণীয়।

পত্র পড়িয়া কুমার হতজ্ঞান হইল এবং উত্তরে লিখিল—

অমৃত সমান তব লিপির লিখনে।
অমর হইনু আজি অমৃত ভক্ষণে॥ —(২১ পৃঃ)

কিন্তু রাজকন্যার বিরহ অসহ্য হইলে সে চিত্ররেখাকে চন্দ্রসেনের নিকট পাঠাইল। সখীর রাজপুত্রকে ভৎর্সনা কিন্তু রসহানিকর। কারণ এই ভৎর্সনার প্রয়োজন বা অর্থ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না—যেন কতকগুলি কথার পর কথা সাজাইয়া রচনাটির কলেবর বৰ্দ্ধিত করা হইয়াছে। যে নিজে বিরহী এবং রাজকন্যার নিকট যাইবার জন্য সর্ব্বদা উন্মুখ, কেবল রাজপ্রাসাদে প্রবেশের উপায় পাইতেছে না—তাহাকে না যাইবার নিমিত্ত ভৎর্সনা করিবার পশ্চাতে কোন যুক্তি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

রাজপুত্র রাজকন্যার নিকট যাইবার পর তাহাদের ভিতর যে আলাপ-আলোচনা হয় তাহাতেও হাস্যরস বা বুদ্ধির দীপ্তি প্রকাশিত হয় নাই। সবই যেন মামুলী ধরণের। সখীগণ রাজপুত্রকে চোর কহিলে সে উত্তর দিল—

না বুঝিয়া চোর বল এ কি বিপরীত।
এ কি ভয়ানক কথা এ দেশের নীত॥ —(২৮ পৃঃ)

তাহাদের গান্ধর্ব্ব বিবাহ হইল এবং সুখে দিন কাটিতে লাগিল। কিন্তু মিলনের পথে জটিলতার সৃষ্টির জন্য কবি সীতাপুরের রাজপুত্র জিতকেতুর সহিত রজনীর বিবাহের প্রস্তাব রজনীর পিতা কর্তৃক উত্থাপিত করাইলেন। ঘটনাটি মূল অংশের সহিত যোগসূত্ররহিত—যেন জোর করিয়া ইহার অবতারণা করা হইয়াছে।

চন্দ্রসেনের ধৃত হওয়া এবং কারাগারে বন্দীরূপে অবস্থান করিবার ব্যাপারাটিও গতানুগতিকভাবে বর্ণিত হইয়াছে। বিদ্যাসুন্দর-কাব্যে সুন্দরের বন্দী হইবার অংশটির প্রভাব এই অংশে কাজ করিয়া থাকিবে। তারপর চন্দ্রসেনের প্রকৃত পরিচয় জ্ঞাত হইয়া রাজা উভয়ের বিবাহ দিয়াছেন।

স্বপ্নদর্শন তখনকার সাহিত্যের একটা প্রধান অংশ ছিল। এই কাব্যেও কিছুদিন সুখে অতিবাহিত করিয়া একদিন রাজপুত্র স্বপ্নে—

দেখিলেন শত্রুগণ নিজরাজ্যে আসি।
পিতাকে বন্ধন করি লোটে ধনরাশি॥ —(৬১ পৃঃ)

সে রজনীকে লইয়া পিতৃরাজ্যে ফিরিল।

কাব্যটিতে রাজপুত্র বা রাজকন্যার চরিত্রে কোন বৈশিষ্ট্য ফুটিয়া উঠে নাই। নায়ক চন্দ্রসেনের রূপ আছে। রজনী সখীগণের নিকট তাহার রূপের বর্ণনা করিয়াছে—

কিবা মুখ শোভাকর, যেন শত সুধাকর
চিকণ চিকুর গুণাতীত।
হেরি কটিদেশ তার, কেশরি লজ্জার ভার,
বহি খেদে হয় পলায়িত॥ —(১৬ পৃঃ)

সে মাঝে মাঝে মৃগয়ায় যাইত। পিতামাতার প্রতি তাহার ভক্তি ছিল। দেশ-ভ্রমণে বাহির হইবার কালে সে তাঁহাদের অনুমতি লইয়াছিল।

রাজকন্যার প্রণয়ে আসক্ত হইয়া চন্দ্রসেন নানারূপ দুর্ভোগ ও কষ্ট সহ্য করিয়াছে। প্রেমের পথে তাহার নিষ্ঠা লক্ষণীয়।

নায়িকা রজনী চন্দ্রসেনকে প্রথম দেখিয়াই তাহার প্রতি আসক্ত হয় এবং সখী দ্বারা মিলনের ব্যবস্থা করে। পিতা বিবাহ প্রস্তাব আনিলে সে এক বৎসর পুরুষ মানুষের মুখদর্শন না করিবার ব্রত গ্রহণ করিবার সঙ্কল্প জানাইয়া পিতাকে নিবৃত্ত করে। চন্দ্রসেন ধৃত হইলে তাহার দুঃখের ও দুশ্চিন্তার অন্ত রহিল না। নায়িকার চরিত্রে কেবল প্রণয়াসক্তি ও নায়কের প্রতি নিষ্ঠা প্রকাশ পাইয়াছে। তাহার অন্য কোনরূপ পরিচয় আমরা পাই না।

কাব্যটিতে কোন প্রাকৃতিক বর্ণনা বা বিশেষ সূক্ষ্ম ভাবের অভিব্যক্তি নাই। প্রাণহীন ঘটনার বিবৃতি ও বর্ণহীন রসের অবতারণা কাব্যটিকে ব্যর্থ করিয়াছে।

ভাষা সহজ ও সরল। পদ্যাংশ পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে লিখিত। স্থানে স্থানে গদ্যের ব্যবহার দৃষ্ট হয়।

পদ্যাংশের কোন কোন স্থলে নূতন শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়,—

কেবল জ্বলিছে হৃদে অপুত্রতানল। —(৩ পৃঃ)

অথবা,—

সুকোমল শয়ণীয়ে করিয়া শয়ন।
সদা অসুখিত হতো যে রাণীর মন॥ —(৩ পৃঃ)

অনুপ্রাসের বাহুল্য নাই—তবে স্থানে স্থানে ইহা ব্যবহৃত হইয়াছে,—

নৃপবর নিরন্তর ভাবেন অন্তরে। —(৫ পৃঃ)

অথবা,— পূর্ণচন্দ্র সম রূপ হেরি অপরূপ। (১৩ পৃঃ)

বা,— খণ্ডাও এ খর ক্ষোভ খলতাবিহীনে।

স্থানে স্থানে একই শব্দের একাধিকবার ব্যবহার দৃষ্ট হয়—

লাজ পেয়ে সে অনঙ্গ, ত্যজিয়াছে নিজ অঙ্গ,
হেরিয়ে সে সুঅঙ্গ ভামুর ॥
কহিব কি সে সুবর্ণ, সুবর্ণ জিনিয়া বর্ণ
সচঞ্চল চপলা সুন্দরি। —(১৬ পৃঃ)

অথবা,—

পরে রাজা কুমারীর কর করি করে।
আনন্দেতে অর্পিলেন কুমারের করে। —(৬০ পৃঃ)

কাব্যের মাঝে মাঝে রাগিণী-উল্লেখে ধুয়া আছে। যেমন—

(রাগিণী বেহাগ—তাল আড়াঠেকা)
আর কি হেরিব আমি সে চন্দ্রবদন।
একবার দেখি যারে সঁপিয়াছি মন ॥ —(১৩ পৃঃ)

সে যুগের অনেক কাব্যে পরিচ্ছেদের ভাব লইয়া রচিত সঙ্গীতের খণ্ডিতাংশকে ধুয়ারূপে রাগিণী ও তাল উল্লেখে পরিচ্ছেদের পূর্ব্বে লিপিবদ্ধ করার একটা রীতি দেখা যায়। এই কাব্যেও সেই রীতি অনুসৃত হইয়াছে।

গদ্যাংশে সংস্কৃত-সাহিত্যের প্রভাব দৃষ্ট হয়।—

"রাজা বায়ু বিক্ষোভিত সমুদ্রনিভ ও দাবানল প্রজ্বলিত হুতাসন সদৃশ প্রলয় কালোচিত বারিদতুল্য ক্রোধপরিপূর্ণ কলেবর হইয়া দ্বারপালকে আহ্বান করিলেন।" —(৫০ পৃঃ)

গদ্যেও অনুপ্রাস ব্যবহৃত হইয়াছে ; যেমন—

"হে জগজ্জীবন! তুমি অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়া এ অকিঞ্চন মনের মনোভিলাষ পূর্ণ কর।"—(১১১ পৃঃ)

গদ্যাংশের স্থানে স্থানে ভাষা সহজ ও সরল ; যেমন—

"এইরূপে যুবরাজদম্পতী প্রণয়ালাপে ও বিবিধ কৌতুকে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ উভয়ের প্রতি উভয়ের অনুরাগ এত প্রগাঢ় হইয়া উঠিয়াছিল যে, পরস্পর পরস্পরের অদর্শনে সংসার তমোময়,

রাজ্যভার অরণ্যময়, দেহ ভারময় এবং জীবনধারণ বিড়ম্বনামাত্র বোধ করিতে লাগিলেন।”—(৩৫ পৃঃ

এই স্থানের ভাব ও ভাষার উপর বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব লক্ষণীয়।

সতি সত্তম কাব্য—‘সতি সত্তম কাব্যে’র লেখক বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়। ইহার মুদ্রণ সময় ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দ। কাব্যটি-সম্বন্ধে কবির নিজের উচ্চ ধারণা ছিল। তিনি ভূমিকায় লিখিয়াছেন—“সুরসিক পাঠকবর্গ ইহার ভাবার্থ প্রভৃতি পর্য্যালোচনা করিয়া যতই পাঠ করিবেন, বোধ করি ততই ইহার সুমিষ্ট রসাস্বাদন করিবেন।”

দেবতা-বন্দনার ভিতর ভাবের অভিনবত্ব লক্ষণীয় –

কে তুমি গোপনে রহ, মিত্রভাবে অহরহ,
দুঃসহ বিপদে কর ত্রাণ।
কোথায় বসতি কর, কি নাম কি রূপ ধর,
চরাচর না পায় সন্ধান ॥

বিশ্বজগতের অন্তর্লোকে থাকিয়া যিনি অলক্ষ্যে মানবকে কল্যাণের পথে চালিত করিতেছেন কবি তাঁহাকেই প্রণতি জানাইয়াছেন। তাঁহার কোন রূপ নাই, কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান নাই—তিনি অখণ্ড, অব্যয়, সত্য।

কাহিনী-বিন্যাসের ভিতরেও কবির নূতন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। দুই সখীর কথোপকথনের মধ্য দিয়া কাহিনী অগ্রসর হইয়াছে। একজন যুবতী ও বিরহবিধুরা, অপরজন বয়স্কা, স্নেহশালিনী ও শুভাকাঙ্ক্ষিণী। যুবতীর বিষণ্ণ বদন দেখিয়া বৃদ্ধা সখীকে কারণ জিজ্ঞাসা করিল।

যুবতী পতির বিরহে অধীরা। সখীর সস্নেহ প্রশ্নের উত্তরে কহিল,—

জীবন যৌবন লয়ে সদা মরি ত্রাসে।
ঘিরেছে বিচ্ছেদ মেঘ বদন আকাশে ॥ —(৮ পৃঃ)

সখী সুমতি তাহাকে সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিল।

কামিনী কুলের বাহির হইবার বাসনা প্রকাশ করিলে সুমতি তাহাকে সৎপথে থাকিবার জন্য অনেক উপদেশ দিয়া পতি-অন্বেষণে যাইতে পরামর্শ দিল। এই-সকল কথাবার্ত্তার ভিতর দিয়া দুইটি রমণীহৃদয়ের কামনা-বেদনা, আশা-নিরাশার কথা ব্যক্ত হইয়াছে।

কামিনী স্বামীর অন্বেষণে বাহির হইল,—

চলিল ভামিনী, ভাবের ভাবিনী,
মরাল গামিনী, বিকল ভাবে।
কোথায় তড়িত, চরণে জড়িত,
কোথায় চকিত, চরণ দাবে॥ —(৪৩ পৃঃ)

অন্তঃপুরবাসিনী বহির্জগতে পদার্পণ করিয়া নানারূপ দৃশ্যাদিও যেমন দেখিতে লাগিল নানাবিধ অভিজ্ঞতাও সেরূপ সঞ্চয় করিল। প্রথমে সে বারাঙ্গনাগণের নিকট আশ্রয় চাহিলে তাহারা কামিনীর পরিচয় শুনিয়া কহিল,—

কিসের প্রয়াস, হেথা অভিলাষ,
এই গৃহ বাস, পাপেতে পোরা। —(৪৫ পৃঃ)

যাহারা দেহ-বিক্রয় করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিতেছে কামিনী তাহার সরল বুদ্ধিতে তাহাদের প্রেমের কাণ্ডারী ভাবিয়া প্রেম-পথের তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলে বারাঙ্গনাগণ ঐ পথের দুঃখকষ্টের বর্ণনা করিয়া তাহাকে নিবৃত্ত করিল,—

অবলা সরলা তুমি তরী তব ক্ষুদ্র।
দেবের অগম্য প্রেম অকূল সমুদ্র॥
গঞ্জনা লাঞ্ছনা ঝড় বহে নিরন্তর।
কলঙ্ক তরঙ্গ তাহে মহা ভয়ঙ্কর॥ —(৫৯ পৃঃ)

ব্যাধ তাহার নিকট কুপ্রস্তাব করিলে সে কৌশলে তাহার মনোভাব পরিবর্ত্তিত করিয়া দিল। সে কহিল,—

বল দেখি প্রেম কোথা, তুমি বক্তা আমি শ্রোতা,
কোথা পোতা পিরীতের বন।
তাতে তুমি বনচর, তৃণ লতা সুগোচর,
চরাচর কি আছে গোপন॥ —(৬৬ পৃঃ)

সন্ন্যাসী তাহার নিকট কুপ্রস্তাব করিলে সে তিরস্কার করিল—

অনুমান করি তুমি জেতে হবে বেদে।
মর্ত্তলোকে অর্থ হর জটা ভার বেঁধে॥ —(৭৩ পৃঃ)

কাব্যে নায়িকা কামিনীর চরিত্রই প্রাণময়। সে বন্ধুবৎসলা ও সাহসী। সখীর কথায় কুপথে যাইবার বাসনা ত্যাগ করিয়া স্বামীর সন্ধানে নানা

দুঃখকষ্টের পথে বাহির হইয়াছে। তাহার পাণ্ডিত্য, তাহার বুদ্ধিমত্তা এবং সর্ব্ব অবস্থার ভিতর দিয়া তাহার চাতুর্য্যপূর্ণ কার্য্যাবলী প্রশংসনীয়। কামিনী স্নেহশীলাও বটে। নিজ স্বর্ণবালা দিয়া ব্যাধের কবল হইতে কপোতের উদ্ধার করিবার ভিতর তাহার দরদী ও স্নেহকাতর মনের পরিচয় পাওয়া যায়। স্বামীর প্রতি তাহার আন্তরিক নিষ্ঠার পরিচয়ও পাওয়া যায়। এই নিষ্ঠার জন্য সমস্ত প্রতিকূল অবস্থাকে অতিক্রম করিয়া স্বামীকে লাভ করিয়া সে সার্থক হইয়াছে।

কাব্যের নায়কের সাক্ষাৎ আমরা শেষাংশে পাই। প্রথমেই দেখি সে ছলনা করিয়া সন্ন্যাসিবেশে কামিনীর নিকট কুপ্রস্তাব করিতেছে। তারপর কামিনীর চরিত্রের দৃঢ়তা দেখিয়া তাহার মনোবাসনা পূর্ণ হইবার ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া গ্রামে পৌছাইয়া দিয়াছে। কামিনী গৃহে ফিরিয়া সুমতির নিকট শুনিল তাহার স্বামী আসিয়া পুনরায় তাহার অন্বেষণে বাহির হইয়াছে। নায়ককে ঠিক হৃদয়হীন বা মূর্খ বলা চলে না। কামিনীকে গৃহে দেখিতে না পাইয়া সে দুঃখে ক্রন্দন করিয়াছিল,—

বহিল সঘনে শ্বাস ঝরিল নয়ন।
রোদন করিল ঢাকি বসনে বদন॥ —(১০৫ পৃঃ)

সন্ন্যাসিবেশে কামিনীর সহিত কথাবার্ত্তার ভিতর দিয়া তাহার পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। কামিনী কাশী যাইবার বাসনা প্রকাশ করিলে সে কহিয়াছিল—

ঋষি বলে তুমি কাশি রূপেতে রূপসী।
তুমি লো ভবের নিত্য তীর্থ বারাণসী॥
দেবের নির্ম্মিত দেহ পুণ্যের শরীর।
নির্জীব সজীব কাম শিবের মন্দির॥ —(৮৩ পৃঃ)

তবে নায়ক কেন যে বিবাহের পর দ্বাদশ বর্ষ পত্নীকে ছাড়িয়া দূরে ছিল ঠিক বোঝা যায় না। কবিও এ বিষয়ে নীরব। পত্নীর কথা মনে পড়িতেই সে পত্নীর উদ্দেশ্যে আসিয়াছিল এবং কৌশলে তাহার সতীত্বের পরীক্ষা করিয়া আনন্দলাভ করিয়াছিল।

পার্শ্বচরিত্র-হিসাবে সখী সুমতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সে কামিনীর দুঃখে দুঃখিত হইয়াছে এবং সৎ পরামর্শ দিয়া পতনের হাত হইতে রক্ষা করিয়াছে।

সখীর স্বামী আসিলে প্রথমেই কামিনীর সংবাদ দেয় নাই। তাহার মনোভাব পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত নীরবে রহিয়া তাহার দুশ্চিন্তা বাড়াইয়াছে। অবশেষে তাহাকে কাঁদিতে দেখিয়া সত্য তথ্য কহিয়াছে। কামিনী গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে সে-ই বেশী আনন্দিত হইয়াছে এবং সখীর যথোপযুক্ত সমাদর করিয়াছে।

কাব্যে নানাবিধ স্থান ও দৃশ্যের বর্ণনা দ্বারা বৈচিত্র্য আনিবার চেষ্টা দেখা যায়। কামিনী চলিতে চলিতে—

কখন নগর পায় কখন কানন।
না মানে প্রচণ্ড তাপ ব্রহ্মাণ্ড দাহন॥ —(৫৮ পৃঃ)

আবার কোথাও দেখিল—

কোথায় বা চক্রবাক, কোথায় ডাকিছে ডাক,
ঝাঁক ঝাঁক বাবুয়ের দল।
শাখা শিরে শারী শুকে, মিলাইয়া মুখে মুখে,
সুখে গান গায় অনর্গল॥ —(৫৯ পৃঃ)

এই কাব্যের সর্ব্বপ্রধান বিশেষত্ব হইল, ইহার নায়ক-নায়িকা রাজপুত বা রাজকন্যা নয় তাহারা সাধারণ গৃহস্থ ঘরের নরনারী। কাব্যে পূর্ব্বেই দেব-দেবীর প্রাধান্য মন্দ হইয়া আসিয়াছিল। এই কাব্যের ভিতর রাজপরিবারের বা সওদাগর-পরিবারের পুত্রকন্যাগণের আধিপত্য হ্রাসের সূচনা দেখা যায়। দ্বিতীয় লক্ষণীয় বিষয় হইতেছে, কোথাও আদিরসের অবতারণা নাই। বিরহ-বেদনার মধ্য দিয়া মিলনকে মধুর করিবার একটা চেষ্টা দেখা যায় এবং অলক্ষ্যে কুলত্যাগিনীগণের প্রতি একটি দরদপূর্ণ উপদেশের ক্ষীণ আভাসও দৃষ্ট হয়। সবচেয়ে বেশী অভিনবত্ব প্রকাশ পাইয়াছে কবি যেখানে কুলত্যাগিনীগণের মুখ দিয়া তাহাদের দুঃখের কথা, বেদনার কথা, কণ্টকাকীর্ণ পাপময় পথের কষ্টের কথা বলাইয়াছেন। সে যুগে যাহারা বিপথগামী হইত তাহাদের প্রতি লেখক-গণের সহানুভূতি দেখা যাইত না। তাহাদের জীবন ও চরিত্র সব সময়ই মসীলিপ্ত করিয়া চিত্রিত করা হইত এবং পাপচিন্তা ছাড়া তাহারাও যে অপরের শুভাকাঙ্ক্ষা করিতে পারে এরূপ ধারণাও তাহারা করিতে পারিত না। কিন্তু এই কাব্যে ঐ কুলত্যাগিনীগণ নিজেদের পাপজর্জ্জরিত জীবনের কথা কহিয়া কামিনীকে পাপপথ হইতে নিবৃত্ত করিয়া নিজেদের মর্ম্মবেদনা

যেমন প্রকাশ করিয়াছে অন্যদিকে অপরের কল্যাণকামনার মত সহৃদয়তাও তাহাদের যে ছিল তাহার প্রমাণ দিয়াছে। কবির অলক্ষ্যেই কবি-হৃদয়ের ইহাদের প্রতি একটা ব্যথাপূর্ণ দরদ আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। কাব্যের ভিতর অনেক দোষত্রুটি রহিয়াছে—কাব্যরস কোথাও ভাল করিয়া জমে নাই—ঘটনা-বিন্যাসও মনোহারী নয়—নানাবিধ তত্ত্বব্যাখ্যা দ্বারা কাব্যটি ভারাক্রান্ত। কিন্তু তথাপি কাব্যের নিজস্ব একটি বৈশিষ্ট্য সুন্দরভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে। পুরাতনের নাগপাশ হইতে মুক্ত হইয়া ইহা যেন নব পথের সূচনা জানাইয়া দেয়। ইহার ভিতর অলৌকিক ঘটনার অবতারণাও নাই। উপমা, রূপক প্রভৃতি অলঙ্কারগুলিও অনেকখানি পুরাতনের কবল হইতে মুক্ত।

কাব্যের স্থানে স্থানে আপ্ত বাক্যের ব্যবহার দৃষ্ট হয়; যেমন—

"যে স্থানে প্রণয় আছে সে স্থানে বিচ্ছেদ।"

অথবা,—

জহরী জহর চিনে রতনে রতন।
ভূজঙ্গের হাঁচি বেদে চিনে বিলক্ষণ॥ —(৬৪ পৃঃ)

পয়ার, ত্রিপদী ও চৌপদী ছন্দে কাব্যটি রচিত। ইহাতে ছয়টি সর্গ আছে। ভাব ও ভাষা অতিরিক্ত তত্ত্বব্যাখ্যায় কিছুটা ভারগ্রস্ত।

প্রেমোল্লাস—১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে 'প্রেমোল্লাস' কাব্যটি কালিদাস সরকার কর্তৃক বিরচিত হয়।

এই কাব্যটিতে রূপকথা-মিশ্রিত প্রণয়মূলক কাহিনী পাওয়া যায়। অনেক অলৌকিক ঘটনা, অনেক অবাস্তব পরিবেশ ইহার ভিতর সন্নিবেশিত হইয়াছে। তাহার সহিত মিশিয়াছে মানবভাগ্যের বিচিত্র গতিধারা। দুই-এর সংমিশ্রণে কাব্যে মানুষকে খুঁজিয়া পাওয়া দুষ্কর। কবি কল্পনারাজ্যের সৌভাগ্যবান্ রাজপুত্রের অলৌকিক কার্য্যাবলীর বর্ণবৈচিত্র্যে ও সুষমায় কাব্যকে রসসমৃদ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। অবশ্য স্থানে স্থানে মানুষের চিত্তবৃত্তির স্ফুরণ ও অভিব্যক্তি ইহাকে রূপকথার রাজ্য হইতে কাহিনীর রাজ্যে লইয়া আসিয়াছে।

"আপন ভাগ্যেতে আমি হতেছি পালন"—কনিষ্ঠ রাজপুত্রের এই উক্তিই সমস্ত কাব্যটির ভিতর রূপায়িত হইয়া রাজপুত্রকে কখন ভোগ-ঐশ্বর্য্যের মাঝে প্রেমের পথে লইয়া গিয়াছে কখন রাত্রির নিবিড় অন্ধকারে গহন অরণ্যের পথে পরিচালিত করিয়াছে—কাহারও নিকট হইতে পাইয়াছে ভর্ৎসনা ও অবজ্ঞা, কাহারাও নিকটে লাভ করিয়াছে বরমাল্য ও ঐশ্বর্য্য। ভাগ্যের অমোঘ শক্তি মানুষের গতিপথকে কিভাবে নিয়ন্ত্রিত করিয়া হাসি কান্না, আনন্দ-বেদনার রঙে অনুরঞ্জিত করে এই কাব্যে তাহারই প্রকাশ দেখা যায়।

প্রথমেই দেখি উজ্জ্বল নগরের প্রতাপশালী রাজা কুশধ্বজ কনিষ্ঠ পুত্রের উত্তরে ক্রুদ্ধ হইয়া পিঞ্জরাবদ্ধ অবস্থায় গভীর অরণ্যে তাহাকে বনবাস দেন। নিজের ভাগ্যে মানুষ চলে এ কথা রাজার বিশ্বাস হয় নাই—তাই তিনি অকৃতজ্ঞ পুত্রকে তাহার ভাগ্য পরীক্ষার নিমিত্ত বিপদের মধ্যে প্রেরণ করিলেন। পুত্র ভাগ্যধরের ভাগ্য কিন্তু সত্যই ভাল ছিল। তাই যেখানে "বন্যজন্তু মহারব করে নিরন্তর"—সেখানে জন্তুগণ তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইল না। যিনি আকৃষ্ট হইলেন তিনি সুখময়-নামক এক রাজা। কন্যার পাত্র হিসাবে ভাগ্যধরকে তাঁহার পছন্দ হইল। তিনি ভাবিলেন—

আমার যেমন কন্যা নামে লীলাবতী।
তেমতি এ পাত্র যদি দেন প্রজাপতি ॥

তিনি ভাগ্যধরের নিদ্রাভঙ্গের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন এবং নিদ্রা ভাঙ্গিলে করযোড়ে তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। যেখানে বাঘ সিংহ হস্তী গণ্ডার প্রভৃতি দ্বারা অভ্যর্থিত হইবার সম্ভাবনা সেখানে শ্বশুর লাভ করা ভাগ্যের কথা বই কি।

রাজা সুখময় রাজ্যে লইয়া গিয়া কন্যা লীলাবতীর জন্য তাহাকে মনোনীত করিলেন। পাণ্ডিত্যাভিমানিনী রাজকন্যা ভাগ্যধরের পাণ্ডিত্য পরীক্ষার নিমিত্ত যখন শ্লোক লিখিয়া পাঠাইল তখনও ভাগ্যধরের অজ্ঞতার ভান করার পশ্চাতে ভাগ্যপরীক্ষার উদ্দেশ্য ছিল বলিয়াই মনে হয়। রাজকন্যা লীলাবতী মূর্খকে পছন্দ করে না। দাসীর মুখে ভাগ্যধরের অজ্ঞতার কথা শুনিয়া তাহার মনে রাজপুত্রের প্রতি অবজ্ঞা আসিল। সে সখীকে কহিল,—

মূর্খের সৌন্দর্য্য রূপে নাহি কোন ফল।
মূর্খ পতি হৈলে তার সকলি নিষ্ফল ॥

গন্ধহীন পুষ্প যেমন হয় অনাদর।
মূর্খজনের সেইরূপ নাহি সমাদর॥ —(১০ পৃঃ)

পণ্ডিতের পুত্র মদনকে বিদ্যোৎসাহী এবং নিজের প্রতি অনুরাগী জানিয়া লীলাবতী তাহার সহিত পলায়নের ব্যবস্থা করিলে ভাগ্যধর তাহা জানিয়া কৌশলে মদনের পরিবর্তে নিজে নৌকায় স্থান করিয়া লইল। ভাগ্যের কথা কে বলিতে পারে? মানুষ ভাবে এক, চেষ্টা করে এক, কিন্তু ঘটে অন্যরূপ। লীলাবতীর ভাগ্যেও তাহাই হইল। লীলাবতী আরোহণ করিলে তরী ছাড়িয়া দিল। সারারাত্রি অপেক্ষা করিয়া প্রত্যুষে লীলাবতী মদনকে ডাকিতে গেল,—

উঠ উঠ প্রাণসখা মুখে দেহ বারি।
হেরে তব চন্দ্রানন প্রাণ স্নিগ্ধ করি॥ —(পৃঃ ২৬)

ভাগ্যধর যখন বস্ত্রের আচ্ছাদন হইতে মুখ বাহির করিল তখন—

তারে দৃষ্টি করি কন্যা আঁখি কৈল স্থির।
তুষানলে দগ্ধ যেন হইল শরীর॥ —(২৭ পৃঃ)

তারপর ভাগ্যধরকে ভৎর্সনা করিল—

শুন রে দুর্ভাগ্য তোর মুখ না হেরিব।
হলাহল পান কিম্বা জলে ঝাঁপ দিব॥ —(২৭ পৃঃ)

ভাগ্যধর বুদ্ধিমান্। কথা কহিলে বিপদের সম্ভাবনা বুঝিয়া "শ্রবণে শ্রবণ নাহি দেয় ভাগ্যধর"।

মনোহর রাজার রাজ্যে লীলাবতীর নিকট ভাগ্যধর ভৃত্যের ন্যায় থাকিতে লাগিল তবু আত্মপরিচয় দিল না।

কিছুদিন গত হইলে নিজ ভাগ্যের কথা ভাবিয়া লীলাবতী ভাগ্যধরকেই পতিত্বে বরণ করিল কিন্তু বাহিরে কিছু প্রকাশ করিল না।

এদিকে ভাগ্যধর মনোহর রাজার বিবাহিতা কন্যা পদ্মাবতীর নিকট গুপ্ত-ভাবে গেল। উভয়ে উভয়কে দেখিয়া মুগ্ধ হইল কিন্তু ভাগ্য তাহাকে ঐ স্থানে বেশীদিন যাতায়াত করিতে দিল না। দুই রাত্রে পালঙ্কের নীচে ও মাদুরের ভিতর লুক্কায়িত থাকিয়া পদ্মাবতীর স্বামী চিত্রসেনের কবল হইতে মুক্তি পাইয়া সে পদ্মাবতীর নিকট যাওয়া ত্যাগ করিল। কিন্তু তাহার সেই নৈশ অভিসারের কথা দিবসে ইঙ্গিতে পাশা খেলিবার কালে কহিয়া সে চিত্রসেনকে

ক্রীড়ায় পরাজিত করিয়া প্রভূত অর্থ উপার্জন করিল। কিন্তু পদ্মাবতী তাহার বিরহে কাতরা। ভাগ্যধর আসিতেছে না দেখিয়া সে আদরিণীর নিকট নিজ মনোবাসনা ব্যক্ত করিয়া কহিতেছে—

স্বর্ণ চাঁপা অনুসারে, ছলনা করিব তারে,
আমি পিতৃ অগ্রেতে চাহিব।
আদেশ দিবেন তারে, যদি না আনিতে পারে,
কারাগারে বান্ধিয়া রাখিব॥ —(৬২ পৃঃ)

রাজাজ্ঞায় ভাগ্যধর স্বর্ণচাঁপার অনুসন্ধানে গেল। অরণ্যের ভিতর রাত্রি আঁধার হইল। বৃক্ষে বসিয়া থাকিতে থাকিতে সে হস্তিপৃষ্ঠে একটি রমণীকে আসিতে দেখিল—

তাহার রূপ সন্দর্শনে, ভাগ্যধর করে মনে,
দীপ্তমান আইসে হুতাশন॥ —(৬৬ পৃঃ)

মুগ্ধ ভাগ্যধর না করিল তাহার অনুসরণ না জানাইল নিজের আগমন—বিস্মিত-হৃদয়ে নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিল। এই-সব স্থানে ভাগ্যের শক্তি দেখাইবার জন্য কবি নায়ককে অনেকখানি প্রাণহীন করিয়াছেন। প্রণয়ের যে আকর্ষণে মানুষ দুর্লঙ্ঘ্য পর্ব্বত উত্তীর্ণ হয়, বিপৎসঙ্কুল অরণ্যে বিচরণ করে এবং ক্ষুধা-তৃষ্ণাকে উপেক্ষা করিয়া, আরাম-বিরাম ছাড়িয়া পথে বাহির হয় সেইরূপ প্রণয় দ্বারা অভিভূত হইয়াও ভাগ্যধর নীরবে বসিয়া রহিল। মহাদেবের নিকট নির্দ্দেশ পাইয়া চাঁপাবতী করিগণের সাহায্যে তাহাকে আনিয়া বরমাল্য দিলে উভয়ে অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিল। গৃহে ফিরিবার কালে হস্তীর নিকট বিদায় চাহিলে হস্তী তাহাকে একটি অঙ্গুরী প্রদান করিল।

নায়ক ভাগ্যগুণে অলৌকিকরূপে অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন অঙ্গুরী লাভ করিল।

রাজকন্যা পদ্মাবতী কিন্তু স্বর্ণচাঁপা পাইয়া সন্তুষ্ট হইল না—

স্বর্ণপাত্রে স্বর্ণ পুষ্প করি নিরীক্ষণ।
কন্যা শিরে বজ্রাঘাত হইল যেমন॥
বিমুখ হইয়া কন্যা সজল নয়নে।
মনে মনে দগ্ধ হয় প্রেম হুতাশনে॥ —(৭৪ পৃঃ)

এস্থানে মানবীয় মনোভাবের সুন্দর অভিব্যক্তি হইয়াছে। যাহার অক্ষমতায় কারাগারে বন্দী করিয়া নিজের কাছে পাইবার জন্য মন কাতর তাহার সার্থকতায় স্বার্থসিদ্ধির পথে বাধা পড়ায় সে দুঃখিতই হইল।

তারপর নাপিতানীর মুখে চাঁপাবতীর রূপ ও তাহার সহিত ভাগ্যধরের বিবাহের সংবাদে তাহার হৃদয়ে ঈর্ষ্যা প্রজ্বলিত হইল। একদিকে হাসিবার সময় চাঁপাবতীর মুখ দিয়া স্বর্ণচাঁপা ঝরিতেছে অপরদিকে পদ্মাবতীর মনে ঈর্ষ্যানল জ্বলিতেছে—একদিকে অবাস্তবতার মধুর পরিবেশ অপরদিকে বাস্তবতার রূঢ় প্রকাশ কাব্যটির ভিতর একটি অভিনব সুরের ঝঙ্কার তুলিয়াছে।

ভাগ্যধর গৃহে ফিরিলে দেরী হইবার জন্য লীলাবতীর নিকট হইতে ভৎসনা পাইল,—

> কত পাপ করিয়াছি জন্ম জন্মান্তরে।
> সেই পাপে হারায়েছি ঠাকুর পুত্রেরে॥
> আমারে হইল তব অন্ন যোগাইতে।
> বুঝিতে না পারি আর কি আছে ভাগ্যেতে॥
> অন্য কোন গুণ তব না পাই দেখিতে।
> গুণের মধ্যেতে পার উদর পূরিতে॥ —(৫৯ পৃঃ)

রমণী-হৃদয়ের এই ক্রোধ প্রকাশের ভিতর দিয়া কবি যেন চাঁপাবতীর অলৌকিক সুখরাজ্য হইতে লীলাবতীর নির্মম পার্থিব রাজ্যে নায়ককে আনিয়া ফেলিয়াছেন। লৌকিক ও অলৌকিকের দোলায় দুলিতে দুলিতে নায়ক জীবনপথে অগ্রসর হইতেছে।

পদ্মাবতী স্বামী চিত্রসেনকে চাঁপাবতীর সংবাদ কহিলে তাহাকে দেখিবার জন্য চিত্রসেন একদিন রমণীর বেশে সজ্জিত হইল এবং তারপর চাঁপাবতীকে দেখিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। সে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তাহাকে পাইবার উপায় চিন্তা করিতে লাগিল।

আবার অরণ্যের পথে ভাগ্যধরের আহ্বান পড়িল। চিত্রসেনের অসুস্থতা দূর করিবার জন্য স্বর্ণকেতকীর প্রয়োজন। ভাগ্যধর তাহারই সন্ধানে চলিয়াছে। কিন্তু এবার সে অন্বেষণে চলে নাই। চাঁপাবতীর নিকট হইতে তাহার ভগ্নী কেয়াবতীর স্থান ও পথঘাট জানিয়া সে যাইতেছে। বটবৃক্ষ-মূলে

একটি প্রস্তর দেখিয়া চাঁপাবতীর নির্দ্দেশ অনুসারে সে স্তব করিলে এক নিশাচর আসিল।

প্রকাণ্ড শরীর তার, দৃশ্য অতি ভয়ঙ্কর,
মনুষ্য হিংসক হয় যেবা।
কেমনে বিশ্বাস হয়, হেরে কম্পিত হৃদয়,
তার সহ বাক্য কহে কেবা॥ —(৮৮ পৃঃ)

নিশাচর কিন্তু তাহাকে হত্যা করিল না—তাহার অভিলাষ পূর্ণ করিবার জন্য কেয়াবতীর নিকট লইয়া চলিল। এই ঘটনার ভিতরও আবার বাস্তব ও অবাস্তবতার সমাবেশ দেখা যায়। চিত্রসেন সুখ দুঃখ আশা আকাঙ্ক্ষায় গড়া মানুষ। ভাগ্যধরের নিধনের উদ্দেশ্যে সে ভাগ্যধরকে অসম্ভব কর্ম্মের পথে অরণ্যে পাঠাইয়াছে, আর হিংস্র নিশাচর তাহাকে লইয়া চলিয়াছে সৌভাগ্যের পথে। মানুষের জীবনে ভাগ্য এইভাবেই অপ্রত্যাশিত-রূপে অনুগ্রহ করে। বাস্তবতার রন্ধ্রে রন্ধ্রে অলৌকিকের স্পর্শ এইভাবেই মানুষের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। কেয়াবতীর নিকট যাইবার কালে অপূর্ব্ব আলোক দেখিয়া ভাগ্যধর নিশাচরকে ঐ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়া শুনিল—

কেয়াবতী যে ললনা, তার রূপ অতুলনা,
জ্যোতির্ম্ময় তাহার লাবণ্য। —(৯০ পৃঃ)

কেয়াবতী ভাগ্যধরকে দেখিয়া মুগ্ধ হইল ও বিবাহ করিল। সে যখন হাস্য করে তখন স্বর্ণকেতকী ঝরিয়া পড়ে। সে স্থানেও বিদায়কালে নিশাচরের নিকট হইতে ভাগ্যধর একটি অঙ্গুরী পাইল যাহা বিপদের সময় তাহাকে সাহায্য করিবে।

অধিকতর বিস্ময় ভাগ্যধরের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। লীলাবতী নাপিতানীর মুখে চাঁপাবতী ও কেয়াবতীর সংবাদ শুনিল এবং ভাগ্যধরের নানাবিধ গুণাবলীর খবর পাইল। তাহার মন হইতে সমস্ত বিরূপভাব তিরোহিত হইল। সে একদিন ভাগ্যধরের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া চাঁপাবতী ও কেয়াবতীর নিকট গিয়া একত্রে বাস করিতে লাগিল। বাস্তব ক্ষেত্রে ভাগ্যধরের ভাগ্যাকাশে যে মেঘের আবির্ভাব হইয়াছিল তাহা সরিয়া গিয়া তাহার জীবনকে সুখময় করিয়া তুলিল।

চিত্রসেন কিন্তু ভাগ্যধরকে বধের উপায় খুঁজিতে লাগিল। অবশেষে

একদিন সে ভাগ্যধরকে বিষমিশ্রিত অন্ন খাইতে দিল ও গৃহে বন্দী করিল। কিন্তু ভাগ্য যাহাকে সৌভাগ্যের শীর্ষে স্থাপন করিতে চায় কেহই তাহার অনিষ্ট করিতে পারে না। ভাগ্যধর কালিকা-স্তব করিয়া অঙ্গুরীগুলি ভূমিতে নিক্ষেপ করিবার নির্দ্দেশ লাভ করিল। সেইরূপ কার্য্য করিয়া সে হস্তিগণের ও নিশাচরগণের সাহায্য লাভ করিল।

অবশেষে স্ত্রীগণের সহিত পরামর্শ করিয়া ভাগ্যধর সপরিবারে ঐ স্থান পরিত্যাগ করিল এবং পিতৃরাজ্য উজ্জ্বল নগরে একটি গৃহে অবস্থান করিতে লাগিল। ভাগ্যক্রমে এক বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ হইলে পিতামাতার অন্ধত্বের সংবাদ এবং পিতৃরাজ্য অপর-কর্ত্তৃক বিজিত হইয়াছে শুনিয়া ভাগ্যধর পুনরায় নিশাচর ও হস্তিগণের সাহায্যে মাতাপিতার চক্ষুও ফিরাইয়া আনিল এবং রাজ্যও পুনরুদ্ধার করিল।

কাব্যের নায়ক ভাগ্যধর নিজস্ব কোন চেষ্টা বা প্রেরণার বশে চলে নাই। ভাগ্যের উপর সে সমস্ত ছাড়িয়া দিয়াছে। সেই ভাগ্যই তাহাকে লীলাবতীর নিকট লইয়া গিয়াছে—তিরস্কার ও ভৎর্সনা লাভ করাইয়াছে—পদ্মাবতীর নিকট হইতে দূরে রাখিয়াছে এবং তাহারই ইচ্ছানুসারে অরণ্যে পাঠাইয়া চাঁপাবতীর সহিত মিলন আনিয়াছে, আবার চিত্রসেন-কর্ত্তৃক তাহাকে নিধনের ষড়্যন্ত্রের ভিতর দিয়া কেয়াবতীকে লাভ করাইয়া তাহার জীবন সার্থকতায় মণ্ডিত করাইয়াছে। ভাগ্যের স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে কখনও সে অলৌকিকের সাক্ষাৎ পাইয়া জীবনে অপ্রত্যাশিতকে লাভ করিতেছে আবার কখনও বাস্তব সত্যের মুখোমুখি দাঁড়াইয়া নির্ম্মম নিষ্ঠুরতা ও ষড়্যন্ত্রের কবলে পড়িতেছে। কিন্তু সর্ব্বত্রই সে সমস্ত বিপদ্-আপদ্ হইতে রক্ষা পাইয়া সৌভাগ্যের চরম শীর্ষে স্থানলাভে সার্থক হইয়াছে। তাহার চরিত্রে মানবোচিত গুণাবলী বা সুখ-দুঃখের অনুভূতির কোন অভিব্যক্তি নাই। সে সুখের দিনেও ভাগ্যের দানকে যেমনভাবে গ্রহণ করিয়াছে দুঃখের দিনেও সেরূপ নির্ব্বিকার-চিত্তে আপন কর্ত্তব্য করিয়া গিয়াছে। তাই চরিত্রটি একটু অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়।

কাব্যের প্রথম নায়িকা লীলাবতী—সুন্দরী ও সুশিক্ষিতা। মূর্খের প্রতি তাহার অত্যন্ত ঘৃণা। কিন্তু ভাগ্যক্রমে মূর্খ বলিয়া যাহাকে সে ঘৃণা করিয়াছে তাহার সহিতই তাহাকে বাস করিতে হইয়াছে। সে ভাগ্যধরকে এজন্য শান্তি দেয় নাই কোনদিন—তিরস্কার ও ভৎর্সনারূপে তাহার ঘৃণা সর্ব্বদা

আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। সে অনন্যোপায় হইয়া ভাগ্যধরের সহিত একত্রে রহিয়াছে কিন্তু ধিক্কারে তাহার জীবন পূর্ণ হইয়াছে। কিন্তু তাহার মনেও পরিবর্তন আসিতে আরম্ভ করিল—সে ভাগ্যধরকে মনে মনে গ্রহণ করিল কিন্তু বাহিরে প্রকাশ করিল না। অবশেষে এক নাপিতানীর মাধ্যমে তাহার দৃষ্টির সম্মুখ হইতে ভ্রান্তির যবনিকা অপসারিত হইলে লীলাবতী ভাগ্যধরের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া সার্থক হইল।

পদ্মাবতী দুশ্চরিত্রা। স্বামীকে সে কোনদিন ভালবাসে নাই। আদরিণীর নিকট তাহার চরিত্রের সংবাদ পাইয়া ভাগ্যধর দুই রাত্রি তাহার নিকট গিয়াছিল। প্রথম দর্শনে তাহাকে দেখিয়া মুগ্ধও হইয়াছিল কিন্তু কোন আসক্তি বা আকর্ষণ ভাগ্যধরের ভিতর আমরা দেখিতে পাই না। পদ্মাবতী কিন্তু তাহার জন্য ব্যাকুল। তাহার বিরহ সে সহ্য করিতে পারিত না। তাহাকে নিকটে পাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াও সে ব্যর্থ-মনোরথ হইয়াছে। চাঁপাবতীর সহিত ভাগ্যধরের বিবাহের সংবাদে সে ঈর্ষ্যা অনুভব করিয়াছে কিন্তু নিজ অভিপ্রায় সিদ্ধ করিবার কোন উপায় খুঁজিয়া পায় নাই।

এই দুইটি চরিত্র, লীলাবতী ও পদ্মাবতী, অনেকখানি মানবোচিত অনুভূতিসম্পন্ন। ইহাদের কার্য্যকলাপ এবং ক্রোধ-দ্বেষ-হিংসা-আসক্তি, সুখ-দুঃখের সংঘাতে নায়কের চরিত্রে মানবোচিত স্পর্শ লাগিয়া তাহাকে কিছুটা পৃথিবীর মানুষরূপে ভাবিতে সাহায্য করিয়াছে। অন্যদিকে কাহিনীকেও রূপকথা হইতে পৃথক্ করিয়াছে।

চাঁপাবতী ও কেয়াবতী যেমন অবাস্তব তাহাদের আগমনও সেরূপ অপ্রত্যাশিত ও আকস্মিক। ভাগ্যের অনুগ্রহরূপেই ভাগ্যধর তাহাদের লাভ করিয়াছে এবং তাহাদের চরিত্রেও মানবোচিত গুণাবলী ও অনুভূতির প্রকাশ কবি দেখান নাই। কবি তাহাদের কল্পনারাজ্যের রহস্যে আচ্ছন্ন রাখিয়া কাব্যের ভিতর এক অলৌকিকের স্পর্শ আনিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

স্থানে স্থানে কবির বাস্তব দৃষ্টিও প্রশংসনীয়। যেমন, ভাগ্যধরকে লেখাপড়া শিখাইবার জন্য রাজবাটী হইতে পণ্ডিতের আহ্বান আসিলে দারিদ্র্যপীড়িত সংসারের যে চিত্রটি কবি আঁকিয়াছেন তাহা অত্যন্ত সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। প্রথমেই ঐ সংবাদ পাইয়া ব্রাহ্মণী কহিল—

প্রতি মাসে তথা যত পাইবে বেতন।
মুদ্রা আনি মম করে করিবে অর্পণ ॥
... ...
গাত্রে স্বর্ণ রূপা রাখি এক দুই তোলা।
আর কিছু না থাকিবে সব থাকিবে তোলা ॥ —(১৩ পৃঃ)

সব আয়ব্যয়ের হিসাব হইয়া গেল। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত পত্নীকে ঐ সংবাদ অপরেব নিকট হইতে গোপন রাখিতে পরামর্শ দিল। কিন্তু রমণী-হৃদয়ের আনন্দ-উচ্ছ্বাস কতক্ষণ চাপা থাকে! তাহার সমস্ত হাবভাব, চাল চলনের ভিতর সেই উচ্ছ্বাসের অভিব্যক্তি হইল।

ঘাটে যাইবার কালে—

উন্মত্তার ন্যায় পথে চলিল ব্রাহ্মণী।
চরণের ভারে যেন কম্পিতা ধরণী ॥
ব্রাহ্মণীরে হেরে লোকে করে কাণাকাণি।
অস্থির গমন কেন কি হৈল না জানি ॥ —(১৩ পৃঃ)

একজন প্রতিবাসিনী তাহাকে আনন্দের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে যেন বাঁচিল এবং খুসীমনে—

হাসিয়ে কহিছে তখন ব্রাহ্মণের নারী।
প্রকাশ করহ পাছে ঐ শঙ্কা করি ॥
সে রামা কহিছে আমি সেই মেয়ে নই।
একের গোপন কথা অন্যেরে না কই ॥
তদন্তরে ব্রাহ্মণী কহিল সমুদয়।
শপথ তোমারে যেন প্রকাশ না হয় ॥ —(১৩ পৃঃ)

দুইটি রমণীর কথোপকথনের ভিতর দিয়া তাহাদের সরল মনের সুন্দর প্রকাশ হইয়াছে। ইহারা আমাদের আশেপাশের রমণী—অত্যন্ত পরিচিত। নয়নতারা নামক অপর এক রমণী ঐ সংবাদ শুনিয়া ব্রাহ্মণীর নিকট আসিয়া অযাচিতভাবে উপদেশ দিয়া নিজের শুভেচ্ছার পরিচয় দিল—

যে তুষ্ট হয়েছি আমি কি কহিব আর।
ত্বরায় ডাকিয়ে আন ভাল স্বর্ণকার ॥

ঢাকা হৈতে কারিগর এসেছে দুজন।
অল্পেতে নির্ম্মিত করে অতি সুগঠন ॥
অগ্রেতে নির্ম্মল মল দেহ দুটি পায়।
ছাঁল্লাদার চুট্‌কি দিলে অতি শোভা পায় ॥ —(১৪ পৃঃ)

এই-সকল সুসময়ের বন্ধুদেরও আমরা চিনি। স্থানে স্থানে এরূপ বাস্তবতার চিত্র কাব্যটিকে অনেকখানি উপভোগ্য ও মধুর করিয়াছে।

বাস্তব ও অবাস্তবের সংমিশ্রণে কাব্যটি নিজ বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। সর্ব্বত্র ইহা সার্থক হয় নাই, অনুভূতির স্পর্শও নাই, প্রাণের আবেগও রূপ পায় নাই—তথাপি কাব্যধারার একটি বিশেষ দিক্ ইহাতে সুন্দরভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

পয়ার, ত্রিপদী, তোটক প্রভৃতি ছন্দে কাব্যটি রচিত। উপমা, রূপক প্রভৃতি অলঙ্কারের ব্যবহার গতানুগতিকভাবেই হইয়াছে।

স্থানে স্থানে হিন্দী ভাষার প্রয়োগ দেখা যায় ;—

দ্বারী কহে জলওয়ালি রাতকো কাঁহা যাও।
সঙ্গমে তেরা দোসরা কোন হাম্‌কো বাতাও ॥ —(৪৩ পৃঃ)

যোজন-গন্ধা—'যোজন-গন্ধা' কাব্যটি বনয়ারীলাল রায় কর্ত্তৃক রচিত। ইহার প্রকাশ-সময় ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দ। কবির নিবাস হুগলী জেলায় হরিপাল গ্রামে।

কবির পিতা প্রেমচাঁদ রায় বর্দ্ধমানের রাজা মহাতাপচাঁদের কর্ম্মচারী অথবা অনুগৃহীত ব্যক্তি ছিলেন। কবির জন্মের পর রাজার মৃত্যু হয়। কবিও রাজার কর্ম্মচারী ছিলেন বলিয়া মনে হয়। কবি দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন—

অতি মোর মন্দ ভাল, অকালে তাঁহারে কাল,
হরিল কি কব হায় হায় ॥
বর্দ্ধমানে তদবধি, থাকি আমি নিরবধি,
ভূপতির কৃপা বৃক্ষতলে।
বাসনা করিয়ে মনে, কতিপয় বন্ধুগণে,
রচিতে এ কাব্য মোরে বলে ॥ —(।/০ পৃঃ)

ভণিতায় পাওয়া যায়—

ভুবনেতে সুপ্রকাশ, হরিপাল গ্রামে বাস,
গোষ্ঠীপতি শিবদাস রায়।

তাঁহার বংশেতে দীন, অতি অভাজন হীন,
বনয়ারিলাল এই গায়॥ —(১৯ পৃঃ)

মঙ্গলাচরণে দেব-বন্দনা দিয়া কাব্যের আরম্ভ। এই স্তুতির ভিতর নানা-রূপ তত্ত্বব্যাখ্যাও স্থান পাইয়াছে।

এই কাব্যে নানারূপ অলৌকিক ঘটনার মধ্য দিয়া প্রেমের গতিপথ চিত্রিত হইয়াছে। রূপকথা ও আখ্যায়িকার সংমিশ্রণে ইহার ভিতর একটি রোমান্টিক পরিবেশের সৃষ্টি হইয়াছে। ইহার আরম্ভেও যেমন পরীগণের কৌতূহল কাজ করিয়াছে পরিণতিতেও সেরূপ কালিকার স্নানজল সকল সমস্যার সমাধান করিতে সাহায্য করিয়াছে।

পরীগণ-কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া রাজপুত্র যখন নিদ্রায় অভিভূত তখন মাতুলালয় হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পথে বিশ্রামরতা রাজকন্যা গন্ধা তাহাকে দেখিয়া মুগ্ধ হয় এবং মালা বদল করে।

নায়িকার এই কার্য্য আমাদের সাধারণ ধারণার ব্যতিক্রম। লোকে বলে, প্রেম নায়ক-নায়িকার হৃদয়ে সমানভাবে সঞ্চারিত হইলেও নায়িকারা তাহা প্রকাশ করিতে লজ্জাবোধ করে এবং নায়কেরাই প্রথমে নিজেদের হৃদয়ভাব ব্যক্ত করিয়া নায়িকাদের মনোভাব জানিয়া লয়। গন্ধার কার্য্যাবলীতে কিন্তু বিপরীত রীতিই দৃষ্ট হইল। তাহার যাহাকে পছন্দ হইল সকলের অলক্ষ্যে তাহারই কণ্ঠে মাল্যদান করিয়া সে নিজ মনোবাসনা পূর্ণ করিল। কোন ভাবনা-চিন্তা, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব তাহার মনে ছায়াপাত করে নাই। নায়কের অলক্ষ্যে নায়িকার হৃদয়ে এই প্রেমের স্ফুরণ কাব্যকে রহস্যময় করিয়া তুলিয়াছে। নায়িকা পরিজনদের সহিত চলিয়া গেল। নায়ক কিছু জানিতেও পারিল না। শুধু স্বপ্নে দেখিল—

যেন এক নারী, রূপ বলিহারি,
নবীনা যৌবনা ধনী।
রূপ মনোহর, নিন্দি শশধর,
ইষদ হাস্য বদনী॥ —(২২ পৃঃ)

নিদ্রাভঙ্গে রমণীকে না দেখিয়া তাহার বিরহ ও অন্বেষণ আরম্ভ হইল।

প্রেমের পথ সুগম হইলে তাহার ভিতর রসস্ফূর্ত্তির অবকাশ থাকে না। তাই কবিগণ প্রথম দর্শন বা প্রথম মিলনের পর ঘটনা-পরম্পরায় বিচ্ছেদ সংঘটিত করিয়া বিরহের ভিতর দিয়া নায়ক-নায়িকা-হৃদয়ের বিচিত্র লীলা

প্রকাশ করেন। এই কাব্যেও কবি নায়ক-নায়িকার পরিচয় উভয়ের নিকটে অজ্ঞাত রাখিয়া একদিকে দুর্জ্ঞেয়তার মায়াজাল সৃষ্টি করিয়াছেন অপরদিকে প্রেমের পথকে জটিলতর করিয়াছেন।

কালিকার প্রসাদে রাজকন্যার পরিচয় লাভ করিবার ব্যাপারেও এক অলৌকিক ঘটনার সমাবেশ দেখা যায়। রাজপুত্র রাত্রে শুকপক্ষিসহ বৃক্ষে অবস্থান-কালে দেখিল যে সরোবরটি শুষ্ক হইল এবং

তাহা হতে এক জন বিকট বিশাল।
বাহির হইয়ে গেল লইয়ে মশাল ॥ —(৩৩ পৃঃ)

এই স্থানে যেন বত্রিশ সিংহাসনের প্রভাব পড়িয়াছে বলিয়া মনে হয়। তারপর রাজপুত্র শুকপক্ষিসহ বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিয়া একটি উত্তম পথ দেখিয়া তাহা দ্বারা অগ্রসর হইল এবং পুরীমধ্যে দেখিল চারিদিকে নানারূপ মণি জ্বলিতেছে। এস্থলে বেশ একটি রোমাণ্টিক পরিবেশের সৃষ্টি হইয়াছে। অপ্রত্যাশিত কিছু দেখিবার আশায় পাঠক-হৃদয়েও একটা শঙ্কামিশ্রিত কৌতূহল জাগিয়া উঠে। কিন্তু কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হইল না। কেবল মন্দির-মাঝে শ্যামা-মূর্ত্তি দৃষ্ট হইল।

উনবিংশ শতাব্দীর সকল কাব্যেই কালিকাদেবী একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছেন। তিনি ভক্তবৎসলা এবং আপদে-বিপদে অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়া ভক্তগণকে উদ্ধার করিয়াছেন। এই কাব্যেও রাজপুত্র কালিকা-পূজা করিলে তিনি তুষ্ট হইয়া অজ্ঞাত রাজকন্যার সংবাদ জানাইলেন। মন যাহা জানিবার জন্য আকুলি-বিকুলি করিতেছিল তাহা জানিবার পক্ষে এই রহস্যময় পরিবেশ অত্যন্ত উপযোগী হইয়াছে। রহস্যজালে যাহা বেষ্টিত রহস্যের ভিতর দিয়া তাহার প্রকাশ মনস্তত্ত্বের দিক্ দিয়া এবং কাব্যের দিক্ দিয়া অনেকখানি রস সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছে। রাজপুত্র যোজন সর্ণাট নগরে গেলেও তাহার পথ সুগম হইল না। রাজ-অন্তঃপুরের দুর্লঙ্ঘ্য আবেষ্টনীর ভিতর যাহার বাস তাহার নাগাল পাওয়া সহজসাধ্য নয়। রাজ-প্রাসাদ প্রহরিগণ দ্বারা দুর্ভেদ্য দুর্গের ন্যায় সংরক্ষিত। রাজপুত্র তাই শুক-পক্ষীর পরামর্শক্রমে অনেকগুলি চিত্র আঁকিয়া পটুয়ানীর বেশ ধারণ করিল এবং হাস্যে-লাস্যে দ্বারিগণকে ভুলাইয়া অন্দরে প্রবেশ করিল। রাণীর সঙ্গিনী সুবদনী তাহার রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া বলিল,—

তোমার স্বরূপ রূপ না হেরি নয়নে।
দেবলোক তুল্য রূপ এই লয় মনে॥ —(৪৫ পৃঃ)

যোজন এইরূপে নানা ছলাকলার সাহায্যে গন্ধার সাক্ষাৎ পাইল এবং প্রত্যহ তাহার নিকট যাইবার অনুমতি লাভ করিল। গন্ধার মনোভাব জানিতেও তাহার দেরী হইল না। প্রথমে যোজনের চিত্র দেখিয়াই তাহার মনে ভাবান্তর উপস্থিত হইল—

দেখিয়ে সে চিত্রপট চিত্ত হারাইল।
চিত্রের পুত্তলী প্রায় চাহিয়া রহিল॥ —(৫১ পৃঃ)

তারপর সহৃদয়া পটুয়ানীর নিকটে রাজকন্যা নিজ-হৃদয়-দ্বার অকপটে উন্মুক্ত করিয়া কহিল,—

এই তো আমার স্বামী, ইঁহার অধিনী আমি,
এঁর পদে বিকায়েছি কায়॥ —(৫৩ পৃঃ)

প্রত্যহ চিত্রকর-রমণীবেশে যোজনের আনাগোনা চলিতে লাগিল। একদিন সে গন্ধাকে কহিল যে, পথে একটি অতি সুন্দর যুবক পাগলের ন্যায় "কোথা গেলে প্রাণপ্রিয়ে এস একবার" বলিয়া ঘুরিতেছে সে দেখিয়া আসিয়াছে। রাজকন্যা উতলা হইয়া উঠিল।

প্রেমরসিক যোজন নিজ পরিচয় না দিয়া নানাভাবে রাজকন্যার প্রেমের পরীক্ষা করিয়া এবং তাহা অনুভব করিয়া আনন্দ পাইতে লাগিল এবং কন্যার হৃদয়েও প্রেমতরু মঞ্জরিত হইবার মত অবকাশ দিল। কিন্তু রাজপুত্রের এই ছলনা বেশী দিন টিঁকিল না। বিরহ-জ্বালায় জর্জ্জরিত হইয়া গন্ধা একদিন কালিকা-পূজা করিয়া সত্য তথ্য জানিতে পারিল। তখন রাজপুত্রকে জব্দ করিবার জন্য নিজে রাজপুত্রের বেশ ধারণ করিল এবং সখী হীরাকে দ্বারবানের পরিচ্ছদে সাজাইল। তারপর তাহারা যাহা করিল তাহা যেমন কৌতুককর তেমনি অভিনব। পুরুষবেশী গন্ধা পথের মধ্যে নারীবেশী যোজনকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া নিজেকে রাজনন্দন বলিয়া পরিচয় দিল এবং সখীর হস্তে তাহাকে অর্পণ করিল। দ্বারবানবেশী হীরা কহিল—

দেখ তুজে হজুরের লাগা আসনাই।
কাহে কত ঝুট আসনায়ে আস নাই॥ —(৮২ পৃঃ)

হিন্দী ও বাংলার সংমিশ্রণের ফলে ভাষা বেশ একটু শ্রুতিমধুর হইয়াছে।

বলপূর্ব্বক কুমারকে মন্দিরে লইয়া গিয়া সঙ্গ-কামনা-ছলে তাহার ছদ্মবেশ আবিষ্কার করিয়া গন্ধা তাহার প্রতি অনেক কটুবাক্য ব্যবহার করিল এবং তাহার রমণী-সজ্জা লইয়া চলিয়া গেল। এখানে নায়কের বুদ্ধি ও সাহসকে নিষ্প্রভ বলিয়া মনে হয়। দুইটি রমণী তাহাকে দিয়া যাহা করাইল সে তাহাই পালন করিয়া অপমান ও লাঞ্ছনা লইয়া গৃহে ফিরিল। অবশ্য এ কথা ঠিক যে, তাহার ছদ্মরূপ পাছে ধরা পড়ে এই ভয়ে সে শারীরিক শক্তির প্রয়োগ করে নাই এবং গন্ধাকে সত্য সত্যই রাজপুত্র ভাবিয়া কিছুটা ভীত হইয়াছে। কিন্তু রাজ্যশাসনের উপযুক্ত শিক্ষালাভ করিয়া রাজপুত্রের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব সাধারণের অপেক্ষা অধিক থাকাই স্বাভাবিক। একথাও ঠিক যে, এ স্থলে রাজপুত্রের এরূপ লাঞ্ছনা না ঘটিলে কাহিনীর অগ্রগতিতে বাধা পড়িত। তবে ইহা বলা চলে যে, এই পরিণতিতে পৌঁছাইতে আরও কিছু বাস্তবতার স্পর্শ বাঞ্ছনীয় ছিল।

তারপর কঙ্কা-নামক শুকের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া গন্ধার নিকট গমনাগমনের মধ্যে অনেকখানি বর্ণবিন্যাসের সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু তাহা হয় নাই। কবি কঙ্কাকে কেবল দুই স্থানের ভিতর যোগাযোগ রক্ষা করিবার জন্য আনয়ন করিয়াছেন। এই যাত্রাপথ কোন প্রকার প্রাকৃতিক বর্ণনা বা মনোভাবের অভিব্যক্তির দ্বারা সমৃদ্ধ হয় নাই। অবশেষে গোপন পরিণয়ের শেষ পরিণতিতে রাজপুত্রের মৃত্যু বাস্তবতাবর্জ্জিত আতিশয্যে পর্য্যবসিত হইয়াছে। কালিকার প্রসাদে পুনর্জ্জীবন-প্রাপ্তি দ্বারা কালিকা-মাহাত্ম্য জ্ঞাপন করিবার জন্য নায়কের অপ্রত্যাশিতভাবে এবং উপযুক্ত কারণ না দেখাইয়া আকস্মিক মৃত্যু ঘটান কাব্যরসকে অনেকখানি ব্যাহত করিয়াছে।

এই কাব্যের নায়ক যোজন ঘটনার স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছে। সে একটু স্পর্শকাতর। উদ্যানে ভ্রমণ করিতে করিতে প্রাকৃতিক শোভা দর্শন করিয়া সে অচৈতন্য হইয়া পড়িল—

> মন্দ মন্দ সমীরণ ঘোর অহঙ্কারে।
> বসন্ত রাজার ক্রম তখন প্রচারে॥
> তাহাতে যোজন রায় হইল অজ্ঞান। —(৪ পৃঃ)

যাহার জীবনে নানাবিধ অলৌকিক ঘটনার সমাবেশ হইবে প্রথমেই তাহার চরিত্রে এই ভাবপ্রবণতার ইঙ্গিত দিয়া কবি শিল্প-নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন।

তাহার রূপও অসাধারণ। পরীগণ নৈশভ্রমণে বাহির হইয়া রাজপুত্রের

রূপে আকৃষ্ট হয় এবং তাহাকে শূন্যপথে লইয়া চলে। কিন্তু দিবাসমাগমে রাজার নিকট শাস্তির আশঙ্কায় তাহারা এক অরণ্যের ভিতর তাহাকে রাখিয়া চলিয়া যায়। তারপর আরম্ভ হইল যোজনের জীবনে দুঃখকষ্ট। নিদ্রিত অবস্থায় সে রাজকন্যার হৃদয় ও মালা পাইল বটে কিন্তু তাহাও তাহার নিকট দুর্জ্ঞেয় হইয়া রহিল। এই প্রেমের জন্য সে অনেক লাঞ্ছনা-অপমান সহ্য করিল, অনেক ছল-চাতুরীর আশ্রয় লইল এবং অবশেষে প্রাণও ত্যাগ করিল। প্রেমের পথে তাহার এই নিষ্ঠা প্রশংসনীয়।

শুকপক্ষীর সহিত যোজনের বন্ধুত্ব তাহার স্নেহপ্রবণ মনের পরিচায়ক। সে শুকপক্ষীকে ধরিল বটে কিন্তু বধ করিল না। তাহার নিঃসঙ্গ জীবনে তাহাকেই সঙ্গী করিয়া রাখিল।

যোজনকে সাহসীও বলা চলে। মধ্যরাত্রে সরোবর হইতে বিরাটকায় মূর্ত্তিকে বাহির হইতে দেখিয়া সে ভীত হয় নাই। বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিয়া অজ্ঞাত পথে চলিয়াছে এবং কালিকার মূর্ত্তি দেখিয়া পূজা করিয়াছে। তাহার হৃদয়ে ভক্তি ও বিশ্বাসের পরিচয়ও ইহা হইতে পাওয়া যায়।

অঙ্কনবিদ্যায়ও রাজকুমারের যথেষ্ট পারদর্শিতা ছিল। স্বল্প সময়ের মধ্যে নানাবিধ চিত্র অঙ্কন করিয়া সে তাহার অভীষ্ট-সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইয়াছে এবং তাহা দ্বারা সফলতাও পাইয়াছে। অন্যান্য কাব্যের নায়কের ন্যায় যোজনেরও রসিক মনের পরিচয় একমাত্র সখী-পরিবৃত রাজকন্যার গৃহে নানা কথোপকথনের ভিতর দিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। তবে এ কথা বলা চলে যে, ঘটনার স্রোতে সে যেমন ভাসিয়া চলিয়াছে সেরূপ ঘটনার সংঘাতে তাহার চরিত্রের নানাদিক্ বিকশিত হইয়াছে।

নায়িকা গন্ধার চরিত্র মনের উপর অনেকখানি রেখাপাত করে। নিজ মনোবাসনা পূর্ণ করিবার জন্য সে কাহারও সহায়তা চাহে নাই, নিজেই উপায় স্থির করিয়া লইয়াছে। রাজপুত্র যোজনকে দেখিয়া সে মুগ্ধ হইয়াছে এবং নিজ অভিলাষ-অনুযায়ী তাহার সহিত মাল্যবদল করিয়াছে। তারপর অজ্ঞাত যুবকের জন্য বিরহ সহ্য করিয়াছে, চিত্রকর-রমণীর শরণাপন্ন হইয়াছে—অবশেষে কালিকার নিকট যোজনের ছদ্মবেশের কথা জ্ঞাত হইয়া তাহাকে জব্দ করিবার পরিকল্পনা নিজেই করিয়াছে ও তাহাতে সিদ্ধকাম হইয়াছে। ইহা দ্বারা তাহার বুদ্ধিমত্তা ও রসিকমনের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রেমের

প্রতি তাহার নিষ্ঠাও প্রশংসাযোগ্য। অনেক বাধা-বিপত্তির মধ্যেও সে রাজপুত্রকে সমাদরে গ্রহণ করিয়াছে ও গান্ধর্ব্ব-বিবাহ করিয়াছে। কাব্যে তাহার চরিত্রটি উজ্জ্বল।

পার্শ্ব-চরিত্র-হিসাবে শুকপক্ষী আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সে দেখিতে সুন্দর। তাই রাজপুত্র তাহার রূপে আকৃষ্ট হইয়া তাহাকে ধরে। প্রথমে সে ভয়ে রাজকুমারের নিকট প্রাণভিক্ষা করিয়া যখন জানিল যে, তাহাকে বধ করিবার বাসনা রাজকুমারের নাই তখন হইতে সে তাহার সারাজীবনের সঙ্গী হইয়া রহিল। বনে বনে ঘুরিয়া ফলমূল আনিয়া যে যোজনকে খাওয়াইয়াছে, বিপদের পথে সঙ্গী হইয়াছে, প্রয়োজন-বোধে পরামর্শ দিয়াছে। গন্ধার নিকট ছদ্মবেশ ধরা পড়িয়া যখন যোজনের রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিবার পথ রুদ্ধ হইয়াছিল তখন শুক পক্ষিগণের অধিপতি কঙ্কার নিকট অনুরোধ করিয়া যোজনের যাতায়াতের পথ সুগম করিয়াছে। অবশেষে রাজপুত্র মৃত্যুমুখে পতিত হইলে স্তব করিয়া কালিকাকে তুষ্ট করিয়া চঞ্চুদ্বারা স্নানজল আনিয়া যোজনকে বাঁচাইয়াছে। বন্ধু-প্রীতির এত বড় নিদর্শন এবং এতখানি দরদপূর্ণ কর্ত্তব্যবোধ মানুষের মধ্যেও বিরল। মনুষ্যজনোচিত অনেক গুণাবলীও তাহার ভিতর বর্ত্তমান। সে মানুষের মত কথা কহিতে পারে। বিপদে-আপদে পরামর্শ দিতে পারে, প্রয়োজনের সময় দেব-দেবীর আরাধনাও করিতে পারে। তাহার ন্যায়বুদ্ধিও প্রশংসাযোগ্য। রাজপুত্রের মৃত্যু হইলে সে গন্ধার পিতামাতাকে ভৎর্সনা করিয়া ন্যায়-উপদেশ দিয়াছিল। বিদ্যাসুন্দরের কাহিনীও শুকের জানা ছিল। সে সেই কাহিনীর উল্লেখও করিয়াছিল।

এই কাব্যে অনেক স্থানেই অতিপ্রাকৃতের অবতারণা করা হইয়াছে। পরীগণের আবির্ভাব ও কার্য্যকলাপ, শুকপক্ষীর মনুষ্যের ন্যায় কথাবার্ত্তা, মধ্যরাত্রে সরোবরের ভিতর পথপ্রাপ্তি ও সর্ব্বশেষে যোজনের পুনর্জ্জীবন-লাভ কাব্যটিকে অনেকখানি রূপকথার রাজ্যে লইয়া গিয়াছে। অবশ্য এই-সকল কল্পনা এ-দেশের সংস্কারের সহিত জড়িত। ইহার নিমিত্ত যুক্তি-তর্কের প্রয়োজন বা অলৌকিক ঘটনার পশ্চাতে কারণ প্রদর্শন করা কবি দরকার বোধ করেন নাই। সে-যুগে কবিগণ রোমান্টিক বলিতে অলৌকিক ও অবাস্তব ঘটনার সমাবেশ বুঝিতেন। এই কাব্যে সেই ধারণার পরিচয় অনেক স্থলেই দেখা যায়। প্রতি ঘটনার পশ্চাতে একটি করিয়া অলৌকিক শক্তি কাজ

করিতেছে দেখা যায় এবং তাহাই কাহিনীর গতি ও পরিবর্ত্তন নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। রূপকথা ও কাহিনীর মিশ্রণে কাব্যটি একদিকে যেমন অবাস্তব ও আতিশয্যে পূর্ণ হইয়াছে অপরদিকে রস-পরিবেশের ভিতর একটা বৈচিত্র্যের সুর আনিয়াছে।

স্থানে স্থানে প্রকৃতির বর্ণনা দিবার চেষ্টা রহিয়াছে—বিভিন্ন স্থানের বর্ণনা রহিয়াছে—কিন্তু সবগুলিই পূর্ব্বেকার কাব্যগুলিকেই অনুসরণ করিয়াছে। নূতনত্ব কিছু নাই।

রাজার কোতোয়ালদিগের মুখ দিয়া দাসত্বের হীনতার কথা কবি বলাইয়াছেন—

যে মারি খেয়েছি আমি পুনশ্চ ডরাই।
পরের চাকুরী করা এ বড় বালাই॥
যে জন দাসত্ব করি স্বাধীনতা নাশে।
তাহারে অধম বলি শাস্ত্রকারে ভাষে॥ —(১২১ পৃঃ)

ইহার ভিতর সে যুগের স্বাধীনচিত্ততা স্ফূর্ত্তি পাইয়াছে।

কাব্যটিতে ত্রিপদী, পয়ার, দীর্ঘ পয়ার, অন্ত্যযমক প্রভৃতি ব্যবহৃত হইয়াছে। উপমা, রূপক প্রভৃতি—প্রাচীনপন্থী। ইহাতে অনুপ্রাসের বাহুল্য রহিয়াছে। তবে কাব্যের ভিতর একটা স্বচ্ছন্দ গতি বর্ত্তমান।

কমলদন্তাহরণ—'কমলদন্তাহরণ'-কাব্যটি তারাশঙ্কর মৈত্রেয় কর্ত্তৃক রচিত ও ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত। রঙ্গপুর কাকিনার জমিদার শম্ভুচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয়ের অনুরোধে বইটি লেখা হয়। রচনাকাল-সম্বন্ধে কবি গ্রন্থশেষে লিখিয়াছেন—

শাকে সপ্তদশ শত বিরাশী বৎসরে।
সৌর চৈত্রমাস তার নবম বাসরে॥
গুরুবার তিথি শুক্ল দশমীর ভোগ।
পুনর্ব্বসু নক্ষত্র শোভন নামে যোগ॥
ত্র্যহঃস্পর্শ তাহে যুক্ত কৌলব কারণ।
সন্নিকট দোল যাত্রা হর্ষ নরগণ॥
ফল্গু উড়াইয়া সবে সুশোভিত হয়।
সমাপ্ত হইল গ্রন্থ এমন সময়॥

নিজ মুখে বলিলেন শম্ভুচন্দ্র রায়।
দ্বিজ তারা শঙ্কর রচিল কবিতায়॥ —(২২১ পৃঃ)

ইহা হইতে মনে হয় কাব্য-রচনা সমাপ্ত হইয়াছে ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে।

'কমলদত্তাহরণ'-কাব্যটিতে প্রাচীন ধরণের রোমান্টিক কাহিনী স্থান পাইয়াছে। পূর্ব্বে রোমান্টিক বলিতে অলৌকিক ঘটনা বুঝা যাইত। তাহার ভিতর শিহরণ থাকিত, ভয় থাকিত, আকস্মিকতা থাকিত এবং আনন্দও থাকিত। তাহাদের মধ্যে রাক্ষস-খোক্কস, পরী-দৈত্য ও দেবতা-গন্ধর্ব্ব নির্ব্বিচারে স্থান পাইত এবং মানুষের উপর তাহাদের অপ্রত্যাশিত করুণা বা ক্রোধ মানুষের ভাগ্যকে নিয়ন্ত্রিত করিত। 'কমলাদত্তাহরণ' যে যুগে রচিত হয় সে যুগে ঐ ধরণের রোমান্টিক কাব্য বড় দেখা যায় না। রোমান্টিসিজম্ তখন মানব-অনুভূতির রাজ্যে প্রবেশ করিয়া আত্মপ্রকাশের পথ খুঁজিতেছিল। তাই ঐ সময়ে রচিত কাব্যগুলিতে কিছুটা বাস্তবতাবোধ ও কিছুটা অলৌকিকত্বের সংমিশ্রণ দেখা যায়। কোন কোন কাব্যে অলৌকিকত্ব-বর্জ্জিত বাস্তব ঘটনাবলীও স্থান পাইতেছিল। কিন্তু 'কমলদত্তাহরণ'ই একমাত্র কাব্য যাহা সে যুগে রচিত হইয়াও পূর্ব্বযুগের অনুকরণে অলৌকিক ঘটনাবলীর সমাবেশ করিয়া ভয়, বিস্ময় ও আনন্দে পাঠকচিত্তকে অভিভূত করে। এই কাব্যে পরী আছে, গন্ধর্ব্ব আছে, রাক্ষসী আছে, এবং দেবতাও আছেন। কখনও কখনও নায়ক কদম্বকুমার কাহারো অনুগ্রহলাভ করিয়া আশাতীত সৌভাগ্য লাভ করিতেছে আবার কখনও কাহারো নিগ্রহের নিষ্পেষণে জর্জ্জরিত হইতেছে। নায়িকা কমলদত্তার সহিত তাহার প্রেমের পথ কখনও কুসুমাস্তীর্ণ হইয়া তাহার মনকে আশার অরুণরাগে রঞ্জিত করিতেছে আবার কখনও বিচ্ছেদের দুঃখে এবং ব্যথায় তাহাকে তিমিরাচ্ছন্ন করিতেছে। এইভাবে উভয়ের প্রেমের ভিতর আসিয়াছে বৈচিত্র্য ও বেদনা, মিলন ও আনন্দ।

কাহিনীটির পশ্চাতে একটু দেবসভার ইতিহাস আছে। সুশীল-নামক গন্ধর্ব্ব একদিন দেবরাজ ইন্দ্রকে স্ত্রৈণ বলিয়া উপহাস করায় দেবরাজের শাপে মর্ত্ত্যে গান্ধাররাজগৃহে কদম্বকুমার-রূপে জন্মগ্রহণ করে। শৈশবকাল হইতেই সে মতিহার ও দুর্ব্বাপর নামক দুই পরীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয় এবং তাহাদের অযাচিত ও অপ্রত্যাশিত অনুগ্রহ লাভ করিয়া বর্দ্ধিত হয়। তাহারা

শকটে তুলিয়া তাহাকে নানাস্থানে লইয়া যাইত এবং আবার লইয়া আসিত। এইভাবে একদিন ব্রহ্মদেশের রাজকন্যা কমলদত্তাকে কমলের উপর দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া তাহারা রাজপুত্রকে রাজকন্যার নিকট লইয়া যায় এবং বিবাহও দেয়। কিছুদিন পর পরীদ্বয় রাজপুত্রকে তথায় যাইবার নিমিত্ত একটি শকট দিয়া বিদায় লইয়া চলিয়া যায়। কিন্তু কয়েকদিন যাতায়াতের পর একদিন শকটটি নষ্ট হইলে সে নদীতে পড়িয়া যায় ও অনেক কষ্টে প্রাণ লইয়া তীরে আরোহণ করে। কিন্তু নানাস্থানে ঘুরিয়াও কমলদত্তার সন্ধান না পাইয়া প্রাণত্যাগের সঙ্কল্প করিলে দৈববাণীতে শুনিল বিরহ-উদ্যানে গেলে সে সিদ্ধ-মনোরথ হইবে। বিরহ-উদ্যানে বুখারের রাজা চিত্রগ্রীবের সাহায্যে পুনরায় মতিহার ও দুর্ব্বাপর পরীদ্বয়ের সন্ধান পাইয়া এবং তাহাদের সাহায্য লইয়া সে কমলদত্তার উদ্দেশ্যে গেল। এদিকে ঐ দিনই শিলীমুখ নামক এক দৈত্য কমলদত্তাকে হরণ করিয়া লইয়া যাইবার কালে চিত্রগ্রীব-ভূপতি কর্ত্তৃক হত হইলে কমলদত্তা রাজার দাসীর নিকট নিজ পরিচয় দিয়া সেখানে রহিল। আর কদম্বকুমার কমলদত্তাকে না দেখিয়া পুনরায় বিষাদগ্রস্ত হইয়া পরীদ্বয়ের উপদেশ-অনুসারে প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। তারপর চিত্রগ্রীব-রাজার সাহায্যে উভয়ের মিলন হইল। কিন্তু দেবতা বাদ সাধিলেন। ইন্দ্রের আদেশে কমলদত্তা অপহৃত হইল এবং কদম্বকুমার তাহার বিরহে মৃতপ্রায় হইলে সেও দেবসভায় নীত হইল। কমলদত্তাকে পিঞ্জরাবদ্ধ দেখিয়া সে যখন ব্যাকুলতা প্রকাশ করিয়া নিজ দেহকে ক্ষতবিক্ষত করিতে লাগিল দেবরাজ তখন পূর্ব্ব-বৃত্তান্ত স্মরণ করাইয়া তাহাকে উপহাস করিতে লাগিলেন। অবশেষে দেবরাজের কৃপায় উভয়ে উভয়কে পাইল, শচীদেবীর গৃহে স্থান লাভ করিল এবং দেবরাজের আদেশে মর্ত্ত্যে আসিয়া পুত্রকন্যাকে পিতামাতার নিকট রাখিয়া স্বশরীরে স্বর্গে গেল।

'কমলদত্তাহরণ'-কাব্যটি দুইটি খণ্ডে প্রকাশিত। কিন্তু প্রথম খণ্ড দুষ্প্রাপ্য। দ্বিতীয় খণ্ড হইতে যে গল্পাংশ পাইয়াছি তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়াছি এবং তাহারই আলোচনা করিতেছি।

দ্বিতীয় খণ্ডের প্রারম্ভে দেখা যায়, নায়ক কদম্বকুমার বিরহ-উদ্যানে আসিয়া মধুতুণ্ড-পরীর নিকট চিত্রগ্রীব-ভূপতির প্রণয়-কাহিনী ও বিরহ-উদ্যানের সৃষ্টির ইতিহাস শুনিতেছে। মধুতুণ্ড-পরী তারপর তাহাকে সাহায্যদানের বাসনায়

চিত্রগ্রীব-রাজার নিকট গিয়া কদম্বকুমারের বিরহের অবস্থা বর্ণনা করিয়া দয়া-সঞ্চারের চেষ্টা করিতেছে।

রাজার অনুগ্রহে দুর্ব্বাপর ও মতিহার কদম্বকুমারকে ব্রহ্মদেশের কাম-সরোবরে লইয়া গেলে সেখানে কমলদন্তাকে না দেখিয়া কদম্বকুমারের বিরহানল তীব্রতর হইল।

এদিকে কমলদন্তা রাজা কর্ত্তৃক শিলীমুখ দৈত্যের হাত হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া সরলা-দাসীর নিকট নিজ পরিচয় ও বিরহের কথা বিবৃত করিতেছে—

ছাড়িয়াছি অন্ন জল না করি আহার।
বন্ধু বিনা হইয়াছে প্রাণ বাঁচা ভার॥ —(১১৭ পৃঃ)

ফুল্লরার বারমাসের দুঃখ বর্ণনার অনুকরণে এস্থলেও কমলদন্তার বারমাসের দুঃখ বর্ণিত হইয়াছে—

বৈশাখে কুসুম বনে সুখি লোক রয়।
বিবিধ পুষ্পের গন্ধে আমোদিত হয়॥
শীতল শীতল বস্ত্র সুশীতল জল।
খাইয়া শীতল হয় মানব সকল॥
আমায় করিল বিধি সে সুখে বঞ্চিত।
প্রাণনাথ বিনা চিত্ত সর্ব্বদা ভাবিত॥
... ...
ফাল্‌গুনেতে দোল যাত্রা জগতে উৎসব।
চারিদিকে শুনা যায় সঙ্গীতের রব॥
দম্পতী শোভিত হয় ফল্‌গু কেশ বাসে।
দিবস রজনী সুখে থাকে পরিহাসে॥
সে সময়ে আমার প্রসন্ন নহে মনঃ।
বিরস বদনে ভাবি বঁধুর বদন॥ —(১১৭-১৯ পৃঃ)

পরীদ্বয়-কর্ত্তৃক কদম্বকুমার পুনরায় চিত্রগ্রীব-ভূপতির গৃহে আনীত হইলে কমলদন্তার অদর্শন সে এক মুহূর্ত্তের জন্যও সহ্য করিতে পারিতেছিল না। সে সমস্ত লজ্জা-সঙ্কোচ ত্যাগ করিয়া রাজাকে কহিল—

আমার কমলাবতী, যুবতী সুন্দরী সতী,
কহ ভূপ আছে কোন্ ঘরে।

বদন কমল তার, দেখি আমি একবার,
না হেরিয়া হৃদয় বিদরে॥ —(১৫৩ পৃঃ)

অনেকদিন বিরহের পর উভয়ে উভয়কে দর্শন করিয়া,—

উৎকট আনন্দে মূর্চ্ছা পায় দুইজনে॥ —(১৫৪ পৃঃ)

রাজার সাহায্যে তাহাদের বিরহ-জর্জ্জরিত জীবনে কিছুদিনের জন্য মিলনের আনন্দ-স্রোত প্রবাহিত হইল। কিন্তু এ-আনন্দ তাহাদের কপালে স্থায়ী হইল না। ইন্দ্রের ক্রোধবহ্নি প্রজ্বলিত হইল। তাঁহার আদেশে জয়ধর গন্ধর্ব্ব কমলদত্তাকে হরণ করিলে কদম্বকুমার উন্মত্তের ন্যায় হইয়া গেল।

চিত্রগ্রীব তাহাকে সান্ত্বনা দিবার নিমিত্ত সুন্দরী কন্যার সহিত বিবাহ দিয়া নিজ রাজ্যের অর্দ্ধেক দিতে চাহিলে কদম্বকুমার কহিল—

কিন্তু কমলিনী মোর হরিয়াছে মনঃ।
ফিরিয়া লইবে হেন আছে কোন জন॥ —(১৮৪ পৃঃ)

তাহার এই প্রেমনিষ্ঠা দেবসভায় সর্ব্বাপেক্ষা বেশী আত্মপ্রকাশ করে। পিঞ্জরাবদ্ধ অবস্থায় কমলদত্তাকে দেখিয়া সে—

কমলিনী আছে ক্ষুর পিঞ্জর ভিতরে।
যুবরাজ ধায় তায় ধরিবার তরে॥
ধারেতে বাধিয়া অঙ্গ হইল বিক্ষত।
ব্যথা নাহি পায় তায় হয়ে জ্ঞান হত॥
পুনঃ পুনঃ পড়ে গিয়া পিঞ্জর উপরে।
ঝর ঝর শোণিত ঝরিছে কলেবরে॥
খণ্ড খণ্ড হয়ে মাংস পড়ে সেই স্থলে।
দেখিয়া করেন হাস্য দেবতা সকলে॥ —(১৯২ পৃঃ)

ইন্দ্রের পরিহাসে কদম্বকুমার নিজ অপরাধ স্বীকার করিল এবং স্বর্গ ছাড়িতে হইলেও কমলদত্তাকে ছাড়িতে পারিবে না জানাইল। তারপর ইন্দ্রের কৃপায় আরোগ্যলাভ করিয়া ও কমলদত্তাকে পাইয়া শচীদেবীর গৃহে তাহারা সুখে কাল কাটাইতে লাগিল।

কমলদত্তা প্রথম হইতে শেষ অবধি রহস্যে ঘেরা। ব্রহ্মদেশের রাজকন্যা সে, কিন্তু রাত্রে সে কাম-সরোবরের কমলের উপর থাকিত। দুই পরীর

সাহায্যে কদম্বকুমারের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয় এবং বিবাহ হয়। তাহার সম্বন্ধে পরীদ্বয় কহিতেছে—

সামান্যা তো নহে কমলিনী, রূপ শশধর জিনি।
রজনীতে সরোবরে থাকে একাকিনী ॥
কাম পদ্মে রহে চিরদিন, তাহা না হয় মলিন।
শিশিরে করিতে নারে তারে দলহীন ॥ —(১২৬ পৃঃ)

চিত্রগ্রীব শিলীমুখ-দৈত্যকে নিধন করিয়া কমলদত্তার রূপে মুগ্ধ হইয়া বিবাহ-প্রস্তাব করিলে স্বামিপরায়ণা বুদ্ধিমতী কমলদত্তা তাহাকে কহিল—

বিপদে করিলা রক্ষা তুমি হও বাপ ॥ —(১১৬ পৃঃ)

তারপর সুশীলা-নাম্নী দাসীর নিকট পরিচয় দিয়া নিজ বিরহের কথা সে বিবৃত করিয়াছে।

অনেকদিন পর কদম্বকুমারকে পাইয়া বিরহবিধুরা কমলদত্তা কদম্বকুমারকে কহিতেছে—

আমারে ছাড়িয়া তুমি নাহি যাবে আর ॥ —(১৫৫ পৃঃ)

কিন্তু পুনরায় ইন্দ্র-কর্তৃক অপহৃত হইয়া তাহার কপালেও দুঃখের শেষ রহিল না। তথাপি সমস্ত দুঃখকষ্টের ভিতরেও তাহাদের নিষ্ঠায় ও আন্তরিকতায় উভয়ের প্রেম উজ্জ্বল হইয়া রহিল এবং ইন্দ্রের আদেশে পুত্রকন্যাকে পিতামাতার নিকট রাখিয়া কদম্বকুমারের সহিত কমলদত্তা সশরীরে স্বর্গে গমন করিল। তবে স্বর্গে লইয়া গিয়া কবি তাহাদের কাম-সরোবরে স্নান করাইয়া দিব্য দেহ প্রাপ্তির বৃত্তান্ত উল্লেখ করিয়া হিন্দুর সংস্কার ও বিশ্বাসকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন।

এই কাব্যে দেবরাজ ইন্দ্রকে প্রথমে নিষ্ঠুর ও কৌতুকপ্রবণ বলিয়া মনে হয়। তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া গন্ধর্ব্বকে স্বর্গভ্রষ্ট করিয়াও ক্ষান্ত হন নাই। তাঁহার প্রতিশোধ-স্পৃহা গন্ধর্ব্বের মনুষ্যজীবনে দুষ্টগ্রহের মত সমস্ত সুখশান্তি হরণ করিয়াছে। দৈববলে বলী দেবতা ক্ষুদ্র মানুষের উপর তাঁহার চরম নিষ্ঠুরতা প্রয়োগ করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছেন। কদম্বকুমার উন্মত্তের ন্যায় পিঞ্জরে পতিত হইয়া নিজ দেহকে ক্ষতবিক্ষত করিতে লাগিলে তিনি দেবতা-মণ্ডলীকে লইয়া হাস্য-পরিহাসও করিতেছিলেন—

সহস্র নয়নে হেরি হাসেন বাসব ॥
হাসিছে দেখিয়া রঙ্গ পারিষদ সব ॥ —(১৯৩ পৃঃ)

অবশেষে কদম্বকুমার ক্ষমা প্রার্থনা করিলে এবং অন্যান্য দেবগণ অনুরোধ জানাইলে ইন্দ্র তাহাদের প্রতি কৃপা করিলেন এবং তাঁহার অনুগ্রহে কদম্বকুমার ও কমলদত্তা আনন্দে ও শান্তিতে কালিকার স্তব করিয়া দিন কাটাইতে লাগিল। সে-যুগের কাব্যে কালিকার অনুগ্রহ এবং কালিকার স্তব কাব্যের একটি অপরিহার্য্য-অঙ্গ-রূপে গণ্য হইত। তাই এই কাব্যেও সমস্ত কাহিনী শেষ হইবার পর প্রয়োজন না থাকিলেও কবি নায়ক-নায়িকা দ্বারা কালিকা স্তব করাইয়াছেন।

'কমলদত্তাহরণ'-কাব্যের দ্বিতীয়ভাগে চিত্রগ্রীব-ভূপতির নীলপ্রভা পরীরাজ-কন্যার সহিত প্রণয়-কাহিনী এবং অদ্ভুত কার্য্যকলাপের বিষয় বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। একদিন রাত্রে রাজা নক্ষত্র দেখিতেছিলেন এমন সময় শকটারোহণে শূন্যপথে গমনরত নীলপ্রভা-পরীকে দেখিয়া তিনি মুগ্ধ হন।—

ভূপতির প্রাসাদের উর্দ্ধ দিয়া যায়।
দশদিক্ আলো করে রূপের ছটায়॥
বহুরত্ন আভরণ করে ঝলমল।
কজ্জলে মণ্ডিত দুই নয়ন উজ্জ্বল॥
উর্ব্বশীর দর্প যায় রূপ দেখে তার।
হেরিয়া বিকল চিত্ত হইল রাজার॥ —(৩ পৃঃ)

এই-সব স্থলে রূপ-বর্ণনার ভিতর সংস্কৃত-সাহিত্যের উপমা-রূপকাদি অলঙ্কারের বাহুল্য নাই। সরল সহজ দুই-চারিটি কথায় কবি চিত্রের পর চিত্রকে রূপদান করিয়াছেন। তাহাদের প্রণয়-সম্বন্ধে কবি লিখিয়াছেন—

প্রাসাদে ভূপতি শূন্যে শকটেতে পরী।
মধ্যেতে অনঙ্গ রহে পুষ্প ধনুঃ ধরি॥ —(৪ পৃঃ)

এই বর্ণনার মধ্যে তাহাদের প্রণয়ের ভবিষ্যৎ পরিণতি যেন মূর্ত্তি পাইয়াছে। অনঙ্গদেবের ধনুঃশরের নিম্নে রহিয়া রাজা প্রেমে অভিভূত হইয়াছেন কিন্তু নীলপ্রভা উর্দ্ধে রহিয়া অনঙ্গকে উপেক্ষা করিয়াছে। নীলপ্রভা প্রথমে রাজাকে ঐ পথ হইতে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু কৃতকার্য্য না হইয়া তাহার মনে প্রতিশোধ-স্পৃহা জাগিয়া উঠিয়াছে এবং দুঃখকষ্ট দিবার বাসনায় সে রাজাকে মিথ্যা প্রলোভন দেখাইয়া ইন্দ্রকিলে লইয়া গিয়াছে। সে সখীকে কহিতেছে—

নর হয়ে মোর পতি হবে সাধ করে।
ভূপতিরে আমি দুঃখ দিব তার তরে॥ —(১৩ পৃঃ)

নীলপ্রভার চক্রান্তে অনাহারে অনিদ্রায় চিত্রগ্রীব-ভূপতির যখন মৃত্যুদশা উপস্থিত তখন গালবমুনির সাহায্যে তালান্তক-নিশাচরকে হত্যা করিয়া হীরারঞ্জন-বৃক্ষ রোপণ করিয়া এবং মন্ত্র-সাহায্যে নীলপ্রভা-পরীকে বিরহ-উদ্যানে চলচ্ছক্তি রহিত করিয়া রাজা তাহাকে লাভ করিলেন। কিন্তু পরীরাজ ব্যঞ্জুলকের ইচ্ছানুসারে তাঁহাকে মুসা-ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে হইল। ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়াও রাজা নিজ প্রেমকে জয়ী করিলেন।

এই স্থলে কবি মুসা-ধর্ম্ম-সম্বন্ধে কিছু কিছু তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন। কাজী চিত্রগ্রীবকে মুসা-ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া উপদেশ দিলেন—

কাজী কহে শুন বাছা, আর নাহি দিবা কাছা,
যত্ন করি বাড়াইবা নুর।
চুল না রাখিবে শিরে, সেবা দিবা সত্য পীরে,
তবে যশো হইবে মান্নুর॥ —(৮১-৮২ পৃঃ)

রাজা মুসা-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া এবং নীলপ্রভাকে বিবাহ করিয়া এত আনন্দিত হইয়াছিলেন যে গালবমুনি তাঁহার নিকট বিদায় লইতে আসিলে তিনি কহিলেন—

আমি বলি মুসা ধর্ম্ম লও ঋষিরাজ।
এক পাতে খাব তাত লসুন পেঁয়াজ॥

কিন্তু হিন্দুধর্ম্মকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করিবার জন্য অবশেষে কদম্বকুমার ও কমলদত্তাকে সশরীরে স্বর্গযাত্রা করাইয়া চিত্রগ্রীব-ভূপতির মনে অনুতাপ আনিয়াছেন। রাজা ভাবিতেছেন—

তপোবলে হিন্দু লোক লয়ে নিজ কায়।
বিমানে চড়িয়া সুখে দেবলোকে যায়॥
করিলাম জাতি নাশ পাইয়া যুবতী।
নাহি জানি পরিণামে হইবে কি গতি॥
স্বধর্ম্মে বিরত আমি সেই পাপ ফলে।
মৃত্তিকা হইবে দেহ মৃত্তিকার তলে॥ —(২১৮ পৃঃ)

কাব্যটির মধ্যে ঘটনাবাহুল্য লক্ষণীয়। ঘটনার পর ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে—দৃশ্যের পর দৃশ্য পরিবর্ত্তিত হইয়াছে—তথাপি কোন স্থলেই পরস্পরের সহিত যোগসূত্র ছিন্ন হয় নাই। অনেক অলৌকিক ঘটনার সমাবেশ হইয়াছে—অনেক অতিপ্রাকৃত দৃশ্যের অবতারণা হইয়াছে—তথাপি কাব্যটি মাধুর্য্য হারায় নাই। অবশ্য মানুষের মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ অপেক্ষা পরীগণের কার্য্য-কলাপই ইহাতে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে এবং তাহাদের আকস্মিক আবির্ভাবে ও তিরোভাবে ঘটনাস্রোত নিয়ন্ত্রিত হইয়া কাব্যটিকে রোমান্টিক করিয়া তুলিয়াছে। নায়ক কদম্বকুমার পরীগণের সাহায্যেই কমলদন্তার সন্ধান পাইয়াছিল এবং তাহাদের সাহায্যেই পুনঃ পুনঃ সকল বিপদ্ হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছিল। কিন্তু দেবরাজের রোষবহ্নি দুঃখ-দুর্দ্দশার সংঘাত আনিয়া তাহার জীবনকে নানা বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়া নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। এই কাব্যের মূল সুর প্রেম-কাহিনীকে অবলম্বন করিয়াই বিস্তার লাভ করিয়াছে—কিন্তু নানাবিধ ঘটনার সমাবেশে তাহা বাস্তব না হইয়া কল্পনারাজ্যের রূপে রঙে রসে মণ্ডিত হইয়াছে। আদিরসের কোথাও প্রকাশ নাই। সহজ সরল গতিতে ঘটনা স্রোতের সহিত কাহিনীর ধারা দেবলোকের শান্তি ও সৌন্দর্য্যের রাজ্যে পরিসমাপ্তি লাভ করিয়াছে।

এই কাব্যে পয়ার, ত্রিপদী, চতুষ্পদী, ললিত মালিকা একাবলী, ইন্দ্রবজ্রা, কুসুমমালিকা, একমালিকা প্রভৃতি ছন্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। কাহিনীর দিক্ দিয়া কাব্যটি পুরাতনপন্থী হইলেও ভাষা বা ছন্দের দিক্ দিয়া চিরাচরিত প্রথা হইতে মুক্ত। উপমা-রূপকাদিতে সংস্কৃত কাব্যের ধরাবাঁধা শব্দগুলি ব্যবহৃত হয় নাই। অত্যন্ত সহজ সরল ঘরোয়া কথায় ক্যব্যটি রচিত হইয়াছে।

গোলবে সেনুয়ার—'গোলবে সেনুয়ার' কাব্যটি দ্বারকানাথ কুণ্ডু কর্ত্তৃক প্রণীত ও ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। পারস্য দেশের একটি কাহিনীর ভাব অবলম্বন করিয়া ইহা রচিত।

কাহিনীতে অনেক অলৌকিক ঘটনা স্থান পাইয়াছে। নিশাচর, পরী, রাক্ষস, সিংহ প্রভৃতি প্রাণিবৃন্দের কার্য্যাবলীতে কাহিনীটি পূর্ণ। ইহারা যেন পাঠককে পার্থিব জগৎ ভুলাইয়া কোন্ কল্পনারাজ্যে লইয়া যায়। তবে

অলৌকিক ঘটনাগুলির মধ্যে সুন্দর সমতা ও যোগসূত্র রক্ষিত হওয়াতে কাব্যটি কোথাও শ্রীভ্রষ্ট হয় নাই।

চীন রাজকুমারী অপূর্ব্ব সুন্দরী। সে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, গোলকন্যা ও সেমুয়ার রাজার কাহিনী যে তাহাকে কহিতে পারিবে তাহাকেই সে পতিত্বে বরণ করিবে। গোল হইল পরীরাজকন্যা, আর সেমুয়ার ওকাফ্ নগরের রাজা। অনেক দুঃখকষ্ট সহ্য করিয়া সেমুয়ার গোলকে লাভ করিয়াছিল। কিন্তু নিশাচরের সহিত তাহার গোপন প্রণয় জানিতে পারিয়া সেমুয়ার তাহাকে কারারুদ্ধ করে এবং নিশাচরকে বধ করে। একটি কুকুর রাজাকে ঐ কার্য্যে সহায়তা করিয়াছিল বলিয়া সে রাজপ্রাসাদে বহু সম্মানের সহিত রক্ষিত হয়। রাজা সেমুয়ার এই ঘটনায় এতদূর মর্ম্মাহত হয় যে তাহার রাজ্যে কেহ গোলের নাম উচ্চারণ করিলে মৃত্যুদণ্ড পায়। এই অবস্থায় চীন রাজকুমারীর প্রশ্নের উত্তর কেহই দিতে পারিল না এবং সকলেই প্রাণ হারাইল। অবশেষে তুর্কস্থানের কনিষ্ঠ রাজপুত্র এল্মাছ বুবক্স চীন রাজকন্যার দাসী দেলারামের নিকট শুনিল রাজকন্যার সিংহাসনের নীচে গর্ত্তে এক নিশাচর ওকাফ্ নগর হইতে আসিয়া অবস্থান করে। রাজপুত্র ওকাফ্ নগরের সন্ধানে বাহির হইল। অজ্ঞাত পথে নানা বিপদ্-আপদ্ আসিতে লাগিল। লতিফাবান-পরী তাহাকে নিজ উদ্যানে মৃগ করিয়া রাখিল। সে মনের দুঃখে প্রাণ বিসর্জ্জনের আশায় একটি সরোবরে ডুব দিলে অপর একটি উদ্যানে পৌছিল এবং সেখানে জামিলা খাতুন পরীর কৃপায় স্বদেহ পাইল। তাহারই সাহায্যে সে আশীহস্ত-পরিমিত শরীরের সিংহ ও গরুড়ের কৃপা লাভ করিয়া ওকাফ্ নগরে পৌছিল। সে স্থানে ফরখ্কালের সহিত বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হইয়া সে রাজ-দরবারে প্রবেশ করিল এবং নিজের বুদ্ধি ও সততার দ্বারা রাজার মন জয় করিয়া সমস্ত বিষয় অবগত হইল। তারপর পূর্ব্ব-পরিচিত পরীগণকে বিবাহ করিয়া চীন রাজকন্যাকে পরাজিত ও বিবাহ করিয়া রাজপুত্র নিশাচরকে বন্ধন করিল এবং স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। সে পিতার নিকট চীন রাজকুমারী এবং নিশাচরের প্রতি দণ্ডবিধান করিবার অনুমতি চাহিল। কিন্তু পিতার আদেশে সে রাজকন্যাকে ক্ষমা করিয়া পত্নীর ন্যায় পালন করিতে লাগিল এবং নিশাচরের প্রাণ সংহার করিল।

কাব্যে স্থানে স্থানে রোমান্টিক পরিবেশ সৃষ্টির চেষ্টা দেখা যায়। তুর্কস্থানের

জ্যেষ্ঠ রাজপুত্র অরণ্যে একটি মৃগের পশ্চাতে ধাবিত হইয়া পথ হারাইয়া লোকজন হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পিপাসা নিবারণের জন্য অনতিদূরে অবস্থিত অট্টালিকায় প্রবেশ করিয়া —

দেখিল দালানে এক আছে সিংহাসন।
কনকে রচিত তাহা অতি সুশোভন॥
তদুপরি অধ্যাসীন এক যোগীবর।
শিরে জটা চারু ছটা বরণ সুন্দর॥
বয়সে প্রাচীন অতি পলিত চিকুর।
লুলিত হয়েছে ত্বক্ জরায় বিধুর॥ —(১২ পৃঃ)

সেখানে চীন রাজকুমারীর সংবাদ শুনিয়া রাজপুত্রের মন বিচলিত হইল। সে দেশে ফিরিল কিন্তু স্বস্তি পাইল না—

কিন্তু রাজসুতা বিনা উচাটন মন। —(২৪ পৃঃ)

গোল-নামক পরীরাজকন্যার বর্ণনা করিয়া কবি লিখিয়াছেন, কন্যা কাঁদিলে—

তাহার নয়ন-নীর মহীতে পড়িতে।
অপরূপ মুক্তা এক জন্মে আচম্বিতে॥ —(১১৯ পৃঃ)

আর সে হাসিলে—

অমনি কুসুম রাজী পড়িল মহীতে॥ —(১১৯ পৃঃ)

কাব্যের নায়ক তুর্কস্থানের কনিষ্ঠ রাজপুত্র বীরত্বে, তেজস্বিতায় ও বুদ্ধিমত্তায় প্রশংসনীয়।' সে অশেষ গুণসম্পন্ন। সকলকে আকৃষ্ট করিবার ক্ষমতা তাহার ছিল। সমস্ত প্রতিকূল অবস্থাকে জয় করিয়া সে স্বকার্য্য সিদ্ধ করিয়াছে। আর চীনদেশের রাজকুমারীর চরিত্রেও বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। তাহার স্বল্প পরিচয়ই আমরা পাই। তবু তাহার প্রতিজ্ঞার কারণ এবং তাহার জন্য উপায় অবলম্বন একটি টাইপ চরিত্রের আভাস দিতে সক্ষম হইয়াছে। শেষ কথা ইহাই বলা চলে, চরিত্রসৃষ্টি অপেক্ষা ঘটনার সংঘাতই কাব্যটিতে প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে এবং ঘটনার স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে কাব্যটি অগ্রসর হইয়াছে। মুসলমানী আবহাওয়াও কাব্যটিতে বৈচিত্র্য আনিতে সমর্থ হইয়াছে।

কাব্যটিতে পয়ার, ত্রিপদী, চৌপদী প্রভৃতি ছন্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। ভাষা সহজ ও সরল। ইহাকে সুখপাঠ্য বলা চলে।

লয়লা-মজনু—'লয়লা-মজনু' কাব্যটি মহেশচন্দ্র মিত্র কর্ত্তৃক রচিত। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ইহা প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহার রচনাকাল সম্বন্ধে কাব্যের শেষে ভণিতায় আছে—

শরে মজি ঋষিদ্বয় পরব্রহ্মে পান।
সেই শকে এ গান হইল সমাধান॥

এই কাব্য রচনায় কবি দ্বারকানাথ রায়ের নিকট হইতে যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছিলেন। কাহিনী-অংশ পারস্যের গ্রন্থ হইতে লওয়া।

রোমান্টিক কাব্যের উপযুক্ত কাহিনী এবং উপযুক্তভাবে তাহার বিন্যাস এই একটিমাত্র কাব্যেই দেখা যায়। প্রেমের গভীরতায়, বিরহের তীব্রতায় এবং অনুভূতির নিবিড়তায় কাব্যটি সত্যই অনবদ্য।

রাজপুত্র মজনু এবং সদাগরকন্যা লয়লার প্রেম-কাহিনী এই কাব্যের বর্ণিত বিষয়। কিন্তু কাব্যে এমন একটি গভীরতা ও নিবিড়তা রহিয়াছে যাহা কাহিনী-অংশকে ছাড়াইয়া পাঠকের মনে অনুরণিত হইতে থাকে। ইহার মধ্যে এমন একটি বেদনাময় চিত্র অঙ্কিত করা হইয়াছে এবং পরিণতিও এমনভাবে আনা হইয়াছে যাহাতে দুঃখবোধের ভিতরও একটা তৃপ্তি ও আনন্দলাভ হয়। দুঃখবোধ হয় উভয়ের বিরহের অবস্থা মনে করিয়া আর আনন্দ হয় উভয়ের আন্তরিকতা, নিষ্ঠা ও ত্যাগ দেখিয়া। উভয়ের মধ্যে প্রেম রহিয়াছে, উন্মত্ততা রহিয়াছে, আবেগ রহিয়াছে, কিন্তু কোথাও কোন দুর্নীতি বা অবৈধতা নাই। মানুষের প্রেমের মধ্যে যেন স্বর্গের দ্যুতি আসিয়া সমস্ত ব্যথা-বেদনাকে সার্থক করিয়া তুলিয়াছে। মজনু-লয়লার সাধনায় সিদ্ধিলাভ যেন দেবতা-আরাধনায় সিদ্ধিলাভের সহিত একই স্তরের। সেখানে প্রেমের সাধনার ভিতর দিয়াই মজনু যেন দেবত্ব লাভ করিয়াছে। মানবীয় প্রেমসাধনার এত মহৎ ও সুন্দর চিত্র যেন আর কোথাও দেখা যায় না। কবি সর্ব্বশেষে লিখিয়াছেন—

তাই বলি প্রেম তো সামান্য ধন নয়।
প্রেম ব্রহ্ম প্রেম ব্রহ্ম প্রেম ব্রহ্ম ময়॥ —(২০২ পৃঃ)

'লয়লা-মজনু' কাব্যের মধ্যে কবির এই আদর্শ যেন সার্থক হইয়া উঠিয়াছে।

শৈশব অবস্থা হইতে লয়লা ও মজনু পরস্পরের প্রতি আসক্ত ছিল। উভয়ে একই বিদ্যালয়ে শিক্ষারম্ভ করে। কিন্তু—

বিদ্যাছলে প্রেমলাভ হইল দোঁহার।
পরস্পর হেরি দোঁহে আনন্দ অপার॥ —(১৮ পৃঃ)

রাত্রের বিচ্ছেদটুকুও তাহাদের সহ্য হইত না। তাই মজনু লয়লাকে কহিল—

লয়ে যাও লেখন আধার বদলিয়ে॥
তোমার নিকটে যাব বদল ভাঙ্গিতে।
নিশিতে মিলিব নিত্য এরূপ ভঙ্গিতে॥ —(১৯ পৃঃ)

মায়ের শাসনে লয়লা গৃহে আবদ্ধ হইলে উভয়ের ভিতর বিরহ জাগিল। লয়লার অবস্থা—

ক্ষণেক ধরায়, লুটায়ে সে কায়,
ক্ষণে ক্ষণে মোহ যায়।
ক্ষণে সচেতন, ক্ষণেকে কম্পন,
দশম দশা বা পায়॥ —(২৭ পৃঃ)

মজনু বিরহের ভিতর দিয়া প্রেম-সাধনা করিবার সঙ্কল্প গ্রহণ করিল। তাহার মনের অবস্থা—

পিরীতি বিষম বিষ কত দেয় জ্বালা।
তথাপি পরেছি গলে তব প্রেমমালা।
প্রেমের ভিকারী আমি হই যে এখন।
তব প্রেমভিক্ষা আশে করিব ভ্রমণ॥ —(৩০ পৃঃ)

তারপর ফকিরের বেশে লয়লার দ্বারে গেলে ভিক্ষা দিবার ছল করিয়া লয়লার আগমন এবং সাক্ষাতের আনন্দ—মজনুর গৃহত্যাগ ও অরণ্যে প্রেম-সাধনা, যোগী কর্ত্তৃক ঔষধ প্রয়োগে উন্মত্ততা-হ্রাস—গৃহে প্রত্যাগমন—রাজা কর্ত্তৃক লয়লার পিতাকে কন্যাদানে সম্মত করান—লয়লার কুকুর দেখিয়া মজনুর উচ্ছ্বাস এবং লয়লার পিতার কন্যাদানে অসম্মতি—মজনুর পুনরায় উন্মত্ততা প্রাপ্তি—লয়লার সহিত অপর যুবরাজের বিবাহ স্থির ও লয়লা কর্ত্তৃক তাহাকে অপমান, মজনুর স্বপ্নদর্শন এবং লয়লার দ্বারে আগমন—বস্ত্র-সাহায্যে লয়লার প্রাসাদ হইতে অবতরণ ও মজনুর সহিত সাক্ষাৎ—দ্বারপালের বাধা দিতে আসিয়া শাস্তিভোগ—কুটনী নিয়োগের ব্যর্থতা—অপর রাজা দ্বারা মজনুকে সান্ত্বনাদান এবং তাহার সহিত বিবাহ দিবার মানসে লয়লাকে আনয়ন—অবশেষে নিজেই লয়লার রূপে মুগ্ধ হইয়া মজনুর জীবননাশের চেষ্টা ও

মৃত্যুপ্রাপ্তি—পিতার সমভিব্যহারে লয়লার গমন ও পথভ্রান্তি এবং মজনুর সহিত সাক্ষাৎ—অবশেষে উভয়ের মৃত্যু—কাব্যে বর্ণিত বিষয়।

কাব্যের স্থানে স্থানে মজনুর সাধনা পার্থিব বন্ধন হইতে মুক্তির সন্ধান দেয়। পিতা তাহাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিবার নিমিত্ত অরণ্য হইতে গৃহে যাইতে বলিলে মজনু কহিল—

শুদ্ধ লয়লার ভাব মনে মনে জাগে।
শুদ্ধ লয়লার প্রেমে সিদ্ধ হব রাগে॥
সেই মোর রাজ্য ধন ভবন বিভব।
সেই মোর ধ্যান জ্ঞান সেই মোর সব॥
সেই মোর গতি মুক্তি ভক্তির কারণ।
সেই মোর শুদ্ধ সত্য ব্রহ্ম সনাতন॥
সেই মোর নিত্যধন আর সব বৃথা।
তারে বিনা কারে আমি চাহিনা গো পিতা॥ —(৪৬ পৃঃ)

লয়লা অরণ্যে পথ হারাইয়া তাহার নিকট উপস্থিত হইলে প্রথমে উভয়ে উভয়কে চিনিতে পারিল না। পরে পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া উভয়ে উভয়কে চিনিলে মজনু লয়লাকে কহিল—

তোমা ভিন্ন কিছু আমি নাহি চাহি আর।
শুদ্ধ হইয়াছি সিদ্ধ প্রেমেতে তোমার॥
... ...
আশা আছে মনে পরকালে তব সহ।
দেখা হবে একত্রেতে রব অহরহ॥ —(১৬৫ পৃঃ)

বাসনা-কামনা-মুক্ত বিশুদ্ধ প্রেমের সাধনা মজনুর জীবনে দুঃখকেও মহান্ করিয়া তুলিয়াছে।

লয়লা অন্তঃপুরবাসিনী। বাহিরের জগৎ তাহার নিকট রুদ্ধ। গৃহের ভিতরেই সে মজনুর বিরহে অধীরতা, ব্যাকুলতা ও বেদনায় কাটাইয়াছে। অন্যান্য রাজা ও রাজপুত্র তাহাকে বিবাহ করিতে আসিয়াছে—কিন্তু লয়লা তাহাদের অপমান করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছে। যখনই মজনু কোন ছদ্মবেশে তাহার গৃহের নিকটে আসিয়াছে তখনই সে কোন না কোন উপায়ে আত্মীয়-পরিজনের দৃষ্টি এড়াইয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছে। অবশেষে অরণ্যের

ভিতর সাক্ষাৎ হইলে মজনু যখন কহিল যে পরজন্মে তাহাদের মিলন হইবে তখন ইহ-জগতের প্রতি যেন তাহার আর কোন আকর্ষণ রহিল না। তাহার বেদনা তীব্রতর হইল।

নিজালয়ে গিয়ে সতী বিষম বিরহে।
ধরিতে না পারে প্রাণ কান্ত ধ্যানে রহে ॥ —(১৬৬ পৃঃ)

ধীরে ধীরে একদিন লয়লা প্রাণত্যাগ করিল এবং তাহার মাতার মুখে সংবাদ পাইয়া মজনুও দেহত্যাগ করিল। দুইটি প্রাণ আপনাদের নিষ্ঠা ও ত্যাগের ভিতর দিয়া প্রেমের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া ইহধাম হইতে বিদায় লইল।

কাব্যটিতে অলৌকিকত্ব বিশেষ স্থান পায় নাই। কেবল দ্বারপাল মজনুকে প্রহার করিতে হস্ত উত্তোলন করিলে, তাহার আর না নামা এবং অবশেষে মজনুর নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিলে কায়েসের দয়ায় তাহার পূর্ব্বাবস্থা-প্রাপ্তি— একটি অলৌকিক ঘটনা। আবার যোগীর ঔষধে মজনুর উন্মত্ততা হ্রাস হইবার ব্যাপারটিও একটু অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়।

কাব্যটির ভাষা ও ছন্দের মধ্যে নূতনত্ব কিছু নাই। সম্পূর্ণ কাব্যটিই পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে রচিত। ভাষা সহজ সরল ও জড়তামুক্ত।

প্রমোদকামিনী-কাব্য—'প্রমোদকামিনী'-কাব্যটি আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক রচিত এবং ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত। কাব্যের প্রথমে 'বিজ্ঞাপন' শিরোনামায় কবি লিখিয়াছেন—

"আলিবর গোল্ডস্মিথ' সাহেবের হারমিট নামক উৎকৃষ্ট কবিতা অবলম্বন করিয়া এই প্রমোদকামিনী কাব্য রচিত হইল। বিশুদ্ধ প্রণয় বর্ণন এবং স্ত্রীলোকের স্বভাব প্রকটন এই গ্রন্থের মুখ্য উদ্দেশ্য।"

এই কাব্যে একটি বালিকা-হৃদয়ের প্রণয়, ক্রোধ, বিরহ এবং অবশেষে পতি-অন্বেষণে পুরুষবেশে ভ্রমণ ও পতিলাভ বর্ণিত হইয়াছে।

বালিকা প্রমোদকামিনী এক বণিকের কন্যা। নয় বৎসর বয়সে তাহার বিবাহ হয়। তারপর হইতে সে ও ললিত একত্রে খেলিত, বেড়াইত, পড়াশুনা করিত, মালা গাঁথিত এবং মান-অভিমানও করিত। ললিত বালিকাকে অত্যন্ত ভালবাসিত এবং তাহা প্রকাশও করিত। প্রমোদকামিনী কিন্তু মনে মনে তাহাকে ভালবাসিত ও বাহিরে কটুকথা কহিত এবং অপমান করিত। ললিত একদিন অপমান সহ্য করিতে না পারিয়া 'নিশ্চয় মরিব' বলিয়া গৃহত্যাগ

করিল এবং আর ফিরিল না। বালিকা-হৃদয়ে বিরহ জাগিল। বিরহ অসহ্য হইলে স্বামীকে অন্বেষণের নিমিত্ত সে একদিন গৃহত্যাগ করিল। ছয় মাস সে নানাস্থানে ঘুরিয়া কোথাও স্বামীর সাক্ষাৎ না পাইয়া হরিদ্বারে উপস্থিত হইল। সেখানে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনীভূত হইলে এবং বরফ পড়িতে আরম্ভ করিলে সে যখন আশ্রয় খুঁজিতেছিল সেই সময় সন্ন্যাসিবেশী ললিত তাহাকে আশ্রয় দিল। ললিত কিন্তু ছদ্মবেশের আবরণে রমণীরূপ বুঝিতে পারিল। নানাবিধ প্রশ্নের পর বালিকা নিজ পরিচয় এবং অন্বেষণের ব্যর্থতা কহিয়া প্রাণত্যাগের বাসনা প্রকাশ করিলে ললিত নিজ পরিচয় দেয় এবং উভয়ে আনন্দে মগ্ন হয়।

কাব্যের প্রথমে সূর্য্যাস্তের পর প্রকৃতির বর্ণনা করিয়া কবি দেখাইয়াছেন একটি বালিকা সরোবর-সোপানে বসিয়া মুদিত নলিনীকে সম্বোধন করিয়া নিজ মনোবেদনা ব্যক্ত করিতেছে—

কি হয়েছে সরোজিনী ?
আহা কি হয়েছে সরোজিনী লো ?
কোথা সে প্রফুল্ল সাজ ?
ছল ছল আঁখি আজ
বিরস অবনি মাঝে যেন অনাথিনী লো! —(২ পৃঃ)

ঘোটকের পৃষ্ঠে স্বামীর অন্বেষণে বহির্গত বালিকার গতিটিকে কবি সুন্দর-ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন—

মনোগতি ছুটে অশ্ব দুলিছে কামিনী,
যথা সরোবর কোলে,
মৃদু মলয় হিল্লোলে,
দোলেরে সুখের কোলে নবীনা নলিনী! — (২৪ পৃঃ)

তারপর উভয়ের মিলন হইলে—

ফুটিল আনন্দ-ফুল মানস-কাননে! —(৪১ পৃঃ)

ইহাতে হাইফেন দ্বারা শব্দ-দ্বয়ের সংযোগসাধন করিয়া রূপকের ভাব ব্যক্ত করিতে দেখা যায়। নিসর্গ-বর্ণনায়ও ব্যক্তি-নিরপেক্ষ প্রকৃতির শোভা খানিকটা দেখিতে পাওয়া যায়; যথা—

ফুটেছে কামিনী ফুল! সুবাসে ভুলিয়া
স্নিগ্ধময়ী তটিনীর প্রণয় পিপাসা

পরিহরি, সুধামাখা সমীরণ সদা
ভ্রমিছে নিকুঞ্জবনে। ফুটেছে কুসুম
মাঝে মাঝে রমণীর সাজে ; কেহ লাজে
আধো বিকশিত—কেহ হাসি হাসি মুখে,
ভুবনমোহনরূপ ভুবনমোহন
পরিমল সহ সুখে পেতেছে প্রেমের
ফাঁদ ! —(৩ পৃঃ)

কাব্যটিতে তিনটি ভাগ আছে, তবে কোন সর্গবিভাগ নাই। প্রথমে বালিকার বিরহ এবং কুমুদিনীর নিকট তাহার প্রকাশ—স্থান পাইয়াছে। দ্বিতীয় বিভাগে, কক্ষ-বাতায়নে বসিয়া বালিকার নৈশ শোভা দর্শন এবং সে নিদ্রাভিভূত হইলে তাহার নিদ্রিত সৌন্দর্য্য বর্ণিত হইয়াছে। তৃতীয় বিভাগে, তাহার পতি-অন্বেষণে গৃহত্যাগ ও পতির সহিত সাক্ষাৎ চিত্রিত হইয়াছে। ইহাতে বর্ণনাভঙ্গি সুন্দর এবং একটু নূতনত্বও দৃষ্ট হয়। প্রথমে নলিনীর নিকট নিজ মনোভাব ব্যক্ত করিয়া বালিকা তাহার বিরহ প্রকাশ করে। পরের সমস্ত অংশ কবির দ্বারা বর্ণিত। ইহা দ্বারা কাব্যটিতে বৈচিত্র্য আসিয়াছে। ছন্দ পরিবর্ত্তন দ্বারাও এই বৈচিত্র্য সংসাধিত হইয়াছে। ছন্দের ভিতর প্রথম পঙ্‌ক্তির সহিত দুই-একটি শব্দ যোজনা করিয়া পুনরাবৃত্তি দ্বারা দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তি রচনা, একটা নূতন গতি ও সুষমা সৃষ্টি করিয়াছে ; যেমন—

দিনমণি প্রাণ প্রিয়া—
তুমি দিনমণি প্রাণ প্রিয়া লো ! —(৫ পৃঃ)

কাব্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দ, নয় পঙ্‌ক্তির স্তবক এবং তাহার অন্তে ক খ গ গ ঘ ঘ খ খ রূপে মিল, এবং চার পঙ্‌ক্তির স্তবক ও তাহার অন্তে ক খ খ ক রূপে মিল দেখা যায়। ইহাতে ইংরাজী সাহিত্যের প্রভাব অনুভূত হয়। ভাষাও সাবলীল এবং জড়তামুক্ত। কাব্যটিতে নূতন ছন্দে ও ভাবে কাহিনীর প্রকাশ প্রশংসনীয়। কাহিনী-কাব্যের মানদণ্ডে বিচার করিলে কাব্যটিকে ত্রুটিপূর্ণই বলা চলে।

জম্বালিনী—'জম্বালিনী'-কাব্যটি যাদবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক রচিত হইয়া ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। কবি বিজ্ঞাপনে লিখিয়াছেন—

"অধুনা বাঙ্গালা ভাষায় নভেল্ অর্থাৎ ইংরাজী ধরণের পুস্তক অনেক

প্রকাশিত হইতেছে তাবৎগুলিই গদ্যে উক্ত রীতির একখানি গ্রন্থ পদ্যে প্রকাশ করণাশয়ে জম্বালিনী নাম দিয়া এই পুস্তকখানি লিখিলাম ইহা কোন পুস্তক হইতে ভাব সংগৃহীত বা অনুবাদিত নহে।"

কাব্যটির উপর বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব পড়িয়াছে বলিয়া মনে হয়। প্রথমেই লক্ষণীয়, কাব্যের ভিতর কোন সর্গবিভাগ নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের অনুকরণে প্রত্যেক বিভাগের প্রথমে বর্ণিত অংশের দ্যোতকরূপে দুই-একটি শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়; যেমন—কাননকুটিরে, পরিচয়ে, দাস সঙ্গমে, রণসঙ্কুলে এবং কারাকেতনে।

কাব্যের প্রারম্ভেও বঙ্কিমচন্দ্রের অনুকরণ লক্ষিত হয়। চন্দ্রোদয়ের পূর্ব্বে একটি যুবককে অশ্বে আরোহণ করিয়া উদয়পুরাভিমুখে যাইতে দেখা গেল। সারারাত্রি চলিয়া প্রাতঃকালে অরণ্যের মধ্যে একটি কুটীর দেখিয়া ভূরাটের রাজপুত্র সুরেশ তাহার দ্বারদেশে গিয়া আশ্রয় চাহিলে একটি যুবতী বাহিরে আসিল ও তাহাকে সাদরে গৃহে আহ্বান জানাইল। যুবতীর সম্বন্ধে কবি লিখিয়াছেন—

জ্ঞান হইবার পরে, ইতি পূর্ব্বে অন্য নরে,
হেরে নাই যদিও যুবতী।
তথাপি মাতার স্থানে, নানাবিধ উপাখ্যানে,
জানা ছিল মানবমূরতি॥ —(৭ পৃঃ)

অপরিচিত লোকের সাক্ষাতেও তাই যুবতীর মনে সঙ্কোচ দেখা গেল না। যথাযোগ্য সম্মানের সহিত সে অতিথির যত্ন করিল। সুরেশ তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল—

শুনিতে আমার যদি থাকে অধিকার।
বলিতে আপত্তি যদি না থাকে তোমার॥
বলিলে যদ্যপি নাহি হয় ক্ষতিবোধ।
সে কথায় যদি মম চলে অনুরোধ॥
অনুরোধ করি তবে বল বিশেষিয়া।
শুনিয়া হউক তুষ্ট কৌতূহল হিয়া॥ —(৮-৯ পৃঃ)

পরিচয় জিজ্ঞাসার ভিতর অনেক 'যদি' আসিয়া পড়িয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী কাব্যগুলিতে এই ভাব দৃষ্ট হয় না।

যুবতীর উত্তরে আমরা জানিতে পারি,—দ্বারিকা-নগরে বীরেন্দ্রকেশরীর রাজত্বকালে তাহার পিতা সেনাপতি ছিলেন। গুর্জ্জর-দেশের সহিত যুদ্ধে তিনি বন্দী হন ও অরণ্যে নির্ব্বাসিত হন। তারপর তাঁহার মৃত্যু ঘটে। তাহার মাতা অসুস্থ এবং পার্শ্ববর্ত্তী গৃহে অবস্থান করিতেছেন। সুরেশ তাহার মাতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে বৃদ্ধা সুরেশের পরিচয় শুনিয়া চমকিত হইলেন এবং দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। তাঁহার ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া সুরেশ কারণ জানিতে চাহিলে তিনি তাহা ব্যক্ত করিলেন না। কন্যাকে উপদেশ দিলেন যেন রাজকুমারকে সে যথাসাধ্য আদর-যত্ন করে।

পরদিন প্রত্যুষে সুরেশ বিদায় লইয়া চলিয়া গেল। এতক্ষণের মধ্যে সুরেশের বা যুবতীর মনে কোনরূপ ভাববৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয় নাই। কিন্তু যাইবার কালে উভয়ের মনেই বেদনা জাগিল। এই মনোভাবটুকু ব্যক্ত করিয়া কবি হয়তো ভবিষ্যৎ ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন।

ঘোটকের পুচ্ছদেশ, অদৃশ্য হইল শেষ,
সরলার সুখের সহিত ॥
... ...
সরলার কথাগুলি, হৃদয়ের দ্বার খুলি,
করিতে লাগিল গমাগম ॥

পথিমধ্যে এক ভৃত্যের সহিত সুরেশের সাক্ষাৎ হইল এবং তাহাদের কথোপকথনে বোঝা যায় উদয়পুরের রাজার সহিত তাহাদের যুদ্ধ আসন্ন। তাহার পর যুদ্ধক্ষেত্রের ভয়াবহতার মাঝখানে যুবরাজকে অপর পক্ষের সৈন্য-দলের মধ্যে যোদ্ধবেশে সজ্জিত একটি রমণীর প্রতি বদ্ধদৃষ্টিতে দণ্ডায়মান দেখা যায়।—

ধনুকের গুণ সহ সুরেশের মন।
অই দেখ কামিনী করিল আকর্ষণ ॥

যুদ্ধে পরাজিত হইয়া সুরেশ কারাগারে আবদ্ধ হইল। কারাগৃহের বর্ণনা—

অতি ক্ষুদ্রাকার, একমাত্র দ্বার
ছিল সেই কারাপুরে।
তিমির নাশক, একটি জালক,
উত্তর ভিত্তির উরে ॥

ইহার পূর্ব্বে আর কোন কাব্যে কারাগৃহের বর্ণনা পাওয়া যায় নাই। হয়তো ইহা ইংরাজী সাহিত্যের প্রভাবে কাব্যে স্থান পাইয়াছে। একসময়ে সেই কারাগৃহের বাতায়নে একটি রমণীমূর্ত্তি আসিয়া সুরেশকে কুশলপ্রশ্ন করিলে সুরেশ তাহার পরিচয় জানিতে চাহিল। তখন রমণী নিজ পরিচয় দিল যে সে সেনাপতির কন্যা জম্বালিনীর দাসী, প্রভুকন্যার আদেশে তাহার সংবাদ লইতে আসিয়াছে এবং প্রভুকন্যা তাহার মুক্তির জন্য চেষ্টিত।*

ইহাতে পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। ভাষা স্থানে স্থানে দুরূহ এবং নূতন শব্দের প্রয়োগও দেখা যায়; যেমন—জাঘনীদ্বয়, আঘাতী, স্বামিজ সুখের, আননিক, নির্ব্বারি, আজারো, ঘাতজ প্রভৃতি। এই শব্দগুলির ব্যবহারে ভাষা যেন অনেকখানি আড়ষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। কাহিনীতেও বর্ণনা-বাহুল্যের জন্য গতি ব্যাহত। কাব্যটিকে সার্থক রচনা বলা চলে না।

* পুস্তকের শেষ অংশ না পাওয়ায় কাহিনীর সম্পূর্ণ রূপটি দেওয়া গেল না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

গাথা বা নবীন রোমান্টিক কাব্য ও কবিতা

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে রচিত নবীন রোমান্টিক বা গাথা-কাব্য যাহা পাওয়া যায় তাহাকে দুই ভাগে ভাগ করা চলে; যথা—(১) গাথা-কাব্য (২) অন্তর্ভাবিত রূপক গাথা-জাতীয় কাব্য। ইহা ছাড়াও কতকগুলি গাথা-কবিতা পাওয়া যায়।

গাথা-কাব্যের মধ্যে আমরা পাইতেছি—অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী রচিত 'উদাসিনী' (১৮৭৪), রবীন্দ্রনাথের 'কবিকাহিনী' (১৮৭৮) ও 'বনফুল' (১৮৮০), এবং ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'যোগেশ' (১৮৮১)।

এই কাব্যগুলির মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গির নূতনত্ব এবং রচনারীতির অভিনবত্ব প্রথমেই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। নায়ক-নায়িকা নির্ব্বাচনে ইহারা পুরাতন পথ বর্জ্জন করিয়া নূতন পরিবেশের এবং নূতন ভাবের নরনারীকে গ্রহণ করিয়াছে। এই নরনারীগণও সাধারণ হইতে দূরে অবস্থিত—তথাপি ঐশ্বর্য্যের বা আভিজাত্যের জাঁকজমক তাহাদের বেষ্টন করিয়া নাই, ভাবের দিক্ দিয়া, জ্ঞানের দিক্ দিয়া এবং প্রাণচাঞ্চল্যের দিক্ দিয়া তাহাদের মধ্যে অসাধারণত্বের বিকাশ হইয়াছে। এই-সকল কাব্যে প্রকৃতি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছে। মানব-মনে প্রকৃতির প্রভাব কিভাবে কার্য্যকরী হয় এবং মানুষকে মহত্তর সত্যের সন্ধানে ব্যাকুল করিয়া তুলে এই কাব্যগুলির মধ্যে মাঝে মাঝে তাহারও সন্ধান পাওয়া যায়। রচনার দিক্ দিয়াও ইহারা গতানুগতিক পথ বর্জন করিয়াছে,—অলঙ্কারের বাহুল্য নাই বা অনুপ্রাসের আতিশয্য নাই। এগুলিতে ভাব মুক্তপক্ষ বিহঙ্গমের ন্যায় আপন পক্ষ সঞ্চালন করিয়া রসসৃষ্টি করিয়াছে এবং কাব্যগুলিকে জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছে। সেইজন্য ভাষা হইয়াছে সহজ, ছন্দ হইয়াছে আবেগময় এবং কাব্য হইয়াছে ভাব সমৃদ্ধ। কোথাও জটিলতা নাই—দুরূহতা নাই—প্রাণোচ্ছ্বাসে ও অনুভূতির রঙে সবগুলিই পূর্ণ। কবি নিরপেক্ষ থাকিলেও তাঁহার কবি-মানসের ভাবানুভূতির স্পর্শ ইহাদের মধ্যে পাওয়া যায়—চিন্তাধারার সন্ধান পাওয়া

যায়—প্রাণস্পন্দন অনুভব করা যায়। সবচেয়ে বড় কথা, এই-সকল কাব্যের ভাবানুভূতি পাঠকচিত্তে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া রস-সঞ্চার করিতে সমর্থ। পূর্ব্ববর্ত্তী কাব্যগুলির মধ্যে আমরা ভাব-ভাষা-ছন্দ সবই পাই কিন্তু এই রস-সঞ্চারিণী শক্তির প্রকাশ দেখিতে পাই না; উহা যেন বুদ্ধি দ্বারা অনুভব করিতে হয়। কিন্তু এই গাথা-কাব্যগুলি পাঠকের অলক্ষ্যেই তাহার মনকে আলোড়িত করিতে থাকে। অন্যান্য কাব্য হইতে এখানেই ইহাদের বিশেষত্ব।

অন্তর্ভাবিত রূপক গাথা-জাতীয় কাব্যের মধ্যে আমরা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'স্বপ্নপ্রয়াণ' (১৮৭৫) এবং শিবনাথ শাস্ত্রী রচিত 'ছায়াময়ী-পরিণয়' (১৮৮৯) কাব্য দুইটি পাই।

জীবনের গভীর সত্যকে ইহারা রূপকের মধ্য দিয়া প্রকাশ করিয়াছে। আপাতদৃষ্টিতে নায়ক-নায়িকা খুব দূরের লোক নয়। প্রেমের পথের রোমান্টিকতা কাব্যগুলিকে সরস করিয়া তুলিয়াছে। প্রণয়-সঞ্চার ও প্রণয়ীর জন্য ব্যাকুলতা এবং তাহারই নিমিত্ত নানাবিধ দুঃখকষ্ট-ভোগের পর মিলন, কাব্যগুলিকে সুখপাঠ্য করিয়াছে। কিন্তু অন্যান্য কাব্যগুলি হইতে ইহাদের পার্থক্য ভাব-গভীরতায়। ছদ্মবেশের আবরণ ভেদ করিয়া সত্যের বিমল জ্যোতি কাব্যগুলিকে পৃথক্ মর্য্যাদা দান করিয়াছে। দর্শন-শাস্ত্রের গভীর তত্ত্ব ইহাদের মধ্য দিয়া জনসাধারণের নিকট আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। পূর্ব্বের আধ্যাত্মিক বা ধর্ম্মতত্ত্বসমন্বিত কাব্যগুলির ভাব, ভাষা এমন জটিল ও দুরূহ থাকিত যে জনসাধারণ তাহার মর্ম্মগ্রহণ করিতে পারিত না। অনেক সময় ভাষার কাঠিন্য ও বিষয়বস্তুর গুরুত্ব কাব্যপাঠ হইতে চিত্তকে বিরত করিত। এই কাব্যগুলির মধ্যে সেই কষ্টের অবসান হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে ভাব-ভাষা-ছন্দ সবই সহজ। সত্যের সহজ আবেদনে মানুষের হৃদয়কে ইহারা সহজেই আকৃষ্ট করে এবং ছন্দ-ঝঙ্কারে অভিভূত করে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে লেখকগণের দৃষ্টি যে জনসাধারণের প্রতি পড়িয়াছিল ইহারা তাহারই নিদর্শন। কারণ সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ-বেদনাবোধকে ইহারা রূপ দান করিয়াছে।

এই সময় যে-সকল গাথা-কবিতা আত্মপ্রকাশ করে তাহাও এ যুগের বিশেষ সৃষ্টি। এতদিন আমরা মহাকাব্য পাইয়াছি, খণ্ডকাব্য পাইয়াছি,

ব্যঙ্গকাব্য পাইয়াছি, কিন্তু ক্ষুদ্র আয়তনের মধ্যে ঘটনাবিশেষকে কেন্দ্র করিয়া কাহিনীর প্রকাশ নূতন উদ্যমের সূচনা করিল।

পূর্ব্বে যে-সকল গাথা-কবিতা ছিল সেগুলি তখনও মুদ্রিত হয় নাই এবং লেখকগণ তখনও সে সম্বন্ধে জ্ঞাত ছিলেন না। মনে হয়, এই গাথা-কবিতাগুলি ইংরাজী সাহিত্যের প্রভাব-সঞ্জাত। এই সময় রচিত কবিতা পাওয়া যায়—বঙ্কিমচন্দ্রের 'ললিতা' (১৮৫৬), রবীন্দ্রনাথের 'প্রতিশোধ' (১৮৭৮), 'অপ্সরা-প্রেম' (১৮৭৮), 'ভগ্নতরী' (১৮৭৯), স্বর্ণকুমারী দেবীর 'খড়্গ-পরিণয়' (১৮৮০), 'সাশ্রু সম্প্রদান' (১৮৮০), 'সাধের ভাসান' (১৮৮০), 'অভাগিনী' (১৮৮০), এবং সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের 'সুরমা' (১৮৯৫)।

বঙ্কিমচন্দ্রের কবিতায় রোমাণ্টিক পরিবেশ ও বিষয়বস্তুর মধ্যে অভিনবত্ব আনিবার চেষ্টা দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথের কবিতাগুলিতে তাঁহার রচনার বৈশিষ্ট্যটুকু পরিস্ফুট। ক্ষুদ্র ঘটনার সহজ প্রকাশের মধ্যে গভীর তথ্যের প্রতি ইঙ্গিত কবিতাগুলিকে ভাব-সমৃদ্ধ করিয়াছে। স্বর্ণকুমারী দেবীর রচিত কবিতাগুলিতে গাথা-কবিতার উপযুক্ত সহজ ভাব ও সহজ ভাষা দৃষ্ট হয়। সমস্যা আছে, জটিলতা আছে কিন্তু সহজ গতিতে তাহাদের সহজ মীমাংসা হইয়া ঘটনার পরিসমাপ্তি আনয়ন করে—সত্যের প্রকাশ রহিয়াছে কিন্তু গভীর তত্ত্বব্যাখ্যার প্রয়াস নাই—কাহিনী-অংশের অতিরিক্ত কোন ভাব-ব্যঞ্জনা নাই।

এই গাথাকাব্য ও কবিতাগুলি উনবিংশ শতাব্দীর আখ্যায়িকা-কাব্যের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। কবিবর হেমচন্দ্রের মহাকাব্যে যে উপন্যাস-সুলভ ঘটনাবিন্যাস দেখা যায় তাহারই ক্ষুদ্র আকারে উচ্ছ্বাসময় প্রকাশ এই-সকল গাথাকাব্যে দৃষ্ট হয়। বিহারীলালের 'বঙ্গসুন্দরী'তে (১৮৮৩) যাহা গাথাকাব্যের আকারে ও প্রকারে রচিত হইবার প্রয়াস থাকা সত্ত্বেও গীতিকাব্যপ্রধান হইয়া উঠিয়াছে তাহার মধ্য দিয়াই পরবর্ত্তী কালের গীতিকাব্যের সূচনা।

এই গাথা-কবিতার ক্রম-পরিণতিতে একদিকে আমরা গীতিকাব্যগুলিকে পাই—অপরদিকে পাই রবীন্দ্রনাথের 'কথা ও কাহিনী'র কবিতাগুলি এবং 'বিদায় অভিশাপ' প্রভৃতি।

(১)

উদাসিনী—অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী রচিত 'উদাসিনী'-কাব্যটি ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। কাব্যটি সে যুগে বেশ সমাদর লাভ করিয়াছিল। লেখক সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—

"আনন্দ উপভোগ করিবার শক্তি ইঁহার অসামান্য উদার ছিল। প্রাণ ভরিয়া রসগ্রহণ করিতে ইঁহার কোনো বাধা ছিল না এবং মন খুলিয়া গুণগান করিবার বেলায় ইনি কার্পণ্য করিতে জানিতেন না। গান এবং খণ্ডকাব্য লিখিতেও ইঁহার ক্ষিপ্রতা অসামান্য ছিল। অথচ নিজের এই সকল রচনা সম্বন্ধে তাঁহার লেশমাত্র মমত্ব ছিল না। কত ছিন্নপত্রে তাঁহার কত পেন্সিলের লেখা ছড়াছড়ি যাইত, সেদিকে খেয়ালও করিতেন না। রচনা সম্বন্ধে তাঁহার ক্ষমতার যেমন প্রাচুর্য তেমনি ঔদাসীন্য ছিল। উদাসিনী নামে ইঁহার একখানি কাব্য তখনকার বঙ্গদর্শনে যথেষ্ট প্রশংসা লাভ করিয়াছিল। ইঁহার অনেক গান লোককে গাহিতে শুনিয়াছি, কে যে তাহার রচয়িতা তাহা কেহ জানেও না।" —(জীবনস্মৃতি, ১৩৫০ সং, ৭৯ পৃঃ)

'উদাসিনী'-কাব্যটি চিরাচরিত প্রথা বজ্জিত। কোন দেবদেবীর বন্দনা নাই। ইহাতে কবির নিজস্ব ভাব, ভাষা, ভঙ্গি সুস্পষ্ট ও আবেগ-সমৃদ্ধ। কাহিনীর প্রায় শেষ দৃশ্য হইতে কাব্যটির আরম্ভ এবং তাহাতে কাহিনী কৌতূহল সঞ্চার করিতে সক্ষম হইয়াছে।

কাব্যের প্রথমেই একটি রোমাণ্টিক পরিবেশ সৃষ্ট হইয়াছে। দিগন্তব্যাপী অরণ্য—অমাবস্যার জমাটবাঁধা অন্ধকার—আকাশে নিবিড় কালো মেঘ—চারিদিক্ নিশ্চল—মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাইয়া পথিককে বিভ্রান্ত করিতেছে। এই পরিবেশে এক পথিক রমণীকণ্ঠের ক্রন্দনধ্বনি শুনিল এবং তাহার আহ্বানে বনদেবীর আবির্ভাবে অরণ্যভূমি আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। এই বনদেবীর আবির্ভাব কাব্যের বাস্তবতাকে ক্ষুণ্ন করিয়াছে। বনদেবীর সহিত পথিক অগ্রসর হইয়া—

'প্রচণ্ড পাবক শিখা হেরিল বিস্ময়ে।'

যাহা অজানার রহস্যে আবৃত থাকিয়া কৌতূহলের সৃষ্টি করিতেছিল তাহা ক্রমে ক্রমে আপনার আবরণ উন্মোচন করিয়া কাব্যটিকে রসঘন করিয়া

তুলিয়াছে। বনদেবীর প্রশ্নের উত্তরে রমণী নিজ জীবন-কাহিনী বিবৃত করিল। এই পরিচয়ের মধ্যেও একটি নূতন সুর ও নূতন পরিবেশ দেখা যায়। রমণী নিজ পরিচয় দিল—

কষ্টে স্বষ্টে দিন যায়, ভিক্ষান্ন জীবিকা তায়,
পরিধেয় পরিত্যক্ত চীর পরিধান। —(৯ পৃঃ)

সরলা ভিক্ষান্ন দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিত—দারিদ্র্যের দুঃখকষ্ট তাহাকে সহ্য করিতে হইয়াছিল। অপরাপর কাব্যের নায়িকার ন্যায় সে রাজপ্রাসাদের অধিবাসী নয়, প্রাচুর্য্য তাহার ছিল না—শুধু ছিল পিতৃস্নেহ—তাহাও অদৃষ্টে সহিল না।

সুরেন্দ্রের সহিত তাহার প্রণয়-ব্যাপারেও বেশ একটি সংযত প্রকাশ দৃষ্ট হয়। কোথাও আতিশয্য বা অহেতুক উচ্ছ্বাস নাই। গঙ্গার জলে ভাসিয়া যাইবার কালে সুরেন্দ্র তাহাকে রক্ষা করে। সরলা জ্ঞান ফিরিয়া সুরেন্দ্রকে দেখিয়া—

সরমে মুদিনু আঁখি, আবার চাহিয়ে থাকি,
আবার সরমে আঁখি করিনু মুদিত। —(১১ পৃঃ)

নারী-হৃদয়ের প্রেমের প্রথম প্রকাশ লজ্জায়, আর সুরেন্দ্রের হৃদয়ের প্রকাশ সমবেদনায় ও দরদে। সুরেন্দ্র তাহাকে অত্যন্ত যত্নের সহিত গৃহে পৌঁছাইয়া দিল।

বিপদের মাঝে যে পরিচয় তাহা ঘনিষ্ঠ হইতে সময় লাগে না—অনেক ক্ষেত্রে মানুষ অভাবনীয়ভাবে নিকটে আসিয়া যায়। প্রেমের পরিস্ফুরণ হওয়াও সে ক্ষেত্রে বিচিত্র নয়। কবি নায়ক-নায়িকার প্রণয়-ব্যাপারে সেই পন্থাই অবলম্বন করিয়াছেন। কিন্তু সরলার নদীর জলে ভাসিয়া যাওয়ার ব্যাপারটি অসম্ভব এবং ঘটনা-বিন্যাসের নিমিত্ত জোর করিয়া আনা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। এইস্থানে কাব্যরস কিছুটা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে।

পুনরায় পিতার মৃত্যুর পর অচৈতন্য সরলা চেতনা লাভ করিয়া সুরেন্দ্রের ক্রোড়ে মাথা রক্ষিত আছে দেখিল। সুরেন্দ্র অসহায়া বালিকাকে সান্ত্বনা দিয়া কহিল—

সুন্দরি সুস্থিরা হও, তোমার সুরেন্দ্রে লও,
এই যে সুরেন্দ্র তব ভাবনা কি আর। —(১৭ পৃঃ)

সরলা এই আশ্বাস-বাক্যে যেমন সান্ত্বনা পাইল তেমনি সাহসও পাইল। সে তাহার অঙ্গে শিহরণ অনুভব করিল—

জানি না যে কি সাহসে, কি ভাবের পরবশে,
অপূর্ব্ব আশ্বাসে যেন অঙ্গ শিহরিল। —(১৭ পৃঃ)

তারপর অনেকদিন উভয়ের দেখা হয় নাই। প্রেমের স্রোত অন্তঃসলিলা ফল্গুর ন্যায় তলদেশ পর্য্যন্ত প্লাবিত করিয়া বহিতে লাগিল। রাজা সুপ্রকাশের গৃহে আদর-যত্নে থাকিয়াও সরলার অবস্থা—

দেহে যে শোণিত বয়, তাও গো সুরেন্দ্রময়,
প্রাণ গাঁথা সুরেন্দ্র সহিত ॥
ঘোর ভালবাসা ফাঁদে, পড়িয়ে পরাণ কাঁদে,
হুতাশে সঘনে কাঁপে কায়। —(২৩ পৃঃ)

একদিন মধ্যরাত্রে রাজবাটীর ক্রীড়া-উদ্যানে একাকিনী আসীন সরলার নিকট অতর্কিতভাবে যখন সুরেন্দ্র উপস্থিত হইল তখন সরলা প্রথমে চমকিত ও ভীত হইয়াছিল। তারপরে সুরেন্দ্রের কণ্ঠস্বরে তাহাকে চিনিতে পারিয়া—

সোহাগের অভিমানে, ম্রিয়মাণ কায় প্রাণে,
রহিলাম পুত্তলিকা প্রায়। —(৩৩ পৃঃ)

সুরেন্দ্রও তখন বেশী কথা বলিতে পারিল না—শুধু একটি কথার ভিতর দিয়া তাহার প্রাণের অনন্ত ব্যাকুলতা প্রকাশ পাইয়াছে—'সরলে কি ত্যজিলে আমায় ?' —(৩৩ পৃঃ)

প্রেমের আবেদন নাই, নিবেদন নাই। এতদিনের অদর্শনের মধ্যে মদনদেব সকলের অলক্ষ্যে তাঁহার কাজ সমাপ্ত করিয়াছেন। হৃদয় যখন কানায় কানায় পূর্ণ থাকে তখন প্রকাশের প্রয়োজন অনুভূত হয় না। তাই বহুদিন পরে সাক্ষাৎলাভের মধ্যে প্রেমিক-হৃদয় হইতে ব্যাকুলতাই প্রকাশ পাইয়াছে এবং একটি কথার মধ্যে অনেক না-বলা কথাও যেন ধ্বনিত হইয়াছে। এইরূপ ছোট ছোট কথার মধ্য দিয়া কবি মানব-হৃদয়ভাবকে অঙ্কিত করিয়া তাঁহার লিপিকুশলতার পরিচয় দিয়াছেন।

প্রভাতের ঘণ্টা ধ্বনিত হইলে সুরেন্দ্র বিদায় লইয়া চলিয়া গেল আর তাহাকে বিদায় দিয়া ব্যথায় ম্রিয়মাণ হইয়া সরলা দাঁড়াইয়া রহিল। খানিকক্ষণ

পরে গৃহে ফিরিয়া সে নিদ্রাভিভূত হইল ও দুঃস্বপ্ন দেখিল। এই স্বপ্নের ভিতর দিয়া তাহার ভবিষ্যৎ অদৃষ্টের যেন আভাস পাওয়া যায়। প্রথমে দুঃখ-কষ্ট-বিপদ্ এবং পরে নন্দন-উদ্যানের শোভা ও আনন্দ।

নিদ্রাভঙ্গে সুলক্ষণার মুখে তাহার মাতৃদত্ত অঙ্গুরী পরিহিত এক ব্যক্তি রাজবাটীতে ধৃত হইয়াছে এবং বধ্যভূমিতে নীত হইতেছে শুনিয়া সরলার বুঝিতে বাকী রহিল না যে ঐ ধৃত ব্যক্তি সুরেন্দ্র। তাহার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। সে ছুটিল—মশানের পথ শেষ হয় না। অবশেষে যুবরাজের নিকট নিজের মৃত্যু স্বাক্ষর করিয়া সে সুরেন্দ্রকে বাঁচাইল। যুবরাজ সুযোগ বুঝিয়া তাহাকে দিয়া প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইল—

বাঁধিবে আমারে তুমি বিবাহ বন্ধনে,
বসিবে আমার সনে রাজসিংহাসনে।

ত্যাগের মহিমায় প্রেম উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

যুবরাজের সহিত তাহার বিবাহের উৎসবে সরলার নিকট সব বিষময় বোধ হইল। সে ব্যথা-জর্জ্জরিত-হৃদয়ে ক্রীড়া-উদ্যানে গিয়া অশোক-বৃক্ষে সুরেন্দ্র-লিখিত বিদায়-গাথা দেখিতে পাইল—

যাই তবে প্রেয়সি রে! জন্মের মতন,
অবাধে পশিব যথা যাবে দুনয়ন। —(৫৫ পৃঃ)

ক্ষণিকের জন্য সরলার শোণিত স্তব্ধ হইল। সে আর রাজগৃহে থাকিতে পারিল না, প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া সুরেন্দ্রের সন্ধানে বাহির হইল। একটি রমণীর পক্ষে প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করা যেন বাস্তবতাবিরুদ্ধ বলিয়া মনে হয়।

সরলার জীবনে আরম্ভ হইল পথকষ্ট ও অন্বেষণ এবং তাহা চরমে পৌছিল যখন সে মাতৃদত্ত অঙ্গুরী বনভূমিতে দেখিতে পাইল এবং নিকটে মানুষের অস্থিরাশি দেখিতে পাইল। সে তখন প্রাণ বিসর্জ্জনের উদ্যোগ করিতেছিল। কিন্তু বনদেবীর আশ্বাসবাক্যে তাহা করিতে পারিল না।

হিমালয়ের উপর সুরেন্দ্রের সহিত সরলার মিলনের দৃশ্যটিও সুন্দর। সরলা মূর্চ্ছিত হইলে বনদেবী ও পথিক জল আনিতে যাইবার সময় সুরেন্দ্রকে সন্ন্যাসিবেশে দেখিয়া সরলার নিকট থাকিতে অনুরোধ করিয়া অগ্রসর হইলেন। সুরেন্দ্র সরলাকে মূর্চ্ছিত দেখিয়া নিজ হৃদয়াবেগ আর রুদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিল না। সে কহিল—

যে কেন হও না তুমি, মায়াবী মানবী,
রাক্ষসী কিন্নরী কিম্বা স্বপনের ছবি
উপছায়া মায়া মাত্র, যে কেন না হও,
যেখানেই জন্ম তব যেখানেই রও,
যে আশেই আসা তব—অভাগা ছলিতে,
অথবা দ্বিগুণ শোক প্রবল করিতে,
কিছুতে কিছুতে আমি করিব না ভয়,
যখন সরলারূপে হয়েছ উদয়। —(৮৫ পৃঃ)

সরলার জ্ঞান ফিরিল। উভয়ের চিত্তের মেঘ কাটিয়া গেল।

অনেক দুঃখকষ্টের পর প্রেম খাঁটি হইয়া উঠিল। বনদেবী এবং পথিক রতিদেবী ও মদনের রূপ ধারণ করিয়া তাহাদের বিবাহকার্য্য সম্পন্ন করাইলেন। সমস্ত প্রকৃতি এই উৎসবে যোগদান করিল—

হাসিয়ে হাসিয়ে দিগঙ্গনাগণে
হুলুধ্বনি দেয় মিলিয়ে সবে,
কুসুম আসার বরষি সঘনে,
কাঁপায় গগন উৎসব রবে। —(১০৮ পৃঃ)

এই-সকল বর্ণনার মধ্যে কবির রস-কল্পনার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রকৃতি ও মানুষ ইহাতে একাঙ্গ হইয়া গিয়াছে। মনের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ এবং সৌন্দর্য্যের অভিব্যক্তি দ্বারা কাব্যটি সমৃদ্ধ। কোন বাঁধাধরা পথে কাব্যের গতি নিয়ন্ত্রিত হয় নাই। প্রাণের আবেগে কবি যেন তাঁহার নায়ক-নায়িকা-চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন—সেখানে শাস্ত্রের অনুশাসন ও নিয়মাবলী বড় হইয়া কাব্যরসকে ক্ষুণ্ণ করিতে পারে নাই। নায়ক-নায়িকার রূপ বর্ণনা ও গুণ বর্ণনা পৃষ্ঠা ব্যাপিয়া কাব্যের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি করে নাই। ঘটনা-সংঘাতের মধ্যে চরিত্রগুলি পরস্পরের সন্নিকটে আসিয়াছে এবং দূরে গিয়াছে। ঘটনার ভিতর দিয়াই যেন চরিত্রগুলির বিভিন্ন দিক্‌ উদ্‌ঘাটিত হইয়া আপন রহস্য ব্যক্ত করিয়াছে।

নায়ক সুরেন্দ্রের পরিবারগত বা বংশগত পরিচয় কবি দেন নাই। প্রথমেই দেখি সে দরদী ও পরোপকারী। আপন প্রাণ উপেক্ষা করিয়াও সে সরলাকে নদীস্রোত হইতে উদ্ধার করিয়াছে এবং পিতার নিকট পৌছাইয়া দিয়াছে। তাহার মনে তখনও অনুরাগের স্পর্শ লাগিয়াছে কিনা বোঝা যায় না। তাহার

ব্যবহারে কোন আতিশয্য নাই, কোন চাপল্য নাই বা কোনরূপ অসৌজন্য নাই। পিতৃবিয়োগের পর সরলার নিকট তাহার আশ্বাসবাক্যের ভিতর যেন তাহার মনোভাবের একটু আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু তারপর তাহার অদৃশ্য হওয়া সম্বন্ধে কবি কোন যুক্তি প্রদর্শন করেন নাই। কখন সরলা তাহাকে মাতৃদত্ত অঙ্গুরী দিয়াছিল তাহারও কোন বিবরণ নাই। এই ব্যাপারটি একটু অসংলগ্ন মনে হয়। কারণ রাজা সুপ্রকাশের নিকট যাইবার পূর্ব্বে সরলার সহিত সুরেন্দ্রের মাত্র দুইদিনের সাক্ষাৎ লিপিবদ্ধ হইয়াছে এবং তাহাও ঠিক স্বাভাবিক অবস্থায় নয়, আর হৃদয়ের ভাষাও তখন বিশেষ ব্যক্ত হয় নাই। তারপর সুরেন্দ্রকে আমরা দেখি মধ্যরাত্রে রাজবাটীর ক্রীড়া-উদ্যানে। কিরূপে সে রাজ-অন্তঃপুরবাসিনী সরলার সন্ধান পাইল এবং কিরূপেই বা উদ্যানে প্রবেশ করিল তাহার কোন বিবরণ নাই। অবশ্য কাহিনী-ভাগ সরলার মুখ দিয়া বিবৃত হওয়াতে সরলার পক্ষে সুরেন্দ্রের সমস্ত কার্য্যধারা জানিবার সুযোগও ছিল না সম্ভবও ছিল না। তাই ঐ রাজ-উদ্যানে প্রবেশের ঘটনাটির রহস্য উদ্‌ঘাটিত না হওয়াতে কাব্যরস ক্ষুণ্ণ হয় নাই। তারপর দেখা যায় রাজবাটীর রক্ষিগণ-কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া সে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াইয়াছে এবং সরলার আত্মত্যাগে মুক্তি পাইয়াছে। কিন্তু এ মুক্তি তাহার মৃত্যুর নামান্তর। তাই সরলার সহিত যুবরাজের বিবাহের দিনে সে অশোকবৃক্ষে নিজ হৃদয়ের শোকোচ্ছ্বাস লিখিয়া সংসার ছাড়িয়া গিয়াছে। তাহার প্রেমের নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা আমাদের মুগ্ধ করে। অবশেষে মিলনের দৃশ্যে তাহার আবেগ-উচ্ছ্বাস ও ভাবপ্রবণতা যেন বাঁধভাঙ্গা বন্যার ন্যায় সকল চিন্তা-ভাবনা, ব্যথা-কষ্ট বিস্মৃত হইয়া মধুর কলগুঞ্জনে আকাশ-বাতাসকে মুখরিত করিয়াছে।

কাব্যের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সুরেন্দ্র আমাদের নিকট অজ্ঞাতই রহিয়া গেল। রোমাণ্টিক গাথাকাব্যের উপযুক্ত রহস্যময় ও ভাবময় তাহার চরিত্র, কখনো কখনো সামনে আসিয়া সে নিজ কার্য্য সমাধা করিয়াছে—আবার রহস্যের অন্তরালে চলিয়া গিয়াছে। স্বল্প কয়েকটি দৃশ্যের মধ্যে তাহার দরদী প্রেমিক রূপটি সুন্দর ফুটিয়া উঠিয়াছে।

কাব্যের নায়িকা সরলা অনেকখানি প্রকাশিত। তাহার বংশ-পরিচয় আমরা পাই। তাহাকে কেন্দ্র করিয়াই সমস্ত কাহিনীটি আবর্ত্তিত হইয়াছে এবং তাহার বিবৃতির মধ্য দিয়া সমস্ত কাহিনীটি ব্যক্ত হওয়াতে সে-ই বেশী

অভিব্যক্ত হইয়াছে। সরলা সহজ সরল বুদ্ধিমতী। পিতার মৃত্যুতে শোক-বিহ্বল আবার প্রিয়জনের বিরহেও কাতর। সে আবেগময়ী ও ভাবপ্রবণ। প্রেমেতে তাহার নিষ্ঠাও কম প্রশংসাযোগ্য নয়। অন্তরের অন্তরতম বাসনাকে দমন করিয়া সে প্রিয়তমের প্রাণ বাঁচাইয়াছে। সমস্ত অন্তর্দ্বন্দ্বকে তুচ্ছ করিয়া রাজকুমারকে বিবাহ করিতে প্রস্তুত হইয়াছে। কিন্তু তাহার প্রেমই জয়ী হইল। সে বিবাহ-দিনে রাজপ্রাসাদের সুখ-ঐশ্বর্য্য-সম্পদ্-নিরাপত্তা ত্যাগ করিয়া বনে বনে, দেশে দেশে সুরেন্দ্রের সন্ধান করিয়াছে। অবশেষে কপাল ভাঙ্গিয়াছে মনে করিয়া অগ্নিতে প্রাণবিসর্জনের জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। তারপর বনদেবীর কৃপায় সুরেন্দ্রকে যখন দেখিল তখনও নিজের চোখকে বিশ্বাস করিতে পারে নাই এবং হৃত অঙ্গুরীর প্রশ্ন তুলিয়া নিজ সন্দেহ নিরসন করিয়াছে।

সরলা চিরকালই ভাগ্যবিড়ম্বিতা। রাজনন্দিনী হইয়াও সে ভিক্ষা করিয়া নিজের ও পিতার অন্নের সংস্থান করিয়াছে। তারপর রাজবাটীতে শত ভোগের ও আরামের মধ্যে থাকিয়াও অস্বস্তিতে ও অশান্তিতে দিন কাটাইয়াছে। অবশেষে দুঃখের অনলে দগ্ধ হইতে হইতে খাঁটি হইয়া প্রকৃতির মহান্ সৌন্দর্য্যের মধ্যে সরলা আপন প্রিয়জনকে পাইয়াছে।

পথিক ও বনদেবী প্রথম হইতেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাঁহারা দুইজন সুরেন্দ্র ও সরলার মিলনের পথ প্রস্তুত করিয়াছেন এবং শেষ পর্য্যন্ত মদন ও রতির রূপ ধারণ করিয়া নিজেদের মান-অভিমানের পালা সাঙ্গ করিয়াছেন। এই চরিত্র দুটি কাব্যটিকে অনেকখানি অবাস্তব এবং অলৌকিক করিয়া তুলিয়াছে। ইহাতে, কাব্যে যে উপন্যাসসুলভ মনোবিশ্লেষণ ও চরিত্র-সৃষ্টি রহিয়াছে তাহা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে।

কাব্যটি দশটি সর্গে সমাপ্ত। ইহাতে পয়ার, ত্রিপদী, চৌপদী প্রভৃতি ছন্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। কোথাও কোথাও ক খ ক গ ঘ ঘ রূপে ছয় পঙ্‌ক্তির স্তবক, কোথাও ক ক খ ক রূপে চার পঙ্‌ক্তির স্তবক স্থান পাইয়াছে। প্রত্যেক পরিচ্ছেদের পূর্ব্বে বিভিন্ন ইংরাজী কবিগণের রচনা হইতে দুই-চারি পঙ্‌ক্তি করিয়া উদ্ধৃতি রহিয়াছে এবং সেই পরিচ্ছেদের মূল ভাবটিকে ব্যক্ত করিয়াছে। কাব্যের ভাষা সহজ সরল সাবলীল।

কবি-কাহিনী—রবীন্দ্রনাথের রচনাবলীর মধ্যে 'কবি-কাহিনী'ই প্রথম মুদ্রিত কাব্য। 'বনফুল' ইহার পূর্ব্বে রচিত হইলেও মুদ্রিত হইয়াছিল পরে।

ইহা ভারতীতে ধারাবাহিক-রূপে প্রকাশিত হইয়াছিল এবং ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয়। ষোল বৎসর বয়সে কবি এই কাব্যটি রচনা করেন। 'জীবনস্মৃতি'তে কবি ইহার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

"যে বয়সে লেখক জগতের আর সমস্তকে তেমন করিয়া দেখে নাই কেবল নিজের অপরিস্ফুটতার ছায়ামূর্তিটাকেই খুব বড়ো করিয়া দেখিতেছে ইহা সেই বয়সের লেখা। সেইজন্য ইহার নায়ক কবি। সে কবি যে লেখকের সত্তা তাহা নহে, লেখক আপনাকে যাহা বলিয়া মনে করিতে ও ঘোষণা করিতে ইচ্ছা করে ইহা তাহাই। ঠিক ইচ্ছা করে বলিলে যাহা বুঝায় তাহাও নহে—যাহা ইচ্ছা করা উচিত অর্থাৎ যে রূপটি হইলে অন্য দশজন মাথা নাড়িয়া বলিবে, হাঁ কবি বটে, ইহা সেই জিনিষটি। ইহার মধ্যে বিশ্বপ্রেমের ঘটা খুব আছে—তরুণ কবির পক্ষে এইটি বড় উপাদেয়, কারণ ইহা শুনিতে খুব বড়ো এবং বলিতে খুব সহজ। নিজের মনের মধ্যে সত্য যখন জাগ্রত হয় নাই, পরের মুখের কথাই যখন প্রধান সম্বল তখন রচনার মধ্যে সরলতা ও সংযম রক্ষা করা সম্ভব নহে। তখন যাহা স্বতঃই বৃহৎ, তাহাকে বাহিরের দিক হইতে বৃহৎ করিয়া তুলিবার দুশ্চেষ্টায় তাহাকে বিকৃত ও হাস্যকর করিয়া তোলা অনিবার্য্য।"

কবি-হৃদয়ের অদম্য আকাঙ্ক্ষা ও অতৃপ্তি এই কাব্যটির ছত্রে ছত্রে যে হাহাকার ও বেদনার অনুরণন তুলিয়াছে কাব্যটি তাহাতে জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। অনেক অবাস্তবতা, উচ্ছ্বাস ও আবেগ থাকা সত্ত্বেও বালক কবির এক নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ইহার ভিতর পরিস্ফুট হইয়াছে এবং তাঁহার হৃদয়ের একটি উপলব্ধি ভাবোচ্ছ্বাসের বাষ্পীয় কুয়াশার মধ্যেও আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

কাব্যের নায়ক একজন ভাবুক কবি। এইখানেই প্রথম অন্যান্য কবি হইতে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য লক্ষিত হয়। তাঁহার কাব্যের নায়ক রাজপুত্র নয়, সদাগরপুত্র নয়, বিদ্বান্‌, বুদ্ধিমান্‌, খ্যাতিমান্‌ বা বিত্তবান্‌ও নয়—সে ভাবুকতায় পূর্ণ—অন্তর ব্যাপিয়া তাহার অদম্য আকাঙ্ক্ষা। শৈশবকাল হইতেই কল্পনারাজ্যে তাহার সময় অতিবাহিত হইত। শয়নে, স্বপনে, জাগরণে সে কল্পনাদেবীর গীত শ্রবণ করিত। অন্যান্য বালকের ন্যায় সে প্রজাপতি ধরিত এবং ফুলও তুলিত। কিন্তু মাঝে মাঝে সে বৃক্ষতলে চুপ করিয়া

বসিয়া শিশিরে ভিজিত, মাঝে মাঝে প্রকৃতির শোভা দেখিতে দেখিতে তন্ময় হইয়া যাইত।

এইরূপে কি একটি সঙ্গীতের মত,
তপনের স্বর্ণময় কিরণে প্লাবিত
প্রভাতের একখানি মেঘের মতন,
নন্দন বনের কোন অপ্সরা বালার
সুখময় ঘুমঘোরে স্বপ্নের মত—
কবির বালক কাল হইল বিগত। —(১ম সর্গ, ৩ পৃঃ)

এই বর্ণনাটুকুর মধ্যে শৈশবের স্বপ্নময় আবেশ সুন্দরভাবে ব্যক্ত হইয়াছে এবং প্রকাশভঙ্গির ভিতরেও একটা নূতন সুর ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে।

যৌবনে নায়ক কবি প্রকৃতির মধ্যে অধিকতর নিবিড়ভাবে মগ্ন হইল। প্রকৃতির ভাষা তাহার নিকট স্পষ্টতর ও ছন্দময় হইয়া উঠিল এবং 'প্রকৃতি আছিল তার সঙ্গিনীর মত'। কবির মনে হইত প্রকৃতিকে লইয়াই তাহার সমস্ত জীবন আনন্দে অতিবাহিত হইবে—

তাই ভাবিয়াছি আমি হে মহাপ্রকৃতি
মজিয়া তোমার সাথে অনন্ত প্রণয়ে
জুড়াইব হৃদয়ের অনন্ত পিপাসা! —(১ম সর্গ, ৮ পৃঃ)

কিন্তু কবির যৌবনের উদ্দাম আবেগ প্রকৃতির ভিতর তৃপ্তি খুঁজিয়া পাইল না। একটা হাহাকার তাহার অন্তর ব্যাপ্ত করিয়া রহিল।

মনের অন্তর তলে কি যে কি করিছে হুহু,
কি যেন আপন ধন নাইক সেখানে,
সে শূন্য পূরাতে দেবি, ঘুরেছি পৃথিবীময়
মরুভূমি তৃষাতুর মৃগের মতন। —(২য় সর্গ, ১২ পৃঃ)

তারপর এক উদাসীর নিকট কবি শুনিল 'মানুষের মন চায় মানুষেরি মন'। মনুষ্য-সমাজে সে হৃদয়ের অন্বেষণে ঘুরিল। কত লোক তাহাকে হৃদয় দিতে আসিল, কতজন তাহার সঙ্গীত শুনিয়া কাঁদিল কিন্তু কবির মুক্ত-মন সংসারে নিজের মনোমত স্থান দেখিতে পাইল না। কল্পনার পক্ষে ভর করিয়া যে কবি-মন আকাশ-পাতাল পরিভ্রমণ করিয়াছে ক্ষুদ্র সংসারে আবদ্ধ মনে তাহার সংকুলান হইল না। অবশেষে আকস্মিকভাবে এক

সহজ, সরল, প্রকৃতির ক্রোড়ে পালিতা বালিকা কবির হৃদয় জয় করিল। কবির দুঃখের কথা শুনিয়া তাহার চক্ষে অশ্রু ঝরিল—কবি শান্তি ও আশ্রয় খুঁজিয়া পাইল।

বালার কপোল বাহি, নীরবে অশ্রুর বিন্দু
স্বর্গের শিশির সম পড়িল ঝরিয়া, —(২য় সর্গ, ১৫ পৃঃ)

বালিকা কোমল করে কবির অশ্রু মুছাইয়া নিজ কুটিরে লইয়া গেল। কবি বালিকার মুখে অরণ্যের কবিতার সন্ধান পাইল। কবি প্রণয়ের ভিতর মগ্ন হইয়া অসীম আনন্দ লাভ করিল—

অন্য এক হৃদয়েরে হৃদয় করা গো দান
সে কি এক স্বর্গীয় আমোদ। —(২য় সর্গ, পৃঃ ১৮)

কবি এই আনন্দ-উচ্ছ্বাস ভাষায় প্রকাশ করিতে পারিত না বলিয়া ব্যাকুল হইত। অবশেষে একদিন বালিকার নিকট নিজ মনোভাব ব্যক্ত করিতে গেলে তাহার কথা সব এলোমেলো হইয়া গেল। কিন্তু মূল সুরটি বুঝিতে বালিকার বিলম্ব হইল না। তাহার হৃদয়ও উদ্বেলিত হইয়া উঠিল এবং—

গড়ায়ে পড়িল ধীরে বালিকার অশ্রুজল,
কবির অশ্রুর সাথে মিশিল কেমন—। —(২য় সর্গ, ২০ পৃঃ)

এই প্রণয়ে কবির মনের শূন্যতা পূর্ণ হইল না। কিছুদিন পর এই শূন্যতা আবার কবিচিত্তকে ব্যাকুল করিয়া তুলিল—সে ভাবিতেছে—

এত তারে ভালবাসি, তবু কেন মনে হয়
ভালবাসা হইল না আশ মিটাইয়া,
আঁধার সমুদ্রতলে, কি যেন বেড়াই খুঁজে
কি যেন পাইতেছি না চাহিতেছি যাহা।—(২য় সর্গ, ২৫ পৃঃ)

এক আকুল পিপাসা কবিকে অশান্ত করিয়া তুলিল। আদর্শবাদী কবি-মন জাগতিক ক্ষুদ্রতা ও সঙ্কীর্ণতা, নিষ্ঠুরতা ও কুটিলতা হইতে ঊর্দ্ধে বিচরণ করিতে চায়। বহির্বিশ্ব আবার কবিকে আহ্বান করিতে লাগিল। বালিকার নিকট বিদায় লইয়া কবি ভ্রমণে বাহির হইল। বালিকা কিছুই কহিতে পারিল না, সম্বিৎ হারাইয়া নির্নিমেষ-চক্ষে চাহিয়া রহিল। অনেকক্ষণ পর তাহার নয়ন হইতে দুই-এক বিন্দু করিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল—তারপর সে রোদনে ভাঙ্গিয়া পড়িল—

বাহুতে লুকায়ে মুখ কাতর বালিকা

মর্মভেদী অশ্রুজলে করিল রোদন। —(২য় সর্গ, ২৭ পৃঃ)

বালিকার ক্রীড়া-কৌতুক-চপলতা সব থামিয়া গেল। নীরবে অসহ্য বেদনা সে সহ্য করিতে লাগিল। তাহার অন্তরে শুধু একটি বাসনা জাগিয়া রহিল—

আর কোন সাধ নাই, বাসনা রয়েছে শুধু

কবিরে দেখিয়া যেন হয় গো মরণ। —(৩য় সর্গ, ৩৪ পৃঃ)

কবিও ভ্রমণের মধ্যে আনন্দ খুঁজিয়া পাইল না—

যে প্রকৃতি-শোভা মাঝে নলিনী না থাকে

ঠেকে তা শূন্যের মত কবির নয়নে, —(৩য় সর্গ, ৩১ পৃঃ)

অতৃপ্ত হৃদয়ে কবি বালিকার নিকট আবার ফিরিয়া আসিল কিন্তু তখন বালিকা নলিনী ইহজগতে নাই। শুধু তাহার ক্ষুদ্র দেহখানি—

দেখিল সে গিরিশৃঙ্গে শীতল তুষার পরে,

নলিনী ঘুমায়ে আছে ম্লান মুখচ্ছবি।

কঠোর তুষারে তার এলায়ে পড়েছে কেশ,

খসিয়া পড়িছে পাশে শিথিলে আঁচল।—(৩য় সর্গ, ৩৫ পৃঃ)

কবি ক্রমে বৃদ্ধ হইল। সে হিমালয়ের শিখরে শিখরে ঘুরিয়া প্রকৃতির মধ্যে আনন্দ আহরণ করিত এবং জ্যোৎস্না-রাত্রে গান গাহিয়া নলিনীর আহ্বানে সাড়া দিত। কবির মনে হইত হিমালয় মানুষের সুখদুঃখের সাক্ষিরূপে দাঁড়াইয়া আছে এবং নীরবে মানুষের অবিচার ও অত্যাচার দেখিতেছে।

কিন্তু কবির মনে তবু আশার শেষ নাই। সে হিমালয়কে জিজ্ঞাসা করিতেছে—

তবে বল কবে গিরি হবে সেই দিন

যে দিন স্বর্গই হবে পৃথ্বীর আদর্শ! —(৪র্থ সর্গ, ৫১ পৃঃ)

এই ভাবেই একদিন হিমাদ্রিশিখরে কবি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিল এবং—

প্রত্যহ প্রভাত শুধু শিশিরাশ্রুজলে

হরিত পল্লব তার করিত প্লাবিত। —(৪র্থ সর্গ, ৫৩ পৃঃ)

ইহা রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য কাব্যের তুলনায় শৈশবকালের বাষ্পীয় উচ্ছ্বাস-রূপে পরিগণিত হইলেও বাংলা কাহিনী-কাব্যধারায় ইহা আপন বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত। পুরাতন সকল বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া কল্পনার সাহায্যে নবীনতর

আখ্যান-ভাগের সৃষ্টি এবং ছন্দে ভাবে ভাষায় তাহাকে প্রকাশ করা কিশোর কবির পক্ষে কম নিপুণতার পরিচায়ক নয়। ভাষার দিক্ দিয়া ইহা যেমন সহজ-সরল-ছন্দময় ভাবের আবেগেও ইহা তেমনি প্রাণবন্ত। ইহাতে জগৎ ও জীবন-সম্বন্ধে কবির একটি সূক্ষ্মদৃষ্টির আভাস পাওয়া যায়। যে দর্শনবাদ কবির পরবর্ত্তী অনেক কাব্যের মধ্যে সুস্পষ্ট ও ঘনীভূত-রূপে প্রকাশিত হইয়াছে তাহারই তরল রূপ যেন এই কাব্যে দৃষ্ট হয়। প্রকৃতি কবিকে চিরকালই ব্যাকুল করিয়াছে। কিন্তু মানুষের মন অপর মানুষের মন না পাইলে তৃপ্ত হয় না। আবার কেবল মানুষের নিকটেই আনন্দ নাই। প্রকৃতি ও মানুষের মধ্য হইতে আনন্দকে আহরণ করিতে হয়—একটি ব্যতীত অপরটি অসম্পূর্ণ—কাব্যের মধ্যে যেন এই তত্ত্বই কবি বলিতে চেষ্টা করিয়াছেন। যে মানুষ মনের অদম্য আবেগের বশীভূত হইয়া গৃহের কল্যাণ-আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া উদ্দাম প্রকৃতির মধ্যে বৃহত্তর আনন্দের আশায় ছুটিয়া বেড়ায়—আনন্দলাভ তাহার ভাগ্যে জোটে না—উপরন্তু করতলগত আনন্দের উৎসও হারাইয়া যায়। মনের ভাবকেও একেবারে অসংযত-ভাবে মুক্ত করিয়া দিলে তাহা দুঃখেরই কারণ হয়। তাহাকেও সংযত হস্তে নিয়ন্ত্রিত করিলে তবেই প্রকৃত আনন্দের অধিকারী হওয়া যায়। সেটুকু না পারিলে দুঃখ অবশ্যভাবী। এই কাব্যের ভিতর নায়ক-কবির হৃদয়ের যে চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে তাহাতে আতিশয্য থাকিলেও কবি-হৃদয়ের মূল সুরটি যে ধ্বনিত হইয়াছে তাহা অস্বীকার করা যায় না। কবির মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণও প্রশংসনীয়। যে কবি-হৃদয় লোকালয়ের কোথাও শান্তি খুঁজিয়া পায় নাই—এক বালিকার সহজ সরল প্রেমে সে আবদ্ধ হইল। ছোট ছোট ঘটনার মধ্যে তাহাদের আনন্দ উপভোগের চিত্রগুলিও সুন্দর। আবার বিদায়কালের চিত্রটিও প্রাণময়তায় এবং বেদনায় জীবন্ত। তবে নলিনীর মৃত্যুর পর কবির প্রত্যাবর্ত্তন পর্য্যন্ত চিত্রিত করিলেই আখ্যান-অংশ সুন্দর হইত। মৃত্যুর পরের অংশগুলি অবান্তর ও রসহানিকর হইয়াছে। কাব্যটিকে সার্থক রচনা বলা চলে না। তবে আখ্যায়িকা-কাব্য-ক্ষেত্রে ইহা যে নূতন সুরের ঝঙ্কার তুলিতে সমর্থ হইয়াছে ইহা সর্ব্বজনগ্রাহ্য।

বনফুল—রবীন্দ্রনাথ তের-চৌদ্দ বৎসর বয়সে 'বনফুল'-কাব্যটি রচনা করেন। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে ইহা জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব নামক মাসিক পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয় এবং ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে কাব্যগ্রন্থরূপে মুদ্রিত হয়। বালক

কবির রচনার মধ্যে তাঁহার নিজস্ব ধারা এবং বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট। দুই-এক স্থানে অন্যান্য কবিগণের প্রভাব কিছুটা অনুভূত হইলেও রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি-ভঙ্গিটুকু এই কাব্যর মধ্যে নিজ স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়াছে।

কবি প্রথমেই প্রকৃতির ক্রোড়ে পালিতা বালিকা কমলার মনুষ্যসমাজে গিয়া দুঃখানুভূতির অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করিয়াছেন। প্রকৃতির সহিত লোকালয়ের কোথায় একটা বিরোধ মানুষকে অহরহ পীড়া দেয়। অরণ্যবাসী লোকালয়ে শান্তি পায় না, লোকালয়বাসী অরণ্যে গিয়া হৃদয়ের স্পর্শ খুঁজিয়া বেড়ায়। কবি বলিতে চাহেন প্রকৃতির সহিত লোকালয়ের সামঞ্জস্য-বিধান করিতে পারিলেই জীবন পূর্ণ হয়। একটিকে বাদ দিয়া অপরটিকে গ্রহণ করিতে গেলে শান্তি লাভ করা যায় না—অপূর্ণতার ব্যথা অহরহ দুঃখ দিতে থাকে। 'বনফুল' কাব্যের নায়িকা কমলার মধ্যে কবি সেই মর্ম্মবেদনাকে মূর্ত্ত করিয়াছেন। তাই কাব্যের প্রারম্ভেই দেখা যায়—

চাই না জ্ঞেয়ান, চাই না জানিতে
সংসার, মানুষ কাহারে বলে
বনের কুসুম ফুটিতাম বনে
শুকায়ে যেতাম বনের কোলে। —(৫১ পৃঃ)

যেন একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস লইয়া কাব্যটির আরম্ভ। যে অতৃপ্তি মানুষকে স্থান হইতে স্থানান্তরে, কর্ম্ম হইতে কর্ম্মান্তরে আহ্বান জানাইতেছে এবং নানা সংঘাত ও বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া অনির্ব্বচনীয়ের প্রতি আকৃষ্ট করিতেছে—ইহা যেন সেই অতৃপ্তির বেদনা।

তারপরেই কবি হিমালয়ের বর্ণনা দিয়াছেন। সীমাবদ্ধ মনের আনন্দের সন্ধান যেন সীমাহারার মধ্যে রহিয়াছে,—ব্যথা-বেদনার শান্তি যেন বিশালতার মধ্যে নিহিত। ক্ষুদ্র বন্ধন হইতে মুক্তি এবং বিরাটের মধ্যে আত্মবিলোপের ভিতরেই যেন তৃপ্তি ও আনন্দের সন্ধান কবি দেখাইতে চাহিয়াছেন। হিমা-লয়ের বর্ণনার ভিতরেও নূতনত্ব দৃষ্ট হয়—

তুষারে আবরি শির, ছেলেখেলা পৃথিবীর
ভ্রুক্ষেপে যেন সব করিছে লোকন
কত নদী কত নদ, কত নির্ঝরিণী হ্রদ
পদতলে পড়ি তার করে আস্ফালন।

মানুষ বিস্ময়ে ভয়ে, দেখে রয় স্তব্ধ হয়ে
অবাক হইয়া যায় সীমাবদ্ধ মন! —(৫১ পৃঃ)

পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণের ন্যায় রবীন্দ্রনাথ এই কাব্যে কল্পনাদেবীর আশ্রয় লইয়াছেন—

কল্পনে! কুটীর কার তটিনীর তীরে
তরুপত্র ছায়ে ছায়ে, পাদপের গায়ে গায়ে—
ডুবায়ে চরণদেশ স্রোতস্বিনী নীরে। —(৫২ পৃঃ)

কুটীরে অন্ধকার ঘনীভূত হইয়াছে—একটি স্তিমিত-শিখ দীপের ম্লান আলোক জ্বলিতেছে—কন্যার নিকটে মুমূর্ষু পিতার অন্তরের ব্যাকুলতার অভিব্যক্তি ভয়ে-বেদনায় পাঠকচিত্তকে যেমন অভিভূত করে তেমনি কৌতূহলও জাগাইয়া তুলে। কন্যার নিমিত্ত পিতার চিন্তা—

ভাবিতে হৃদয় জ্বলে, মানুষ কারে যে বলে
জানিস্‌নে কারে বলে মানুষের মন
কার দ্বারে কাল প্রাতে, দাঁড়াইবি শূন্য হাতে
কালিকে কাহার দ্বারে করিবি রোদন। —(৫৬ পৃঃ)

তারপর পথভ্রান্ত বিজয়ের প্রথম প্রণয়-সঞ্চারের মধ্যে দ্বিধাটুকু সুন্দর-ভাবে ব্যক্ত হইয়াছ। মৃত পিতার নিকট অচৈতন্য বালিকাকে দেখিয়া বিজয়—

আনমিত করি শিরে, পথিকটি ধীরে ধীরে
বালার নাসার কাছে সঁপিলেন কর।
হস্ত কাঁপে থর থরে, বুক ধুক্ ধুক্ করে
পড়িল অবশ বাহু কপোলের পর,
লোমাঞ্চিত কলেবরে, বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম ঝরে
কে জানে পথিক কেন টানি লয় কর। —(৫৯ পৃঃ)

আবার নূতন মানুষকে দেখিয়া বালিকার চক্ষে বিস্ময়ের দৃষ্টিটুকুও অতিশয় মনোজ্ঞ—

মেলিয়া নয়ন পুটে, বালিকা চমকি উঠে
এক দৃষ্টে পথিকেরে করে নিরীক্ষণ

পৃথিবী ছাড়া এ আঁখি, স্বর্গের আড়ালে থাকি
পৃথ্বীরে জিজ্ঞাসে কে তুমি কে তুমি? —(৬১ পৃঃ)

বিজয়ের সহিত যাইবার কালে পশু পক্ষী বৃক্ষ প্রভৃতির নিকট হইতে কমলার বিদায়গ্রহণ শকুন্তলার বিদায়-গ্রহণের চিত্রটি মনে করাইয়া দেয়। যাইবার কালে কমলার মনে হইল সমস্ত প্রকৃতি যেন তাহাকে যাইতে নিষেধ করিতেছে—

কুটীর ডাকিছে যেন যেওনা—যেওনা!
তটিনী তরঙ্গ কুল ভিজায়ে গাছের মূল
ধীরে ধীরে বলে যেন যেওনা! যেওনা!
বনদেবী নেত্র খুলি—পাতার আঙ্গুল তুলি,
যেন বলিছেন তাহা—যেওনা! যেওনা! (৬৫ পৃঃ)

প্রকৃতির মধ্যে মানুষের জন্য দরদবোধ চিত্রিত হইয়া বাংলা আখ্যায়িকা-কাব্যে নূতন সুর ধ্বনিত করিয়াছে।

বিজয়ের সহিত বিবাহের পরও প্রকৃতি-দুহিতা কমলা বনভূমিকে ভুলিতে পারে নাই। পূর্ব্ব জীবনের স্মৃতি তাহার হৃদয়ে ব্যাকুলতা জাগাইত। কিন্তু বিজয়ের বন্ধু নীরোদকে ভালবাসিয়া তাহার মনে পরিবর্ত্তন আসিল। সে কহিতেছে—

হায়রে সেদিন ভুলাই ভালো
সাধের স্বপন ভাঙ্গিয়া গেছে!
এখন মানুষে বেসেছি ভালো
হৃদয় খুলিব মানুষ কাছে! —(৭০ পৃঃ)

কিন্তু এই ভালবাসার মধ্যে আগুনের জ্বালাও সে বুঝিতে পারিয়াছে। বন্ধু-বৎসল নীরোদ নিজ মনোভাবকে দমন করিয়া কমলাকে বিজয়ের প্রতি কর্ত্তব্য করিতে উপদেশ দেয়—নীরোদের প্রতি তাহার ভালবাসা থাকা উচিত নয়—সমাজ তাহা ভালচক্ষে দেখিবে না প্রভৃতি বলিয়া কমলাকে ফিরাইতে চেষ্টা করে। নিজ মনোভাব সম্বন্ধে সে কমলাকে কহিতেছে—

তবু শুধাও যদি দিব না উত্তর!
হৃদয়ে যা লিখা আছে দেখাবোনা কারো কাছে
হৃদয়ে লুকান রবে আমরণ কাল।

রুদ্ধ অগ্নিরাশিসম দহিবে হৃদয় মম
ছিঁড়িয়া খুঁড়িয়া যাবে হৃদি গ্রন্থিজাল। —(৮১ পৃঃ)

কমলা সমাজ-সংসারের নিয়মকানুন জানে না, জানিতেও চাহে না। প্রাণের আবেগ ও মনের আকাঙ্ক্ষাই তাহার নিকট একমাত্র সত্য। সে নীরোদের উপদেশের উত্তরে কহিল—

বিবাহ কাহারে বলে জানিতে চাহি না—
তাহারে বাসিব ভাল, ভালবাসি যারে!
তাহারই ভালবাসা করিব কামনা
যে মোরে বাসে না ভাল ভালবাসি যারে। —(৮২ পৃঃ)

নীরোদ তাহাকে অনেক বুঝাইল। শেষে ভৎর্সনা করিতে গিয়া নিজ হৃদয়ের দুর্ব্বলতা লুকাইতে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিল।

নীরজা নামক অপর একটি বালিকা বিজয়কে ভালবাসে কিন্তু প্রকাশ করে না। একদিন সে মনের দুঃখ দমন করিতে পারিল না—কমলার নিকট বলিল—

পরাণ হইতে অগ্নি নিভিবে না আর
বনে ছিলি বনবালা সেত বেশ ছিলি
জ্বালালি! জ্বলিলি বোন! খুলি মর্ম্মদ্বার
কাঁদিতে করিগে যত্ন যেথা নিরিবিলি। —(৮৯ পৃঃ)

কমলা ব্যথা পাইল। মনে পড়িল সে পূর্ব্বদিন বিজয়কে নীরোদের প্রতি তাহার ভালবাসার কথা জানাইয়াছে। সে কহিয়াছে—

একটি হৃদয়ে নাই দুজনের স্থান। —(পৃঃ ৮৭)

বিজয়ের জোর জবরদস্তি এতদিন কমলার নিকট অসহ্য ছিল—কিন্তু হৃদয়ে প্রেমের আবির্ভাবে সে বিজয়কে ক্ষমা করিতে পারিয়াছে এবং সংসারে আনিয়া ভালবাসা উপলব্ধি করিতে সহায়তা করিয়াছে বলিয়া বিজয়ের প্রতি তাহার কৃতজ্ঞতারও শেষ নাই।

কিন্তু বিজয় যখন নীরোদের পৃষ্ঠদেশে ছুরিকাঘাত করিয়া চলিয়া গেল কমলা তাহাকে অভিশাপ দিল—ক্ষমা করিতে পারিল না—

রক্তে লিপ্ত হয়ে যাক্ বিজয়ের মন! —(৯৮ পৃঃ)

নীরোদের দেহ চিতায় পুড়িয়া ছাই হইয়া গেলে কমলার নিকট সমস্ত

পৃথিবী শূন্য বোধ হইতে লাগিল। পূর্ব্ব-পরিচিত বনভূমিতে সে শান্তির অন্বেষণে গেল—কিন্তু পূর্ব্বের দিন ফিরিয়া পাইল না। পাহাড়ের উপর দাঁড়াইয়া তাহার মনে হইতে লাগিল—

চন্দ্র সূর্য্য নাই কিছু—
শূন্যময় আগু পিছু!
নাইরে কিছুই যেন ভূধর কানন!
নাইক শরীর দেহ—
জগতে নাইক কেহ—
একেলা রয়েছে যেন কমলার মন! —(১১৪ পৃঃ)

সে নীচে ঝাঁপাইয়া পড়িল। নদীর জলে তাহার প্রাণহীন দেহ ভাসিয়া চলিল।

ইহার পরের দুইটি স্তবক না থাকিলেই কাব্যটির সমাপ্তি সুন্দর হইত। ঐ স্তবক দুইটির কোন প্রয়োজন নাই—উহা বাহুল্য।

কাব্যের নায়িকা-চরিত্রের সহিত শেক্স্পীয়রের মিরাণ্ডা ও বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলার সামঞ্জস্য লক্ষিত হয়। সকলেই লোকালয় হইতে দূরে পালিত। মিরাণ্ডা তাহার পিতার সহিত একটি দ্বীপে বাস করিত এবং প্রথম দর্শনেই ফার্ডিনাণ্ডকে ভালবাসিল। কপালকুণ্ডলা কিন্তু নবকুমারকে বা অপর কাহাকেও ভালবাসিতে পারে নাই। সমস্ত জীবনব্যাপী এক ঔদাসীন্য তাঁহাকে মৃত্যুর পথে লইয়া গিয়াছে। আর কমলা, ভালবাসিয়াছে কিন্তু যাহাকে ভালবাসা উচিত তাহাকে ভালবাসিতে পারে নাই। সে সংসারের ন্যায়-অন্যায়, পাপ-পুণ্যের ধার ধারে না। নিজ হৃদয়-বৃত্তিকে সংযত করিতেও সে শেখে নাই। তাহার মন যখন যাহা চাহিয়াছে তাহাই সে পাইয়াছে। তাই সংসারে আসিয়াও সে সমাজকে মানিতে চায় নাই। হৃদয় যাহাকে বরণ করিয়া লইয়াছে সে তাহাকেই অকপটে গ্রহণ করিয়াছে এবং সে-কথা প্রকাশ করিতে কোনরূপ লজ্জা বা সঙ্কোচ অনুভব করে নাই, বা কাহারও সুখদুঃখের প্রতি দৃষ্টিপাত করে নাই। লোকালয়ে আসিয়া সে কোনদিনই শান্তি পাইল না—কিন্তু নীরোদকে হারাইয়া শান্তির সন্ধানে প্রকৃতির ক্রোড়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াও সে শান্তি পাইল না। কারণ তাহার মনে তখন জীবনের আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছে। তাই সে জীবন বিসর্জ্জন দিয়া অশান্তির শেষ করিল।

কবির শৈশবকালে রচিত হইলেও কাহিনীর মধ্যে একটা নূতন সুর ধ্বনিত হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী কাব্যকারগণের হস্তে প্রেমের পথে বিঘ্ন আসিয়াছে বহির্জগৎ হইতে, হয় মাতাপিতা অন্তরায় হইয়াছেন নতুবা দেশগত দূরত্ব ব্যবধান সৃষ্টি করিয়াছে। কিন্তু এই কাব্যের মধ্যে আসিয়াছে অন্তর্দ্বন্দ্ব। বিজয় ভালবাসে কমলাকে কিন্তু প্রতিদান পায় না। নীরজা ভালবাসে বিজয়কে কিন্তু প্রকাশের মত পরিবেশ বা সুযোগ নাই। কমলা ও নীরোদ পরস্পর পরস্পরকে ভালবাসিয়াও দূরেই রহিয়া গেল। প্রেমের পথে এই জটিলতা পূর্ব্ব কাব্যগুলির ভিতর লক্ষিত হয় না। এই দিক্ হইতে কিশোর কবির কৃতিত্ব স্বীকার করিতেই হইবে।

ভাষা ভাব ছন্দও অত্যন্ত সহজ সরল এবং আবেগময়। কাব্যটি আটটি সর্গে সমাপ্ত। চৌপদী, পয়ার, মাঝে মাঝে আট পঙ্ক্তির স্তবক এবং তাহাতে ক খ ক খ গ ঘ গ ঘ রূপে অন্তপদের মিল, কোথাও ছয় পঙ্ক্তির স্তবক এবং কক খ গগ খ রূপে অন্তপদের মিল দেখা যায়।

গীতিকাব্যের ভাবাবেগ কাব্যটিকে অনেক স্থানে মাধুর্য্য দান করিয়াছে।

যোগেশ—ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'যোগেশ' কাব্যটি ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই কাব্যটি রচনা সম্বন্ধে কবি উৎসর্গপত্রে লিখিয়াছেন—

"যোগেশ সম্বন্ধে দুই চারটী কথা তোমায় বলিয়া দিই। যোগেশ কাল্পনিক উপন্যাস নহে, যোগেশ, অধিকাংশই যোগেশের জীবনের প্রকৃত ইতিহাস। যোগেশ আমার আজীবন সুহৃদ—আমার সংসারে সান্ত্বনা—আমার অন্তরের অন্তর—আমার কাব্যে সহায় ছিলেন।........"

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে যে-সকল গাথাকাব্য রচিত হইয়াছিল 'যোগেশ' কাব্যটি তাহাদের মধ্যে একটি প্রধান স্থান লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। ভাবপ্রবণ বাঙালীর মনে এই কাব্যের উচ্ছ্বাস, আবেগ ও আন্তরিকতা যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিতে পারিয়াছিল। ইহার ভিতর যে বেদনা মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে তাহা গাথাকাব্যের একান্ত উপযোগী এবং কবির প্রকাশভঙ্গিও যেমন চিত্তগ্রাহী তেমনই মর্ম্মস্পর্শী।

'যোগেশ'-কাব্যটি ব্যর্থ প্রেমিক-হৃদয়ের শোকোচ্ছ্বাস। নায়ক যোগেশ বিবাহিত। স্ত্রী নর্ম্মদাকে সে ভালবাসিতে পারে নাই। নর্ম্মদার সখী

মন্দাকিনীর প্রতি তাহার আসক্তি। কিন্তু তাহার এ প্রণয়ের প্রতিদান সে পায় নাই। নায়ক নিজ হৃদয়ভাবকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতেছে—

গৌরাঙ্গী নর্ম্মদা সত্য—গঠনো সুন্দর
বদনো স্বরূপ—কিন্তু শক্তি নাহি তায়।
মন্দাকিনী শ্যামাঙ্গিনী—কিন্তু অঙ্গে অঙ্গে
যেই স্বপ্নমাখা—যেই শক্তি আকর্ষিণী—
যে মোহিনী দৃষ্টি তার নয়নযুগলে,
সে স্বপ্ন—সে সম্মোহিনী মূর্ত্তি নর্ম্মদাতে
যোগেশ জীবনে তার কভু না হেরিল।

—(২সং, ৫ম সর্গ, ৪৭ পৃঃ)

যোগেশ যে মন্দাকিনীর রূপেই আকৃষ্ট হইয়াছে তাহা নয়। মন্দাকিনীর ভিতর একটি অমিত তেজ, পবিত্রতা, মহিমা রহিয়াছে যাহা যোগেশকে বিস্মিত ও অভিভূত করিয়াছে বেশী—

সকলি পবিত্র যেন, সব তেজোময়!
অস্পর্শ অস্পৃহ্য যেন সে হৃদয়খানি।—(২সং, ১০ম সর্গ, ১১৬ পৃঃ)

নর্ম্মদাকে বিবাহ করিবার সময় মন্দাকিনীর সহিত যোগেশের পরিচয় হয়। আলাপ প্রগাঢ় হইলে মন্দাকিনী তাহাকে ভ্রাতার ন্যায় ভালবাসিতে লাগিল। যোগেশের মনে আসিল প্রণয়ের বন্যা। যোগেশ মন্দাকিনীকে একখানি পত্র লিখিয়া নিজ মনোভাব ব্যক্ত করিলে মন্দাকিনী তাহাকে তীব্রভাষায় তিরস্কার করে। যোগেশের হৃদয়ে তাহাই গভীর ক্ষত সৃষ্টি করিয়াছে। যোগেশ তাহার নিকট প্রেম পাইবার আশা করে নাই, কিন্তু তাহার ঘৃণা যোগেশের হৃদয়কে ক্ষতবিক্ষত করিয়া দিতেছে। যোগেশের দুঃখ—

প্রতিদান নাহি দিল নহি দুখী তায়
দুখী শুধু তার সেই দারুণ ঘৃণায়।—(২য় সং, ৭ম সর্গ, ৮২ পৃঃ)

তাই সে ব্যর্থতায়-ক্ষোভে-লজ্জায় স্ত্রী-পুত্র-পরিজন সকলকে ত্যাগ করিয়া নির্জ্জন পর্ব্বতগুহায় ও সমুদ্রতটে দিন কাটাইতেছে। তাহার বেদনা-জর্জ্জরিত হৃদয়ের প্রতিচ্ছবি কবি সুন্দর আঁকিয়াছেন। সে ভাবিতেছে—

জ্বলন্ত যন্ত্রণা শুধু, অন্তরে আমার
আবর্ত্তিয়া পরিখায় ভ্রমিছে ছুটিয়া।

পিপাসা আমার—ওই বেলাভূমি মত
পড়িয়া রয়েছে বক্ষে অঙ্গার আবৃত।—(২য় সং, ১ম সর্গ, ৭ পৃঃ)

একদিকে সংসারের প্রতি কর্ত্তব্য করিতে পারিতেছে না বলিয়া তাহার অনুশোচনা অপরদিকে প্রেমের প্রচণ্ড আবেগে ব্যর্থতার দীর্ঘশ্বাস তাহাকে অহরহ দগ্ধ করিতেছে। তাহার শিক্ষা-দীক্ষা-কর্ত্তব্যবোধ সবই প্রণয়ের তীব্রতার নিকট লুপ্ত হইয়াছে। নিজেকে সংযত করিয়া সংসারে ফিরিবার চেষ্টায় সে ব্যর্থ-মনোরথ হইয়াছে। অন্তরের প্রচণ্ড বেদনা ও দুঃখ তাহাকে পর্ব্বত হইতে সমুদ্রতটে এবং সমুদ্রতট হইতে উপত্যকায় অশান্তভাবে ঘুরাইতেছে। তাহার দেহ শীর্ণ ও বেদনাব্যঞ্জক, কেবল নয়নে অগ্নি জ্বলিতেছে। যে অন্তর্দাহে তাহার জীবন দগ্ধ হইতেছে তাহাই জ্বলন্ত আকারে তাহার নয়নে স্ফুরিত হইতেছে। ব্যাধ তাহার বর্ণনা করিতেছে—

কি করুণ যুবা! শুষ্ক বদন তোমার!
জ্বলন্ত ভাবনা যেন রয়েছে মাখান
তব বদনমণ্ডলে, নয়ন ভেদিয়া
উঠিছে উথলি যেন ভীষণ যাতনা!—(২য় সং, ২ সর্গ, ১৫ পৃঃ)

নিরাশ ব্যর্থ হৃদয়ের জীবন্ত চিত্র এরূপভাবে আর কোন কাব্যে প্রকাশিত হয় নাই। ব্যাধ তাহার পরিচয় ও গৃহ সম্বন্ধে জানিতে চাহিলে সে আকাশের দিকে অঙ্গুলি-সঙ্কেত করিয়া যেন শূন্যতাকেই ব্যক্ত করিল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনা ও বর্ণনার ভিতর দিয়া কবির রচনানৈপুণ্যের যেমন পরিচয় পাওয়া যায় সেরূপ কবির অন্তর্দৃষ্টি ও উপলব্ধির আবেগও হৃদয়কে স্পর্শ করে।

যোগেশের বিবেক কখনও কখনও মৃত পিতার আত্মারূপে, কখনও ভাগ্য-রূপে, কখনও সর্পসঙ্কুল সমুদ্ররূপে তাহার সম্মুখে ভয়ঙ্কর ও দুঃখদায়ক চিত্র প্রতিবিম্বিত করিয়া তাহাকে সংসারের পথে ফিরাইবার চেষ্টা করিয়াছে কিন্তু কৃতকার্য্য হয় নাই। একদিন রাত্রে পর্ব্বতগুহায় বসিয়া সে মাতাপিতার আত্মাকে দেখিতে পাইল। পিতা যোগেশকে তিরস্কার করিয়া তাহার কর্ত্তব্যের ত্রুটিতে সংসারে মাতা, পত্নী, ভ্রাতা ও পুত্রের দুর্দ্দশার চিত্র দেখাইলেন। পূর্ব্ব-স্মৃতির প্রতি মমত্ব জাগাইবার জন্য তাহার পাঠকক্ষ ও শয়নকক্ষ দৃষ্টির সমক্ষে আনিলেন। যোগেশের চিত্ত বিচলিত হইল—কিন্তু নিজ হৃদয়-বেদনাকে সে জয় করিতে পারিল না। পিতার আত্মা ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়া গেলেন—

নির্ম্মম অলস ঘৃণ্য নির্ব্বোধ জনার,
ভবিষ্যৎ কিবা আর—যন্ত্রণা কেবল।—(২য় সং ৩য় সর্গ, ৩৩ পৃঃ)

যোগেশ জগতের সমস্ত কিছুর প্রতি নিরাসক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। দেবতার প্রতিও তাহার বিশ্বাস ছিল না। কিন্তু ভৈরবী যখন কহিলেন যে দেবতার কৃপায় মানুষের কষ্টের লাঘব হওয়া সম্ভব তখন দেবতার প্রস্তরমূর্ত্তির প্রতি চাহিয়া তাহার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। যোগেশ ভাবিল—

ভৈরব প্রস্তর মূর্ত্তি—তারে কেন হেরি
আমার এ শূন্য বক্ষঃ উঠিল কাঁপিয়া
তবে কি দেবতা সত্য—দেবনাম তবে
নহে কি মানব চিত্তে শুধুই সান্ত্বনা! —(৬ষ্ঠ সর্গ, ৬৭ পৃঃ)

ভৈরব-মূর্ত্তির প্রতি পুনরায় দৃষ্টিপাত করিয়া সে জ্ঞান হারাইয়া ফেলিল।

একটি ব্যর্থ জীবনের বেদনার চিত্র কবি পর্দ্দার পর পর্দ্দা অপসারণ করিয়া পাঠকের সমক্ষে তুলিয়া ধরিয়াছেন। তাহা ব্যথায় যেমন নিবিড়, নিরাশায় তেমনি মুহ্যমান—শুধু দুঃখ-দহনের অসহ্য যন্ত্রণায় সে ছটফট করিতেছে। একদিন যে জীবন সুন্দর ছিল, শিক্ষায়-দীক্ষায়, আশায়-আকাঙ্ক্ষায় পূর্ণ ছিল প্রেমের দুর্জ্জয় আকর্ষণে সেই জীবন সমস্ত বাসনা কামনা ও আকাঙ্ক্ষাকে সমূলে উৎপাটিত করিবার প্রয়াসে নিজ জীবনশুদ্ধ বিসর্জ্জন দিল। মানুষের চেতন ও অবচেতন মনের সংঘর্ষে একটি সতেজ সুন্দর জীবন ব্যর্থতার মরুভূমিতে নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল।

বিবেক পুনরায় ভাগ্যের মূর্ত্তি ধরিয়া তাহার সমক্ষে পতিসহ মন্দাকিনীর সুখময় জীবন দেখাইতে লাগিল। যেদিকে সে নয়ন ফিরায় সেই দিকেই এ চিত্র মূর্ত্ত হইয়া উঠিতে লাগিল। যোগেশের নিকট ঐ চিত্র অসহ্য। সে চীৎকার করিয়া অচৈতন্য হইয়া রহিল। এইভাবে ভাগ্যের সহিত সংগ্রাম করিতে করিতে তাহার জীবনদীপ নির্ব্বাপিত হইয়া আসিল। পুনরায় পিতৃ-আত্মা আসিয়া তাহাকে তিরস্কার করিলে সে নিজ অক্ষমতার কথা ব্যক্ত করিয়া কহিল—

কিন্তু কৈ পারিলাম মুছিতে সে ছায়া।—(১০ম সর্গ, ১১০ পৃঃ)

মৃত্যুকালে ভৈরবীর সহিত মন্দাকিনী আসিলে তাহার যে অন্তর্দ্বন্দ্ব ও ব্যথা প্রকাশিত হইয়াছে তাহা মর্ম্মস্পর্শী। মন্দাকিনী মৃত্যুকে বরণ করিবার জন্য যোগেশকে অনুযোগ করিলে যোগেশ কহিল—

বক্ষঃস্থল শূন্য আজ—নহিলে এখনি
দেখাতাম চিরি বুক হৃদয় আমার ;
ত্যজিতে এ পাপ তৃষ্ণা এই দীর্ঘকাল
এত যুঝিয়াছি আমি হৃদয়ের সনে,
নর প্রকৃতিতে তত পারে না যুঝিতে।
... .
আজ সে পিপাসা মম গেছে শুকাইয়া,
কিন্তু উন্মাদের জ্ঞান মরণের আগে।—(২য় সং, ১১ সর্গ, ১২৪পৃঃ)

মৃত্যু আসিয়া যোগেশকে ব্যর্থতার যন্ত্রণা হইতে মুক্তি দিল।

রমণীচরিত্র অঙ্কিত করিবার পূর্ব্বে কবি মাইকেলের ন্যায় বাণীদেবীর করুণা ভিক্ষা করিয়াছেন—

দেহ মাত! শ্বেতভুজে কবীশ জননী
অধমে করুণাবিন্দু, চিত্রি দুজনায়।—(২য় সং, ৫ম সর্গ, ৪৫ পৃঃ)

তারপর কবি নর্ম্মদা ও মন্দাকিনীর যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহাতে উভয়ের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য যেমন ফুটিয়া উঠিয়াছে নারী-মহিমার দুইটি বিভিন্ন দিক্‌ও তেমনি প্রকাশিত হইয়াছে।—

দুইটি সুন্দর মূর্ত্তি—দুইটি যুবতী,
যৌবন উদ্যানে দুই বিকচ কুসুম,
দুজনাই রূপবতী ; কিন্তু মন্দাকিনী
উষার নীহার ধৌত প্রফুল্ল নলিনী
দলে দলে স্নিগ্ধ কান্তি পড়েছে বিকাশি,
অনুরাগে স্ফীতবক্ষঃ গরবে উন্মুখ।
সায়াহ্নের সূর্য্যমুখী নিষ্প্রভ নর্ম্মদা,
সঙ্কুচিত দলগুলি অবনত মুখ
হৃদয়পল্লবে ঢাকা সুষমা অস্ফুট। —(২য় সং, ৫ম সর্গ, ৪৭ পৃঃ)

মন্দাকিনী যদিও গৌরাঙ্গী নয় তথাপি তাহার রূপে একটা আকর্ষণী শক্তি ছিল। তাহার অন্তরে দৃঢ়তা ও কোমলতার অপূর্ব্ব সমাবেশ। যোগেশ এইজন্যই আকৃষ্ট হইয়াছিল। যোগেশের প্রতিও মন্দাকিনীর ভ্রাতৃভাব ছিল। কিন্তু যখনই যোগেশের মনোভাব সে জানিতে পারিয়াছে তখনই তীব্র-

ভাষায় তাহাকে তিরস্কার করিয়াছে। যোগেশের সেই ব্যবহার মনে পড়িলেও সে উত্তেজিত হইয়া উঠে।

মন্দাকিনীর স্নেহশীল মন আবার যোগেশকে ক্ষমা করিবার জন্যও ব্যাকুল হয়।

কিন্তু আহা! অবোধেরে কি হবে দুষিয়া।
কে কোথায় ভ্রমশূন্য কুটিল সংসারে?—(২য় সং, ৫ম সর্গ, ৬০ পৃঃ)

সখী নর্ম্মদাকে সে ভগ্নীর ন্যায় ভালবাসে। বিরহিণীর দুঃখের দিনগুলিকে সে-ই একমাত্র নিজ স্নেহপ্রীতি ও সান্ত্বনা দিয়া ভরিয়া রাখিয়াছিল। নর্ম্মদার প্রতি চাহিয়া সে যোগেশের প্রতি নিজ ক্রোধকে সংযত করিত এবং বেদনা বোধ করিত। তাহার মনে হইত—

আমারি হয়েছে ভ্রম—সে সময় যদি
মিষ্টভাষে বুঝাতাম ধরি করযুগ,
হেন সর্ব্বনাশ তবে হইত কি আজ
সেই মম অপরাধ—সেই মম পাপ। —(২য় সং, ৫ম সর্গ, ৬১ পৃঃ)

ভৈরবী আসিয়া যোগেশের সংবাদ দিলে মন্দাকিনী প্রথমে ক্রুদ্ধ হইল। নিজ পত্নীর কথা না ভাবিয়া যে ব্যক্তি কেবল তাহার চিন্তা করে তাহাকে সে ক্ষমা করিতে পারিতেছিল না। সে কহিল—

মরিতে বাসনা যদি এতই তাহার,
আমি কি করিব সে ত ইচ্ছাধীন তার।—(২য় সং, ৮ম সর্গ, ৯৩ পৃঃ)

নর্ম্মদা এই নিষ্ঠুর বাক্য শুনিয়া অচৈতন্য হইয়া পড়িলে মন্দাকিনী অনেক সেবা ও যত্নে তাহার চেতনা ফিরাইয়া আনিল। ভৈরবী তাহাকে যোগেশের প্রতি অন্ততঃ বাহ্যিক স্নেহ প্রদর্শন করিতে অনুরোধ করিলে সে কহিল—

পাষাণ নহেক মন্দা—এই বক্ষে মম
কত শ্রদ্ধা—কত ভক্তি—কি গভীর স্নেহ
আজো অস্তশালী-বাহী যোগেশের তরে
কে বুঝিবে এ সংসারে কে পারে বুঝিতে।
—(২য় সং, ৮ম সর্গ, ৯৬ পৃঃ)

মন্দাকিনী স্বামিপ্রেমে সুখী। স্বামীর অনুমতি লইয়া সব কাজ করে। যোগেশের মুমূর্ষু অবস্থার কথা শুনিয়া স্বামীকে লইয়া ভৈরবীর সহিত যোগেশের

নিকট গেল এবং মৃত্যুর পূর্ব্বে যোগেশের সন্তপ্ত হৃদয়ে একটু শান্তি দিতে প্রয়াস পাইয়াছিল।

মন্দাকিনী-চরিত্রটিকে কবি আদর্শরমণী-রূপে অঙ্কিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। সে স্বামিপরায়ণা—সংসারের কুলবধূ। কিন্তু বন্ধুর স্বামীর সহিত আলাপ করিতে ও পত্রাদি-বিনিময় করিতে তাহার সঙ্কোচ নাই। পরপুরুষকে সে সহোদরাধিক ভালবাসিতে পারে। অপরদিকে সে কর্ত্তব্য-পরায়ণ ও তেজোদৃপ্ত। অন্যায়কে সে সহ্য করিতে রাজী নয়। যে কর্ম্মকে সে পাপ মনে করে তাহাকে সে আঘাত করিতে দ্বিধা করে না। আবার তাহার পরদুঃখে কাতর হৃদয়ে অপরের প্রতি স্নেহেরও অভাব নাই। সে নর্ম্মদাকে নিজ স্নেহ ও প্রীতি দ্বারা পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে এবং তাহার দিক্ চাহিয়া যোগেশকে ক্ষমা করিতেও প্রস্তুত হইয়াছে। কঠোরতায় ও কোমলতায় চরিত্রটি অপূর্ব্ব শ্রীমণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে।

কাব্যে নর্ম্মদা-চরিত্রটি রামায়ণের সীতা চরিত্রের কথাই বারবার স্মরণ করাইয়া দেয়। নর্ম্মদা চিরদুঃখিনী। সীতা রাজকন্যা ও রাজকুলবধূ—স্বামীর প্রেমও তিনি যথেষ্ট পাইয়াছিলেন—অদৃষ্টচক্রে পড়িয়া তাঁহার ভাগ্যে দুঃখের অন্ত ছিল না। কিন্তু এই কাব্যের নর্ম্মদা-চরিত্রটি অধিকতর করুণ ও ভাগ্যবিড়ম্বিত। দেবতার মত স্বামী লাভ করিয়াও সে স্বামীর ভালবাসা পায় নাই। স্বামীর ভালবাসা যে পায় নাই—ইহাও সে জানিত না। সে সরলা, স্নেহশীলা, বিশ্বাসপ্রবণা। স্বামীর প্রতি ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও নির্ভরতা তাহার মনে ক্ষণিকের জন্যও কোন সংশয় বা সন্দেহ জাগায় নাই। স্বামী নিরুদ্দেশ হইলেও তাহার মনে স্বামীর প্রতি ভক্তি ও ভালবাসা অটুট ছিল। একদিন মন্দাকিনীর মুখ দিয়া যখন অলক্ষ্যে বাহির হইল—

যোগেশ! এই কি তব নিরমল স্নেহ।

—(২য় সং, ৫ম সর্গ, ৫১ পৃঃ)

তখন নর্ম্মদা অত্যন্ত ব্যথা পাইয়া অশ্রুপূর্ণ-লোচনে সখীকে কহিয়াছিল—

কেন নিন্দ মন্দাকিনী প্রাণেশে আমার
তাঁর কিবা অপরাধ, আমি অভাগিনী।
আমার অদৃষ্টে বিধি না লিখিলা সুখ।

—(২য় সং, ৫ম সর্গ, ৫২ পৃঃ)

নিরুদ্দিষ্ট স্বামীর জন্য তাহার নানা চিন্তা। স্বামি-বিরহে তাহার নিজ জীবনকে অসহ্য বোধ হয় তথাপি সে প্রাণত্যাগ করিতে পারে না। স্বামী ফিরিয়া আসিয়া তাহাকে না দেখিয়া যদি ব্যথা পান—তাই সে দুঃখের দিনগুলি প্রতীক্ষায় কাটাইতে থাকে। একদিন মন্দাকিনীকে সে হৃদয়ভাব ব্যক্ত করিয়া কহিল—

কিন্তু প্রাণনাথ যদি থাকেন জীবিত,
ফিরিয়া আসেন যদি আলয়ে আবার।
তখন শুনিলে মম মরণ সংবাদ
ব্যথিবে যে সখি তাঁর কোমল অন্তর।—(২য় সং, ৫ম সর্গ, ৫৪ পৃঃ)

পুত্রমুখ দর্শন করিয়া আবার সে আশায় বুক বাঁধে। কবি তাহাকে কেবল মানসিক দুঃখ দিয়াই নিরস্ত হন নাই। তাহার মাতাপিতা দরিদ্র। যোগেশের মাতার মৃত্যুর পর শ্বশুরগৃহেও তাহার থাকিবার উপায় রহিল না। সে পুত্র লইয়া পিতৃগৃহে বাস করিতেছিল। আর্থিক অনটনও তাহার জীবনে কষ্টের কারণ হইয়াছিল।

ভৈরবীর বাক্যে মন্দাকিনী যোগেশের উদ্দেশ্যে কর্কশ বাক্য প্রয়োগ করিলে নর্ম্মদা হয়তো স্বামীর নিরুদ্দেশের কারণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিল এবং চেতনা হারাইয়াছিল। জ্ঞান ফিরিলে মন্দাকিনীর কথার উত্তরে সে শুধু 'হাঁ,' 'না' ব্যতীত কিছুই কহিতে পারে নাই। অবশেষে যোগেশের মৃত্যুর দিন প্রাতে তাহার হস্তে মাথার সিঁদুর মুছিয়া গেলে সে স্বামীর অমঙ্গল-আশঙ্কায় চেতনা হারায় এবং স্বামীর পূর্ব্বেই ইহধাম ত্যাগ করে।

যোগেশের মৃত্যুর পর কাব্যটি সমাপ্ত হইলেই ভাল হইত। কবি তাহার পরেও যোগেশের ও নর্ম্মদার দুইটি আত্মাকে শূন্যপথে লইয়া গিয়াছেন। নর্ম্মদার আত্মাকে সতীকুঞ্জে স্থাপন করিয়া অশেষ যশ ও সুখের ভাগী করিয়াছেন এবং যোগেশের আত্মাকে তাহারই নিম্নে রাখিয়া দুঃখভোগ করাইয়াছেন। এই অংশটুকুতে কাব্যরস ব্যাহত হইয়াছে।

প্রকৃতি-বর্ণনায় কবি সর্ব্বত্র মানবীয় মনোভাব আরোপ করিয়াছেন। সন্ধ্যার বর্ণনা—

ধূসরবরণা মহী উচ্চতরু আর,
শূন্যভেদী গিরিশৃঙ্গ, সাগর তটিনী,

বিষণ্ণ ভাবেতে যেন মেলিয়া নয়ন
সেই রবি অস্ত পানে রয়েছে চাহিয়া।—(২য় সং, ৪র্থ সর্গ, ১৪ পৃঃ)

জ্যোৎস্নাবিধৌত সমুদ্রের বর্ণনা—

চন্দ্র করে বিভাসিত অকূল জলধি
ধূ ধূ করিতেছে শুধু স্বপনের মত।—(২য় সং, ১০ম সর্গ, ১০৫ পৃঃ)

সম্পূর্ণ কাব্যটিই অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত। ভাষা জোরাল, সুন্দর, সাবলীল ও আন্তরিকতাপূর্ণ। কাব্যে চারিটি সঙ্গীত আছে। ইহা দ্বাদশ সর্গে সমাপ্ত।

'যোগেশ'-কাব্যে গীতিকাব্যের সুর প্রধান। ইহা প্রেমিক-হৃদয়ের ব্যর্থতার দীর্ঘশ্বাস ও হতাশার গ্লানিতে ভরা। সাধারণ শিক্ষিত ব্যক্তির সুখদুঃখের কাহিনী কাব্যটিতে স্থান পাইয়াছে—রাজপরিবারের ঐশ্বর্য্যের আড়ম্বর ইহাতে নাই। মানব-হৃদয়ের গভীরতা ও বেদনার আলোড়ন ইহাতে চিত্রিত হইয়াছে। তাহা ছাড়াও যে আন্তরিকতা ও আবেগ কাব্যের ছত্রে ছত্রে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে তাহা দ্বারাই কাব্যটি গাথাকাব্যের পর্য্যায়ভুক্ত হইয়া সজীব হইয়াছে। নায়কের প্রতি কবির সহানুভূতির অভাব নাই—যাহা সে-যুগের কাব্যে দৃষ্ট হইত না। নায়ক কর্ত্তব্য করে নাই বলিয়া কবি তাহাকে দিয়া নরক-যন্ত্রণা ভোগ করাইয়াছেন—কিন্তু অন্তর হইতে তিনি নায়ককে অপরাধী করিতে পারেন নাই। যোগেশ যেন ভাগ্যের বিপর্য্যয়ে অন্যায় করিয়াছে—তাহার নিজের দোষ নাই। মন্দাকিনী ও নর্ম্মদার চরিত্র দুটিও সুন্দর। কাব্যের ভিতর আখ্যানভাগ কম।, কবি মানব-মনের রহস্যদ্বার উদ্‌ঘাটনে সিদ্ধহস্ত—এবং তাহারই বর্ণবিন্যাস কাব্যটিকে মনোরম করিয়াছে।

(২)

স্বপ্ন-প্রয়াণ—কবি দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত 'স্বপ্ন-প্রয়াণ' কাব্যটি ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ইহা একটি অন্তর্ভাবিত রূপক গাথা-জাতীয় কাব্য। একটি রোমান্টিক পরিবেশের মধ্যে কবির মনোরাজ্যের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। কবি-জীবনের নিগূঢ় সত্য ও তথ্য ইহার মধ্যে রূপায়িত দেখা যায়। ভাষা যেমন সহজ সরল তেমনি চিত্রধর্ম্মী ও ভাবসমৃদ্ধ। কবির অন্তর্জীবনের আলেখ্য যেন পাঠকের চোখের সামনে সহজভাবে আসিতেছে ও পরিবর্ত্তিত

হইতেছে। ভাষা গাথাকাব্যের উপযোগী—সহজেই প্রাণের ভিতর ঝঙ্কার তুলে—কিন্তু কোথাও দাঁড়ায় না বা গভীর রেখাপাত করে না। স্বপ্নে-দৃষ্ট দৃশ্যের ন্যায় কতগুলি দৃশ্য চোখের সামনে দিয়া চলিয়া যায় এবং পরে ভাবিতে গেলে অনেক বড় সত্য আত্মপ্রকাশ করে। 'স্বপ্ন-প্রয়াণ' সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—

"স্বপ্ন-প্রয়াণ যেন একটা রূপকের অপরূপ রাজপ্রাসাদ। তাহার কত রকমের কক্ষ গবাক্ষ চিত্র মূর্ত্তি ও কারুনৈপুণ্য। তাহার মহলগুলিও বিচিত্র। তাহার চারিদিকের বাগানবাড়িতে কত ক্রীড়াশৈল, কত ফোয়ারা, কত নিকুঞ্জ, কত লতাবিতান। ইহার মধ্যে কেবল ভাবের প্রাচুর্য্য নহে, রচনার বিপুল বিচিত্রতা আছে। সেই যে একটি বড়ো জিনিসকে তাহার নানা কলেবরে সম্পূর্ণ করিয়া গড়িয়া তুলিবার শক্তি সেটি তো সহজ নহে। ইহা যে আমি চেষ্টা করিলে পারি, এমন কথা আমার কল্পনাতেও উদয় হয় নাই।"

—(জীবনস্মৃতি, ১৩৫০ সং, ৮২ পৃঃ)

কাব্যের নায়ক কবি। শৈশবকাল হইতেই কল্পনাদেবীর সহিত তাহার পরিচয়। একদিন নিদ্রাভিভূত হইলে স্বপ্নের মধ্যে কবি মনোরথে আরোহণ করেন এবং সারথিরূপে কল্পনার সাক্ষাৎ লাভ করেন। অনেকদিন পর কল্পনাকে দেখিয়া তিনি বিস্ময়ে, আনন্দে ও প্রেমে অভিভূত হইয়া পড়েন। তাঁহার অবস্থা—

স্তব্ধ পুলকিতচ্ছবি কবিবর, মুখে নাই ভাষা। —(৪ পৃঃ)

আবেগ কমিলে তিনি কল্পনাদেবীকে কহিলেন—

কত কাল পরে আজি ভাগ্যোদয়।
পূর্ব্বে সে যখন তুমি দেখা দিতে সে এক সময়।
জাগিছে সে সব,
যেন অভিনব।
যতনের বস্তু সে যে, বচনের নয়। —(৪ পৃঃ)

কল্পনাদেবী মনোরাজ্যে কবিকে লইয়া গিয়া কবির প্রয়োজনের নিমিত্ত সখ্য-রসকে পাঠাইবেন কহিয়া চলিয়া গেলে কবির নিকট সমস্ত ভুবন শূন্য বোধ হইল।

সখ্যরসের সহিত কবি নানা স্থান ভ্রমণ করিলেন—আনন্দ রাজার প্রাসাদে গেলেন—আনন্দ রাজার জ্যেষ্ঠপুত্র প্রমোদের বিলাসরাজ্যে অবস্থিতির সংবাদ শুনিলেন—যমজ দুইটি পুত্র হরষ ও উল্লাসকে দেখিলেন—রাণী মায়াদেবীর

সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং রাণীর দাসী রাজসী কবির চক্ষে মায়াঞ্জন দিলে তিনি বিরহিণী কল্পনাদেবীকে দেখিতে পাইলেন। সন্ধ্যাভ্র-গিরি-শিখরে কল্পনাদেবী এক অট্টালিকার বাতায়নে দাঁড়াইয়া ছিলেন। কবির বিরহে কল্পনাদেবীর মনে স্বস্তি নাই—

হেতায় রম্য, অটবী,
কোথায় হায় কবি,
জাগিছে তারি ছবি,
কল্পনা প্রাণে। —(৪৫ পৃঃ)

তারপর মায়াদেবীর অপর সহচরী তামসীদেবীর প্রভাবে কবির মনে বিরহের হতাশ্বাস জাগিল এবং কল্পনাদেবীর দৃশ্যও অন্তর্হিত হইল।

দারুণ বিরহে কবিবর দহে।
মরম ভেদিয়া বাহিরয় শ্বাস, যাতনা না সহে। —(৪৯ পৃঃ)

সখ্যরস কবিকে সান্ত্বনা দিয়া প্রমোদের রাজ্য বিলাসপুরে লইয়া গেলেন। প্রমোদের সংসর্গে কবি আদিরসের প্রেয়সী লালসাদেবীর প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। লালসাদেবীর বর্ণনা—

ভুরু-ধনুতে করে কুরুক্ষেত্র
তনুতে নাহি রহে প্রাণ। —(৬১ পৃঃ)

তাহার গীত শুনিয়া কবি মুগ্ধচিত্তে তাহার বক্ষে পুষ্প নিক্ষেপ করিলে লালসার হৃদয়ও কম্পিত হইল। কবি আবেগবিহ্বলচিত্তে কল্পনাদত্ত মালাটি তাহাকে অর্পণ করিলেন। আদিরস ক্রুদ্ধ হইলেন এবং হাস্যরসের দ্বারা কল্পনাদেবীর নিকট সংবাদটি দিয়া মালাটি পাঠাইলেন। কবি এদিকে সখ্যরসের সহিত ভ্রমণ করিতে করিতে কুঞ্জবনে কল্পনাদেবীকে দেখিতে পাইলেন।

কবিকে দেখিয়া নিজ মনোব্যথা ব্যক্ত করিয়া মালা ছুড়িয়া দিয়া কল্পনাদেবী কবিকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

কবি-জীবনের একটি অতি বড় সত্যের দ্বার এস্থানে উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। সংযতচিত্তে প্রমোদ বিলাস লালসা প্রভৃতি প্রবৃত্তিগুলিকে জয় করিতে না পারিলে কবির আবেগ ও ভাবপ্রবণতা কবিকে বিষাদের মধ্যে ধ্বংসের পথে লইয়া যায়। সুন্দর তাঁহার অন্তর হইতে অন্তর্হিত হয়—কল্পনাদেবীর জ্যোতির্ময় রূপ অদৃশ্য হয়—তখন অসুন্দর পাতালের পথে কবির যাত্রা সুরু হয়।

কল্পনাদেবী ত্যাগ করিয়া গেলে কবি বিষণ্নমনে সখ্যরসের উপদেশ ও সান্ত্বনাবাণী না শুনিয়া একাকী ভ্রমণ করিতে করিতে এক অন্ধকার রাজ্যে গিয়া পড়িলেন। চেতনাদেবী বিমল দ্যুতিতে উদ্ভাসিত হইয়া তাঁহাকে ফিরাইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু কবির তখন ফিরিবার মত অবস্থা ছিল না। চেতনাদেবী অন্তর্হিত হইলে কবি বিষাদপুরে দেখিলেন—

করিয়া জয়
মহা প্রলয়,
বাজিয়া উঠিল বাজনা নানা।
তাল বেতাল
দিচ্ছে তাল,
ধেই ধেই নাচে পিশাচ দানা॥ —(৯১ পৃঃ)

সেখানে কবি আধিব্যাধি-কর্তৃক ধৃত হইয়া রাজা হাহাহূহূর নিকট নীত হইলে রাজা কবির আঙ্গুলে শত্রুরাজ প্রমোদের অঙ্গুরী দেখিয়া কবিকে বলি দিবার জন্য ভয়ানকরাজের নিকট পাতালে প্রেরণ করিলেন।

বিষাদপুরের রাজসভার বর্ণনা—

বলিছে উল্লুক, আমারি মুল্লুক!
খঞ্জনি বাজাওরে বিড়াল ভায়া,
নাচরে ভল্লুক। —(১০০ পৃঃ)

বর্ণনার ভিতরেই যেন এক বীভৎস ও অদ্ভুতরসের চিত্র ফুটিয়া উঠে। দেহের ন্যায় মনেরও অসুখ-বিসুখ আছে এবং সংযম হারাইলে সে সেই ব্যাধির হস্তে পড়িয়া নানাবিধ বীভৎস ভাবের বন্যায় ভাসিতে থাকে।

রাজার আদেশে আধিব্যাধি কবিকে পাতালের পথে লইয়া চলিল। কবি দেখিলেন—

যত যেথাকার
বিকট আকার,
জড়ো হইয়াছে সবে আঁধার করিয়া॥ —(১১৬ পৃঃ)

সেখানে অত্যাচার-পিশাচ, মারী-নিশাচরী, দুর্ভিক্ষ-অসুর, দ্বেষহিংসা-দানা প্রভৃতি সকলের হুঙ্কার ও আত্মম্ভরিতা দেখিয়া কবি ভীত হইলেন।

ভয়ানকরাজ বলি দিবার নিমিত্ত কবিকে ভৈরবের হস্তে সমর্পণ করিলেন। কবি অশ্বত্থ বৃক্ষের সহিত বাঁধা রহিলেন। ভৈরব কালিকার পূজা করিতে লাগিলেন। কালিকার স্তবের মধ্যেও এক ভয়ঙ্কর ভাব ঝঙ্কৃত হইতে দেখা যায়; যেমন—

জয় দেবি ভয়ঙ্করী
নিখিল প্রলয়ঙ্করী!
যক্ষ রক্ষ ডাকিনী সঙ্গিনী!
ঘোর কাল রাত্রি রূপা!
দিগম্বর বুকে দু পা!
রণ রঙ্গ মত্ত মাতঙ্গিনী! —(১২৫ পৃঃ)

কালিকাদেবী আবির্ভূত হইলেন। কবি ভয়ে মায়াদেবীকে ডাকিতে থাকিলে করুণাদেবী তাঁহাকে উদ্ধার করেন এবং পথে একটি গহ্বরে অত্যাচার-দৈত্য দ্বারা ঋতুরাজকন্যা প্রমদার লাঞ্ছনা দেখিতে পান। প্রমদা অত্যাচারের প্রণয়-ভিক্ষায় কর্ণপাত না করিলে অত্যাচার দুই ভগ্নী ঈর্ষ্যা ও বড়াইকে আহ্বান করেন। তাহাদের রূপের ও চরিত্রের বর্ণনা অপূর্ব্ব হইয়াছে—

চিবায়ে কড়াই, বলিছে বড়াই,
হুঁয়ে মোর কাঁপে লোক, ফুঁয়ে আমি পর্ব্বত নড়াই।
পড়িয়া সরিষা
বলিছে ঈরিষা
হাসি মুখ যত আছে পুড়ি হোক ছাই! —(১৩৬ পৃঃ)

করুণাদেবী প্রমদাকে উদ্ধার করিলেন। পথে ভয়ানকরাজের সহিত যুদ্ধের নিমিত্ত আনন্দরাজ-কর্ত্তৃক প্রেরিত সেনাপতি বীররসকে দেখিয়া করুণাদেবী কবিকে তাঁহার নিকট অর্পণ করিয়া অন্তর্দ্ধান করিলেন। বীররস ও ভয়ানক-রসের অধীনে দুই দল সৈন্যের ভিতর তুমুল যুদ্ধ হইল। অবশেষে বীররস জয়লাভ করিলেন। এই যুদ্ধ ও হতাহত সৈন্যগণকে দেখিয়া কবির মনে বৈরাগ্য আসিল এবং করুণাদেবীর কৃপায় তিনি সুসঙ্গকে সঙ্গী পাইলেন। তারপর শমদমের আশ্রমে পাশব বৃত্তিসমূহের উচ্ছেদ—শ্রেয় ও প্রেয় পথের আলোচনা—কুহক বিঘ্ন প্রভৃতি দ্বারা পথরোধ ও পতনের পথে আকর্ষণ এবং তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া কবির অগ্রসর বর্ণিত হইয়াছে।

চারিদিকের বাধাবিঘ্ন দুঃখকষ্ট দেখিয়া কবির চিত্তে বেদনাবোধ জাগরিত হইলে সুসঙ্গ তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া কহিলেন—

কবি তুমি—কিসের দুঃখ তোমার, ব্যথা পেলে প্রাণে
ফুটিয়া কহিতে পার বেদনা, জগত জন কানে। —(২১২ পৃঃ)

প্রকাশের মধ্যেই কবির আনন্দ—ইহাই যেন এই ছত্রটিতে ব্যক্ত হইয়াছে। সুসঙ্গের স্নেহের স্পর্শে কবির জড়তা দূর হইল। তিনি ধর্ম্মকে অবলম্বন করিয়া সাম্যের পথে চলিলেন। সমস্ত বিশ্বের রূপ একীভূত হইয়া কবির চক্ষে প্রতিভাত হইল—

খুলি গেল দিগন্ত সকল দিকে ;
পর্ব্বত পাথার ব্যোম দেখা দিল একৈ নিমিখে। —(২৯৫ পৃঃ)

সাম্যের ক্ষেত্রে আনন্দ-ভূপতি বীর, কল্যাণ, প্রমদা, কল্পনা ও শোভাকে লইয়া আসিলেন। সকলে আনন্দে মগ্ন হইলেন। সুসঙ্গের পরামর্শে কবি শান্তিদেবীর ধ্যান করিয়া তাঁহার সাক্ষাৎ লাভ করিলে পুণ্যলোক হইতে সত্য, ধর্ম্ম, শর্ম্ম, শ্রী, হ্রী, ধী, করুণা, ক্ষমা, পরা বিদ্যা, শ্রদ্ধা, প্রীতি প্রভৃতি আগমন করিলেন। আনন্দ-ভূপতি সত্যদেবকে সাক্ষী রাখিয়া কল্পনাদেবীর সহিত কবির, শোভার সহিত কল্যাণের এবং প্রমদার সহিত বীরের বিবাহ দিলেন। চারিদিক্ হইতে ব্রহ্মের জয়ধ্বনি গীত হইতে লাগিল।

কবির নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। তখন প্রায় নিশা-অবসান হইয়া আসিয়াছে —বিশ্বচরাচর নিদ্রায় অভিভূত—কবি উদ্যানে আসিয়া দেখিলেন—

নিঃশব্দ তরঙ্গবতী
চলে গঙ্গা ভাগীরথী
ধীরে ধীরে সাগরের পানে॥ —(২২৭ পৃঃ)

এই কয়টি পঙ্‌ক্তিতে কবি হয়তো মানস-ভাগীরথীর বিভিন্ন উত্থান-পতনের মধ্য দিয়া নিঃশব্দে অনন্তের পথে যাত্রার ইঙ্গিত করিয়াছেন।

কবিচিত্তের আনন্দ বিভ্রম ও পরম কাম্যকে প্রাপ্তি—মানববৃত্তিগুলির রূপকের মধ্যে সুন্দরভাবে ব্যক্ত হইয়াছে।

ইহাতে সাতটি সর্গ আছে এবং তাহাদের নামকরণ—মনোরাজ্য প্রয়াণ, নন্দনপুর প্রয়াণ, বিলাসপুর প্রয়াণ, বিষাদপুর প্রয়াণ, রসাতল প্রয়াণ, সমর প্রয়াণ, শান্তি প্রয়াণ হইয়াছে। ছন্দে পয়ার, পয়ার ও চৌপদীর মিশ্রণ,

কোথাও ক ক ক ক খ খ খ ক রূপে অন্তপদের মিল, কোথাও ক ক খ খ ক রূপে পাঁচ পঙ্‌ক্তির স্তবক ব্যবহৃত হইয়াছে। ছন্দের মধ্যে অনেক পরিবর্ত্তন ও নূতনত্ব দৃষ্ট হয় এবং ইহা দ্বারা কাব্যটি সরস ও গতিশীল এবং সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। রূপকের আবরণে আধ্যাত্মিকতার ব্যাখ্যা পৌরাণিক আখ্যায়িকা কাব্যগুলিতে অনেকদিন আগে হইতেই প্রচলিত ছিল। কিন্তু সেই কাব্যগুলির সহিত এই 'স্বপ্নপ্রয়াণ'-কাব্যটির অনেক পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হয়। ইহার প্রকাশ-ভঙ্গির মধ্যে এবং কাহিনীর উপস্থাপনার মধ্যে রোমাণ্টিক সুর প্রধান—কাব্যের অন্তর্গত গভীর তত্ত্ব ইহার কাব্যরসকে কোথাও ক্ষুণ্ণ করে নাই।

ছায়াময়ী-পরিণয়—শিবনাথ শাস্ত্রী কর্ত্তৃক রচিত 'ছায়াময়ী-পরিণয়' কাব্যটি ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই কাব্যটি রচনা সম্বন্ধে কবি ভূমিকায় লিখিয়াছেন—

"দুই বৎসর গত হইল, অতি সহজ ভাষায় লিখিত একখানি ইংরাজী রূপক কাব্য পড়িতেছিলাম। তাহার মধ্যে একটি গভীর আধ্যাত্মিক উপদেশ আছে; অথচ তাহার ভাষা এরূপ সরল যে বালকেও পড়িতে ও বুঝিতে পারে। তখন মনে হইল সহজ ভাষায় ও সহজ ছন্দে বাঙ্গালাতে এরূপ কোন রূপক কাব্য করা যায় কি না, যাহার ছন্দ ও ভাষা আবালবৃদ্ধবনিতা সকলের সুখপাঠ্য হইবে, অথচ তাহার মধ্যে কোন প্রকার আধ্যাত্মিক তত্ত্ব থাকিবে। তদনুসারে এই গ্রন্থখানি লিখিতে আরম্ভ করি।"

'ছায়াময়ী-পরিণয়' কাব্যটিকে অন্তর্ভাবিত রূপক গাথা-জাতীয় কাব্য বলা যাইতে পারে। ইহার ভাষা এবং ছন্দ অত্যন্ত সহজ সরল ও গতিশীল। ইহাতে গভীর সত্য নিহিত থাকিলেও কাহিনীর ভিতর কোথাও ভাবের বা প্রকাশের দুরূহতা নাই। কাব্যটির সারমর্ম্ম বুঝিতে আবালবৃদ্ধবনিতার কোনরূপ কষ্ট হয় না। গাথাকাব্যের ছন্দ ভাষা ও ভঙ্গির ভিতর দিয়া একটি দার্শনিক তত্ত্বের সহজ প্রকাশ লেখকের লিপিকুশলতার পরিচায়ক।

কাব্যের অন্তর্নিহিত ভাবটি হইতেছে—সহজ সরল সুন্দর প্রাণে দেবতার আহ্বান সহজেই ধ্বনিত হয় এবং তাহাকে আনমনা করিয়া দেয়। মাঝে মাঝে দেবতার জ্যোতির্ম্ময় স্নিগ্ধ মূর্ত্তি অতর্কিতভাবে দর্শন দিয়া তাহাকে আকুল করিয়া তুলে। তখন পৃথিবীর সমস্ত রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ, ভোগ-ঐশ্বর্য্য, সুখ-আরাম তাহার নিকট নিরর্থক বলিয়া মনে হয়। পরম পুরুষের প্রেমময় মধুর আহ্বান

শুনিবার জন্য সে উন্মুখ হইয়া থাকে—জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি দেখিতে পাইতেছে না বলিয়া কাঁদিয়া আকুল হয়। তারপর কামনা ও সাধনাকে সঙ্গী করিয়া জ্যোতির্ম্ময় পুরুষের আবাসস্থান আনন্দধামের উদ্দেশ্যে তাহার যাত্রা সুরু হয়। কামনা তাহার মনে আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া রাখে—সাধনা তাহাকে পথ দেখাইয়া দেয়। পথিমধ্যে বিনয় ও শ্রদ্ধা তাহাদের সঙ্গী হয়। নানারকম প্রবৃত্তি তাহাদের বিভ্রান্ত করিবার চেষ্টা করে। সাধনা সর্ব্বত্রই ভ্রান্তিকে অপসারিত করিয়া দেয়। শোচনা তাহাদের সঙ্গী হয়। তারপর প্রলোভন-রাজার অনুচর অলসের প্ররোচনায় এবং শঠতা ছলনা-মায়ার কুহকে পড়িয়া কাম-রাজার হস্তে লাঞ্ছিত হইবার পূর্ব্বমুহূর্ত্তেই সে সাধনা ও বিবেক-বৈরাগ্য-সংযমের সাহায্যে শত্রুদলকে পরাজিত করিয়া গন্তব্যপথের উদ্দেশ্যে চলে। পথে নিরাশা নদী ও সংশয় কুয়াশা বাধা দিলেও তাহারা আনন্দধামে পৌছায় এবং পবিত্রতা তাহাদের মর্ত্ত্যের বসন-ভূষণ পরিত্যাগ করাইয়া জ্যোতির্ম্ময় করিয়া তুলে। সরলতা ও দীনতার নিকট শিক্ষালাভ করিয়া তাহারা মহাগীতের মধ্যে আলোকের রাজ্যে প্রবেশলাভ করে। জ্যোতির্ম্ময় পুরুষের সহিত রমণীর বিবাহ হইলে উভয়ে একাত্ম হইয়া যায় এবং জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ জ্যোতির আকারে রমণীর ভিতর অবস্থান করিতে থাকেন।

এই তথ্যটিকে একটি রোমান্টিক আবেষ্টনী ও ভাবের মধ্য দিয়া কবি সুন্দর-ভাবে রূপ দিয়াছেন।

বিষয়-নামক ধনী ব্যক্তির একমাত্র কন্যা ছায়াময়ী। সে সুন্দরী ও পিতার অত্যন্ত আদরের কন্যা। কবি তাহার পরিচয় দিয়াছেন—

ছায়াময়ী স্বর্ণলতা বাপ-সোহাগী মেয়ে,
রূপের প্রভায় উঠ্‌লো ফুটে যৌবনে পা দিয়ে। —(১ পৃঃ)

কিন্তু এই হাসিখুশীভাব তাহার রহিল না। এক মধুর আহ্বান তাহাকে উতলা করিয়া তুলিল, প্রেমের আবির্ভাবে সমস্ত জীবনের ধারা পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। তাহার অবস্থা—

আহার বিহার ছায়াময়ী ভাল না বাসে ;
পিতা এলে হাসি মুখে ছুটে না আসে ;
গভীর গভীর ভাব যেন তার সখীরা ভয় পায়
দূরে দূরে সদাই ফিরে পুছিতে ডরায়। —(৫ পৃঃ)

পিতার প্রশ্নে সে জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ এবং তাঁহার আহ্বান জানাইয়া সেই জ্যোতির্ম্ময় পুরুষকে আনিয়া দিতে কহিল। পিতা পুরুষ বন্ধু আনিয়া দিলেন এবং একজনের সহিত কন্যার বিবাহ দিবার স্থির করিলেন। কিন্তু জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ পুনরায় আসিয়া ছায়াময়ীকে ব্যাকুল করিয়া তুলিলেন। এইবার তাঁহার আগমনও যেমন রোমান্টিক, তাঁহার কথাও সেরূপ রোমান্টিক। ছায়াময়ী শ্রান্ত হইয়া বৃক্ষতলে নিদ্রিত হইলে কাহার চুম্বন-স্পর্শে নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। সে দেখিল গাছের আড়ালে কে চলিয়া যাইতেছে। ডাকিতে ডাকিতে তাহার পিছু ছুটিয়া ছায়াময়ী সেই জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি দেখিতে পাইল এবং শুনিল—

আর কিছু নাই তোমারে চাই শুন সরলে।
আনন্দধাম আমার নগর তথায় তোমারে
রাখবো লয়ে ছায়াময়ি প্রাণের আগারে। —(২৭ পৃঃ)

মূর্ত্তি অদৃশ্য হইলে ছায়াময়ীর বিরহ আরম্ভ হইল। সে কাঁদিয়া কাঁদিয়া প্রেমিক পুরুষকে ডাকিতে লাগিল—

সহেনা এ অন্ধকার শূন্য দেখি ত্রিসংসার,
অনুতাপে প্রাণ পুড়ে যায় ;
দেখা দাও ধরি দুটী পায়। —(৩০ পৃঃ)

তারপর দুই সখীর সহিত গৃহত্যাগ করিয়া তাহার যাত্রা ও অন্বেষণ সুরু হইল।

নিসর্গ-বর্ণনায়ও কবির ভাবের সহজ প্রকাশ মুগ্ধ করে—

পূর্ব্বাকাশে অরুণ হাসে, কি সুন্দর তার প্রভা।
আগুন যেন লাগলো কোথা দেখা যায় তার আভা।
কোমল কোমল ধরার মুখটি বড়ই মিষ্টি লাগে।
শিশির কণায় মুক্তা কে তায় পরায়েছে সোহাগে। —(৪২ পৃঃ)

শঠতা, মায়া, ছলনা তিনটি ভগ্নীর বর্ণনাও তাহাদের চরিত্রকে আমাদের চক্ষের সামনে মূর্ত্ত করিয়া তুলে। শঠতার বর্ণনা—

মুখখানি তার বড়ই মিষ্টি নামটী শঠতা।
সদাই হাসে, চোখে মুখে কতই কয় কথা। —(৮৭ পৃঃ)

ছলনা ও মায়ার বর্ণনা—

যেমনি রূপ তেমনি সাজ সদাই হাসিছে ;
প্রাণটা যেন মুখের উপর সদাই ভাসিছে।

ছুটা যেন প্রজাপতি রয় কোনো ফুলে,
কোমল কোমল মধু খেয়েই বাঁচে ভূতলে। —(৯২ পৃঃ)

আনন্দধামে পৌছিলে ছায়াময়ীর সহিত জ্যোতির্ম্ময় পুরুষের, সাধনার সহিত বিবেকের, কামনার সহিত সংযমের এবং শোচনার সহিত বৈরাগ্যের বিবাহ হইল। ছায়াময়ী পুনরায় পিতার নিকট ফিরিয়া আসিয়া মানব-সেবায় আত্মনিয়োগ করিল।

কাব্যটিতে সাতটি সর্গ আছে এবং পয়ার, ত্রিপদী, চৌপদী ও ক ক খ খ ক ক রূপে স্তবকে অন্তপদের মিল লক্ষিত হয়। অনেক স্থলে পঙ্‌ক্তির শেষ শব্দে ক্রিয়াপদ ব্যবহার করিয়া মিল আনা হইয়াছে এবং তাহাতে কাব্যে এক নূতন সুর ধ্বনিত হইয়াছে। ভাবে ভাষায় ছন্দে কাব্যটির মধ্যে অনেক নূতনত্বের সন্ধান পাওয়া যায়।

ললিতা—বঙ্কিমচন্দ্রের রচিত 'ললিতা'-কবিতাটির মধ্যে প্রথমে গাথা-কবিতার সুর ধ্বনিত হয়। ইহা আকারে ক্ষুদ্র—কাহিনী-অংশ স্বল্প—সৌন্দর্য্য-রচনায় এবং ভাবাবেগ-প্রকাশে প্রাণময়। কবিতাটির বিজ্ঞাপনে বঙ্কিমচন্দ্র 'ললিতা ও মানস' সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

"সুকাব্যালোচক মাত্রেরই অত্র কবিতাদ্বয় পাঠে প্রতীতি জন্মিবেক যে ইহা বঙ্গীয় কাব্যে রচনা রীতি পরিবর্ত্তনের এক পরীক্ষা বলা যায়। তাহাতে গ্রন্থকার কতদূর সূত্তীর্ণ হইয়াছেন তাহা পাঠক মহাশয়েরা বিবেচনা করিবেন।"

ললিতার মধ্যে রোমাণ্টিক ভাবের প্রথম বিকাশ দেখা যায়। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের প্রতি একটা ব্যাকুলতা এবং তাহারই রহস্যময় পরিবেশের মধ্যে কাহিনীর সূত্রপাত কাব্যটিকে রসঘন করিয়া তুলিয়াছে।

অরণ্যে অন্ধকার—আকাশে চাঁদ। বনান্তরালের ফাঁকে ফাঁকে জ্যোৎস্না ছড়াইয়া পড়িয়াছে। বন্যজন্তুদিগের নিশ্বাস ও পত্র-মর্ম্মর-ধ্বনি অরণ্যকে জীবনময় করিয়া তুলিয়াছে। তাহার মধ্যে একটি করুণ গীতের ধ্বনি ভাসিয়া আসিতেছে এবং অপেক্ষাকৃত ফাঁকা জায়গায় একটি রমণীকে বসিয়া থাকিতে দেখা যাইতেছে—

মিশেছে সে চন্দ্রিকায় ; ভাবে তায় চিত্ত।
শুধু সে স্বপ্নের ছায়া, অসত্য অনিত্য॥ —(৩ পৃঃ)

স্বরধ্বনি শুনিয়া নদীতীরে আসিয়া ললিতা তাহার প্রিয় মন্মথকে পাইল। প্রণয়ের নিমিত্ত ললিতা অরণ্যে পিতা কর্ত্তৃক নির্ব্বাসিত হইয়াছিল। মন্মথ তাহা জানিত না। নিদ্রাভঙ্গে নিজেকে তরীতে দেখিয়া সে যেমন বিস্মিত হইল—তরীতে রক্ষিত পত্র পাঠ করিয়া ততোধিক দুঃখিত হইল। পত্রে লেখা ছিল রাজা তাহার প্রাণবধের চেষ্টা করিতেছেন সুতরাং তাহাকে বাঁচাইবার চেষ্টায় তরীতে তুলিয়া দেওয়া হইল এবং রাজকন্যা ললিতা নির্ব্বাসিতা। পত্র পড়িয়া তাহার অবস্থা—

ভাবি নাই, কাঁদি নাই, কথা নাই আর।
ছাড়ি নাই দীর্ঘশ্বাস, ছাড়িনে হুঙ্কার॥
দেখি নাই, শুনি নাই হলেম পাথর।
জানি নাই নভ নদী ছিল শোভাকর॥ —(৯ পৃঃ)

তাহাদের আশ্রয়-স্থান সন্ধানের মধ্যেও কবি এক অলৌকিক ঘটনার সন্নিবেশ করিয়া কাব্যটিকে রোমাণ্টিক করিবার প্রয়াস করিয়াছেন। অরণ্যে সঙ্গীতধ্বনি শুনিয়া তাহারা অগ্রসর হইয়া একটি নিকুঞ্জের মধ্য হইতে সঙ্গীত আসিতেছে বুঝিয়া নিকুঞ্জে প্রবেশ করিলে কাহাকেও দেখিতে পাইল না এবং সঙ্গীতও বন্ধ হইল। কেবল,—

ললিতার জ্ঞান হলো প্রবেশ সময়।
যেন কোন স্বপ্নে দেখা মত শোভাময়॥
দুই মনোরম রূপ নারী নরাকারে।
দেখিল চকিত মত নিকুঞ্জের ধারে। —(১৮ পৃঃ)

ঐদিন তাহারা ঐ নিকুঞ্জেই রহিল কিন্তু সর্ব্বদা অনুভব করিল—"যেন কোন মেঘ ছায়া পড়িছে ধরায়।"

পরদিন রাত্রে ঐস্থানে নিদ্রিত হইলে এক সঙ্গীত-ধ্বনিতে তাহাদের ঘুম ভাঙ্গিল এবং ঐ কুঞ্জে থাকিবার জন্য দেবতা রুষ্ট হইয়াছেন মনে করিয়া তাঁহার সন্তোষ বিধানের জন্য তাহারা অপর নিকুঞ্জের দিকে অগ্রসর হইল। পূর্ব্বদিনের ন্যায় সেদিনও নিকুঞ্জে প্রবেশমাত্রই গীতধ্বনি বন্ধ হইল এবং দুইটি ছায়ামূর্ত্তিকে চলিয়া যাইতে দেখিল। তৃতীয় ও চতুর্থ রাত্রেও ঐরূপ ঘটনা সংঘটিত হইল। পঞ্চম রাত্রে ললিতা ও মন্মথ গীতধ্বনি শুনিবার জন্য উন্মুখ হইয়া রহিল। নির্দ্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেল, কিন্তু গান শোনা গেল না। চারিদিক্ থম্ থম্

করিতেছে—বিপদের পূর্ব্বাভাস বলিয়া মনে হইতে লাগিল। অকারণেই ললিতা ও মন্মথের চক্ষে জল আসিতে লাগিল—ললিতা ভয়ে মন্মথের ক্রোড়ে মাথা লুকাইল। এমন সময় গভীর গর্জ্জন করিয়া ঝড় আসিল—

গম্ভীর জলদ নাদ, গড়ায় আকাশ ছাদ
থেকে থেকে উচ্চতর স্বনে।
সমুদ্র কল্লোল সোরে, পবন পাগল জোরে,
হুঙ্কারে গরজে প্রাণপণে।
বারেক চঞ্চলতায়, দেখি নীল মেঘ গায়,
কটা মাথা নাড়ে ক্ষিপ্তবন।
পাতা উড়ে ঢাকে ঘনে, পড়িতেছে ঘোর স্বনে
ভীম ভীম মহীরুহগণ॥ —(২৪ পৃঃ)

ঝটিকা থামিলে দেখা গেল ললিতা ও মন্মথ প্রাণ হারাইয়াছে। আর আজও সেই অরণ্যে—

এ কাননে গভীর এমন, কে করে রে বাঁশরী বাদন।
অনিবার নিশাভাগে, যেন কার অনুরাগে,
গায় সাধে মনের যাতন॥ —(২৯ পৃঃ)

একটি রহস্যময় পরিবেশের মধ্যে নায়ক-নায়িকাকে আনিয়া অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতির মধ্যে কাহিনীর পরিসমাপ্তি কাব্যটিকে রোমান্টিক করিয়াছে সন্দেহ নাই এবং কাহিনীর শেষেও সুরটিকে ঝঙ্কৃত রাখিতে শেষের পঙ্‌ক্তি কয়টি অতীব মনোজ্ঞরূপে রচিত হইয়াছে। কিন্তু এই রহস্যময়তা আনিবার নিমিত্ত কবি যে অলৌকিকতাকে আশ্রয় করিয়াছেন, তাহাতে যেন বাস্তবতার স্পর্শ নাই—তাই তাহা অলীক মায়াজালের সৃষ্টি করিয়া কাব্যরসকে সমৃদ্ধতর করিতে পারে নাই। কাব্যটি কবির শৈশবকালের রচনা—সুতরাং কিছু দোষ-ত্রুটি রহিবেই। তথাপি নূতন পথিকৃৎ হিসাবে ইহার মূল্য কম নয়।

কাব্যটিতে পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

প্রতিশোধ—১৮৭৮-১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি গাথা-কবিতা রচনা করেন এবং সেগুলি তাঁহার 'শৈশব-সঙ্গীতে' প্রকাশিত হয়। 'প্রতিশোধ' নামক কবিতাটি ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে শ্রাবণ মাসে রচিত হয়।

অন্যান্য গাথা-কবিতাগুলির সহিত রবীন্দ্রনাথের রচনার পার্থক্য সহজেই

অনুভূত হয়। স্বর্ণকুমারী দেবীর গাথা-কবিতায় সহজ ভাষায় সহজ ভাবে আখ্যান-বস্তু বিবৃত হইয়া যে মাধুর্য্য সৃষ্টি করিয়াছে রবীন্দ্রনাথের লেখনীতে সেই গাথা-কবিতা সহজ ভাষার মধ্যে ভাবগভীর বিষয়ের অবতারণা করিয়া একটি নূতন ব্যঞ্জনা ও সুর ধ্বনিত করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ দার্শনিক। তাঁহার কবি-মন কখনই কোন বিষয়বস্তুর বিবৃতিমাত্রে বা ছবি-অঙ্কনে তুষ্ট হয় নাই। প্রতি ঘটনার মর্ম্মমূলে যে চিরন্তন সত্য নিগূঢ়ভাবে বিদ্যমান তিনি তাহারই মর্ম্মোদ্ঘাটন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাই তাঁহার বৃহৎ কাব্যেও যেমন ক্ষুদ্র কবিতাতেও সেরূপ ভাব-ব্যঞ্জনা যেন সমস্ত সুর-ঝঙ্কারকে ছাপাইয়া, আখ্যানবস্তুকে ছাড়াইয়া, গভীর সত্যের সন্ধান দেয়—কবিতা শেষ হইলেও ভাব শেষ হয় না। গাথা-কবিতাগুলিতেও রবীন্দ্রনাথের কবি-মানসের এই বৈশিষ্ট্যটুকু পরিস্ফুট।

মানুষের কোমল বৃত্তির উপর অবুঝ প্রতিজ্ঞার ভার কিরূপে চাপিয়া বসে এবং কিভাবে তাহাকে দিয়া অন্যায় কর্ম্ম করাইয়া সমস্ত জীবনকে ব্যর্থ করিয়া দেয় এই 'প্রতিশোধ'-কবিতাটিতে কবি তাহাই দেখাইতে চাহিয়াছেন। কাব্যের নায়ক বালক-বয়সে পিতার মৃত্যুশয্যায় পিতার আদেশে ছুরিকা স্পর্শ করিয়া পিতৃহন্তার প্রতি প্রতিশোধ লইবার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিল। বয়স অল্প—প্রতিজ্ঞার মর্ম্ম গ্রহণ করিবার মত ক্ষমতা তাহার নাই। কেবল মুমূর্ষু পিতার আদেশে হৃদয়াবেগের মধ্যে সে প্রতিজ্ঞা-বাণী উচ্চারণ করিল। তারপর এই জলন্ত প্রতিজ্ঞা বক্ষে লইয়া অক্লান্তভাবে ভ্রমণ করিতে লাগিল।

ভ্রমিছে কুমার কত দেশে দেশে
ঘুচাতে শপথ ভার। —(৪৫৭ পৃঃ)

যখন সময় আসিল এই প্রতিজ্ঞা তাহার নিকট জীবন-মৃত্যুর পরীক্ষা লইয়া উপস্থিত হইল। মালতীর নিকট আশ্রয় পাইয়া যখন উভয়ে উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট এবং কন্যার পিতা প্রতাপ উভয়ের বিবাহের ব্যবস্থা করিলেন, তখন সেই বিবাহ-বাসরে প্রতাপ ও মালতী অচৈতন্য হইয়া পড়িলে—

সভয়ে কুমার চাহিয়া দেখিল
জনকের উপছায়া—
আগুনের মত জ্বলে দুনয়ন
শোণিত-মাখানো কায়া—

কি কথা বলিতে চাহিল কুমার,
ভয়ে হল কথা রোধ,
জলদ-গভীর স্বরে কে কহিল
প্রতিশোধ প্রতিশোধ।—(৪৬০-৪৬১ পৃঃ)

কুমার পিতৃ-আজ্ঞায় কতবার প্রতাপের বুকে ছুরি বিদ্ধ করিতে অগ্রসর হইল—কিন্তু পারিল না—হাত কাঁপিতে লাগিল। তাহাকে উত্তেজিত করিবার নিমিত্ত গৃহের মধ্যে ধ্বনিত হইতে লাগিল 'প্রতিশোধ', 'প্রতিশোধ'। প্রতাপ ও মালতীর জ্ঞান ফিরিলে কুমার তাহাদের নিকট সব কথা ব্যক্ত করিয়া বলিল,—এতদিন সে পিতৃহন্তার সন্ধান পায় নাই বলিয়া প্রতিশোধ লইতে পারে নাই। প্রতাপ তাহার পিতাকে হত্যা করিয়াছে স্বীকার করিয়া তাহার নিকট মৃত্যু চাহিতে লাগিল—

নিভাও সে জ্বালা—নিভাও সে জ্বালা
দাও তার প্রতিফল—
মৃত্যু ছাড়া এই হৃদি অনলের
নাই আর কোন জল। —(৪৬৩ পৃঃ)

মালতী কুমারের পদতলে পড়িয়া পিতার নিমিত্ত ক্ষমা ভিক্ষা করিতে লাগিল। কুমার কাতর-হৃদয়ে আকাশের পানে চাহিয়া পিতার নিকট ইহাদের নিমিত্ত ক্ষমা চাহিতে লাগিল, যাহারা অনুতাপে দগ্ধ তাহাদের প্রতি প্রতিশোধ লইবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু পিতৃ-আত্মা তুষ্ট হইল না। কুমারের প্রতি শিরা-উপশিরা কাঁপিতে লাগিল। সে উন্মত্তের ন্যায় প্রতাপের বক্ষে ছুরিকা বিদ্ধ করিয়া গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল। মালতী মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল—তাহার জ্ঞান আর ফিরিল না। আর

এখনো কুমার, সেই বন মাঝে,
পাগল হইয়া ভ্রমে। —(৪৬৪ পৃঃ)

মানুষ যেখানে মনুষ্যত্বের ঊর্দ্ধে নীতিকে স্থান দেয় সেখানেই আসে অত্যাচার, অবিচার—তাহা তাহার নিজের জীবনকেও যেমন ছারখার করিয়া দেয়, অপরের জীবনেও তেমনি ধ্বংস আনে। স্নেহে, প্রেমে, অনুরাগে যখন কুমারের হৃদয় পূর্ণ ঠিক সেই সময় বজ্রগম্ভীরস্বরে পিতার আদেশ আসিল। দ্বিধা-সঙ্কোচ আসিয়া তাহাকে পশুপ্রবৃত্তির হাত হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা

করিল। প্রতিজ্ঞার দুরূহতা বুঝিবার ক্ষমতা যখন কুমারের হইল তখন মায়া-মমতা আসিয়া মানবোচিত কর্ম্মে তাহাকে উদ্দীপনা দিতে লাগিল। কিন্তু অবশেষে জয়ী হইল তাহার প্রতিজ্ঞা। প্রতিজ্ঞা রক্ষা না করা পাপ—পিতার আদেশ অমান্য করা পাপ—এই নীতিবোধ তাহার মনুষ্যত্বকে ক্ষুণ্ণ করিয়া তাহাকে দিয়া প্রতাপকে হত্যা করাইল—সঙ্গে সঙ্গে মালতীকেও সে হারাইল এবং নিজেও উন্মাদ হইল।

কবিতাটিতে কোন সর্গ বা অধ্যায়-বিভাগ নাই। সমস্তটাই চৌপদী ছন্দে লিখিত।

লীলা—'লীলা'-কবিতাটি রবীন্দ্রনাথ ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দের আশ্বিন মাসে রচনা করেন। ব্যর্থ প্রেম মানুষকে কতখানি অমানুষ করিয়া তুলে তাহাই কবি ইহাতে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। স্বার্থপরতায় যেখানে মানুষের মন আচ্ছন্ন সেখানে মানুষ পরম প্রিয়জনের অমঙ্গল সাধন করিতেও পশ্চাৎপদ হয় না। যে ভালবাসার মধ্যে কল্যাণবুদ্ধি নাই তাহা মানুষকে ধ্বংসের পথেই লইয়া যায় এবং অপরেরও ক্ষতিসাধন করে।

বিজয় লীলাকে ভালবাসিত—কিন্তু কিছুতেই তাহার মন পাইল না। লীলা রণধীর প্রতি আকৃষ্ট। মানুষের প্রেম ধন-মান-যশ-রূপ-যৌবন কিছুরই অপেক্ষা রাখে না। যাহাকে সে ভালবাসে সে-ই তাহার চোখে অসামান্য হইয়া উঠে। কিন্তু বিজয় এ সত্যকে মানিতে চাহিল না। ক্রোধে ক্ষোভে সে জ্বলিতে লাগিল ও কালিকা-পূজা করিয়া প্রতিজ্ঞা করিল—

> তাহারি শোণিতে মিটায় পিপাসা
> যেন মোর এই কৃপাণ। —(৪৬৯ পৃঃ)

তারপর পথ হইতে ডাকাতি করাইয়া লীলাকে ধরিয়া আনা ও কারাগারে আবদ্ধ করা এবং অবশেষে মিথ্যা প্রতারণা দ্বারা লীলাকে দুঃখার্ত্ত ও বিভ্রান্ত করা—কেবল লীলার জীবনেই অশান্তি দুর্য্যোগ আনিল না তাহাকেও আত্মহত্যায় প্রবৃত্ত করিল। বিজয়ের মুখে রণধীর মৃত্যু-সংবাদ শুনিয়া লীলা যখন নিজ হৃদয়ে ছুরিকা বিদ্ধ করিয়া মুমূর্ষু তখন রণধী যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া তাহার নিকট আসিল ও লীলার অবস্থা দেখিয়া উন্মত্তের ন্যায় হইয়া গেল। লীলার নিকট বিজয়ের প্রতারণার সংবাদে ক্রুদ্ধ হইয়া সে যখন প্রতিশোধ লইতে গেল তখন—

দেখে বিজয়ের মৃতদেহ সেই
রয়েছে পড়িয়া সমর ভূমে।
রণধীর যবে মরিছে জলিয়া
বিজয় ঘুমায় মরণ ঘুমে। —(৪৭৪ পৃঃ)

কবিতাটিতে কোন সর্গ-বিভাগ বা অধ্যায়-বিভাগ নাই। কবিতাটিতে কখনও ক ক খ গ খ রূপে কখনও ক খ খ ক রূপে এবং কখনও চৌপদীর রূপে অন্ত্যপদের মিল দেখা যায়। কবিতাটির মধ্যে একটি ভাবোচ্ছ্বাস কাহিনীর মধ্য দিয়া অনুরণিত হইয়া উঠিয়াছে এবং রোমান্টিক গাথা-কবিতার উপযুক্ত ব্যঞ্জনায় পূর্ণ হইয়াছে।

অপ্সরা-প্রেম—রবীন্দ্রনাথ ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দের ফাল্গুন মাসে 'অপ্সরা-প্রেম' নামক কবিতাটি রচনা করেন।

মানুষের জীবনে বিপর্য্যয় ও ভ্রান্তির শেষ নাই। অপার্থিব শক্তির প্রভাবেও মানুষ অনেক সময় বিভ্রান্ত হইয়া পড়ে। এক অপ্সরা একজন যোদ্ধার প্রেমে পড়িয়া তাহাকে বিপদ্-আপদ্ হইতে রক্ষা করিয়া পূর্ব্বস্মৃতি অপসারিত করিয়া নিজ বাসনা চরিতার্থ করিবার চেষ্টা করে কিন্তু ব্যর্থকাম হয়।

নায়িকার উক্তি—অপ্সরার উক্তি—নায়কের উক্তি—অপ্সসার উক্তি—এই পর্য্যায়ে কবিতাটিতে চারিটি বিভাগ দেখা যায় এবং প্রত্যেক বিভাগে এক একজন তাহার মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছে।

প্রথমে দেখা যায় যোদ্ধা যুদ্ধে গিয়াছে। তাহার পত্নী বাতায়নে বসিয়া স্বামীর প্রত্যাবর্ত্তনের অপেক্ষা করিতেছে। সব গৃহে যোদ্ধারা ফিরিয়া আসিয়া আনন্দ উৎসব করিতেছে কেবল একটি রমণীর প্রতীক্ষার যামিনী শেষ হইতেছে না। বিরহিণী বলিতেছে—

আমিই কেবল একা আছি পড়ে
পরিশ্রান্ত অতি—আশা করে করে
নিরাশ পরাণ আর ত রহে না,
আর ত পারি না, আর ত সহে না,
আর ত সহে না প্রাণে।
এস গো সখা এস গো। —(৪৭৮ পৃঃ)

তারপর অপ্সরার উক্তি হইতে সেই যোদ্ধার প্রতি তাহার প্রণয়ের কথা জানা যায়—

পৃথ্বী নত হয় যাঁহার অসিতে
স্বর্গ যে জন পারেন শাসিতে,
দুরবল এই নারী হৃদয়ের
তাঁহারে করিনু প্রভু। —(৪৮০ পৃঃ)

অপ্সরা যুদ্ধে তাহাকে রক্ষা করিল এবং সমুদ্রে ঝড় উঠিলে গীত শুনাইয়া সমুদ্রকে শান্ত করিয়া যোদ্ধাকে উদ্ধার করিয়া নিজালয়ে লইয়া গেল। তারপর মায়াময় গীত গাহিয়া যোদ্ধার মন হইতে পূর্ব্ব-স্মৃতি অপসারিত করিল। যোদ্ধার জ্ঞান ফিরিলে সে অপলক-দৃষ্টিতে অপ্‌সরার দিকে চাহিয়া রহিল। অপ্‌সরা তাহাকে স্পর্শ করিলে সে চমকিয়া উঠিল—যেন নারীর কোমল স্পর্শ-টুকুও তাহার সহ্য হইল না।

নায়কের উক্তির মধ্যে একটা অ-বোঝার ব্যাকুলতা মূর্ত্তি গ্রহণ করে। তাহার পূর্ব্বস্মৃতি লোপ পাইয়াছে কিন্তু তাহার আভাস তাহাকে বিভ্রান্ত করিয়া তুলে। তাহার অবস্থা—

সহসা ভুলিয়ে যেন গিয়েছে কি কথা!
এই মনে আসে আসে, আর যেন আসে না সে,
অধীর হৃদয়ে শেষে ভ্রমি হেথা হোথা!
এ কি হল, এ কি হল ব্যথা।
... ...
এ যে সব লতাপাতা হেরি চারিপাশে
এরা সব জানে যেন তবু ও বলে না কেন!
আধখানি বলে, আর তুলে তুলে হাসে! —(৪৮৭-৪৮৮ পৃঃ)

পুনরায় অপ্‌সরার উক্তির মধ্যে দেখা যায় নায়কের অশান্ত ভাব দেখিয়া অপ্‌সরাও শান্তি পাইতেছে না। তাহার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইলে সে নায়ককে মুক্তি দিবার বাসনা করিয়া গান করিতেছে—

সোনার পিঞ্জর ভাঙ্গিয়ে আমার
প্রাণের পাখীটি উড়িয়ে যাক্!
সে যে হেথা গান গাহে না,
সে যে মোরে আর চাহে না। —(৪৯০ পৃঃ)

কবিতাটির প্রকাশ-ভঙ্গির মধ্যেও যেমন নূতনত্ব দেখা যায় ভাবধারায়ও

সেরূপ একটি নূতন সুর ধ্বনিত হইয়া উঠে। বিভিন্ন উক্তির মধ্য দিয়া বিভিন্ন ব্যক্তির মনের রহস্যদ্বার উদ্‌ঘাটন করিবার প্রচেষ্টা বাংলা কাব্য-সাহিত্যে বোধহয় ইহাই প্রথম। বিষয়বস্তুর মধ্যেও কোন ধারাবাহিক কাহিনী নাই—কেবল তিনটি নরনারীর মনোভাবের অভিব্যক্তির ভিতর একটি যোগসূত্রে সংযোজিত হইয়া কাহিনী-অংশের আভাস দেয়।

কবিতাটিতে দুইটি গান আছে এবং ত্রিপদী, চৌপদী ও বিভিন্ন ছন্দের মিশ্রণ লক্ষিত হয়।

ভগ্নতরী—'ভগ্নতরী'-নামক গাথা-কবিতাটি রবীন্দ্রনাথ ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে শ্রাবণ মাসে রচনা করেন।

মানুষের জীবনে পুরাতনের সহিত নূতনের দ্বন্দ্ব চিরকালের। মানুষ যখন পুরাতনকে আঁকড়াইয়া ধরে নূতন বার বার আসিয়া ফিরিয়া যায়—তাহার মনের সমস্ত আনন্দ হরণ করে—স্মৃতির খোলসটুকু অবলম্বন করিয়া তাহার দুঃখের দিন কাটিতে থাকে। কিন্তু পরিবর্ত্তনশীল জগতে মানুষের মনেও পরিবর্ত্তন আসে। দুঃখের স্মৃতিও আস্তে আস্তে খসিয়া পড়ে, নূতনের সমাগমে নবীন আনন্দে প্রাণ ভরিয়া উঠে। কিন্তু তাহার মধ্যেও যখন পুরাতন অকস্মাৎ আসিয়া পূর্ব্ববন্ধনের দাবী জানায় তখন সমস্ত আনন্দ মসীলিপ্ত হইয়া উঠে। অনাবিল আনন্দ মানুষের জীবনে দুর্ল্লভ।

'ভগ্নতরী'-কবিতার নায়িকার জীবনে এই ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের ইতিহাস কবি অঙ্কিত করিয়াছেন। প্রেমে সুখী ললিতা ও অজিত নৌকায় যাইবার কালে ঝড় আসিলে ভীত হইল না—উভয়ে হাত ধরাধরি করিয়া জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল—একসঙ্গে তাহাদের মরিতে কোন ভয়-দ্বিধা নাই—সঙ্কোচ নাই। তাহাদের মনের অবস্থা—

কি ভয় মরণে, এক সাথে যবে
মরিবে দুজন মিলে? —(৫০২ পৃঃ)

কিন্তু ভাগ্যদেবীর ইচ্ছা অন্যরূপ। তাহারা মরিল না। ললিতা একটি দ্বীপে অচৈতন্য অবস্থায় পড়িয়া রহিল। অনেকদিন পূর্ব্বে তরী ভগ্ন হইলে সুরেশ ঐ দ্বীপে আশ্রয় লইয়াছিল এবং একাই সেখানে থাকিত। প্রাতঃকালে ললিতাকে দেখিয়া সে গৃহে লইয়া আসিয়া তাহার চেতনা ফিরাইল। ললিতা কিন্তু শান্তি পাইল না। অজিতের কথা ভাবিয়া, পূর্ব্বদিনের কথা সব ভাবিয়া সে

দুঃখের দিনগুলি কাটাইতে লাগিল। সুরেশ যত্ন করিয়া চেষ্টা করিয়া কোন-রূপেই ললিতাকে একটু শান্তি দিতে পারিত না। মন তাহার ব্যথায় ভরিয়া উঠিত—প্রাণপণে সে ললিতার যত্ন করিতে চেষ্টা করিত। তারপর অনিয়ম ও অত্যাচার করিয়া ললিতা যখন অসুস্থ হইয়া পড়িল সুরেশ তখন হৃদয়ের সমস্ত দরদ ও স্নেহ দিয়া তাহার সেবা করিত।

আকুল নয়ন মেলি, কাতর নিশ্বাস ফেলি,
একটিও কথা না কহিয়া,
শিয়রের সন্নিধানে সুরেশ সে মুখপানে,
একদৃষ্টি রহিত চাহিয়া। —(৫০৭ পৃঃ)

তাহার এই অক্লান্ত সেবায় ললিতার তাহাকে দেবতা বলিয়া মনে হইত এবং মনে পরিবর্ত্তন আসিতে আরম্ভ করিল। নূতনের জয়যাত্রা সূচিত হইল। বসন্তের সমাগমে ললিতার প্রাণেও এল নবীন আশা, নূতন প্রণয়—

পুরাণো পল্লব ত্যজি নব কিশলয় যথা
চারিদিকে বনে বনে সাজিয়াছে তরুলতা
তেমনি গো ললিতার হৃদয় লতাটি ঘিরে
নবীন হরিত প্রেম বিকশিত ধীরে ধীরে। —(৫০৯ পৃঃ)

আনন্দে তাহাদের দিন কাটিতে লাগিল। একটি তরী পাইয়া তাহারা দ্বীপ ত্যাগ করিয়া বিপাশার তীরে গৃহ বাঁধিল। ভ্রমণে বাহির হইয়া একদিন ঝড়-জলে পড়িয়া একটি ভগ্ন গৃহে আশ্রয় লইতে গিয়া জীর্ণশীর্ণ অজিতকে দেখিতে পাইল এবং অজিত ও ললিতা উভয়েই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। বাতাস আসিয়া স্তিমিত শিখাটি নিভাইয়া দিল।

কবিতাটিতে পাঁচটি সর্গ রহিয়াছে এবং পয়ার, ত্রিপদী ও চৌপদী ছন্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

খড়্গ-পরিণয়—স্বর্ণকুমারী দেবী 'খড়্গ-পরিণয়' নামক কবিতাটি ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে রচনা করিয়াছিলেন। সেই যুগে গাথা-জাতীয় কবিতা যাহা আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল তাহাদের মধ্যে স্বর্ণকুমারী দেবীর গাথা-কবিতাগুলি বিশেষ খ্যাতি লাভ করে। এই গাথা-কবিতায় কবি প্রেমের পথে বাধা আনিয়াছেন এবং অপ্রত্যাশিতভাবে তাহার পরিণতিও প্রদর্শন করিয়াছেন। ভাষা ও ছন্দ সহজ সরল গতিশীল।

'খড়্গ-পরিণয়ে'র বিষয়বস্তু কবি টডের রাজস্থান-গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন।

আম্বের রাজকন্যাকে চিতোর-যুবরাজ গোপনে বিবাহ করিয়া একটি তরবারি দিয়া যান এবং বলিয়া যান যে তিনি সিংহাসনে আরোহণের পূর্ব্বে সংবাদটি প্রকাশিত হইলে তাঁহার পক্ষে বিপদের সম্ভাবনা। সিংহাসন পাইলেই তিনি অলকাকে লইয়া যাইবেন তরবারি দেখিয়া দেখিয়া অলকার সময় কাটে।

মুক্ত বাতায়নে আসিছে জোছনা
ঝলসে ওই যে কৃপাণ গায়,
এক মনে বালা অনিমেষ চোখে
আপন ভুলিয়া দেখিছে তায়। —(৩৮ পৃঃ)

কিন্তু পিতা বুন্দীরাজ সূর্য্যের সহিত তাহার বিবাহ স্থির করিলে সখীর মুখে রতনের অনেকদিন পূর্ব্বেই রাজ্যপ্রাপ্তির সংবাদ তাহার বক্ষে শেল হানিল। তথাপি সে আশায় বক্ষ বাঁধিল এবং রতনের নিকট পত্র প্রেরণ করিল। বিবাহের দিন সমাগত। পত্রের উত্তর আসিতেছে না। বুন্দীরাজের সহিত তাহার বিবাহ হইয়া গেল—সে নিশ্চল, নির্ব্বাক্। তাহার অবস্থা—

উৎসব আমোদ উথলে চৌদিকে
সে সবে বালিকা মৃতের প্রায়। —(৪৯ পৃঃ)

ফুলশয্যার দিন রণবাদ্য বাজিয়া উঠিল এবং শোনা গেল চিতোর-রাণা যুদ্ধ করিয়া অলকাকে লইয়া যাইবেন। অলকা দুই বিবাহে অনুতপ্ত হইয়া মৃত্যু স্থির করিয়া রতনকে সন্ন্যাসিবেশে আসিবার অনুরোধ জানাইয়া সখীকে পাঠাইল। রতন আসিলে—

আঁখি হতে উৎস ধায়, দিবে না বহিতে তায়,
আটকি রাখিতে তারে চায় প্রাণপণে। —(৫৬ পৃঃ)

সে রতনকে কহিল—

নিশ্চিন্তে মরণ বুকে যেতেছি ঘুমাতে সুখে,
সুখ অশ্রু পড়ে তাই ভেবো না দুঃখেতে কাঁদি।—(৫৮ পৃঃ)

রতন সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিল কিন্তু তাহার বাক্যে আন্তরিকতা ধ্বনিত হইল না। অলকা নিজ সঙ্কল্পে দৃঢ় রহিল। পরদিন প্রাতঃকালে প্রাসাদের ছাদে দাঁড়াইয়া অলকা চিতোর-রাণা ও বুন্দীরাজের মধ্যে যুদ্ধ দেখিল। বুন্দীরাজ

আহত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলে এবং চিতোর-রাণাও অবসন্ন হইয়া ভূমিতে নিপতিত হইলে অলকা সেই তরবারি বাহির করিয়া বলিল—

চিরদিন তরে আছিনু তোমারি,
চিরদিন তরে থাকিব তোরি,
বিবাহ হয়েছে তোর সাথে অসি,
মরিবও তোরে বুকেতে ধরি। —(৭২ পৃঃ)

নিজ বক্ষে অসি বিদ্ধ করিয়া সে-ও মরণকে বরণ করিল। মিলনের আনন্দ-উৎসব বিষাদের বেদনায় আচ্ছন্ন হইল।

কাব্যটির মধ্যে কোথাও কোন জটিলতা সৃষ্টির প্রয়াস নাই। দুইটি নর-নারীর প্রেমের পথে অকস্মাৎ এক বাধা আসিয়া সব ওলট-পালট করিয়া দিল। অলকার প্রেম ও নিষ্ঠাও সার্থক হইল না। চিতোর-রাণার প্রতারণাও ব্যর্থ হইল—বুন্দীরাজের বিবাহের আনন্দও পূর্ণ হইল না। অলক্ষিতে ভাগ্যদেবীর হস্তের কৃষ্ণ যবনিকা সকলের জীবনের সমাপ্তি ঘটাইল।

কবিতাটি পাঁচটি অংশে বিভক্ত। সর্ব্বত্রই চৌপদী ছন্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। সহজ কথায় সহজ ভাবে, সহজ ছন্দে ধীরে কলতান তুলিয়া কবিতাটি আপন প্রবাহ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। স্বর্ণকুমারী দেবীর রচনার এই বিশেষত্বটুকু তাঁহার প্রত্যেক কবিতাতেই লক্ষণীয় এবং গাথা-কবিতা রচনায় ইহাই তাঁহাকে সার্থকতা দান করিয়াছে।

সাশ্রু-সম্প্রদান—স্বর্ণকুমারী দেবী রচিত এই গাথা-কবিতাটি একটি প্রেমিক-হৃদয়ের আত্মত্যাগের মহিমাতে উজ্জ্বল। নলিনী তাহার এক বাল্য-সখার প্রণয়ে আবদ্ধ। সেই বাল্যসখা বিদেশে গেলে তাহারই প্রতীক্ষায় নলিনীর সময় কাটিতে থাকে। ইহার মধ্যে অজিত-নামক একটি যুবক নলিনীকে ভালবাসিয়া ফেলিল, এবং নিজ মনোভাব ব্যক্ত করিয়া নলিনীর অন্তরের কথা জানিয়া মর্ম্মাহত হইয়া পড়িল। নলিনীর বাল্যসখা ফিরিয়া আসিয়া নলিনীর হাতে অজিতের হাত দেখিয়া ভুল বুঝিয়া কোথায় নিরুদ্দেশ হইল। সকলের জীবনেই দুঃখ ঘনাইয়া আসিল।

অনেকদিন পর শিবমন্দিরে নলিনীর সহিত বাল্যসখার সাক্ষাৎ হইলে উভয়ে আনন্দিত-মনে আশ্রয়ের সন্ধানে পথ চলিতে চলিতে একটি ভগ্ন কালিকার মন্দির দেখিল। মন্দিরের বর্ণনাটি সুন্দর—

বিজন একটি বনের মাঝারে
কালের কালিমা মাখিয়া গায়,
দাঁড়ায়ে একটি কালিকা মন্দির
অনিত্যের স্থির প্রতিমা প্রায়। —(২০ পৃঃ)

মন্দিরে পূজারত পুরোহিতকে তাহারা বিবাহ-কার্য্য সম্পন্ন করাইতে অনুরোধ করিলে সে প্রদীপ জ্বালিয়া কন্যার মুখদর্শন করিয়া চমকিত হইল। অজিতকে নলিনী চিনিতে পারিল না। অজিত তাহাদের বিবাহ-ক্রিয়া সম্পন্ন করাইল। তাহার অবস্থা—

একবার শুধু আটকিল কথা,
একবার হিয়া কাঁপিল তাতে,
এক ফোঁটা তার আঁখিজল শুধু
পড়িল তখন বালার হাতে। —(২৩ পৃঃ)

যদিও নলিনীর সহিত তাহার বাল্যসখার মিলন হইল তবু কবিতাটির শেষেও অজিতের হৃদয়-বেদনা যেন পাঠকচিত্তে অনুরণিত হইতে থাকে। ছোট্ট কথায় ছোট্ট ভাবের মধ্যে রসসঞ্চার কবিতাটিকে মনোজ্ঞ করিয়াছে। 'খড়্গ-পরিণয়'-কবিতা অপেক্ষা এই কবিতাটির মধ্যে কবির সূক্ষ্মদৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায় এবং রচনার দিক্ দিয়াও ইহা বেশী হৃদয়গ্রাহী।

কবিতাটিতে তিনটি অংশ আছে ও গীত আছে। ত্রিপদী ও চৌপদী ছন্দের সাবলীল গতি ও ঝঙ্কার ভাবপ্রকাশের উপযোগিরূপে ইহাতে ব্যবহৃত হইয়াছে।

সাধের ভাসান—'সাধের ভাসান' কবিতাটিতে স্বর্ণকুমারী দেবী একটি ব্যর্থ প্রেমে উন্মাদিনী বালিকার হৃদয়ের ছবি আঁকিয়াছেন। সে পথে গান করিতে করিতে যাইতেছে। সামনে নদী প্রবাহিত, দূরে পর্ব্বতশ্রেণী। বেলা তিন প্রহর; রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে। এমন সময় নৌকা হইতে পরিচিত কণ্ঠের গীতধ্বনি শুনিয়া উন্মাদিনী সরলা বিহ্বলা হইয়া পড়িল। তাহার অবস্থা—

কাঁপে যে হৃদয়, বেঁধে যে পরাণে
গানের একটি একটি কথা
এ কি রে বালার বিভল হৃদয়ে
এ কিরে সহসা এ কি রে ব্যথা? —(২৬ পৃঃ)

বিনোদ উন্মাদিনী অবস্থায় সরলাকে দেখিয়া দুঃখিত হইল। তাহার চক্ষু দিয়া

জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। সরলা তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া খানিকক্ষণ কাঁদিল। তারপর কি বলিতে গিয়া বলিতে পারিল না। হঠাৎ এক সময় অনেক ফুল তুলিয়া আনিল ও বিনোদের পায়ে দিয়া কহিল—

ফোটা ফুলগুলি আনিয়াছি তুলি
আঁখি দুটি মেলি, হের গো হের,
এইটি নলিনী, কাহাকে বলিনি
চুপি চুপি আমি এনেছি ধর,
গোলাপটি ওই, মোর হৃদি সই
সে যে তোমা বই হবে না কারো,
হৃদি ধনে ভুলে, তুলেছি বকুলে
সেঁউতির ফুলে পর গো পর। —(৩০ পৃঃ)

এই কথাগুলির মধ্যে-উন্মাদ-অবস্থার আত্মকেন্দ্রিক ভাবটি সুন্দর ফুটিয়া উঠিয়াছে। বিনোদ রবি-শশীকে সাক্ষী রাখিয়া সরলাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিল ও নিজ অঙ্গুরী তাহাকে পরাইয়া দিল। নৌকাতে করিয়া যাইবার কালে বিনোদের মনে আনন্দের সঞ্চার হইল। রাত্রে হঠাৎ ঝড় আসিলে সকলে যখন ভয়ে ব্যাকুল সরলা তখন—

হাসিলে দামিনী,—হাসিছে বালিকা
উথলিয়া ঢেউ উথলে হৃদি,
গরজিলে মেঘ হেসেই আকুল
কি ভয়, কাছেতে বিনোদ যদি। —(৩৫ পৃঃ)

বিনোদও আনন্দে তাহার মাথাটি বক্ষে ধারণ করিয়া গান ধরিল এবং উভয়ে এক সঙ্গে নদীগর্ভে সমাধিস্থ হইল।

কবিতাটি তিনটি অংশে বিভক্ত। ইহাতে দুইটি গান আছে। সমস্তটাই চৌপদী ছন্দে রচিত।

অভাগিনী—স্বর্ণকুমারী দেবী রচিত 'অভাগিনী'-কবিতাটিতে একটি রমণীর প্রণয়নিষ্ঠা অভিব্যক্ত হইয়াছে। দামিনী স্বামীর প্রেম লাভ করিয়া সুখী—পৃথিবীতে তাহার চাহিবার যেন আর কিছুই নাই। স্বামী সংসারের দারিদ্র্য দূর করিবার নিমিত্ত বিদেশে যাইবার বাসনা প্রকাশ করিলে দামিনী কাঁদিয়া স্বামীকে কহিতেছে—

যেও না, যেও না একা ফেলিয়া আমায়,
কি কাজ ঐশ্বর্য্য সুখে তোমারে পাইলে বুকে
অলঙ্কার রত্ন ধন অভাগী না চায়। —(৭৪ পৃঃ)

তথাপি স্বামীকে যাইতে হইল। প্রতীক্ষায় অনেক দিন কাটাইয়া দামিনী যেদিন স্বামীর প্রত্যাবর্ত্তনের সংবাদ পাইল সেদিন মনের আনন্দে সজ্জা করিল—

তুলিয়ে কুঁড়িটি পরিল খোঁপায়
কবরী বেঁধেছে এলান কেশে
নয়নের পাতে এঁকেছে কাজল,
সেজেছে কেমন দেখিছে হেসে। —(৯২ পৃঃ)

কিন্তু আনন্দ মানুষের ভাগ্যে সয় না। সমস্ত রাত অপেক্ষা করিবার পরও স্বামী ফিরিল না। দামিনী শুনিল, স্বামী যে জাহাজে ছিল তাহা জলমগ্ন হইয়াছে। দামিনী মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। এমন সময় তাহার স্বামী আসিয়া আদর করিয়া তাহাকে ডাকিলে সে চক্ষু উন্মীলিত করিল ও স্বামীকে দেখিয়া তাহার অধরকোণে হাসি ফুটিয়া উঠিল। দুঃখের রজনী পোহাইয়া অন্তিমকালে সে শান্তিতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিল। জীবনের কোন আশাই হয়তো তাহার পূর্ণ হয় নাই। যখন পূর্ণ হইবার সময় আসিল তখন তাহাকে ইহধাম ত্যাগ করিতে হইল। তথাপি শেষ মুহূর্ত্তেও তাহার বহু আকাঙ্ক্ষিত স্বামীকে দেখিয়া তাহার ভাগ্যবিড়ম্বিত জীবন নিশ্চয়ই আনন্দলাভ করিয়াছিল।

কবিতাটি তিনটি অংশে বিভক্ত ও চৌপদী ছন্দে রচিত। কবিতাটির মধ্যে দামিনী-হৃদয়ের ব্যাকুল প্রতীক্ষা ও বিরহ-বেদনা যেন মূর্ত্ত হইয়া কাহিনীর সমাপ্তির পরেও পাঠকচিত্তকে ভারাক্রান্ত করিয়া রাখে। কবিতাটির সুষমা ও বৈশিষ্ট্য এইখানেই।

সুরমা—সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার প্রণীত 'সুরমা'-কাব্যটি ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ইহা প্রথমে 'চিকিৎসাতত্ত্ব বিজ্ঞান এবং সমীরণ' পত্রিকার ১ম, ৮ম, ৯ম, ১০ম সংখ্যায় মুদ্রিত হইয়াছিল। কাব্যটি প্রায় লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। সাহিত্য-পরিষদ্ হইতে মুদ্রিত বাংলার 'কবি ও কাব্য গ্রন্থমালা'র প্রথম খণ্ডে কাব্যটি পুনরায় মুদ্রিত হইয়াছে।

ইহা একটি গাথা-কবিতা। প্রেম মানব-হৃদয়ের স্বাভাবিক বৃত্তি—আপনা হইতেই ইহার উৎপত্তি এবং আপন গতিপথেই ইহাই শ্রীবৃদ্ধি। ইহার পথে

কেহই বাধা দিতে পারে না। এই সত্যটুকুই কবি 'সুরমা'-কাব্যে প্রকাশ করিতে চাহিয়াছেন।

বিনোদের প্রতি সুরমার আসক্তিকে তাহার আত্মীয়-স্বজন সুনজরে দেখে নাই। মাতা, পিতা, ভগ্নী সকলেই তাহাকে লাঞ্ছনা করে। সুরমা কহিতেছে—

যেমন ছিলাম পূর্ব্বে নয়নপুত্তলি।
তেমনি হয়েছি নাথ নয়নের ধূলি॥ —(৮৫ পৃঃ)

সুরমার নিকট এই প্রেম কত স্বাভাবিক তাহা তাহার কথা হইতে বুঝা যায়—

কত শত জনে দেখি দোষ নাই তায়।
কেবল কি পাপ নাথ দেখিতে তোমায়॥
... ...
নিশ্বাস সঞ্চারে প্রাণে আপনি যেমন।
প্রেম কি প্রাণের নয় স্বভাব তেমন॥ —(৮৪ ৮৫ পৃঃ)

বিনোদ তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলে যদি তাহাদের সাক্ষাৎ আর না হয় তবে বনে বনে সে বীণা বাজাইয়া সুরমাগীত গাহিবে ও প্রতিধ্বনি তুলিবে। একদিন সত্যই তাহাদের সাক্ষাতের পথ বন্ধ হইল। পিতা সুরমাকে কোথায় বন্ধ করিয়া রাখিলেন। অবশেষে এক নৌকায় এক বৃদ্ধার সাহায্যে পরস্পরের সাক্ষাৎ হইল। বিনোদের আন্তরিকতার পরীক্ষার ছলে বৃদ্ধা সুরমার কণ্ঠহার নদীতে নিক্ষেপ করিলে বিনোদ তাহা উত্তোলনের নিমিত্ত জলে নামে এবং নিমজ্জিত হয়। বৃদ্ধা ভাবিয়াছিল ইহার পর সুরমা বিনোদকে ভুলিয়া যাইবে এবং মাতাপিতার মনোনীত ব্যক্তিকে বিবাহ করিবে। কিন্তু তাহার মনোবাসনা পূর্ণ হইল না। এক মাস পর সেই পথে ফিরিবার কালে সুরমা সেই স্থলে নদীর জলে প্রাণ বিসর্জ্জন করিল।

কাহিনীর মধ্যে বিশেষত্ব কিছু নাই। বিবৃতির ন্যায় ঘটনাটি ব্যক্ত হইয়াছে, সেইজন্য জমিয়া ওঠে নাই। ইহা পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে রচিত। ভাষা সরল। কবিতাটিকে সার্থক রচনা বলা যায় না।

———

নির্ঘণ্ট

গ্রন্থকার

গ্রন্থ